মামা সমগ্র

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মামা সমগ্র

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

তের 'বি' ব্লক বাঙুর এভিন্যু
কলকাতা-সাত লক্ষ পঞ্চান্ন

Mama Samagro
Sanjib Chattapadhya
Rs. : 160 Only.

প্রচ্ছদ—অনুপ রায়
ভিতরের ছবি দেবাশীষ দেব, শংকর বসাক ও প্রণব হাজরা

প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৯ দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০০ ॥ তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৩ ॥ চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৬ ॥ প্রকাশক ঃ ভারতী দত্ত 'পুষ্প' প্রযত্নে ঘোষ লাইব্রেরী, ১৩ ব্লক 'বি' বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা-৭০০ ০৫৫ ॥ বর্ণ গ্রন্থণে ঃ দি এক্‌জিকিউটিভ প্রিন্টার, ৩৭ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ॥

চিঠিপত্র ও যোগাযোগ ঃ ৫৭ 'এ' ব্লক বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা-৭০০ ০৫৫

দাম ঃ ১৬০ টাকা

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় রবিদাকে

(শ্রী রবি ঘোষ, সি.এ.)

আমাদের প্রকাশিত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বই

শ্রেষ্ঠ গল্প
(প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্ব)
মৃগয়া
আকাশ পাতাল
বারুদ
বুলেট
ফেরিওয়ালা
স্বপ্ন
যদি হই মুখ্যমন্ত্রী
জুতো চোর হইতে সাবধান
দ্বিতীয় পক্ষ

কিশোর সাহিত্য

গুপ্তধনের সন্ধানে
বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল
আড়ং ধোলাই

ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বড়মামা ও মেজমামাকে নিয়ে অজস্র কিশোর রচনা। সেগুলিকে একত্র করার এই প্রয়াস আমার বন্ধুবর আশিস দত্তর। তাঁর সৎ প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও সততার গুণে ধীরে ধীরে পুষ্পিত হচ্ছে "পুষ্প"।

আমার লেখা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বড়মামা ও মেজমামা সকলের প্রিয়। বড়মামা ও মেজমামাকে নিয়ে লেখা সমস্ত গল্প এই গ্রন্থে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন আশিস বাবু। কিছু হয়ত পড়ে রইল বাইরে।

অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা এতদিনে বাস্তবায়িত হল। যাঁর কৃপায় সম্ভব হয় এই সব, সেই করুণাময়কে আমার প্রণাম।

১ জানুয়ারী, ১৯৯৯ — সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা

"পশুপ্রেমী বড়মামা"

সূচী

মর্ণিং ওয়াক ৯
গুপ্তধনের সন্ধানে ১৭
বড়দার বেড়াল ৫৩
একদা এক বাঘের গলায় ৫৯
তেঁতুল গাছে ডাক্তার ৯৭
নিজের ঢাক নিজে পেটালে ১১১
বড়মামার মশা মারা ১২৫
বড়মামার দাঁত ১৩১
উৎপাতের ধন চিৎপাতে ১৪২
অবতার ১৫৪
আবিষ্কার ১৬১
ঘুস ১৬৯
বড়মামার মিনেজারি ১৭৭
বড়মামার সাইকেল ১৮৭
বড়মামার বেড়াল ধরা ২০৩
মেজকে বড়র জুতো দান ২১৭
লঙ্গরখানা ২২৮
গরুর রেজাল্ট ২৪৭
বড়মামার বাইক ২৫৭
ফিজিওথেরাপি ২৬৬
বামাখ্যাপার চেলা ২৭১
গোমুখ্যু গোরু ২৭৬
সাপে আর নেউলে ২৮১
মহাপ্রস্থান ৩২৪
বিপাশায় দুই মামা ৩৪৫
রুপোর মাছ ৩৫০
বড়মামার সাপ-লুডো ৩৫৭
সোনার পালক ৩৬৩

বড়মামার সংসার!
-প্রনব

মর্নিং ওয়াক

'জানিস। এসব কুকুর হল জাতের কুকুর। তোর দিশি নেড়ি কুকুর নয়। খাস্ জার্মান শেফার্ড ডগ। মাতৃভাষা জার্মান। অল্প সল্প সংস্কৃত বোঝে। উত্তিষ্ঠত, বললে ওঠে। জাগ্রত বললে ঘেউ করে। প্রাপ্য বরান, বললেই লাফিয়ে বিস্কুট ধরে।'

মেজমামা বললেন, 'সংস্কৃতে এতটা পারদর্শী হওয়ার কারণ?'

বড়মামা হুঁহুঁ করে এক চিলতে ব্যাঙ্গের হাসি ছেড়ে বললেন, 'এই তো ভ্রাতা, তোমার শিক্ষার দৌড়! তুমি একজন নামকরা দর্শনের-অধ্যাপক, তোমার ছাত্র-ছাত্রীরা সব মুড়ি-মুড়কির মতো ডক্টরেট পায় অথচ তুমি জান না, সংস্কৃতের সঙ্গে জার্মানের কি সম্পর্ক। লজ্জা, লজ্জা, আরক্ত বদনে আমার হাঁউ হাঁউ করিয়া ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্য করিবার ইচ্ছা হইতেছে।'

মেজমামা বললেন, 'জল মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায়? অথবা তিন্তিড়ী বারিতে ভাসমান লোচিকার ন্যায়।'

আমি পাশে বসেছিলুম, বড়মামা কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'দ্বিতীয়টা কি রে?'

আমি বললুম, 'এখন যেমন চলছে চালিয়ে যান, আমি পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করে পরে জানিয়ে দেবো। এখন চালিয়ে যান। হেরে যাবেন না।'

ভোরবেলা বাড়ির বাগানে বাঁধান বকুলতলায় বসে এই সব হচ্ছে। আর বড়মামার সবচেয়ে আদরের অ্যালসেসিয়ান কুন্তলা কখন ছুটছে, কখন বসছে। একটু পরেই আমরা চারজন মর্নিংওয়াকে বেরবো। তখন কুন্তলার গলায় একটা বাহারি বগলশ আর খুব দামি চামড়ায় তৈরি লম্বা বেল্ট পরান হবে। বড়মামার হাতে থাকবে খুব সুন্দর একটা ব্যাটন।

মেজমামা তখন আমাকে বলবেন, 'ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ, লর্ড মাউণ্ট ব্যাটন।'

বড়মামা হঠাৎ একটা সত্য কথা বললেন, 'দেখ মেজো, মর্নিংওয়াক-এর চেয়ে মরনিং স্লিপ অনেক ভালো ; ভোরের মিষ্টি ঘুম।'

মেজমামা বললেন, 'সে-কথাটা তো আমি আমার ছাত্রজীবন থেকে শুধু বলে আসছিলুম না করেও আসছিলুম, হঠাৎ তোমারই মাথায় ঢুকলো মর্নিংওয়াক। তার ঠেলায় শরীরটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। জান! কলেজের ক্লাসে আমার কি অবস্থা, থেকে থেকে হাই, বিরাট বিরাট হাই। কাঁহাতক চাপা যায়! তারপর ছেলেবেলা থেকে মা অভ্যাস করিয়েছিলেন, হাই তোলার সময় হাঁ-মুখের সামনে দু আঙুলে টুসকি। সেই অভ্যাস রক্তে চলে গেছে। মনে থাকে না ক্লাসে পড়াচ্ছি, থেকে থেকে হাই তুলছি আর টাস টাস করে টুসকি মারছি। ছাত্র ছাত্রীরা প্রথমে হাসাহাসি করত, এখন তারা সমবেত টুসকি মারে। ভেবে দেখ, তোমার এই মর্নিংওয়াকের জন্যে আমার কি হেনস্তা! আমি একটা হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট!'

বড়মামা বললেন, 'আরে ধুর, সবাই নিজের দুঃখটাকেই বড় করে দেখে, আমার কি হয়েছে শুনবি, আমি এত বড় একজন ডাক্তার...' মেজমামার যা স্বভাব, বড় মামাকে আর এগোতে না দিয়ে বললেন, 'আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।'

অন্য সময় হলে লেগে যেত ধুমধাম। মাসিমাকে ছুটে আসতে হত সব ফেলে, বড়মামা এখন নিজের দুঃখের কথাটা বিনা বাধায় বলতে চান। তাই বললেন, 'বেশ! কোনটা বাদ দেবো বল? ডাক্তার বাদ দিলে বড় থাকে, সেটা বেঠিক কিছু নয়, আমি তোর বড়। আর যদি বড় বাদ দিতে বলিস, তাহলে থাকে ডাক্তার। সেটাও অসত্য নয়। এখন বল, কোনটা থাকবে কোনটা যাবে?'

'বড়টা তুলে নাও, ডাক্তারটা থাক।'

'বেশ, আমি একজন ডাক্তার, আমার কি লজ্জা। রুগির বুকে স্টেথো বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঝুঁকে দেখছিলুম। আমার মাথাটা সামনে ঝুঁকতে ঝুঁকতে রুগির বুকে। মাথা আর স্টেথিস্কোপ দুটোই পড়ে আছে বুকে। রুগির আত্মীয়স্বজন ভাবছে, কেস খুব সিরিয়াস। তোরা তো সবাই জানিস, আমি ফ্ল্যাট হয়ে ঘুমোলে নাকে পাখোয়াজ, আর বসে ঘুমোলে সেইটাই প্রেসার কুকার—সিঁ সিঁ। সবাই ভাবছে, শব্দটা আসছে রুগির বুক থেকে। কতক্ষণ ওইভাবে ছিলুম কে জানে, খেয়াল হতেই মাথা তুলে নিলুম। সবাই করুণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তারবাবু বাঁচবে তো! আমি গম্ভীর মুখে বললুম, কেস খুব সিরিয়াস। ঘরে একটা বিচ্ছু টাইপের বাচ্চা ছিল, সে কেবল বলতে লাগল, ডাক্তারবাবু, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? ডাক্তারবাবু আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'রুগি পুরুষ না রমণী?'

বড়মামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'রমণী!'

মেজমামা বললেন, 'ছি, ছি, ছিছি। তুমি কোনদিন মারধোর খেয়ে মরবে।'

'সবই তো ভাই এই মর্নিংওয়াকের জন্যে!'

'এই উৎপাতটাকে আমাদের জীবন থেকে হাটাও না।'

'উপায় নেই রে ভাই, কুসি আমাদের খাওয়া বন্ধ করে দেবে। তোর আর আমার ভুঁড়ির সাইজ দেখিছিস। তুই চিৎ হয়ে শুয়ে পায়ের আঙুল দেখতে পাস?'

'তুমি পাও?'

বড়মামা খুব দুঃখের গলায় বললেন, 'না, রে ভাই।'

মেজমামা বললেন, 'আমি তো এখনো পাই, পরিষ্কার দেখতে পাই, তাহলে আমার আর মর্নিওয়াকের দরকার কি? কাল থেকে তোমার সঙ্গে আমি আর নেই।'

বড়মামা কুঁক করে খানিক হাসলেন। সেই বিখ্যাত হাসি, যে হাসি শুনলে মাসিমা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'বৎস। একদা আমিও অনুরূপই ভাবিতাম। তাহার পর প্রতিরাত্রেই ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা একপ্রকার বেলুন বিশেষ। বেলুনে ফুঁ মারিতে হয়, ইহা অটোমেটিক। আর একবার বাড়িতে থাকিলে বাড়িতেই থাকিবে, সেই বৃদ্ধি রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। কেশ বৃদ্ধি পাইলে কর্তন করা যায়, উদর বৃদ্ধি পাইলে কিছুই করিবার নাই। আজ তুমি তোমার পদদ্বয় দেখিতে পাইতেছ, অচিরেই আর দেখিতে পাইবে না।'

পেছন দিক থেকে মাসিমার গলা পেয়ে আমরা তিন জনেই চমকে উঠেছি, 'এই তোমাদের মরনিংওয়াক হচ্ছে! মরনিংওয়াক থেকে ইভনিংওয়াক, সেটাও হবে না, যা হবে আমি জানি—স্লিপ ওয়াক। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে হাঁটবে। তোমাদের দুজনের এত কি কথা থাকে বলো তো। সেই কখন উঠেছ। সবাই বেড়িয়ে ফিরছে, তোমরা এখনো বেরতেই পারলে না!'

বড়মামা বললেন, 'খেলতে নামার আগে বড় বড় খেলোয়াড়রা কি করে। ওয়ার্ম আপ। আমরা তাই করছি।'

মাসিমা বললেন, 'বসে বসে ওয়ার্ম আপ? একরপর তো শুয়ে পড়বে!'

মেজমামা বললেন, 'ও ঠিক বোঝাতে পারলে না, ওয়ার্ম আপ নয় মোটিভেসান। মনকে দৃঢ় করছিলুম। প্রাতভ্রমণের সুফল ও কুফল সম্পর্কে দেশ বিদেশের মনীষীদের অভিমত।' ওর অভিমত।'

মাসিমা বললেন, 'ওর আবার অভিমত কী? ও আবার মনীষী হল কবে?'

মেজমামা বললেন, 'আহা, ও ডাক্তার তো! একজন নামকরা বড় ডাক্তার!'

বড়মামা বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, 'কি যে বলিস! বড় কেন ভাই, আমি একজন সামান্য চিকিৎসক।'

মাসিমা বললেন, 'কারো অভিমত শোনার প্রয়োজন নেই, আমার অভিমত শোনো। প্রাতভ্রমণের হাতে হাতে ফল—সুফল ও কুফল। করলে খেতে পাবে, না করলে উপবাস। মাছ, মাংস, ডিম, আইসক্রিম, ফুলকো লুচি, ছোলার ডাল। সেই বুঝে কাজ, এখানে বসে আড্ডা মেরে পুডুক করে পাঁচ মিনিট ঘুরে আসবে—ও চালাকি চলবে না। পাক্কা এক ঘণ্টা জোরে জোরে হাঁটা যতক্ষণ না নাভিশ্বাস বেরোচ্ছে।'

বড়মামা বললেন, 'নাভিশ্বাস বলিসনা বোন! ওটি বেরিয়ে গেলে ডেড বডি। বল, হাঁসফাঁস।'

‘তোমাদের তো দু’পা হাঁটলেই হাঁসফাঁস।’ আমাকে বললেন, ‘তুই কড়া নজর রাখবি, আমাকে রিপোর্ট দিবি। রোব্বারে রোব্বারে আমি ভুঁড়ি মাপব। তখনই ধরা পড়ে যাবে।’

মাসিমা চলে যেতেই দুজনে বলাবলি করলেন খুব দুঃখের গলায়, ‘দেখ ভাই, বোন ভাল, এত কড়া বোন কি ভাল!’

‘বরাত ভাই! সবই মানুষের বরাত!’

গঙ্গার ধারটা ভারি সুন্দর। বিশাল ঘাসে ঢাকা একটা মাঠ। বড় বড় গাছ। গাছের তলায় তলায় বাঁধান বেদী। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। বাঁধা নৌকো, ভাসা নৌকো। বাঁশ থেকে বাঁশে টেনে বাঁধা জাল। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ হোঁত হোঁত করে হাটছেন এপাশ থেকে ওপাশে। এ দিক থেকে ওদিকে তো ও'দিক থেকে এদিক। সারা মাঠ জুড়ে ভয়ঙ্কর এক ব্যস্ততা। এরই মধ্যে একপাশে চলছে জগিং, যোগাসন। কয়েকজন ভীষণ বৃদ্ধ লাঠি ঠুকঠুক করে হাঁটছেন, দু দশ পা হেঁটেই থমকে দাঁড়াচ্ছেন, অসহায় মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। দৃষ্টি কমে এসেছে। দেখার চেষ্টা করছেন সকালটা কেমন! পরস্পর পরস্পরের খবর নিচ্ছেন। পরিচিত জন নিত্যানন্দের ভয়ঙ্কর অবস্থা। বাহাত্তর

ঘণ্টা না কাটলে কিছুই হবে না, বলাই যাবে না, নিত্যানন্দ থাকবে কি যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য, 'আর কি, আমাদেরও ডাক এল বলে।' বলেই লাঠি উঁচিয়ে নবীন শক্তিতে দুজন দুদিকে হাঁটা দিলেন।

বড়মামাকে হাঁটতে হচ্ছে না। কুন্তলা হিড় হিড় করে টানছে, বড় মামা টাল খেতে খেতে তার পেছনে পেছনে চলেছেন। মেজমামাকে দেখে মনে হচ্ছে, মাঠে নয় বাড়ির দোতলার বারান্দায় দার্শনিক চিন্তা নিয়ে পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছেন, নিজের মনেই হাসছেন। এমন একটা জায়গা বেছেছেন যেদিকটা নির্জন। মেজমামার সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলেন না ভয়ে। সবাই জানেন, তিনি পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীতে থাকেন না। আর বড়মামার সঙ্গে কে কথা বলবে। সর্বক্ষণ বিশাল একটা কুকুর হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।

অনেক দিন পরে আজ বেড়াতে এসেছেন সমরবাবু। নামকরা ব্যক্তি। সারা জীবন ইওরোপেই কেটেছে। বৃদ্ধ বয়সে দেশ এমন টান মেরেছে সব ছেড়ে চলে এসেছেন। গঙ্গার ধারের পৈতৃক বাগান বাড়িটি অঢেল টাকায় মেরামত করে জাঁকিয়ে বসেছেন। নিরহঙ্কারী, সদা হাস্যমুখ মানুষ। আমাকে খুব ভালবাসেন।

বড়মামার বিব্রত অবস্থা দেখে সমরবাবু বললেন, 'এটা তো ট্রেন্‌ড ডগ!'

বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'অবশ্যই। ব্যারাকপুরের স্কুল থেকে ট্রেনিং দিয়ে আনা।'

'তা হলে অত কষ্ট করছেন কেন? বিলেতে সায়েবরাও কুকুর নিয়ে বেরোয়, বেল্টটেল্ট বাঁধে না। এ তো কুকুরের অপমান। বেল্ট খুলে দিন। মানুষের মতো স্বাধীন ভাবে ঘুরতে দিন।'

বড়মামা বললেন, 'যদি কামড়ে টামড়ে দেয়।'

'কেন কামড়াবে ট্রেন্‌ড ডগ! দিন খুলে দিন।'

বড়মামার একটু ইতস্তত ভাব ছিল, তবু খুলে দিলেন। আমার মন বললে, কাজটা ভাল করলেন না। কতকগুলো ব্যাপারে কুন্তলার অ্যালার্জি আছে। একটা হল বেড়াল, সে দেশি, বিদেশি সব কুকুরেরই আছে। আর একটা হল গরু। সাদা মতো বিশাল, মন্থর গতি, বোকা বোকা চেহারার, বড় বড় চোখ ওই প্রাণীটিকে দেখলেই ট্রেনিং ফ্রেনিং সব ভুলে কুন্তলা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়।

এমনই বরাত, বেল্টটা খোলা মাত্রই হরেনদের অতি অবাধ্য সেই গরুটা মর্নিংওয়াকে চলে এল। হরেনরা খুব ক্যালাস। বহুবার বলা হয়েছে, ভোরবেলা ওকে মাঠে আসতে দিও না, প্লিজ অনেক অসুবিধে আছে। শোনো না। যে হেতু পার্টি করে, সেই হেতু, সারা দেশ, আইন-কানুন সব তার। দেড় চোখে বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে, কর্কশ গলায় বলবে, কার অসুবিধে, কিসের অসুবিধে! আমার গরুরও মর্নিওয়াক করার রাইট আছে। ওই মাঠটা কারুর একার নয়।

সেই পলিটিক্যাল গরুটি গদাইলস্করি চালে মাঠে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলা তার আদিমতায় ফিরে গিয়ে নেকড়ে বাঘের চেহারা নিল। এইবার পর পর যা হল তার ধারা বিবরণী ঃ

লেজ উঁচিয়ে চার পা তুলে সারা মাঠে গরু ছুটছে গোল হয়ে। কুন্তলা কখনো তার পেছনে, কখনো তার সামনে, যখন সামনে তখন ঝুল কেটে ঘেউ ঘেউ করে তার দৌড়ের দিক পরিবর্তন করে দিয়েই পেছন পেছন ছুটছে। বড়মামা একটা বেদীর ওপর উঠে প্রবল উত্তেজনায় গরুর বদলে নিজেই চিৎকার করছেন, 'হেল্প, হেল্প!' খেয়াল নেই, কুন্তলার বেল্টটা নিজের গলায় চড়িয়েছেন। মেজমামা ধারে কাছে কোথাও নেই, মনে হয় গঙ্গার পাতায় নেমে গেছেন। উত্তেজনা, বিপদ, দুর্যোগ, অশান্তি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, সঙ্গে-সঙ্গে অম্বল, তারপরেই মাথা ধরা। একজন যোগাসনের পর শবাসনে ছিল, গরু তাকে টপকে চলে গেল, ঝাঁপিয়ে গেল কুন্তলা। ভাগ্য ভাল, বুকের মাঝখানে গরুর পা দুটো পড়লেই প্রকৃত শব। দুজন বৃদ্ধের একজন চিৎপাত, লাঠিটা মাঠের মাঝখানে, আর একজন বৃদ্ধ দূরে মোটামুটি নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে, গরুর উপকারিতা ও কুকুরের অনুপকারিতা সম্পর্কে অনর্গল বলে চলেছেন। গরু বৈদিক প্রাণী। বেদের কোথাও কুত্তার উল্লেখ নেই। মহাভারতে একবার মাত্র উল্লেখ আছে, সেও আসল কুকুর নয়, ছদ্মবেশী ধর্ম। একটা বাচ্চা আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় না দেখে তারস্বরে কেঁদে চলেছে, আর তার বাবা একটা বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছেন, ছুট্টে চলে আয়, গাধা কোথাকার ছুটে চলে আসতে পারিছস না!' একজন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দেখছেন তো মেয়েটা ঘাবড়ে গেছে, মাঝমাঠে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে, ঝট করে কোলে তুলে নিয়ে চলে আসুন না!' ভদ্রলোক ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'আপনি আনুন না উপদেশ না দিয়ে!' ভদ্রলোক বললেন, 'মেয়েটা তো আপনার!' তিনি বললেন, 'পরোপকারে আবার আমার তোমার কি? আমার তোমার আসে কোথা থেকে!' কুন্তলা গরু তাড়া করে একটা মজার খেলা পেয়ে গেছে। কুন্তলা বাচ্চা খুব ভালবাসে। সে ফাঁক পেয়ে মেয়েটার সামনে একটুখানি দাঁড়িয়ে মেয়েটার গলা দুটো চুক চুক করে চেটে দিলে। মাঠে রোল উঠল, 'খেয়ে ফেললে, খেয়ে ফেললে।' বড় মামা সবার ওপরে গলা চড়িয়ে চিৎকার করছেন, 'খাচ্ছে না, খাচ্ছে না। চাটছে।' সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য, 'কখনো চেটে খায়, কখনো খেয়ে চাটে।'

স্পট জগিং আর ওয়াকিং এখন রানিং। সব এলোপাতাড়ি ছুটছে। গরুটা এইবার পাশের একটা খানায় হুড়মাড় করে পড়ে গেল। কুন্তলা খানার ধারে দাঁড়িয়ে ঝুল কেটে কেটে ঘেউ ঘেউ করছে। এটা তার আদরের ডাক। যেন বলতে চাইছে, বোকা মেয়ে, আমি তো তোর সঙ্গে খেলা করছিলুম গাধা! কে তোকে খানায় পড়ে যেতে বলেছিল!

সব শান্ত! গরু খানায়। ভ্রমণকারিরা বিশ্রামরত। বড়মামা কুন্তলাকে বেল্টবন্ধ করেছেন। মেজমামা আবার আবির্ভূত হয়েছেন। এইবার শুরু হল দ্বিতীয় পর্ব। হরেনদা লেটরাইজার, কারণ তাঁর ব্যবসাটাই এমন, ভয়ংকর রাত জাগতে হয়। তবে ব্যবসাটা কি পরিষ্কার করে

কেউ বলতে পারে না, তিনিও পারেন না। ঠেলে ঠুলে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। সকালবেলা তাঁর মুখটা বেশ আদুরে আদুরে দেখায়। তাঁর মুখের কনস্ট্রাকসানটা অবিকল চালতার মতো। ভগবান একপিস চালতা গাছ থেকে পেড়ে এনে একটুকরো হোসপাইপ ফিট করে ধড়ে সেঁটে দিয়েছেন।

তিনি খানার ধারে দাঁড়িয়ে জনে জনে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'কি করে হল? কেমন করে হল! মাতালরাই তো মাঝরাতে এটার মধ্যে পড়ে। পরশু রতন পড়েছিল। অ্যাঁ, এই গরুটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে। এই সেদিন দাঁয়েদের পাতকোতে পড়েছিল। দমকল কল করতে হল। এর চেয়ে একটা গাধা পোষা ভাল ছিল!'

বড়মামা আগ বাড়িয়ে বললেন, 'আই অ্যাম সরি হরেন!'

হরেনদা তীব্র প্রতিবাদ করলেন, 'না, না, ডাক্তারবাবু, এইরকম একটা গরুর মতো গরুর জন্যে আপনার সরি হবার কোনো কারণ নেই।'

জনতা বললেন, 'ডাক্তারবাবুর কুকুর তাড়া করে ফেলে দিয়েছে।'

হরেনদা বললেন, 'হতেই পারে না, ওই কুকুর আমি নিউ আলিপুরের কেজরিওয়ালদের বাড়ি থেকে বাচ্চা অবস্থায় এনে ডাক্তারবাবুকে দিয়েছি। ওর বংশলতিকা শুনলে সবাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। ওর ঠাকুরদা ছিল কেনসিংটন প্যালেসে, আর ক্রেমলিন প্যালেস থেকে এসেছিল ওর ঠাকুমা। এ কুকুর সে কুকুর নয় গো দাদা!'

একজন বললেন, 'তাহলে পড়ল কি করে।'

হরেনদা বিপ্লবীর মতো বললেন, 'স্বভাবে পড়েছে। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করে। ও থাক পড়ে, যখন ইচ্ছে হবে উঠে আসবে। আমার এখনো দুঘণ্টা ঘুম বাকি। আমি চাললুম। হেল্‌থ ইজ ওয়েল্‌থ। এই ব্যাটা গরু আমার ওয়েলথ নয়।'

হরেনদার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গুঞ্জন উঠল, 'যা ব্বাবা।'

গরুটা বড় ফ্যাল ফ্যাল চোখে বড়মামার দিকে তাকিয়ে আছে। দু চোখে জলের ধারা। আমার পশুপ্রেমী বড়মামা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন কেন। খানার ওধারে দাঁড়িয়েছিল বড়মামার বড় পেয়ারের পরান আর তার দলবল। ওদের ক্লাবের নাম দুর্গতিনাশিনী। নন পলিটিক্যাল। ব্রত হল, জীবের দুর্গতি দূর করা। কথার কথা নয়, প্রকৃতই করে থাকে। আর যেটা থাকে, সবরকমের কালীপুজো, রক্ষাকালী, ফলহারিনী, রটন্তি। ঢালাও খিচুড়ি ভোগ! পাথরকোঁদা চেহারা পরানের। গঙ্গায় মাছ ধরে। বছরের প্রথম ইলিশটা বড়মামাকে নিবেদন করে যায়। দুর্দান্ত ছেলে।

বড়মামা পরানের দিকে তাকিয়ে শুধু একটি কথাই বললেন, 'অ্যাকশান।'

সঙ্গে, সঙ্গে এসে গেল বাঁশ, দড়ি, প্ল্যাস্টিক শিট, বাণ্ডিল, বাণ্ডিল খড়, সাবান, বালতি, বুরুশ, পাইপ। গরু উঠে এল। বড়মামা ভীষণ আবেগের গলায় বলতে লাগলেন, 'ওমা, তোমার লাগেনি তো মা! তোমার লাগেনি তো মা।'

গরুর ভাষা লেজে। কাদামাখা বিশাল লেজটি সপাং করে ঘুরিয়ে দিল। বড়মামার কর্দম স্নান। পরান বললে 'ডাক্তারবাবু, একটা জিনিস শিখে রাখুন, গরুর লেজের দিকে

কখনো দাঁড়াবেন না, সপাং করে মেরে দেবে। মাথার দিকে দাঁড়াবেন না, গুঁত্তে দেবে। সব সময় দাঁড়াবেন পেটের দিকে।'

জল দিয়ে সাবান মাখিয়ে, খড় ঘষে শুরু হল গরুর চান। কত বছর চান করছে কে জানে। গরুটার সে কি আরাম! বড় মামা হটাৎ বললেন, 'আমাকেও চান করিয়ে দাও। এইসব নিয়ে বাড়ি ঢোকাটা ঠিক হবে না। বেশ তোড়ে জল আসছে পাইপে। প্রাথমিক ধোয়াটা হয়ে যাক। তারপর দেখা যাবে।'

মেজমামা মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলে চলেছেন, 'আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে তো।'

কে কার কথা শোনে, যেন হোলি খেলা হচ্ছে। 'কি আনন্দ! মায়ে পোয়ে স্নান, মায়ে পোয়ে স্নান।' মেজমামা যোগ করলেন, 'স্নানান্তে বিচালি ভোজন।'

এইবার শেষ দৃশ্য। ভিজে সপসপে বড় মামা বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে। অদূরে কুন্তলা বসে, আধ হাত জিভ বের করে হ্যা হ্যা করছে। মেজমামা যথেষ্ট দূরে। সামনে গম্ভীর মুখে মাসিমা।

মেজমামা মিন মিন করে বললেন, 'বিশ্বাস কর, আমি কিছু করিনি। একেবারে ইনোসেণ্ট।'

মাসিমার এক ধমক, 'চুপ্। মর্নিংওয়াক করতে গিয়েছিলে না জলে ডুবতে!'

বড়মামা মিন মিন করে বললেন, 'আমি কিছু করিনি, কুন্তলা...'

মাসিমার আবার ধমক, 'চুপ, মর্নিংওয়াক বন্ধ। কাল থেকে ডল, বৈঠক।'

মেজমামা বললেন, 'পাঁচশো টাকা দিয়ে এসেছে।'

মাসিমা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'গোমাতার পুজো।'

মাসিমা বললেন, 'টাকা খোলাম কুঁচি। আজ থেকে এক মাস তোমাদের দুজনেরই কফি বন্ধ।

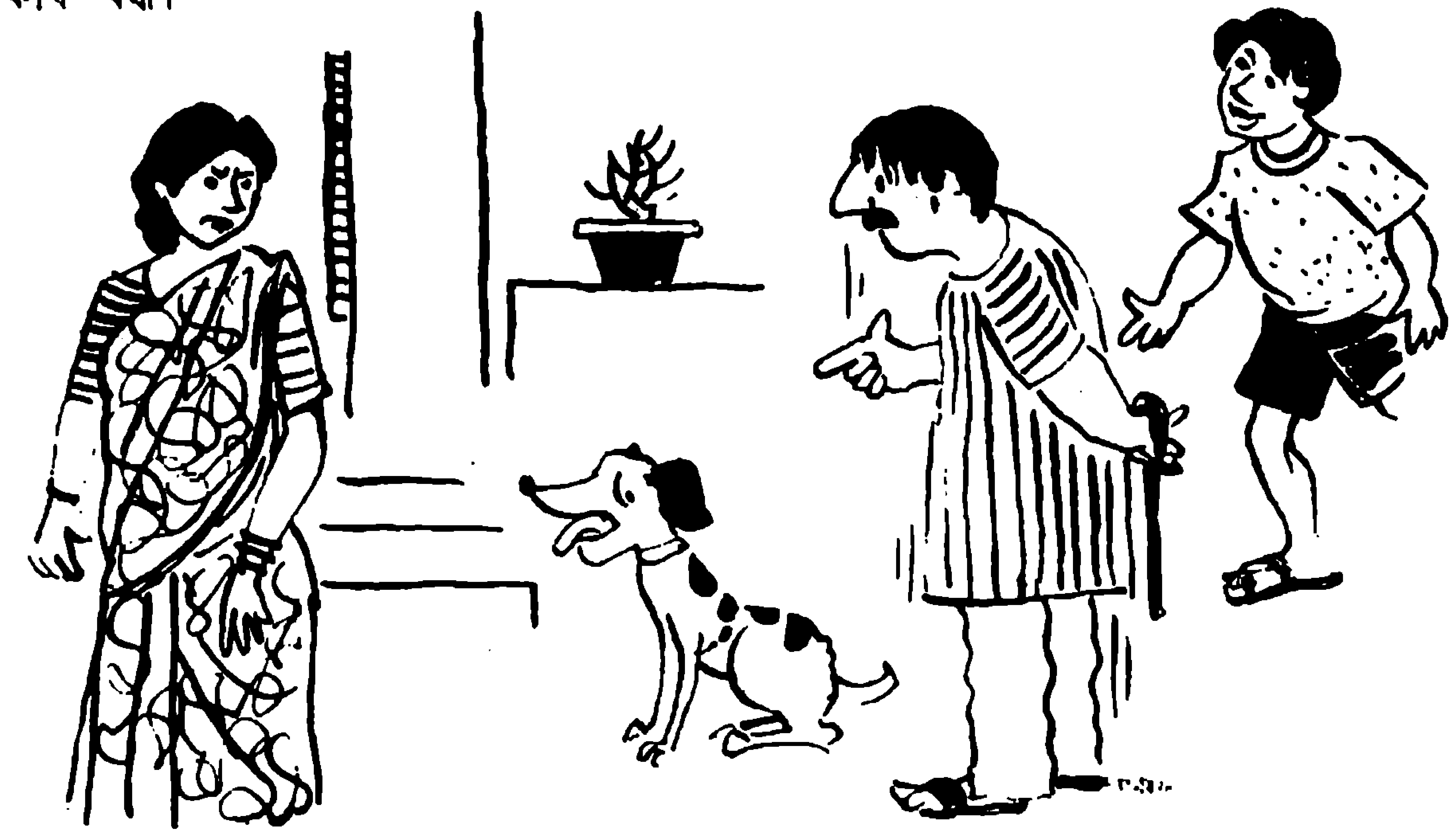

গুপ্তধনের সন্ধানে

রাত তখন কটা হবে কে জানে। চারপাশে ছটফট করছে চাঁদের আলো। হু হু করে বাতাস বইছে। দক্ষিণের জানলায় লতিয়ে ওঠা জুঁই গাছ দুলে দুলে উঠছে। বড়মামা বলছেন, 'ওঠ ওঠ, উঠে পড় শিগগির। ভীষণ ব্যাপার।' বিছানায় উঠে বসলুম। ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। ঘরে তখনও নীল আলো জ্বলছে।

একই বিছানায় বড়মামা গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। বুকের ওপর আড়া-আড়ি পড়ে আছে মোটা সাদা পইতে। নীল আলোয় আরও সাদা দেখাচ্ছে। এক ঝলক চাঁদের আলো নাইলনের মশারি গলে বিছানায় আমাদের পাশে শুতে এসেছিল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে বড়মামা? চোর এসেছে?'

'আরে না রে না, চোর আসবে কোন দুঃখে। ছ'টা ছ'রকমের কুকুর ছ' দিকে পাহারা দিচ্ছে। এলে চোরের নাম ভুলিয়ে দেবে।'

'তবে?'

'স্বপ্ন দেখেছি রে বোকা। ভীষণ এক স্বপ্ন।'

'বাঘ?'

'বাঘ নয়। গুপ্তধন।'

'কোথাকার গুপ্তধন? আফ্রিকার?'

'আজ্ঞে না, এই বাড়িতে। রাশি রাশি গুপ্তধন। নে ওঠ, উঠে পড়।'

'আজই উদ্ধার করবেন?'

একদম বকবক করবি না। ভুলে যাবার আগে স্বপ্নটাকে আবার তৈরি করতে হবে।'

'স্বপ্ন আবার তৈরি করা যায় নাকি?'

'আবার প্রশ্ন?'

'বাঃ আপনিই তো সেদিন বললেন, প্রণিপাতে পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'

'মূর্খ, সেটা হল ধর্মশিক্ষার সময়। বেদবেদান্তের বেলায়। এখন যা বলি তাই কর।'

বড়মামা মশারি তুলে মেঝেতে নামলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি সোফার ওপর ঘুমোচ্ছিল, সেও অমনি তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ে অ্যায়সা গা ঝাড়া দিল, তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে উলটে পড়ে গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। ছোট্ট একটা ডন মেরে নিল। ভেবেছে ভোর হয়েছে। ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। সবে রাত পৌনে তিনটে।

বড়মামা ইজিচেয়ার পাতলেন।

'ইজিচেয়ার কী হবে বড়মামা?'

'স্বপ্নে ছিল।'

'এই যে বললেন গুপ্তধন ছিল।'

'চুপ। একটাও কথা নয়। স্বপ্ন ভুল হয়ে যাবে। যা বলি মুখ বুজে করে যাও? এই আমি ইজিচেয়ারে বসলুম।'

বড়মামা যেই বসলেন, লাকি কোলে উঠে পড়ল। নামাতে গেলুম, বড়মামা বললেন, 'থাক থাক, আমার স্বপ্নে ছিল। তুমি ওই দরজার সামনে দাঁড়াও।'

নির্দেশ পালন করতেই বড়মামা বললেন, 'ভেরি গুড, তুমি হলে মা লক্ষ্মী। তা হলে এই হল গিয়ে তোমার স্বপ্নের ফার্স্ট পার্ট। আমি ইজিচেয়ারে বসে লাকির গায়ে হাত বুলোচ্ছি। বেশ, এই আমি হাত বুলোলুম। দরজার কাছটা হঠাৎ আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল। চমকে তাকাতেই তোমাকে দেখলুম।'

'আমাকে?'

'আহা, তোমাকে কেন দেখব? দেখলুম মা-লক্ষ্মীকে। দরজার সামনে ঝলমল করছেন। তুমি কি ঝলমল করছ? ম্যাড়ম্যাড় করছ। জিজ্ঞেস করলুম, 'মা, আপনি কে? উত্তর দিন।'

'বাবা সুধাংশু, আমি মা-লক্ষ্মী, আমাকে চিনতে পারছ না?'

'ভেরি গুড। ভেরি গুড। অবিকল মা-লক্ষ্মী আমাকে এই কথা বলেছিলেন। তুই কী করে জানলি?'

'তা জানি না।'

'মনে হয় মা তোর ওপর ভর করেছেন। আচ্ছা, এরপর মা কী বললেন বল তো?'

'আমাকে চিনতে পারলে না বাবা সুধাংশু। আমাকে তুমি ঠাকুরঘরের পটে রোজই দেখ। তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কী বর চাও বলো?'

'আঃ ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিকই প্রায় বলেছ, তবে শেষটায় একটু গণ্ডগোল করে ফেলেছ। মা রেগে বললেন, 'ব্যাটা আমাকে তুই চিনবি কী করে? কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। গাড়ি কেনার সময় রোজ আমার পটের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঠুকতে, মা আরও চারটি রুগি এনে দাও, রুগি এনে দাও। মায়ের প্রাণ। সন্তান চাইছে রুগি। ফেরাই কী করে। ঝাঁক-ঝাঁক প্যাঁচা ছেড়ে দিলুম। ফসল খেয়ে ফাঁক করে দিলে। রেশনে পচা চাল এল। খেয়ে সব কাত। তোর রুগি বেড়ে গেল। এখন আর আমাকে চিনবে কেন?'

'আমি অমনি দুম করে লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলুম।'

বড়মামা সত্যি সত্যিই লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। ইজিচেয়ারে মানুষ একবার ঢুকলে সহজে শরীর বের করতে পারে না। ওঠার সময় হাঁচরপাঁচর করতে হয়। বড়মামা কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি তখন মাকে বললুম, মা, পায়ের ধুলো দাও মা, এ দীনের অপরাধ তুমি মার্জনা করো মা। এমনি ভাবে নিচু হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিতে গেলুম।'

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

'আপনি আমার পায়ের ধুলো নেবেন নাকি?'

সামনে ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই বড়মামা বললেন, 'ধ্যার বোকা, ধুলো নেবার আগেই তো মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তুইও অদৃশ্য হয়ে যা।'

'আমি কী করে অদৃশ্য হব? আমি কি স্বপ্ন।'

'গাধা। তুই দরজা খুলে ছাদে চলে যা। চট্ করে যা। কতক্ষণ নিচু হয়ে থাকব? কোমর টনটন করছে।'

'কতদূরে যাব বড়মামা?'

দরজার পাশে লুকিয়ে থাকবে।'

নির্দেশ-মতো ছাদের দরজা খুলে পাশে জুঁইগাছের কাছে গা-ঢাকা দিয়ে রইলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, বড়মামা সামনে আর একটু ঝুকে পড়েই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ কী মা, তুমি গেলে কোথায়? মা, মা!'

আড়াল থেকে আমি বললুম, 'এই যে আমি এইখানে বাবা সুধাংশু।'

স্কুলের থিয়েটারের ডায়ালগ আজ খুব কাজে লেগে যাচ্ছে। বড়মামা কিন্তু ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে এলেন, 'কে তোকে উত্তর দিতে বলেছে! স্বপ্নে মা কি আমায় উত্তর দিয়েছিলেন? মা তো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।'

বড়মামা রেগে গিয়ে গজগজ করতে লাগলেন। আমি কী করে জানব? স্বপ্ন কি আমি দেখেছি, না মামা দেখেছেন। আগে থেকে রিহারশাল দেওয়া না থাকলে অভিনয়ে গোলমাল তো হবেই।

বড়মামা বললেন, 'এইরকম উলটোপালটা করলে স্বপ্ন তৈরি করা যায় না। বারে বারে তুই আমার ভাব নষ্ট করে দিচ্ছিস। দু'একটা উত্তর শুনে ভেবেছিলুম তোর ওপর মা বোধহয় ভর করেছেন। এখন দেখছি সব বোগাস।'

ধমক খেয়ে জুঁইগাছের পাশে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ঠিক আছে। নিজের থেকে আর কিছু করব না। এবার যা বলবেন তাই করব।

বড়মামা দরজার বাইরে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, আমি ছাদে এই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালুম, হ্যাঁ দাঁড়ালুম। তারপর কী হল। মা অদৃশ্য হয়েছেন। চাঁদের আলোয় ফিনিক ফুটছে। কেউ কোথ্থাও নেই। ভীষণ ভয়

করছে। হঠাৎ ওই যে, ওই তো ওইখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি দেখতে পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম। চাঁদের আলোয় মা আমার ঝমঝম করে উঠলেন। কিন্তু কোন্‌দিকে?

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন্‌দিকে বল তো? স্বপ্নে যে দিক ঠিক থাকে না। সব কিছু কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে ছড়িয়ে থাকে।'

একটু আগে ধমক খেয়েছি। অভিমান হয়েছে। আমি বললুম, 'আপনার স্বপ্ন আমি কেমন করে বলব?'

'রাগ করছিস কেন? একটু সাহায্য কর না। গুপ্তধন পেয়ে গেলে হিমালয়ে গিয়ে

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে পায়ের দিকে.........

একটা পাহাড় কিনব। বরফ-ঢাকা পাহাড়। সেই পাহাড়ে টানেল কেটে একটা আধুনিক গুহা বানাব। সেই গুহায় সব-কিছু থাকবে। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, টিভি, লাইব্রেরী, গরম জল, ঠাণ্ডা জল, একটা হেলিপ্যাড, হেলিকপটার। অ্যামেরিকা থেকে ইন্‌জিনিয়ার আনিয়ে জেমস বণ্ড ছবির কায়দায় সব তৈরি করাব। একটু সাহায্য কর না রে। পেয়ে গেলে তোর আর আমার দুজনেরই বরাত ফিরে যাবে। তোর এই ঘ্যানর ঘ্যানর পড়া

আর আমার ওই রোজ ছুঁচ ফোটানো, সব ছেড়ে মনের আনন্দে হিমালয়ে গিয়ে উঠব। চমরিগাইয়ের দুধ চিনি দিয়ে মেরে ঘন করে পাথরের বাটিতে ঢেলে বরফের গর্তের মধ্যে রেখে দোব। জমে আইসক্রিম। রোজ আমরা কাপ কাপ আইসক্রিম খাব। পাহাড়ের গা বেয়ে কাবুলি ফেরিঅলারা হেঁকে যাবে, হিং চাই সুর্মা। সঙ্গে সঙ্গে দশ কেজি বারো কেজি আখরোট, কিশমিশ, খুবানি, মনাক্কা, বাদাম কিনে নোব। আইসক্রিমে একবারে গিজগিজে করে দোব। বল না রে কোন্‌দিকে! এদিকে না ওদিকে?'

'আচ্ছা, মা-লক্ষ্মী যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিকে আর কিছু কি ছিল? পেছনে, সামনে পাশে, মাথার ওপর?'

'দাঁড়া, ভেবে দেখি। হ্যাঁ, মাথার ওপর এসবেসটাসের চালের একটা অংশ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল তারই ছায়া পড়েছিল মায়ের মুখে।'

'ব্যাস্, আর বলতে হবে না। পেয়ে গেছি। ওই যে ওই জায়গাটায়। ঠাকুরঘরের পাশে তুলসীগাছের টবের কাছে।'

'উঃ তোর মাথা বটে। ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, ওখানে গিয়ে একবার দাঁড়া তো!' দূর থেকে দেখি।'

'বড়মামা, আপনি এত সব করছেন কেন? মা লক্ষ্মী কী বললেন, সেইটা মনে পড়লেই তো হয়ে গেল।'

'অ্যায়, ওই জন্যেই তোর ওপর রাগ ধরে যায়। তুই কখনও গাধা কখনও পণ্ডিত। মা-লক্ষ্মী ছাদে দাঁড়িয়ে বললেন, এদিকে আয়।'

'কাছে গেলুম। বললেন, তোদের বাড়িতে গুপ্তধন আছে।'

'আমি বললুম, কোথায় আছে মা?'

'হাসি-হাসি মুখে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশের দেয়ালে হাত রেখে বললেন, এই লিখে দিলুম।'

'কী লিখলেন মনে আছে?'

'মনে হয়, মনে হয়—'

'মনে করুন, মনে করার চেষ্টা করুন।'

'মনে হয়, মনে হয়—' বড়মামা ঘাড় চুলকোতে লাগলেন। 'মনে হয় লিখলেন, ক, খ, গ, ঘ,। ওই জায়গায় চল তো, দেখি সত্যিই কিছু লেখা আছে কি না!'

আমরা দু'জনে ঠাকুরঘরের কাছে গেলুম। ছাদে যেন দুধের মতো চাঁদের আলোর ধারা বইছে। ঠাকুঘরের দেয়ালে অনেকদিন আগে বালির কাজ করা হয়েছিল। বছরখানেক হল রঙ পড়েছে। দেয়ালে কোথাও কোনও লেখা নজরে পড়ল না। বড় ইচ্ছে ছিল মা-লক্ষ্মীর হাতের লেখা দেখব।

বড়মামা ভীষণ হতাশ হয়ে বললেন, 'কী হল বল তো? জায়গাটা মনে হয় ঠিক হল না।'

'স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় বড়মামা, তা হলে পরীক্ষার আগে স্বপ্নে যেসব প্রশ্ন দেখি তার একটাও অন্তত আসত।'

বড়মামা আবার রেগে গেলেন, 'তুমি ঘোড়ার ডিম জানো। লিঙ্কন স্বপ্ন দেখে মারা গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, কোথায় যেন পড়েছি।'

'পড়েছ যখন তখন অবিশ্বাস করছ কেন? ইংল্যাণ্ডে জে ডব্লু ডান নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন, জানো কি?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে স্বপ্নকে অবিশ্বাস করছ কেন?'

'তিনি কে ছিলেন?'

'একজন ইনজিনিয়ার। যা-তা নয়, উড়োজাহাজের ইনজিনিয়ার, বিজ্ঞানী। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন তাঁর হাতঘড়িটা রাত সাড়ে চারটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখলেন, সত্যিই তাই—ঘড়ি সাড়ে চারটে বেজে অচল হয়ে আছে। কী বুঝলে, তোমার কিছু বলার আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'সেই ডানসায়েব আর-একদিন স্বপ্ন দেখলেন, পৃথিবীর কোথাও একটা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে, শত শত লোক লাভাস্রোতে পুড়ে মারা গেছে। মৃতের সংখ্যা চার হাজার। তিনি স্বপ্নে খবরের কাগজের হেডলাইনও পড়ে ফেলেছিলেন। পরের দিন কাগজ খুলেই চমকে উঠলেন, প্রথম পাতার খবর বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন, মার্টিনিতে অগ্ন্যুদ্গার, মৃত চার হাজার। পরের দিন আবার ভ্রম সংশোধন—মৃত চার নয়, চল্লিশ হাজার। তার মানে স্বপ্নে কাগজ পড়ার সময় ডান চল্লিশকে চার হাজার পড়েছেন, শূন্যের গোলমাল। কিছু বলার আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হলে?'

'তা হলে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, কিছু কিছু লেখা আছে যা জলে ভেজালে তবেই পড়া যায়। মা-লক্ষ্মী মনে হয় সেই রকম কোনও কালি ব্যবহার করেছেন। দেয়ালটাকে জলে ভেজালে তবেই পড়া যাবে।'

'আঃ, সাংঘাতিক বলেছিস। তোর মাথাটা আমি বাঁধিয়ে রেখে দোব।'

ঘড়াস করে একটা শব্দ হল। বড়মামা চমকে উঠলেন। ছাদের ও-মাথায় মেজমামার ঘর। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে এলেন। ঘরে আলো জ্বলছে। বড়মামা ঠোঁটে আঙুল রাখলেন, মানে একটাও কথা নয়। মেজমামা কবি মানুষ। দু'পাশে দু'হাত মেলে চাঁদের আলো ধরছেন। সাবান মাখার মতো গায়ে মাখছেন। বড়মামা বললেন, 'গুঁড়ি মেরে মেরে ঘরে চলো। দেখতে না পায়।'

মেজমামা বলছেন, 'কে, কে ওখানে?'

আর কে! আমরা ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিয়েছি। লাকিটা তিন লাফে ঘরে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়েছে।

সকাল বেলার চায়ের টেবিল।

আমার মেজমামা সব সময় ফিটফাট। চোখে ইয়া মোটা পুরু ফ্রেমের চশমা। দু'পায়ের মাঝে চটির ওপর পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে দিশি ধুতির কোঁচা। সামনে বোতাম লাগানো, হাফ হাতা, গোলগলা গেঞ্জি। ধবধব করছে সাদা। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল।

মেজমামা চেয়ারে এসে বসেছেন। কোলের ওপর খবরের কাগজ। মুখ তোলার অবসর নেই। টেবিলে কাপ ডিশ চামচ এসে গেছে। চিনির পাত্র, দুধের পাত্র এসে গেছে, চা এল বলে। বড়মামার দেখা নেই। অন্যদিন বড়মামাই আগে এসে বসেন, আর দানা দানা চিনি খান। আমি জানতুম আজ আসতে একটু দেরি হবে। আমি এখন বড়মামার গুপ্তচর হয়ে বসে আছি। মেজোমামার গতিবিধির দিকে নজর রাখছি। নড়াচড়া কি ওঠার চেষ্টা করলেই যে-কোনও একটা পড়ার প্রশ্ন করব। এই ঘরে মেজমামাকে যেমন করেই হোক আটকে রাখতে হবে। বড়মামা এখন দেয়াল জল দিয়ে ভিজোচ্ছেন। সত্যিই যদি ক, খ, গ, ঘ লেখা ফুটে ওঠে, তা হলে আজ রাত থেকেই শুরু হয়ে যাবে গুপ্তধন খোঁজার কাজ।

মেজমামা কাগজ থেকে মুখ তুলে এদিকে-ওদিক তাকালেন। খুবই সন্দেহজনক। হঠাৎ না উঠে পড়েন! মাসিমা কী করছেন। চা এসে গেলে বাঁচা যায়। কড়া নিয়ম। পাঁচ মিনিট ভিজবেই। মেজমামা উঠে দাঁড়ালেন।

'কী হল মেজমামা?'

'চায়ের এখনও দেরি আছে মনে হচ্ছে। যাই, আর একটা কাজ ততক্ষণ সেরে আসি।'

'না না, দেরি নেই। এখুনি আসবে।'

'কী করে জানলে? চা তো তুমি কর না, চা করে কুসি।'

'মেজমামা, একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে।'

'কী জিনিস?'

'বসুন বলছি।'

'আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনব। তুমি বলো।'

'এই বড়মামা, প্রায়ই আপনার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেন।'

'কী বলে?'

ব্যাস্ ওষুধ ধরে গেছে। মেজমামা বসে পড়লেন, 'কী, বলে কী?'

'বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখার চেষ্টা করাটাই অন্যায়। কিছুই হয় না, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। গোরুর জাবরকাটার মতো।'

‘আচ্ছা, তাই নাকি? উনি এবার ডাক্তারি ছেড়ে কাব্যসমালোচক হলেন। এর নাম কি জান? অনধিকারচর্চা। শুনবে তা হলে আমার একটা কবিতা! কাল সারারাত ধরে লিখেছি। দাঁড়াও, খাতাটা নিয়ে আসি।’

মরেছে রে! এইবার আমি কী করি! মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

‘মেজমামা, আপনি বসুন, খাতা আমি নিয়ে আসছি।’

‘তুমি খুঁজেই পাবে না। সে আমি এক গোপন জায়গায় রেখে এসেছি।’

‘আমাকে বলে দিন, ঠিক নিয়ে আসব। আপনি আবার ওপরে উঠবেন, আবার নিচে নামবেন, কী দরকার!’

‘কেন, আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? গোটা দুয়েক চুল পাকলে মানুষ বুড়ো হয়ে যায়! ঘোড়ার ডাক্তারের ওসব কথায় কান দিও না, পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।’

আর বোধহয় মেজমামাকে আটকানো গেল না, দরজার কাছে চলে গেছেন। বড়মামার এজেণ্ট হিসেবে একেবারে ফেল করেছি। যাক, ভগবান বাঁচালেন। বড়মামা আসছেন। এবার মেজমামা যেখানে খুশি যেতে পারেন। মেজমামা বড়মামার পাশ কাটিয়ে যেতে

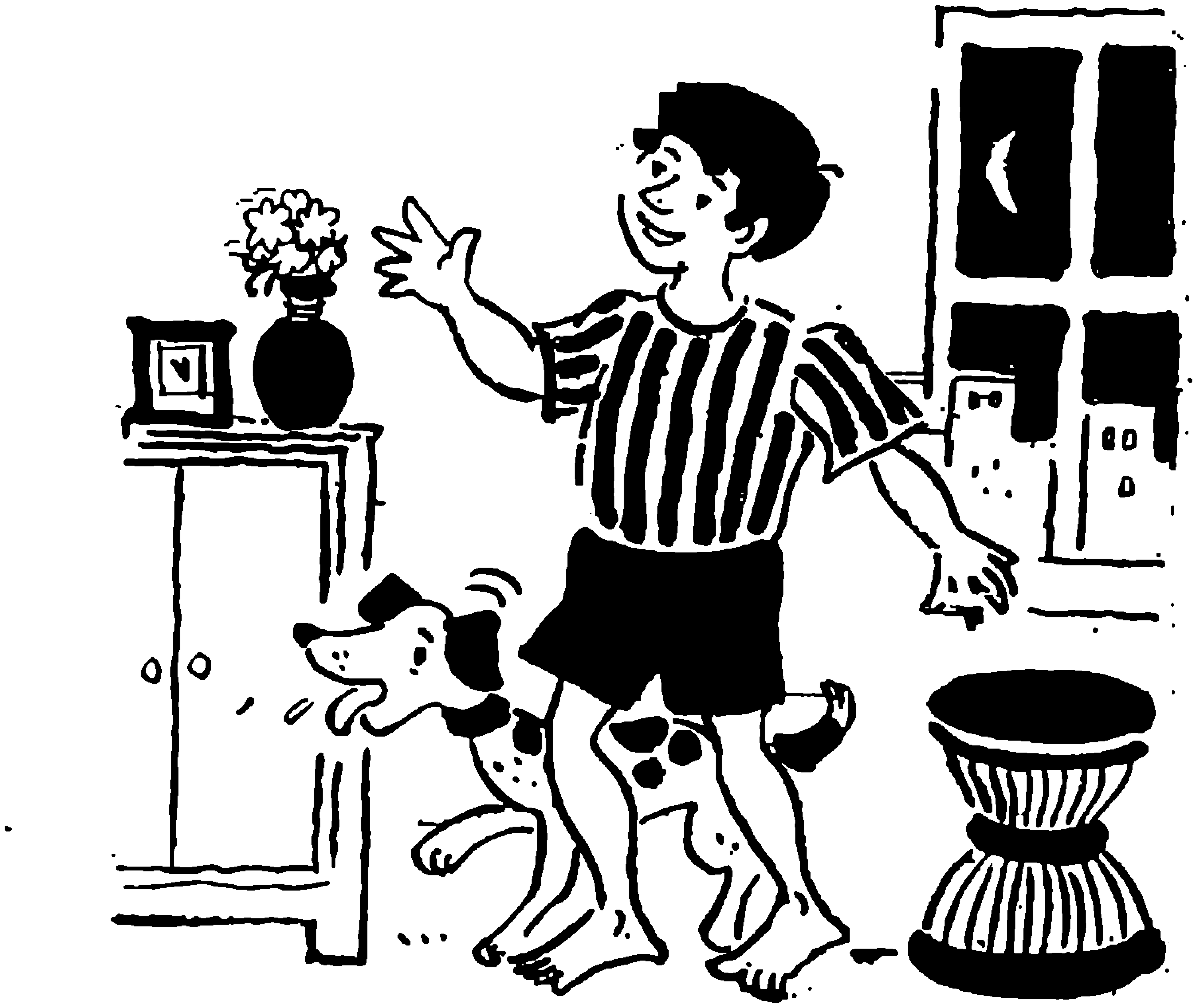

যেতে মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঃ করে একটা শব্দ করলেন। বড়মামা তেমন খেয়াল করলেন না। নিজেই আনন্দেই মশগুল। ঘরে ঢুকে বললেন, 'পেয়ে গেছি, একেবারে স্পষ্ট। স্বপ্ন আমার কোনও দিন মিথ্যে হয়নি, সেই ছেলেবেলা থেকে, স্বপ্ন দেখলুম মাসিমার সিকেতে পুলিপিঠে ঝুলছে। স্পষ্ট স্বপ্ন, যেন কড়িকাঠ থেকে টিকটিকি হয়ে ঝুলতে ঝুলতে দেখছি। স্কুল থেকে ফেরার পথে গিয়ে দেখি, ঠিক তাই।'

'কালির লেখা বড়মামা?'

'মা-লক্ষ্মী কালি কোথায় পাবেন। প্ল্যাস্টারে সব চুলের মতো ফাট ধরেছে। অলৌকিক ফাটল। যেই জল পড়ল অমনি স্পষ্ট ফুটে উঠল, ক, খ, গ, ঘ। কাউকে বলবি না। টপ সিক্রেট।'

'মেজমামাকে আটকাতে পারছিলুম না, তাই আপনার নাম করে রাগিয়ে এতক্ষণ ধরে রেখেছিলুম। এইমাত্র হাতছাড়া হয়ে পালালেন। এখুনি আসছেন কবিতা শোনাতে।'

'উঃ, সর্বনাশ করেছে। এর চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল ছিল রে। কী বলেছিস?'

'সেই রবীন্দ্রনাথ আর এখনকার কালের কবিতা।'

'অন্যায় কী বলেছিস? হেঁকে বল। মাইক নিয়ে বল।'

চা নিয়ে মাসিমা, খাতা নিয়ে মেজমামা প্রায় এক সঙ্গেই ঢুকলেন। মেজমামা খাতা খুলে পড়তে শুরু করলেন—

দিন শেষ হলে রাত আসে
রাত শেষ হলে দিন আসে
আকাশের চাকা অহরহ
ঘুরেই চলেছে, ঘুরছে ॥

বড়মামা কাপের গায়ে চামচে দিয়ে টাং করে একটা শব্দ করে বললেন, 'আহা, অহো!' তারপর নিজেই চারটে লাইন বানিয়ে ফেললেন—

জল জমলে মশা বাড়ে
মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া
কুইনিন খেলে জ্বল ছাড়ে
বড় হয়ে ওঠে পিলে ॥

মেজমামা বললেন, 'ওটা একটা কবিতা হল?'

'তোমারটা যদি হয়ে থাকে, আমারটাও হয়েছে, পরিষ্কার মানে, নিখুঁত অন্ত্যমিল।'

'আর আমারটা?'

'তোমারটা পাগলের প্রলাপ ভাই। বিকারের রুগির প্রলাপ, অনেকটা এই রকম—

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে
ভূতের বেগার খেটে মরে
হাত ঘুরলে নাড়ু পাবে

নইলে নাড়ু কোথায় পাবে ॥'

মাসিমা বললেন, 'মরেছে, সাতসকালেই শুম্ভনিশুম্ভ শুরু হল। পয়সা থাকলে দুটোকেই আমি হস্টেলে পাঠিয়ে দিতুম।'

মেজমামা বললেন, 'দ্যাখো দাদা, সমালোচনা মানে ব্যঙ্গ করা নয়। কবিতার তুমি কী বোঝ হে! পরের চারটে লাইন শুনলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে যেতে ইচ্ছে করবে—

জাঁতায় পড়েছে মানুষ
অহঙ্কারের ফানুস
জীবনের চাপে চোখ ঠেলে আসে
মরণ মরে না তবু ॥'

বড়মামা বললেন, 'অহো, অহো, হৃদয়ের চাপ সহিতে পারি না, বুক ফেটে ভেঙে যায় মা ॥'

মাসিমা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের তর্জা থামাবে, নয়তো ওই দরজা আছে।'

মাসিমার কথায় কাজ হল। দুজনের ঠোঁটই চায়ের কাপের দিকে নেমে এল। মাসিমার কাছে দুজনেই জব্দ।

মেজমামা কয়েক চুমুক চা খেলেন। দু-জানলার বাইরে রোদের দিকে তাকালেন, তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, 'আমার আর কোনও সন্দেহ নেই।' বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বাঃ, এই তো আমার লক্ষ্মী ছেলে, এতদিনে বুঝলে তাহলে, কবিতা লেখা সহজ কাজ নয়।'

মেজমামা বড়মামার কথা কানেই তুললেন না, আপন মনেই বলে চলেছেন, 'এতদিনে, আমি নিঃসন্দেহ, এ বাড়িতে ভূত আছে।'

বড়মামা বললেন, 'অবশ্যই আছে। আমি বহুবার দেখেছি।'

আমার কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, 'খুব ভয় দেখিয়ে দি, আমাদের কাজের সুবিধে হবে। গুপ্তধনের কাজ খুব গোপনে করতে হয়, আমি বইয়ে পড়েছি। ওর চেহারাটা দেখেছিস, ঠিক ভিলেনের মতো। লাস্ট মোমেণ্টে গুপ্তধন নিয়ে সরে পড়তে পারে। তুই আমাকে সাপোর্ট করে যা।'

মেজমামা বললেন, 'ছাদ বড় ডেন্‌জারাস জায়গা বড়দা। সব বাড়ির ছাদেই একটা না একটা কিছু থাকে। গুলি গড়ায়, বল চলে বেড়ায়, পায়ের শব্দ শোনা যায়, ধুপধাপ আওয়াজ হয়। বাড়িতে ওই জন্যে ছাদ রাখতে নেই।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'বললি বটে। ছাদ ছাড়া বাড়ি হয়!'

'কেন হবে না, ঢালু ছাদ কর, টিনের চাল কর, খড়ের চাল কর, যাতে ভূতের পা স্লিপ করে।'

'ভূতের আবার পা হয় নাকি!'

'নিশ্চয়ই হয়, তা না হলে শব্দ করে কী করে! মাঝ-রাতে লোহার বল নিয়ে খেলে

কী করে! কাল রাতে আমি এক জোড়া ভূত দেখেছি। অবিকল মানুষের মতো চেহারা, কেবল সামান্য একটু কুঁজো। কিছু মনে কোরো না বড়দা, ভূতের চেহারার সঙ্গে তোমাদের চেহারার অদ্ভুত মিল আছে। আমি কাল বড় ভূত, ছোট ভূত একসঙ্গে দেখেছি। তবে এও দেখলুম, ভূত মানুষকে ভীষণ ভয় পায়। আমাকে দেখে কুঁজো হয়ে ভূতজোড়া পালাল। পুরোহিতমশাইকে ডেকে একটু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। তিলপড়া, সরষেপড়া জলপড়া।'

শেষ চুমুক চা খেয়ে মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে গটগট করে চলে গেলেন।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো, ঠিক ধরতে পারলুম না হে! এ যেন সেই, তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায় গোছের চরিত্র। সাবধান। স্বপ্নের কথা কেউ যেন জানতে না পারে, বুঝলে।'

বড়মামা নিজের জন্যে আর এক কাপ চা তৈরি করলেন।

মোক্ষদা এসে বললে, 'তিনজন রুগি এসে বসে আছে যে গো! বলছে, ছিরিয়াছ কেছ।'

বড়মামা উদাস সুরে বললেন, 'হ্যাঁঃ, সবই সিরিয়াস।'

ঠাকুরঘরের দেয়ালের প্ল্যাস্টার জলে ভেজালে, চুল-চুল কাটা বেড়ালের নখের আঁচড়ের মতো ফুটে উঠেছে। ভাল করে তাকালে, সত্যিই ক, খ, গ, ঘ, চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। বড়মামাকে মজা করে বলেছিলুম, এখন নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। স্বপ্ন তাহলে সত্যি। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে সব সময় এত বড় একটা সাদা প্যাঁচা ঘোরে। প্যাঁচার বড় বড় নখ আছে। সেই নখের লেখা। মামারা একসময় জমিদার ছিলেন। জমিদারবাড়িতে, রাজবাড়িতে গুপ্তধন থাকে, আমি বইয়ে পড়েছি।

দেখি, মা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে পায়ের ছাপ পড়েছে কি না! নিচু হতেই চকচকে কী একটা নজরে পড়ল। কী রে বাবা! আরে এ যে দেখছি সোনার দুল। মায়ের কান থেকে খুলে পড়ে গেছে। থানায় গিয়ে জমা দেওয়া উচিত। ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি, পরের দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলেও গ্রহণ করা উচিত নয়। এখন আমার কাছে থাক, বড়মামা কলে গেছেন। ফিরে, এলে, পরামর্শ করে যা হয় কিছু করা যাবে।

বেলা দুটো নাগাদ বড়মামা ফিরে এলেন। আশ্বিনের রোদে মুখ-চোখ লাল জবাফুল। এক হাতে ডাক্তারি ব্যাগ, আর-এক হাতে খানচারেক ঘুড়ি। মাসিমা বললেন, "তুমি কি ভিজিটের বদলে টাকা ফেলে ঘুড়ি নিয়ে এলে? অবশ্য গ্রামের ডাক্তাররা লাউ, কুমড়ো, কাঁচকলা ভিজিট পায়। ভালই করেছ।'

অন্যসময় হলে বড়মামাতে মাসিমাতে লেগে যেত। আজ বড়মামার মুখে দেবতার হাসি।

কোনও রকমে খাওয়াদাওয়া সেরে বড়মামা ঘরে এসেই দরজা দিলেন। অন্যদিন এই সময়ে একটু শুয়ে পড়েন, আজ মেঝেতে বাবু হয়ে বসলেন। আমি বড়মামার ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে, জানলায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে, ট্রেজার আইল্যাণ্ড পড়ছিলুম।

তোমার সন্ন্যাসী হয়ে যেতে ইচ্ছে.....

বড়মামা বললেন, 'আয়, নেমে আয়। আমাদের এখন অনেক কাজ। অনেক মাথা খাটাতে হবে। ক খ ক ঘ-র রহস্য উদ্ধার করতে হবে। মা একটা সঙ্কেত রেখে গেছেন। সেই সঙ্গেত উদ্ধার করতে হবে। অনেক ভেবে একটা কোড উদ্ধার করেছি।'

'কোন্‌টা?'

'ঘ। ঘ-এ ঘুড়ি। চারখানা ঘুড়ি কিনে এনেছি।'

'ঘুড়ির সঙ্গে গুপ্তধনের কী সম্পর্ক!'

'উঃ, তোর মতো অশিক্ষিত আমি খুব কম দেখেছি। একটু যদি লেখাপড়া করতিস! রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যকের ধন।'

'আজ্ঞে পড়েছি। ওসবই তো আমি পড়ি।'

'তাই যদি পড় বাছা, তাহলে বোঝ না কেন, গুপ্তধনের আগে সঙ্কেত, পরে একজন কুচক্রী শয়তান, তারপর এক রাউণ্ড ফাইট, তারপর গুপ্তধন। মনে পড়ে গুপ্তধন গল্পে সন্ন্যাসী হরিহরকে যে তুলট কাগজ দিয়েছিলেন, তাতে কী লেখা ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এতবারে পড়েছি একেবারে মুখস্থ—
পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা।
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশান কোণে ঈশানী
কহে দিলাম নিশানী॥'

'বাঃ ফাসক্লাস। ওই ধাঁধা ভেঙে মৃত্যুঞ্জয় কী পেল?'

'আজ্ঞে ধারাগোল, একটা গ্রামের নাম।'

'ভেরি গুড। বুঝলি, বরীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ। এসো, তাহলে আমাদের সংকেতের অর্থটা উদ্ধার করে ফেলার চেষ্টা করি। ক। ক মানে কী?'

'ক মানে ক।'

'তোমার মাথা, ওইজন্যে রাগ ধরে। ক দিয়ে কী কী হয়, কী কী শব্দ, গবেট!'

'আজ্ঞে, কালি, কলম, কাজল, কমলা কয়লা, কলস, কেবল, কলা, কদম, কমল, কুসুম, কালা, কিল, কুল, কাঁটা, কাদা।'

বড়মামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'বড় ডেঁপো হয়ে গেছ।'

'বাঃ, ক-দিয়ে যা যা মনে আসছে বলছি। এই তো বললেন, ক দিয়ে যে শব্দ হয় বলতে।'

'ওভাবে হবে না। অভিধান আনো।'

'মেজমামার ঘরে।'

'ঘরে আছে?'

'না কলেজে।'

'নিয়ে এসো। আনার সময় দেখে আসবে, কী ভাবে রাখা ছিল। ফেস ডাউন অর ফেস আপ, রাখার সময় সেইভাবে রেখে আসতে হবে, যেন ধরতে না পারে। বুঝলে?

অভিধান নিয়ে ফিরে এলুম। বড়মামা বললেন, 'ক-এর এলাকায় ঝট করে একটা পাতা উলটে ফেল। কী পেলি?'

'আজ্ঞে করকচ, করকচি, করকর, করকা, করগ্রহ, করঙ্ক, করঙ্গ, করঞ্জা।'

'ফেলে দে, ফেলে দে। কিস্যু নেই ওতে। হোপলেস, হোপলেস। আবার খোল মুড়ে ঝপাস করে খোল। কী পেলি?'

'আজ্ঞে, কোঁ, কোঁক, কোঁকড়া, কোঁড়, কোঁত, কোঁৎকা।'

'ধ্যাত, তোমার হাতে ভাল কিছু উঠবে না। তখনই সাবধান করেছিলুম, অত মুরগির

ডিম খেও না, গলা দিয়ে কোঁকর কোঁ-ই বেরোবে। দাও, আমার হাতে দাও। তোমার হাত নষ্ট হয়ে গেছে।'

বড়মামা অভিধান নিয়ে ঝট করে একটা জায়গা খুললেন।

'কী পেলেন বড়মামা?'

করুণ মুখে বড়মামা বললেন, 'বীভৎস! কল্কী, কল্ক্য, কল্মষ, কল্মা, কশ, কশা, কশাড়, কশিদা। ফেলে দে, ফেলে দে। এভাবে হবে না। এইসময় বেশ মাথা অলা একজন কাউকে পেলে বেশ হত। ক-তেই এই অবস্থা! এখনও খ আছে, গ আছে, ঘ আছে। আচ্ছা শোন।'

'বলুন।'

'গুপ্তধন তো তোর আমার একার হতে পারে না। করালীরও ভাগ আছে।'

'করালী কে?'

'যকের ধন পড়িসনি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আবার বোকার মত প্রশ্ন করছিস কেন, করালী কে? এ কেসে করালী হয়ে দাঁড়াবে মেজ। প্রথম থেকেই সে পথ মেরে দিতে হবে।'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছিস?'

'আমরা করালী হয়ে যাব। উল্টো রথের মতো, উল্টো যকের ধন লেখা হবে। মেজমামার মাথা ভাল। মেজমামাকে আমরা দলে টেনে নোব। লাস্ট মোমেণ্টে সিন্দুকটা যখন—'

'সিন্দুক নয়, চেন-বাঁধা পেতলের ঘড়া, স্বপ্নে আমি সেইরকমই দেখেছি।'

'আচ্ছা, তাই হোক, সিন্দুকের বদলে যেই ঘড়া বেরোবে, আমরা করালী হয়ে যাব।'

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হল। মেজমামা ফিরলেন।

বড়মামার এক রুগি বড়মামাকে খুব সুন্দর বিস্কুট-রঙের একটা টি-সেট প্রেজেণ্ট করেছে। ভদ্রলোকের মেয়ে সেলাই করতে করতে পাখিছুঁচ খেয়ে ফেলেছিল। বাঁচার আশাই ছিল না। ছুঁচ রক্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও পেটে খোঁচা মারে, কখনও বুকে খোঁচা মারে। বড়মামা কীভাবে যেন বাঁচিয়ে দিলেন। মনে হয়, ম্যাগনেট খাইয়েছিলেন।

বড়মামা ছোটখাটো একটা টি-পার্টি দিয়েছেন। মেজমামা আর মাসিমা নিমন্ত্রিত। সেই বিস্কুট-রঙের টি-সেটের আজ উদ্বোধন হল। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর চানাচুর আছে। এক চুমুক চা খেয়ে বড়মামা বললেন, 'বন্ধুগণ, আজ তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ আছে।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'বন্ধুগণ কী, বন্ধুগণ? তুমি কি নির্বাচনী সভা ডেকেছ?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'শত্রুগণ!'

মেজমামা লাফিয়ে উঠলেন, 'শত্রুগণ! আমি প্রতিবাদে চা-সভা পরিত্যাগ করছি।'

'ও, তুমি দেখি শাঁখের করাত! যেতেও কাট, আসতেও কাট। বন্ধুগণও পছন্দ নয়, শত্রুগণও পছন্দ নয়, তাহলে তোমরা আমার কে? বলে দাও।'

'কেন, ভ্রাতা আর ভগিনী বলা যায় না, ব্রাদার অ্যাণ্ড সিস্টার!'

মাসিমা বললেন, 'সত্যিই, তোমরা দু'জনে একেবারে বিগড়ে গেছ। তোমাদের সংশোধনী স্কুলে দিতে না পারলে মানুষ হবার আশা নেই।'

বড়মামার কানে কানে বললুম, 'করছেন কী? এখন মেজমামাকে চটাচ্ছেন কেন?

আমাদের মাথাটা চাই। তারপর তো করালী হবই।'

বড়মামা বললেন, 'ইস্, একদম ভুলে গেছি। দাঁড়া, সামলে নিচ্ছি। আমার প্রাণের ভ্রাতা, আমার প্রাণের ভগিনী!'

মাসিমা বললেন, 'না না, তোমার মতলব ভাল নয়। সেবারের মতো আবার বাইরে যাবার তালে আছ। আমার ঘাড়ে যত কুকুর, বেড়াল, গোরু, মোষ। ওসব আর আমি সামলাতে পারব না।'

'বৎসে, স্থিরোভব। তোমাদের এখন আমি যে সংবাদ দোব, তা শুনলে তোমরা দু'জনেই তাথৈ তাথৈ করে নৃত্য করবে। আমি এই বাড়িতে অবশেষে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। আমাদের কোনও এক পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার।'

মেজমামা হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ করে গলার এক অদ্ভুত শব্দ করলেন।

বড়মামা বললেন, 'এর মানে?'

মেজমামা এবার পা নাচাতে নাচাতে সেইরকম শব্দ করলেন।

বড়মামা বললেন, 'অবিশ্বাস করছিস?'

মেজমামা এবার নিজেকে ভাঙলেন, 'আমিও পেয়েছি বিগ ব্রাদার!'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ, ক খ গ ঘ।'

বড়মামা চমকে উঠলেন। মুখ দেখে মনে হল চোপসানো বেলুন। আমার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক! তুমি ডবল এজেণ্ট হয়ে বসে আছ!'

'যাব্বা, যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমি কিছুই জানি না বড়মামা। মেজমামাকে আমি কিছুই বলিনি।'

'তাহলে জানল কী করে?'

'তা আমি জানি না, মেজমামাকে জিজ্ঞেস করুন।'

মেজমামা বললেন, 'তুমি যেভাবে জেনেছ, আমিও সেইভাবে জেনেছি। একই স্বপ্ন দু'জনে, একই সময়ে দেখেছি।'

'তা কখনও হয়!'

'এই তো হয়েছে।'

'তুমি ক খ গ ঘ-এর রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছ?'

'তুমি পেরেছ?'

'না।'

'আমিও পারিনি।'

'এসো তাহলে, হাত মেলাও।'

'মেলাও।'

মাসিমা চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, 'নাও, এবার আর এক পাগলামি শুরু হল। বিরাশি সালে গুপ্তধন! লোকে শুনলে হাসবে।'

মাসিমা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দুই মামা বসলেন, রহস্য-সমাধানে।

বড়মামা বললেন, 'তাহলে ক দিয়ে শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ, ক। ক হল এই বাড়ির এমন একটা অংশ যার প্রথম অক্ষর ক। ক এই চৌহদ্দির মধ্যেই আছে, বাইরে কোথাও নেই। নাও, এইবার খুঁজে বের করো। পরিধি অনেক ছোট হয়ে এল কেমন?'

'উঃ, তোর মাথা বটে! নাঃ, কবিতাটা তুই ভালই লিখিস!'

'বলছ! পঁরে আবার মত পালটাবে না তো?'

'নেভার।'

'ভাগনে, ক দিয়ে কী কী আছে, আমরা বলে যাই, তুমি লিখে যাও।'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বলনেল, 'কলাঝাড়।'

'রাইট, কলাঝাড়। এবার লেখো, কয়লার ঘর।'

'রাইট, কয়লার ঘর, লেখো কলতলা।'

'ঠিক, কলতলা। তারপর?'

'তারপর? আর তো কিছু নেই।'

'আচ্ছা, এবার তাহলে খ-এ এসো। এই তিনটে জায়গার কাছাকাছি খ কোথায় আছে?'

আমি বললুম, 'কেন? কলতলার পাশেই রয়েছে খড়ের ঘর।'

দু'মামাই লাফিয়ে উঠলেন, ব্রিলিয়েণ্ট, ব্রিলিয়েণ্ট, এ ছেলে শার্লক হোমস হবে।

মেজমামা বললেন, 'আর কিছু দরকার নেই, বাকিটা জলবৎ তরলং, কলতলায় খড়ে ছাওয়া গোরুর ঘর, ক খ গ ঘ। পেয়ে গেছি বড়দা, আর ভাবনা নেই। নাও চা বলো। মিউজিক, মিউজিক লাগাও।'

বড়মামা চেয়ারের পেছনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওই জন্যেই বলে, ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল।'

বড়মামা একই সঙ্গে রেকর্ডপ্লেয়ারে চাপালেন সেতার আর টেপ-রেকর্ডারে চাপালেন সানাই। মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী হল?'

'কেন? ফার্স্টক্লাস যুগলবন্দী।'

'ও, যুগলবন্দী! যেমন তুমি আর আমি! তাহলে তুমি হলে ওই সানাই, আমি হলুম সুললিত সেতার।'

'তা কেন, তুই হলি সানাই। প্যাঁ করে পোঁ ধরে আছিস, একটু কর্কশ।'

'আমি কর্কশ, আর তুমি হলে মধুর, নিজের সম্বন্ধে তোমার কী উচ্চ ধারণা তাই না!'

'জানিস আমি ডাক্তার! জীবনদান করি।'

'জানো আমি অধ্যাপক। আমি জ্ঞান দান করি বলেই তুমি ডাক্তার।'

'তোর জ্ঞানে মানুষ গোরুর ডাক্তার হয়।'

'তুমি কি নিজেকে তার চেয়ে বড় কিছু ভাবো?'

মাসিমা গট গট করে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, 'তোমরা দু'জনেই বেরোও, বেরিয়ে যাও। যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে বোসো।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তো আমার ঘরেই রয়েছি রে কুসি!'

পুরোহিতমশাই কাঠের চৌকির ওপর বসে কাঁসার গেলাসে চা পান করেছে। পরনে

পট্টবস্ত্র, গলার চাদর। মনে হল এইমাত্র পুজো সেরে উঠে এলেন। এক চুমুক চা খেয়ে, জিবে আর দাঁতে একটা চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'কী বললে ডাক্তার, কী প্রতিষ্ঠা করবে?'

'আজ্ঞে, মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী। লোকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে, দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করে, তুমি কী প্রতিষ্ঠা করবে বললে?'

পুরোহিতমশাইয়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাই মনে হয় এক কথা একশোবার বললে তবেই বুঝতে পারেন। বড়মামা আবার বললেন, 'আজ্ঞে, মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'ও বস্তু তুমি পেলে কোথায়?'

'আজ্ঞে, আমি পেয়েছি। অলৌকিক উপায়ে পেয়েছি। সবই আমার মায়ের দয়া।'

'যাক্, সে আমার জানার দরকার নেই। কোথায় প্রতিষ্ঠা করবে?'

'আমাদের ঠাকুঘরে।'

'বেশ, দেখি, ওই পাঁজিটা আমার হাতের কাছে এগিয়ে দাও।'

আমি পাঁজিটা এগিয়ে দিলুম। পাতার পর পাতা উলটে এক জায়গায় এসে তাঁর চোখ স্থির হল। সামনে ঝুঁকে পড়ে বিড়বিড় করে কী পড়লেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, কাল সকালেই একটা দিন আছে। নটা পনেরো গতে সকাল বারোটা এক।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কালই হোক, খুব ভাল সময়।'

'তাহলে আমি একটা ফর্দ করে দি।'

প্রায় এক ফুট লম্বা একটা ফর্দ হাতে আমরা দু'জন সেই পবিত্র ধাম ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলুম। রহমতুল্লার রিকশা অপেক্ষা করছিল। দু'জনে উঠে বসলুম। বড়মামা ফর্দ পড়তে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলেন, 'একটি স্বর্ণ-সিংহাসন, স্বর্ণ-সিংহাসন মানে সোনার সিংহাসন, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে তো প্রচণ্ড দাম হবে রে!'

'তাতে কী হয়েছে বড়মামা, গুপ্তধন ধরুন পাওয়াই হয়ে গেছে, মায়ের দুল প্রতিষ্ঠার পরই তো আমরা গোয়ালের মেঝে খুঁড়তে শুরু করব, তারপর ট্যাং করে একটা আওয়াজ। শাবল গিয়ে লাগবে ঘড়ার কানায়। গুপ্তধন মানে কী বড়মামা?'

সাঁই সাঁই করে রিকশা ছুটছে। বাতাসে বড়মামার চুল উড়ছে। আমার দিকে অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'যাব্বাবা, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে শেষে এই প্রশ্ন?'

'না, তা নয়, আমি বলছি, সে-যুগের টাকা বেরুলে তো কোনও কাজে লাগবে না, এ যুগে অচল। মোহর বেরুলে, মেজমামা বললেন, গভরন্‌মেনট গুপ্তধন আইন অনুসারে নিয়ে নেবে।'

'মেজ? আবার তুই সেই অপোজিশন ক্যাম্পে চলে গেছিস? মেজ আমার এনিমি। স্বপ্নটপ্ন সব বাজে, তুই-ই তাহলে মেজকে বলেছিলিস?'

'সত্যি বলছি, আমি বলিনি। মা-লক্ষ্মী সেদিন দু কপি স্বপ্ন তৈরি করে, এক কপি আপনার ঘুমে, আর এক কপি মেজমামার ঘুমে ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

রিকশা থেকে বাড়ির সামনে নেমে বড়মামা বললেন, 'আর কতক্ষণ বা সময় আছে, আটটার সময় চেম্বারে বসতে হবে, এদিকে এই আধহাত ফর্দ, কে সামলাবে!'

'আমি আর মাসিমা সোদপুর থেকে করে আনি।'

'ওই যে স্বর্ণ-সিংহাসন, বউবাজার ছাড়া পাচ্ছ কোথায়?'

'বড়মামা!'

ডাকটা মনে হয় বেশ জোরে হল। উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারছি না।

বড়মামা বললেন, 'কী রে? অমন করছিস কেন?'

অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, ওই গুপ্তধনের ঘড়ায় একটা সোনার সিংহাসন আছেই আছে। সেই সিংহাসনে মায়ের কানের দুল বসাবেন। ব্যাস, আর ভাবনা নেই। আগে গুপ্তধন উদ্ধার, তারপর দুল প্রতিষ্ঠা।'

সামনেই মাসিমা। বেশ রাগ-রাগভাবে বললেন, 'গিয়েছিলে কোথায়? থেকে থেকে যাও কোথায়? মাণিকের বাবার এখন-তখন অবস্থা! বেচারা সেই থেকে বসে আছে মুখ শুকিয়ে।'

বড়মামা মাসিমার খুব কাছে গিয়ে, ফিসফিস করে বললেন, 'নব্বইয়ের আগে বুড়ো মরবে না, একশোতেও যেতে পারে। হাঁপানির রুগি সহজে মরে না।'

'তাহলেও একটা রিলিফ তো দিতে পারা যায়। দাঁড়াও, আমার ফাইনাল ইয়ার, একবার পাশ করে বেরুতে দাও, তোমার সব রুগি কেড়ে নোব।'

বড়মামা কম্পাউণ্ডারকে নির্দেশ নিয়ে, মাণিকের বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। একটা ইনজেকশন, আবার মাসখানেক ঠিক থাকবেন বৃদ্ধ।

মাসিমা চা এনেছেন। বড়মামা চা খেয়ে চান করে সাদা প্যান্টের ওপর বুক খোলা টি-সার্ট পরে চেম্বার আলো করে চিকিৎসায় বসবেন। তখন বড়মামার অন্যরূপ। তখন কারুর একটার বেশি দুটো কথা বলার সাহস হবে না। তখন মেজমামা, মাসিমা সকলেই ভয় পাবেন।

বড়মামা মধুর স্বরে ডাকলেন, 'কুসি!'

মাসিমা বললেন, 'আবার কী হল? তোমার গলা শুনেই মনে হচ্ছে, কিছু গোলমেলে ব্যাপার।'

'বোস না, একটু বোস না, সব সময় অমন ধানিপটকার মেজাজে ঘুরিস কেন?'

'কী, বলো?'

মাসিমা বড়মামার চেয়ারের হাতলে বসলেন। বড় মধুর দৃশ্য। আমার মা-ও নেই, বোনও নেই। আমার আমি ছাড়া কেউ নেই।

বড়মামা বললেন, 'বুঝলি কুসি, কাল এ-পরিবারের একটা দিনের মতো দিন, ডে অব অল ডেজ।'

'কেন? কাল আবার কী হল? পক্ষিরাজ কিনছ নাকি?'

মুখে রহস্য মেখে বড়মামা বললেন, 'আমি একটা দুর্লভ জিনিস পেয়েছি। তার দাম? পৃথিবীকে গ্রহজগতের নিলামে চাপালেও হবে না। দুর্লভ, সুদুর্লভ, মহাদুর্লভ!'

'আঃ, বিশেষণ থামিয়ে দয়া করে বলো না, জিনিসটা কী?'

'মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ডিসটেমপারড হয়ে গেছ। কালই চলো সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর গাঙ্গুলির কাছে।'

'চেঁচাচ্ছিস কেন? ঘটনাটা শোন না। যে রাতে স্বপ্নে দেখলুম, ছাদে ঠাকুরঘরের পাশে মা-লক্ষ্মী ইশারায় আমাকে ডাকছেন, তার পরের দিন সকালে বুড়ো দেখে কি, কী একটা চকচক করছে সেই জায়গাটায়। পড়ে আছে এক পাশে। ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝলি? মা হলে কী হবে, মহিলা তো, অনেকটা তোর মতই। দেবলোক থেকে নরলোকে আসার পথে, তাড়াহুড়োয় আংটা ঠিকমতো লাগানো হয়নি, খুস করে খুলে পড়ে গেছে।'

'কই দেখি, জিনিসটা কোথায়?'

'আমি আর হাত দোব না, রাস্তার কাপড়, চায়ের হাত, ওই আলমারিটা খুললে, কাঁচের একটা ট্রের মধ্যে আছে।'

মাসিমা উঠে গিয়ে আলমারি খুললেন। দুলটা দু'আঙ্গুলে দোলাতে দোলাতে আমাদের কাছে এলেন, তারপর নিজের ডান কানে পরে নিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, তুমি ঠিক বলেছ বড়দা, আমি মা-লক্ষ্মীর মতোই কেয়ারলেস। বুড়ো, তোকে আইসক্রিম খাওয়াব। থ্যাঙ্ক ইউ বড়দা।' মাসিমা চলে গেলেন।

মেজমামা বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি হাত মিলিয়েছিলুম, সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, নেতা কে হবে? সব কাজেরই একটা মেথড আছে। আমি খুঁড়তে শুরু করলুম উত্তরে, তুমি শুরু করলে দক্ষিণে, তা তো হয় না! এ একটা বিরাট কাজ। অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মতো! মহেঞ্জোদারো-হারপ্পার ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই আমিই আমাকে নেতা নির্বাচিত করলুম। তুমি আমাকে কখনোই যা করতে না, কারণ তোমার মধ্যে সে উদারতা নেই। তোমার এখনও জমিদারি মেজাজ যায়নি, তোমার মধ্যে কোনও দিন আমি গণতান্ত্রিক নেতার সন্ধান পাইনি। তুমি যেন কাইজার উইলহেল্‌ম, তুমি যেন জার নিকোলাস ওয়ান, তুমি যেন লর্ড চেম্বারলেন—'

'আমি তো তোকেই নেতা করতে চেয়েছিলুম, তার আগেই তুই নরম গরম, গরম গরম কত কী বলে গেলি। এর থেকেই বোঝা যায় তুমি আমাকে একেবারেই ভালবাসিস না।'

'ভালবাসি না? এই তোমার ধারণা? তা হলে শুনে রাখো, আমার প্রথম কবিতার বই তোমাকেই উৎসর্গ করেছি। কী লিখেছি জানো উৎসর্গপত্রে, আমার পিতৃপ্রতিম বড়দাকে।'

'তাই নাকি, তা হলে ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই কথাটা ঠিক নয়।'

'সে এখন তুমি বুঝবে।'

'পাড়ার লোকে কী বলে জানিস, দুটি ভাই যেন রাম-লক্ষ্মণ।'

মাসিমা বললেন, 'গিন্নিবান্নিরা কী বলে জানো, সীতা কোথায়?'

'তোদের ওই এক কথা!'

মেজমামা বললেন, 'শোনো বড়দা, ও সব কথা ছাড়ো, কাজের কথায় এসো। টিমটা আমি ঠিক করে ফেলেছি, আলোকসম্পাতে বুড়ো, মঞ্চসজ্জায় কুসি, রাত্রির প্রথম যামে শাবলে আমি, ঝুড়িতে তুমি, দ্বিতীয় যামে ঝুড়িতে আমি, শাবলে তুমি।'

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'মঞ্চসজ্জাটা কী জিনিস?'

'এই যেমন ধর চা দিলি, মাঝে মাঝে কফি সাপ্লাই করলি, কোকোও করে দিতে পারিস। লাইট স্ন্যাকস। হাতের কাছে জল, তোয়ালে, ফার্স্ট এড। মানে তোর ওপর খুব একটা চাপ পড়বে না, তবে ব্যবস্থাপনা বেশ ভাল হওয়া চাই।'

‘তোমাদের এই পাগলামি করাতে চলবে?’

‘বলতে পারছি না। তদ্দিন চলবে যদ্দিন না ঠং করে একটা আওয়াজ হচ্ছে।’

‘স্বপ্ন নিয়ে এই বাড়াবাড়ি ঠিক হবে?’

‘তুই জানিস, স্বপ্নে গ্লুকোজের ঠিক ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছিল? মলিকিউলের গঠন? স্বপ্নে কত কী পাওয়া গেছে জানিস। কবিতায় পড়িসনি? স্বপ্নে কুললক্ষ্মী এসে মাইকেলকে বলেছিলেন, বাছা, ইংরিজি নয়, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করো।’

মাসিমা বললেন, ‘তোমাদের দেখে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে সাধকপ্রেমিকের সেই

গানটা গাই, হতেছে পাগলের মেলা খেপাতে খেপিতে মিলে। শুধু খেপি শব্দটা পালটে খেপা বসাতে হবে।’

মাসিমা চলে গেলেন। সামনে পরীক্ষা। খুব পড়ার চাপ। এর ওপর গুপ্তধনের উৎপাত। মেজমামা বললেন, ‘বড়দা, গুপ্তধন খুঁড়ে বের করার আগে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হয়। তোমার কাছে গোয়ালঘরের নকশা আছে?’

'গোয়ালের আবার নকশা? কে কবে তৈরি করে গোরু রেখেছিল সেই থেকে চলে আসছে।'

'তা হলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে গোয়ালের একটা ডিটেল্‌স্ তৈরি করা। তুমি গোয়ালে কোনও দিন ঢুকেছ?'

'কতবার।'

'আমি একবারও ঢুকিনি। বিশ্রী বোটকা গন্ধ—'

'তা কেন ঢুকবে? তুমি হলে ভাই সুখের পায়রা। দুধ খাবে, দধি খাবে, গন্ধটি সহ্য করবে না।'

'সে হল গিয়ে যার যেমন বরাত। আচ্ছা গোয়ালটার আগাপাশতলা কি তুমি দেখেছ ভাল করে? কোথায় কী আছে না-আছে?'

'সেই গোয়েন্দার চোখে কোনও দিন দেখা হয়নি। আরে ম্যান, গোরু আগে না গোয়াল আগে!'

'শোনো, কাল আর্লি মর্নিং-এ আমরা গোয়াল সার্ভে করতে যাব। ইতিমধ্যে সার্ভে কীভাবে করতে হয় আমি পড়ে রাখছি।'

'শুনেছি থিওডোলাইট না কী সব যেন লাগে।'

'ধুর, অত সবের দরকার নেই। আসল কথা হল খুঁড়ে যাও। একটা কবিতার প্রথম দুটো লাইন লিখে ভীষণ আটকে গেছি, পরের দুটো লাইন পেয়ে গেলে এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতুম এখুনি।'

'বল না, লাইন দুটো বল না, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি।'

'ভাবটা খুব দার্শনিক ধরনের, বুঝলে—'

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে

'গাঁয়ের শ্মশানে চিতা।'

'বাঃ, এ যে দেখছি একেবারে শেষের কবিতা। তুমি এটাকে এখন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ?'

'আর একটা লাইন টপকে দিয়ে, এমন একটা লাইনে শেষে করতে হবে, যার শেষ শব্দ চিতার সঙ্গে মিলে যাবে।'

'তার মানে চিতার সঙ্গে মেলাতে হবে? ছাইয়ে তা হলে চলবে না!'

'না, ছাই-ফাই চলবে না। সেইটাই তো সমস্যা রে দাদা।'

'চিতার সঙ্গে কী মেলে? মিতা। চিতাই মোদের মিতা।'

'কোন্ যুগে পড়ে আছ তুমি? এইট্টি টুতে তুমি অমন একটা লাইন ভাবতে পারলে?'

'দাঁড়া দাঁড়া, এসে গেছে, একেবারে আলট্রা মডার্ন লাইন, শোন তাহলে, পুরোটা কী দাঁড়াচ্ছে,

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে

গাঁয়ের শ্মশানে চিতা
তোমার আমার ভুঁড়ি বেড়ে চলে
মাপিতে পারে না ফিতা ॥'

'বল কেমন হল?'

'একসেলেন্ট, একসেলেন্ট!'

'অর্থটা কী মারাত্মক হল জানিস? মৃত্যুতেই মানুষের শেষ। হবেই হবে, তবু আমরা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে ভুঁড়ি বাগিয়ে চলেছি।'

'কামাল কর দিয়া ম্যান। মানুষের কান মলে ছেড়ে দিয়েছ।'

মেজমামা নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড়মামা বললেন, 'লোকটাকে এখনও ঠিক চিনতে পারলুম না।'

'কার কথা বলছেন বড়মামা?'

'তোমার ওই মেজমামা।'

'মেজমামাকে লোক বলছেন?'

'কেন, ও লোক নয়?'

'হ্যাঁ, লোক, তবে ভদ্রলোক বললে ভাল হয়।'

'আরে রাখ, নিজের ছোট ভাই আবার ভদ্রলোক? তোকে আরও কয়েকদিন গুপ্তচরবৃত্তি করতে হবে। প্রফেসারকে বিশ্বাস নেই। সব না বানচাল করে দেয়!'

'উনি তো ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিলেন।'

'জানলা তো খোলা আছে।'

'তা আছে!'

ছাদের দিকে জানলায় পাতলা পর্দা ঝুলছে। ঘরে শেড লাগানো টেবল ল্যাম্প ঝুলছে। ঝুলছে কেন? এ বাড়ির সবই অদ্ভুত। টেবিলে ল্যাম্প রাখার জায়গা নেই। অসাধারণ উপায়ে সেটাকে দেওয়ালের হুকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মেজমামা টেবিলে একবার করে তাল বাজাচ্ছেন আর খাতায় একটু একটু লিখছেন। বীরেরা তাল ঠুকে যুদ্ধ করে, ইনি তাল ঠুকে লিখছেন। বড় বড় লোকের বড় বড় ব্যাপার। আমার খুব মজা লাগছে। আড়াল থেকে মানুষকে নজরে রাখলে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন লেখার তাল আছে। পেনসিল শুধু ছোটরাই চিবোয় না। বড়রা বড় জিনিস চিবোয়, যার দাম আরও বেশি, পার্কার কলম। লিখতে গেলে মাঝে মাঝে মাথা চুলকোতে হয়। ওদিকে-ওদিকে তাকাতে হয় বোকার মতো। মাথায় ভাল কিছু এসে গেলে শরীর আর মাথা দোলাতে হয়।

মেজমামাকে দেখতে দেখেতে মনে হচ্ছে, কবিতা লেখা ভীষণ কঠিন কাজ। এক সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ঘরে একটা স্টিল আলমারি রয়েছে। আলমারিটা খুললেন। লোহার পাল্লা ঝনঝন করে উঠল। মেজমামা নিচু হয়ে একেবারে তলার খোপ থেকে

কী একটা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। হাতে একটা পুরানো খাতা। ফিতে দিয়ে বাঁধা।

টেবিল ল্যাম্পের তলায় খাতাটা ফেললেন। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে পাঁপড় ভাজার মতো হয়ে গেছে। মেজমামা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ওপাশে খট্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলেন। খাতাটাকে লুকোবার চেষ্টা করলেন।

তার মানে? এ খাতা তেমন নিরীহ খাতা নয়। ওর পাতায় পাতায় অবশ্যই কোনও

তা হলে একটা ফর্দ করে........

গুপ্ত তথ্য আছে? গুপ্তধনের পেছনে এই রকম সব গোপন দলিল থাকে। খবরটা আমার 'বস'-কে দিতে হচ্ছে। বড়মামাকে বস বলতে বেশ মজা লাগল!

বড়মামা সব শুনে বললেন, 'অ্যাঁ, বলিস কী, খুব পুরানো খাতা! অনেকটা ডায়েরির মতো! তা হলে কি, তাহলে কি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হলে সেই।'

'তার মানে, কী সেই?'

'সেই বইয়ে যেমন পড়ি, ওর মধ্যে কোনও রহস্য আছে, কবিতা নেই।'

'ঠিক বলেছিস। কবিতা হল একটা মুখোশ। ও মনে হয় কোনওভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রসন্নকুমারের ডায়েরিটা খুঁজে পেয়েছে। তখন সারা বাংলায় বর্গির হাঙ্গামা চলছে। যার যা ধনসম্পদ সব পুঁতে রাখছে মাটির তলায় গোপন জায়গায়। ডায়েরিতে লিখে রাখছেন সন্ধানের নির্দেশ নিজের জন্যে, উত্তরপুরুষের জন্যে। শুনেছি প্রসন্নকুমারের অনেক কিছু ছিল।'

'তিনি কে ছিলেন বড়মামা?'

'দাঁড়া, গুনে বলি, প্রপ্রপ্রপিতামহ। দেখ তো ঠিক হল কি না? পিতার পিতা—পিতামহ, তস্য পিতা—প্রপিতামহ, তস্য পিতা—প্রপ্রপিতামহ, তস্য পিতা—প্রপ্রপ্রপিতামহ, ক'পুরুষ হল বল তো?'

বাবা! এ যে দেখি আর এক গুপ্তধন!

রাতে মেজমামা ঘোষণা করলেন, 'আজ আর আমি খাব না। নো মিল। পেটের টিউনিং ঠিক নেই। একদিন অফ করে দি।'

মাসিমার ডাকে ঘরের ভেতর থেকেই বললেন। দরজা খুললেন না। মাসিমার পাশে দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'কী হচ্ছে বলো, একটু ওষুধ দিয়ে দি।'

'না না, ওষুধ কী হবে? কথায় কথায় ওষুধ! নাসে, মাসে, উপবাসে।'

'আরে দূর, কারটা কার ঘাড়ে চাপাচ্ছ? ওতে জ্বর সারে, পেটের জন্যে দাওয়াই লাগে। হজমি, অথবা অ্যান্টাসিড।'

মেজমামা বললেন, 'মুড়ি আর ভুঁড়ি।'

বড়মামা বললেন, 'আঃ, আবার ভুল বললে! ওটা হল শরীরের যোগাযোগের কথা। পেটের সঙ্গে মাথা, মাথার সঙ্গে পেটের যোগ।'

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, ডোণ্ট ডিস্টার্ব।'

আমরা খাবার টেবিলে বসতেই বড়মামা বললেন, 'একেই বলে, বিষয় বিষ, বুঝলি কুসি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটার স্বভাব কী রকম পালটে গেল! চোখে পড়ার মতো।'

মাসিমা বললেন, 'খাচ্ছ খাও, তোমাকে আর কারুর সমালোচনা করতে হবে না। বিষয়ের কী দেখলে তুমি?'

'অ্যাঁ, বলিস কি! প্রসন্নকুমার কত লক্ষ কত কোটি টাকা মাটির তলায় পুঁতে রেখে গেছেন, তোর ধারণা আছে!'

'হঠাৎ সেই পূর্বপুরুষকে ধরে টানাটানি কেন? তিনি ছিলেন সাধক মানুষ। সমাধি পেয়েছিলেন। সমাধির ওপর সেই বুড়ো বকুলে আজও ফুল ফোটে। পাঁজিতে জন্মদিন, মৃত্যুদিন লেখা হয়। কত বড় বৈষ্ণব ছিলেন তিনি!'

'তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না, বর্গির হাঙ্গামার সময় সব পুঁতে ফেলেছিলেন মাটিতে।'

'আজ্ঞে না, সব দান করে দিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে না, পুঁতে রেখেছিলেন।'

'তর্ক না করে, তাঁর জীবনীটা পড়ে দেখ।'

'কোথায় পাব?'

'মেজদার কাছে পাবে। মেজদা রিসার্চ করছে, বৈষ্ণব আন্দোলন ও প্রসন্নকুমার।'

খাওয়া শেষ হল। বড়মামা মেজমামার ঘরে গিয়ে টুকটুক করে টোকা মারলেন। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা গলা ভেসে এল, 'এখন আমাকে বিরক্ত না করলেই সুখী হব।'

বড়মামা বললেন, 'কার গলা বল তো! ডক্টর জেকিলের, না মিস্টার হাইডের?'

'কারুর গলাই যে আমি শুনিনি বড়মামা!'

'তোর কল্পনাশক্তি বড় কম। না দেখলে না শুনলে তোর মাথায় কিছু আসে না। পরী কেউ কোনও দিন দেখেছে! ছবি এঁকেছে। নিয়তির গলা কেউ শুনেছে! যাত্রায়, থিয়েটারে সেই না-শোনা গলাই অনুকরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কম্বুকণ্ঠে কথা বলতেন, মানুষ শুনে জানেনি, জেনে শুনেছে।'

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এলুম। গুপ্তধন নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ভাল লাগছে না। বড়মামা মোটা একটা ডাক্তারি বই নিয়ে বসেছেন। বড়মামার এই এক গুণ দেখেছি, কোন কিছুতে একবার ডুবে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। আমারও একটা গুণ আছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর জ্ঞান থাকে না। কোথায় কোন্ জগতে যে চলে যাই।

মনে হয় গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামা ঠেলছেন। ঠেলতে ঠেলতে প্রায় খাটের ধারে এনে ফেলেছেন। শরীরের একটা অংশ ঝুলে পড়েছে। চাঁদের আলোয় চারপাশ ফুটিফাটা।

'ওঠ ওঠ, উঠে পড়।'

'অ্যাঁ, কী হল বড়মামা, আবার স্বপ্ন?'

'ধ্যাত, এবার দুঃস্বপ্ন। শিগগির নিচের বাগানে চল। আমার মনে হচ্ছে, মেজ গোয়ালে গিয়ে ঢুকেছে। গোরুটা যেন ভেও করে ঢেঁকুর তুলল।'

এই অসময়ে আমার আর নীচে নামতে ইচ্ছে করছে না। বড়মামাকে থামাবার জন্যে বললুম, 'দুপুরে চরতে বেরিয়েছিল। মনে হয় খুব গুরুপাক খাওয়া হয়ে গেছে, তাই বদহজম হয়েছে।'

'হ্যাঁ রে ব্যাটা গোবদ্যি, তুই সব জেনে বসে আছিস! গোরু কি মানুষ, যে বদহজম হবে। ফাঁকিবাজ। চল, নীচে চল। আমার একা যেতে ভীষণ ভয় করছে।'

উঠতেই হল। দু'জনেরই ভীষণ ভয়। বড়মামা যদি আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যান, থাকতে পারব না। বাগানে নেমে অবাক হয়ে গেলুম। আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলুম, সেই ফাঁকে কত ফুল ফুটেছে। চারপাশে সাদা হয়ে আছে। গোয়ালঘর জমাট অন্ধকারের মতো দাড়িয়ে আছে একপাশে। কেউ কোথাও নেই। গোরুর নিশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে।

বড়মামা বললেন, 'এই নে টর্চ। গোয়ালের ভেতরটা একবার দেখে আয় তো, কেউ আছে কি না!'

'ওরেবাবা, আমি পারব না বড়মামা, কামড়ে দেবে।'

'কে কামড়াবে?'

'গোরু।'

'গোরু কামড়ে দেবে?' বড়মামা হোহো করে হেসে উঠলেন, 'কোন্ বইয়ে পড়েছিস, গোরু কামরায়!'

'আপনি যাচ্ছেন না কেন বড়মামা!'

'সত্যি কথা বলব? ছোটদের মিথ্যে বলতে নেই। আমারও একটু ভয়-ভয় লাগছে রে! বলা যায় না, যদি কিছু থাকে!'

'কী আর থাকবে?'

'তোমার মেজমামা থাকতে পারে।'

'পারে কেন, আছে। তবে গোয়ালে নেই। আছে এই কাঁঠালতলায়।"

বাজ পড়লে মানুষ কেমন চমকে ওঠে, আমরা দু'জনে ঠিক সেই রকম চমকে উঠলুম। মেজমামার গলা। বড়মামা বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক।'

'কে, তুমি না আমি?'

'তুমি।'

'যদি বলি তুমি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না বলেই নিচে নেমে এসেছ, আমার গতিবিধির ওপর চোখ রাখার জন্যে।'

'সে তো কিছু ভুল করিনি।'

'ভুল অবশ্যই করেছ। তুমি পরীক্ষায় ফেল করেছ। গোল্লা পেয়েছ। আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছ।'

'ফাঁদ মানে?'

'ফাঁদ মানে ট্র্যাপ। তুমি আমাকে কতটা বিশ্বাস কর দেখার জন্যে নীচে নেমে এসে একটু শব্দ-টব্দ করেছিলুম। যা ভেবেছিলুম তাই। সুড়সুড় করে নেমে এলে। বড়দা, একেই বলে বিষয় বিষ।'

'এত বড় একটা কথা বললি, বিষয় বিষ! যাঃ, তোকেই দিয়ে দিলুম। তোকে স্বপ্ন দিলুম, গুপ্তধন দিয়ে দিলুম, সব দিয়ে দিলুম, এমন-কী আমার কৌতূহলটা পর্যন্ত দিয়ে দিলুম। সব তোর।'

বড়মামা হাত চেপে ধরে বললেন, 'চল, ওপরে চল। আমরা এখন মুক্ত পুরুষ।'

মেজমামা বললেন, 'স্টপ। এদিকে এসো। দুজনেই এগিয়ে এসো।'

এতক্ষণ মেজমামার গলাই শুনছিলুম। চোখে দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে আলোর খেলা চলেছে। গাছের পাতা রূপকথার রূপোর পাতার মতো ঝিলমিল করছে! সবচেয়ে সুন্দর হয়ে সেজে উঠেছে তাল, সুপুরি, খেজুর আর নারকেল গাছ।

বড়মামা বললেন, 'অন্ধকারে, তুমি আছ কোথায়?'

কাঁঠাল গাছের তলায়, একটা ছায়া দুলে উঠল, স্বর ভেসে এল, 'খুব কাছেই। এটাও তোমার একটা শিক্ষা হল।'

'কী শিক্ষা?'

'হৃদয়ে অন্ধকার জমে থাকলে মানুষ চেনা যায় না দাদা। মানুষ চিনতে হলে আলো জ্বালতে হয়। হৃদয়ের আলো। কাঁঠালতলায় এসো, খবর আছে।'

আমরা দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। চাঁদের আলোয় পাতার ছায়া পড়ে, সে যেন আর এক স্বপ্ন! দূরে ফাঁকা মাঠে ঝলমল করছে আলো। তাকালেই মনে হচ্ছে, এক্ষুনি পক্ষিরাজ নেমে আসবে। পিঠে রাজপুত্র। কাঁঠালতলায় একটা বড় পাথর পড়ে ছিল, তার ওপর মেজমামা বসে আছেন, দু'হাঁটুতে হাত রেখে আরাম করে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'টর্চ জ্বেলে অন্ধকারকে বিরক্ত কোরো না। দু'জনে বোসো। ওই যে আরও দুটো পাথর রয়েছে।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তুমি আমাদের নিয়ে কী করতে চাইছ? আমরা দু'জনেই কিন্তু নিরস্ত্র!'

'আমিও তাই!'

'তোমার গলাটা কেমন যেন ভিলেনের মতো শোনাচ্ছে, অনেকটা করালীচরণের মতো।'

'তুমি করালীচরণের গলা শুনেছ?'

'ঠিক শুনিনি; কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে কানের কাছে ভাসছে।'

'হৃদয়ের শব্দ শুনতে পাওনি, তাই কানের কাছে করালী।'

'বলো কী, রোজ আমি স্টেথো ফেলে ডজন-ডজন হৃদয়ের শব্দ শুনি!'

'সে-সব অসুস্থ হৃদয়। নিজের হৃদয়ের আসল শব্দ শোনার চেষ্টা করো। বড় অন্ধকার, বড় বেসুরো। বোসো, বোসো।'

আমরা বসলুম, দু'জনে, দুটো পাথরে। সত্যিই মেজমামাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। রহস্যময়। মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা দাদা, ক-এ কী হয়?'

'ক-এ কলতলা।'

'ক-এ কাঁঠালতলা হলে আপত্তি আছে?'

'না। তবে তুমি বলেছিলে কলতলা।'

'আচ্ছা দাদা, খ-এ যদি খড়ের বদলে খরগোশের গর্ত হয়, তোমার আপত্তি হবে?'

'না, হতে পারে।'

'তা হলে ক খ গ ঘ যদি এই রকম হয়, কাঁঠালতলায় খরগোশের গর্তে খড়্গ, তা হলে কেমন হয়!'

'কিন্তু গোয়ালে তা হলে কী হবে?'

'গোয়ালটা গোরুকে ছেড়ে দাও। অবোধ জীবটিকে শান্তিতে, মশার কামড়ে থাকতে দাও।'

'বেশ, তাই হোক।'

'দেখি টর্চটা দাও।'

মেজমামা বড়মামার হাত থেকে টর্চ নিলেন, 'নাও, এইবার দ্যাখো।'

মেজমামা টর্চের বোতাম টিপলেন। আলোর রেখায় কিছু দূরে একটা গর্ত দেখা গেল।

'দাদা! কী দেখছ, এই সেই গর্ত!'

'কিন্তু খোরগোস আসে কোথা থেকে?'

'খরগোশ আসার তো দরকার নেই। এই রহস্যে গর্তটাই বড় কথা, খরগোশটা নয়।'

'তা হলে?'

'আর প্রশ্ন নয়, গর্ত ইজ এ ক্লিয়ার প্রুফ অব আওয়াজ গুপ্তধন। লেট আস স্টার্ট।'

'রাতের বেলায় গর্তে খোঁড়াখুঁড়ি না করাই ভাল। বলা যায় না, সাপখোপের ব্যাপার থাকতে পারে।'

'দেখ দাদা, ভয় পেলে মানুষের কিছু হয় না। সাহস চাই, সাহস। তুমি টর্চটা ধরো, আমি শাবল চালাই। আমার সে সাহস আছে।'

মেজমামা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন.......

'কাল সকালে করলে হত না ভাই!'

'সকালে? গুপ্তধন কেউ কোনও দিন সকালে, সবার সামনে খোঁজে? গুপ্তধন গোপনে, রাতের অন্ধকারে অনুসন্ধানের জিনিস। বিপদের ঝুঁকি থাকবে, বাধা থাকবে, ভয় থাকবে, মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবে। এ তো আর, ময়রার দোকানের মোয়া নয়। অতএব আজই। এখনই। জয় মা!'

মেজমামা নিচু হয়ে পায়ের কাছ থেকে যে জিনিসটি তুলে নিলেন, সেটি একটি বড় সাইজের শাবল। চাঁদের আলোয় শাবল হাতে মেজমামা। কেমন যেন দেখাচ্ছে! গুপ্তধন সত্যিই কি আছে? দিনের বেলায় বিশ্বাস হয় না। রাতের বেলায় ভাবলে গা ছমছম করে।

মেজমামা বললেন, 'বলো, ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।'

আমরা বললুম, 'ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।'

একটা প্যাঁচা ডাকল। প্যাঁচার ডাক নিশ্চয়ই শুভলক্ষণ। মা-লক্ষ্মীর বাহন বার-তিনেক চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডাকল। সেই ডাকের সঙ্গে ডাক মিলিয়ে মেজমামা ডাকলেন—জয় মা। তারপর গর্তে মারলেন শাবলের খোঁচা। খোঁচা মারার সঙ্গে সঙ্গে ঝম করে একটা শব্দ হল।

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পিছিয়ে এলেন। বড়মামাকে বললেন, 'শুনলে, কিছু শুনতে পেলে?'

বড়মামা বললেন, 'কে যেন টাকার তোড়া নাচাল!'

'রাইট। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দাঁড়াও, আর একবার শাবল চালাই।'

মেজমামা নাচের ভঙ্গিতে আর একবার শাবল চালালেন, এবার ঝমঝমাঝম করে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। শুধু শব্দ নয়, গর্তের মুখে কী একটা বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

বড়মামা বললেন, 'বুঝলি, মনে হচ্ছে মোহরের থলে।'

মেজমামা বললেন, 'রাইট ইউ আর, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দাঁড়াও, বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে। টেনে বের করে আনি।'

মেজমামা হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'ফোকাস, ফোকাস।'

আমার হাতের টর্চ ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ল। মেজমামা গর্তে শাবল চালিয়ে কিছু একটা সামনের দিকে টেনে আনতে চাইলেন। তালগোল পাকিয়ে কী একটা বেরিয়ে এল। মেজমামা 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে উঠলেন। বড়মামা, 'আমার স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন' বলে জিনিসটাকে ধরতে গেলেন।

ঝম্ করে একটা শব্দ হল। গুপ্তধনের চারপাশে কাঁটা উঠল খোঁচা-খোঁচা হয়ে। বড়মামা ভয়ে পিছিয়ে এলেন।

'কী বল তো জিনিসটা?'

মেজমামাও সরে এসেছেন। বড়মামার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আলোর তেজ ক্রমশই কমে আসছে। মেজমামা বললেন, 'পরকুপাইন।'

পাথরের পাশে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেশ........

বড়মামা বললেন, 'তার মানে শজারু।'

'ইয়েস।'

কাঁটা-খোঁচা শজারু, নড়েও না, চড়েও না, গর্তের মুখ আগলে বসে আছে। বড়মামা বললেন, 'এটা মনে হয় ছদ্মবেশী যক্ষ।'

মেজমামা বললেন, 'গুপ্তধনের মুখে অনেক বাধা থাকে, আমাদের সুবিধের জন্যে, সব বাধা, বাধার তাল হয়ে কাঁটা উঁচিয়ে সামনে বসে আছে। মায়ের কী দয়া বলো তো। বলো, জয় মা! হেকে বলো।'

মেজমামা শাবল তুলে আবার যেই গর্তের দিকে এগোতে গেছেন, শজারু উলবোনা কাঁটার বলের মতো লাফিয়ে উঠল। বড়মামা একসঙ্গে বললেন, 'জয় মা, সাবধান!'

গোলমাল বেশ ভালই হয়েছে মনে হয়, তা না হলে মাসিমা ঘুম ভেঙে উঠে আসবেন কেন? মাসিমা এসে বললেন, 'তোমাদের ঘুম নেই? রাতেও পাগলামি? তোমাদের জন্য এবার দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। এ কী, এটা আবার কী?'

বড়মামা ভালমানুষের মত বললেন, 'আমাদের গুপ্তধন।'

মাসিমা ঝুঁকে পড়লেন সামনে, 'ও মা, এ তো সেই শজারুটা। ক'দিন হল আমাদের বাগনের এসে বাসা বেঁধেছে। ওটাকে টেনেটুনে গর্ত থেকে বের করেছ কেন? ওর বাচ্চা হয়েছে। তোমাদের কি খেয়েদেয়ে আর কোনও কাজ নেই। যাও, বাড়ি যাও।'

মেজমামা বললেন, 'দাদা!'

বড়মামা বললেন, 'ভাই।'

মাসিমা বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা, ভাই, ভাগনে, তিনজনেই আর একটুও কথা না বাড়িয়ে সোজা যে-যার ঘরে। ভোর হয়ে আসছে। উঃ, দেখেছ, কি কাণ্ড, একেবারে শাবল-টাবল এনে মনের আনন্দে। জানে তো, কুসি এখন ঘুমোচ্ছে!'

বড়মামা বললেন, 'মেজো, গোয়ালটা একবার উসকে দেখলে হয় না? থাকলেও থাকতে পারে। মনে আছে, কতকাল আগে আমরা পড়েছিলুম,

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ ভাই
মিলিলেও মিলিতে পারে
পরশপাথর ॥'

'দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট।'

কাঁঠাল গাছের তলা থেকে মাসিমার গলা পাওয়া গেল, 'মেজদা, তোমার এই সুটকেসে কী আছে? এখানে ফেলে গেলে কেন?'

'আমার সুটকেস? আমার আবার সুটকেস আসবে কোথা থেকে? কই দেখি?'

আবার আমরা কাঁঠালতলায়। শজারু গর্তে ফিরে গেছে। মেজমামা যে পাথরে বসেছিলেন, চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ায়, সেখানে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। পাথরের পাশে ঝকঝক করছে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেস। এইমাত্র কেউ যেন রেখে উঠে গেছে।

মেজমামা বললেন, 'একটু আগেও এটা এখানে ছিল না।'
বড়মামা বললেন, 'আর ইউ শিওর?'
'ডেড শিওর।'
'তা হলে এটাকে খোলা যাক। আমার মনে হয় এর মধ্যে আমাদের জন্যে স্পেশ্যাল কোনও খবর আছে। গুপ্তধন মানুষকে এইভাবেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে যায়।'
মাসিমা সুটকেসটা তুললেন। দু'মামা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, খুব ভারী! খুব ভারী?'
মাসিমা কাঠকাঠ গলায় বললেন, 'ভেতরে চলো। মনে হচ্ছে কিছু আছে।'
রহস্য-উপন্যাসের মতো দৃশ্য। বিশাল উঠোনে এ বাড়ির কোনও পূর্ব-পুরুষ একটা বেদী তৈরি করে রেখেছিলেন। পাথর বাঁধানো। সেই বেদীতে আমরা বসে আছি। মাথার অনেক ওপরে চৌকো আকাশ। ভোর হয়ে আসছে। বেশ একটা হিম-হিম ভাব।
মেজমামা বললেন, 'কখন সুটকেসটা খুলবি রে কুসি?'
'ধৈর্য ধরো।'
বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধৈর্য মানুষের একটা বড় গুণ, ধৈর্য ছাড়া কিছু হয় না।'
মাথার ওপর শেষ তারাটি মিলিয়ে গেল। একটা-দুটো পাখি ডাকছে। মেজমামা বললেন, 'আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরাবি কুসি?'
মাসিমা বললেন, 'আলো ফুটুক।'
বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলো আলো। আলো ছাড়া কিছু হয় না।'
পাখিদের শোরগোল পড়ে গেছে। মেজমামা বললেন, 'তোর ব্যাপারটা কী বল তো কুসি? এভাবে ঝুলিয়ে রাখছিস কেন বোন?'
'তোমাদের একটু শিক্ষা হোক।'
বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বয়সই শিক্ষার বয়েস। শেখার কোনও বয়েস নেই।'
সদরে একটা শব্দ হল। এইবার একে একে সব আসতে আরম্ভ করবে। কাজের লোক। বাড়িতে শোরগোল পড়ে যাবে। সবশেষে আসবেন সাইকেল চেপে কমপাউণ্ডারবাবু। এসেই চা চা করবেন।
প্রথমেই যে এল, সে হল মোক্ষদার নাতি। ছোট্ট এতটুকু ছেলে, ফুলোফুলো গাল। চোখ ঘুম লেগে আছে। পরনে হাফ প্যাণ্ট, গেঞ্জি। গত বছর ছেলেটির বাবা মারা গেছেন। মাসিমাই মানুষ করছেন বলা চলে। ওষুধ, পথ্য, জামাকাপড়, অল্পস্বল্প লেখাপড়া শেখানো। সারাদিন এ বাড়িতেই থাকে। বড় শান্ত ছেলে।
মাসিমা ডাকলেন, 'শঙ্কর, এদিকে এসো।'
মেজমামা বললেন, 'তোর মতলবটা কী বল তো কুসি?'
মাসিমা কথা কানে তুললেন না। শঙ্কর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মাসিমা বললেন, 'কান ধরো। দু'কান।'

ভাল মানুষ শঙ্কর আদেশ পালন করল। মাসিমা বললেন, 'তুমি এটা কাল বাগানে ফেলে গিয়েছিলে?'

শঙ্কর ঘাড় নাড়ল। দুই মামা বললেন, 'যাব্ববা, শুধু শুধু তুই বসিয়ে রাখলি!'

দু'জনে উঠতে যাচ্ছিলেন। মাসিমা বললেন, 'বোসো, শুধু শুধু নয়। এইবার আমি বাক্স খুলব। সত্যিই এতে গুপ্তধন আছে। এই দ্যাখো।'

ছোট একটা শ্লেট, পেনসিল, আর প্রথমভাগ। মাসিমা প্রথম ভাগের পাতা খুলে ভোরের আলোয় মেলে ধরলেন। 'নাও পড়ো। দুজনেই পড়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।'

দুই মামা সমস্বরে পড়লেন, 'ক খ গ ঘ।'

'কেমন লাগছে পড়তে?'

দু'জনেই বললেন, 'ফাসক্লাস! আর একবার পড়ি। কী সুন্দর! ক খ গ ঘ। উঃ, মনে হচ্ছে শৈশব আবার ফিরে এসেছে। দাদা?'

'ভাই।'

'বুঝলে কিছু? কুসি কী বোঝাতে চাইল, বুঝলে?'

'না রে ভাই।'

'মোটা মাথা।'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ। কিঞ্চিৎ গবেট। গুপ্তধন হল কখগঘ। বর্ণ পরিচয়। আর লুপ্তধন, আমাদের শৈশব।"

'আরে হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো।'

'তা হলে বুঝলে, মা-লক্ষ্মী আসেননি। এসেছিলেন মা-সরস্বতী।'

'বীণা! হাতে তো বীণা ছিল না ভাই।'

'তুমি গবেট। মা কি তোমাকে বাজনা শেখাতে এসেছিলেন? মা এসেছিলেন মানুষের জীবনের গুপ্তধনের সন্ধান দিতে!'

'আর ইউ শিওর?'

'ডেড শিওর। মায়ের হাতের বীণা, আর মায়ের পায়ের প্যাঁচা সরিয়ে নিলে, তুমি বলতে পারবে, কে লক্ষ্মী কে সবস্বতী?'

'না।'

'সব এক, সব একাকার।'

'তা হলে তুমি বলছ, জ্ঞানের সন্ধানই গুপ্তধনের সন্ধান!'

'ইয়েস।'

'মা সেই কথাই বলে গেলেন?'

'ইয়েস।'

'তা হলে কুসি, চা বানাও, আজ কী আনন্দ, কী আনন্দ!'

ভোরের আলোয় শঙ্কর দুলে দুলে আধো-আধো গলায় পড়ছে, ক খ গ ঘ।

এই গল্পের ছবি এঁকেছেন দেবাশীষ দেব

বড়দার বেড়াল

আমার বড়মামার দুটো বেড়াল। একটার নাম চাঁদিয়াল, আর একটার নাম ঘোড়েল। চাঁদিয়াল নামটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। কারো কোনো প্রদিবাদ ছিল না। সাদা ধবধবে বেড়াল, একপাশে পেটের কাছে গোলমতো কালো একটা ছাপ, যেন কমপাস ফেলে আঁকা। বেড়ালের আকাশে কালো চাঁদ। বেড়ালটার স্বভাব চরিত্র খুবই ভাল। সর্বক্ষণ একপাশে চোখ বুজিয়ে বসে থাকে, যেন ধ্যানমগ্ন। মাসীমা যখন খেতে দেয় তখন খায়। তারপর সামনের ডানথাবায় মুখটুখ মুছে আবার ধ্যানে বসে পড়ে। কোনো দিন ইচ্ছেটিচ্ছে হলে গা হাত পা একটু চাটাচাটি করে। নয় তো ওই সব ঝামেলার মধ্যে একেবারেই যেতে চায় না। বড়মামার থিওরি হল, বেড়ালের লোমে এমন একটা কেমিকেল আছে যাতে অটো ক্লিনিং হয়ে যায়, টেপরেকর্ডারের অটো স্টপের মতো, রেফ্রিজারেটারের অটো ডি-ফ্রস্টিং-এর মতো।

মাসীমা শুনে বলেছিলেন, 'রাখো তো! বেড়ালের মত অলস প্রাণী আর দুটি নেই। লেজি ক্যাট।'

বড়মামা বেড়াল গবেষণায় আরো কিছুটা এগিয়েছেন। তাঁর ধারণা, চাঁদিয়াল হল ছদ্মবেশী সাধক। রূপ গোপন করে আছে। সারাদিন ধ্যানমগ্ন। এক কড়া দুধ খোলা পড়ে আছে। একটু চেখে দেখার সামান্যতম ইচ্ছে নেই। মাছ পড়ে আছে, মানুষের তো একদিনও চুরি করার ইচ্ছে হয়! চাঁদিয়াল নির্বিকার। কার্নিসে বসে স্পেস্যাল কোনো ধ্যান করছে নিরালম্ব সাধন প্রণালী অনুসারে। দুটো পরশ্রীকাতর ছোটলোক শ্রেণীর কাক এসে প্রলম্বিত লেজে প্যাঁক প্যাঁক ঠোকর মারছে। চাঁদিয়ালের কী সহিষ্ণুতা। ভুরু কুঁচকে মাঝে মাঝে ক্যাঁক শব্দ ছাড়া আর কিছুই করছে না। মাঝে মধ্যে চড়াই পাখি এসে মাথা চুলকে দিয়ে যায়।

এ বেড়াল. বেড়াল নয়, লুক্কায়িত সাধক। হিংসা, লোভ, ক্রোধ সব জয় করেছে।

এ বেড়াল ইঁদুরের চৌকিদার হতে পারে। এ বেড়ালকে ভাঁড়ারের চার্জে বিশ্বাস করে বসান যায়। আস্থাভাজন বেড়াল।

মেজমামা এই সব শুনতে শুনতে একদিন বললেন, 'আমার একটা ছোট্ট প্রতিবাদ আছে ভারতীয় সাধক সমাজের তরফ থেকে। তাঁরা বৃন্দাবনে বৃক্ষ হয়ে থাকতে পারেন, তাঁরা কোন দুঃখে বড়দার বেড়াল হতে যাবেন! আই রেজিস্টার মাই আম্বল প্রোটেস্ট ইন দিস রিগার্ড।' মেজমামা আজকাল পাইপ ধরেছেন। সায়েবি চালচলন। টিভিতে টেনিস খেলা দেখেন। শোনা যাচ্ছে গল্ফ খেলবেন। খেতে বসে এক চুমুকে এক বাটি ডাল সাবাড়। ওইটাই হল স্যুপ।

মেজমামা পাইপ পরিষ্কারে মন দিলেন। মাসিমা বসে আছেন। বড়মামা বহুক্ষণ ধরে একটা ওষুধের শিশির ছিপি খোলার চেষ্টায় জেরবার। যা হয়, প্যাঁচ ঘুরে গেছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কেবলই বলছেন, 'ধ্যাত তেরিকা। ধ্যাত তেরিকা।'

মাসিমা বললেন, 'মেজদার কথাটা শুনলে?'

—শুনেছি।

—কিছু বলার আছে!

—জাস্ট উলটে দিলুম। সাধক বেড়াল হয়েছে বললে আপত্তি, বেশ, তাহলে বলি, বেড়াল সাধক হয়েছে। এতে তো আপত্তি নেই!

মেজমামা বললেন, 'অর্থাৎ, বেড়াল তপস্বী।'

বড়মামা উঠে চলে গেলেন। বাইরে থেকে আমাকে হেঁকে বললেন, 'ছুরি, কাঁচি, দা, কাটারি, যা পাশ নিয়ে আয়। শিশির ছিপি খুলব, তবে জলস্পর্শ করব।'

মেজমামা যোগ করলেন, 'চিতোর রাণার পণ। ফ্রি স্যামপলের ওই দশাই হয়। ওষুধ খেতে হলে আমাদের মতো পয়সা খরচ করে খেতে হয়। এ যেন মানুষ মারা হচ্ছে। ওরে, আগে একটা এ. টি. এস. দিয়ে দে। রক্তারক্তি তো হবেই।'

বড়মামার যাবতীয় কেরামতিকে আমরা সকলেই ভয় পাই। একবার পাখার ব্লেড পরিষ্কার করার জন্যে ঘড়াঞ্চিতে উঠেছিলেন। সবসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে তিনমাস পায়ে প্লাস্টার। ছবি টাঙাবেন, দেয়ালে পেরেক মারছেন। সেখানেও অধৈর্য, ধ্যাত্তেরিকা। বুড়ো আঙুলের মাথা হাতুড়ির এক ঘায়ে থেঁতো। এতখানি ব্যাণ্ডেজ। আঙুল ফুলে কলাগাছ।

মাসিমা শিশিটা বড়মামার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই লাফিয়ে উঠলেন, 'এ কী! এ তো তরল আলতা! আলতার শিশি নিয়ে তুমি এতক্ষণ ধরে কী করছ!'

বড়মামা ঘাবড়ে গেছেন। 'আলতা! আমি তো ভেবেছি কাফ মিকশ্চার।'

—এটা তোমার কাফ মিকশ্চার? একবার পড়ে দেখবে তো! খুলে গেলে কী করতে?'

—দু চামচ পরিমাণ গালে ঢেলে দিতুম।

মেজমামার ঠোঁটে পাইপ। উঠে এসেছেন বারান্দায়। বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'একটা জিনিস। মুকুজ্যে ফ্যামিলিতে এই এক পিসই পাবি। আলতা খেয়ে সতী সাবিত্রী হওয়ার

ইচ্ছে। তোর মনে আছে কুসী, সোদপুরের মেলা থেকে একবার একটা এঁড়ে বাছুর কিনে এনেছিল। রোজ খাঁটি দুধ খাবে!'

বড়মামা দমে না গিয়ে বললেন, 'তুই আর কথা বলিসনি। একবার লেবেল না পড়ে টিংচার আইডিন খেয়েছিলিস। মনে আছে কুসী? আর হাতীবাগান থেকে কিনে এনেছিল অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা। হঠাৎ একদিন শেষ প্রহরে ডাক ছাড়ল, হুক্কা, হুয়া, কেয়া হুয়া। তাড়া তাড়া, ব্যাটা শেয়ালের পো।'

মাসীমা রায় দিলেন, 'এক পিস মুকুজ্যে নয়, দু পিস। দুটি ভারতরত্ন। এ বলে, আমায় দেখ, ও বলে, আমায় দেখ।'

বড়মামা এক গাল হেসে বললেন, 'আমরা ওই রকমই, কী বল মেজো? ভোলে ভালে।' মেজমামা বললেন, 'আমি অনেকটা চেঞ্জ করে গেছি। সম্প্রতি সিডনি থেকে ঘুরে আসার পর একেবারে পাক্কা সায়েব। তুমি এখনো যে গেঁইয়া, সেই গেঁইয়াই। মানুষ আর হতে পারলে কই। আঙুল চেটে চেটে ভাত খাও, চেয়ারে ঠ্যাং তুলে বসার অভ্যাস, ঢ্যাড়স করে ঢেঁকুর তোলো। গামছা দিয়ে গা মোছো। লজ্জা, লজ্জা, শেম, শেম।' বড়মামা ফুঃ করে একটা আওয়াজ করলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার সায়েব! বলিস নি, বলিস নি, লোকে হাসবে। সায়েব একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই পাওয়া যায়। সাদা, সাদা। তাদের কথা তুই এক বর্ণও বুঝতে পারবি না। সাধারণ একটা ইংরিজি যেমন ধর ওয়াটার, কি ভাবে উচ্চারণ করবে জানিস, ওটাররর। ওরা দি বলে না, বলে দ্যা। সায়েব অত শস্তা নয়। থ্রি পিস স্যুট পরে। গলায় টাই। গিঁট দেবার কায়দা জানিস, টানলেই ফস্। তুইও তো পরিস, কাঁচি দিয়ে কেটে খুলতে হয়। সায়েব হয়ে জন্মাতে হয়, জন্মে সায়েব হওয়া যায়-না।'

কাজিয়া আরো এগতো। বড়মামার কমপাউণ্ডার হুড়তে পুড়তে এসে হাজির। বৃদ্ধ হাঁপাচ্ছেন আর হায় হায় করছেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল, নৃশংস হত্যাকাণ্ড।'

শুদ্ধ বাংলা শুনে শুদ্ধ বাংলায় বড় মামার প্রশ্ন, 'কোথায় সংঘটিত হল?'

—আপনার চেম্বারে।

—চেম্বারে! সে কী! আপনি অ্যালাউ করলেন কেন?

—হ্যাট হ্যাট করতে করতেই ওষুধের বড় আলমারিটার তলায় চলে গেল।

—কে গেল, খুনী?

—আপনাদের ধুমসো বেড়ালটা। এই এত বড় একটি পায়রা ধরেছে। ধড়ফড়, ধরফর করছে। গোলাপি রঙের জ্বলজ্যান্ত, টাটকা একটা পায়রা।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এ ওই ঘোড়েলটার কাজ। মেজর আদরে একটি বাঁদর তৈরি হয়েছে। এত খাচ্ছে, ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, তবু জীব হিংসা। চলুন, চলুন, কোনো রকমে বাঁচান যায় কি না দেখি। আপনি স্যালাইন রেডি করুন। ইল্‌লিটারেট ক্যাট। ওটাকে আজই বিদায় করব। বস্তায় ভরে সোজা ব্যারাকপুরে। জানোয়ার।'

দলবল বড়মামার চেম্বারে। মেজমামাও আছেন। বড়মামার পেয়ারের সাগরেদ মনিদার হাতে একটা লাঠি। মাসিমার মুখের চেহারা করুণতম। রোজ সকালে পায়রাদের দানা খাওয়ান। চারপাশে ফট ফট করে ওড়াউড়ি করে। কাঁধে এসে বসে।

কম্পাউণ্ডারবাবু বলছেন, 'ফেরোসাস বেড়াল মশাই। আমি তাড়া দিতেই গোঁ গোঁ করছিল। পারলে পায়রা ছেড়ে আমাকেই ধরে।'

তাড়া খেয়ে আলমারির তলা থেকে বেড়ালটা পায়রামুখে বেরিয়ে এল।

মেজমামার চিৎকার, মুখ থেকে পাইপ পড়ে গেল, 'লুক হিয়ার, এ আমার ঘোড়েল নয়, আমাদের ওয়ান পিস বড়দার সাধক বেড়াল চাঁদিয়াল। আজ তার ধ্যান ভেঙেছে, আজ তার পতন হয়েছে।'

ধর, ধর, মহা ছোটাছুটি। তাড়া খেয়ে চাঁদিয়াল পায়রা ফেলে সোজা মিটার ঘরের ছাদে। ক্ষিপ্ত বড়মামা মনিদাকে বলছেন, 'আজ ব্যাটাকে কিমা কর। আমার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছে।' মেজমামা বললেন, 'প্রেস্টিজ পাংচার করেনি বড়দা, তোমার বেড়ালটা এতদিনে বেড়াল হল। ছিল একটা ভ্যাবা গঙ্গারাম। ভেবে দেখো বাঘ যদি মানুষ না খেয়ে ছাগলের মতো বটপাতা খায় তাকে কেউ টাইগার বলবে? বেড়াল যদি ফলাহারী হয় তাকে তুমি বেড়াল বলবে। বেড়ালের যা করা উচিত এতদিনে তাই করে জাতে

উঠল। ব্র্যাভো চাঁদিয়াল ব্র্যাভো!'

মাসিমা পায়রাটাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চাঁদিয়াল গলায় একটা দাঁত বসিয়েছে। রক্ত বেরোচ্ছে। এতটুকু একটা নরম বুক ধড়ফড় করছে। চোখ দুটো আধ বোজা। বড়মামা ছোটা ছুটি করছেন। একবার বলছেন, স্যালাই চালাবেন। একবার বলছেন ব্লাড দেবেন।

মেজমামা বললেন, 'ব্লাড যে দেবে, ওর ব্লাড গ্রুপ জান?'

বড়মামা বললেন, 'পায়রা গ্রুপ।'

—তাহলে আর একটা পায়রা ধরে এনে রক্তদান নয় রক্তপাত করো।

কিছুই করতে হল না, পায়রাটা আস্তে আস্তে মাসিমার কোলে নেতিয়ে পড়ল। বাড়িতে শোকের ছায়া। গোটা কতক পায়রার পালক বাতাসে উড়ছে।

বড়মামা বললেন, 'সঙ্গ দোষ।'

মেজমামা বললেন 'তার অর্থ?'

—চাঁদিয়াল ঘোড়েলের সঙ্গে মিশে স্বভাব হারিয়েছে। মাস্তান হয়ে গেছে। ওর কালো হাত আমি ভেঙে দেবো, গুঁড়িয়ে দেবো।

ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়াল না। বড়মামার রুগিরা সব এসে গেছেন, চেম্বার ভর্তি।

দুপুরে আমরা সবাই খেতে বসেছি। বেড়ালের মেমারি খুব কম। বড়মামার সামনে চাঁদিয়াল রোজ যেমন এসে বসে, সেইরকম বসেছে, চোখ বুজিয়ে থুপ্পি মেরে।

বড়মামা বললেন, 'মনি এটাকে সামনে থেকে হাঁটা, এটার আমি মুখদর্শন করতে চাই না।'

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটা পেছন ফিরে বসল।

মেজমামা বললেন, 'কি সেন্‌স দেখেছ! মানুষের মতো।'

মাসিমা ঘোষণা করলেন, 'আজ সব নিরামিষ, ঘোড়েল মাছ খেয়ে হাওয়া হয়েছে। আমরা যখন পায়রা নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় সাবাড় করেছে।'

বড়মামা মেজমামাকে বললেন, 'শুনলি, শুনলি, যত চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে কারবার।'

—বেড়াল মাছ খাবেই, এটা তাদের ধর্ম। সুযোগ পেলেই খাবে।

বড়মামা হঠাৎ যেন একটা ক্লু পেলেন, ডিটেকটিভরা যেমন পায়, 'বুঝেছি, বুঝেছি, চাঁদিয়াল কেন পায়রা ধরেছে।'

—কেন ধরেছে!

—যাতে তোর বেড়াল মাছ চুরি করতে পারে। কায়দা করে আমাদের সব ব্যস্ত করে রাখলে, রান্নাঘর আরক্ষিত, তখন তোর নিকৃষ্ট বেড়ালটা সব সাবড়ে দিলে।

মেজমামা বললেন, 'বড়দা, একেই বলে ফ্রেণ্ডশিপ্‌। বেড়ালে বেড়ালে সহমর্মিতা, যেটা মানুষের মধ্যে নেই। বুঝলে ভায়া!'

মাসিমার পরবর্তী ঘোষণা, 'দুধও সাবাড়, বিকেলে র চা।'

একদা এক বাঘের গলায়

মেজমামা আর মাসিমা পেছনের আসনে। আমি সামনে বড়মামার পাশে। গাড়ি চলেছে। বড়মামার হাত বেশ তৈরি হয়ে গেছে। এই সেদিন গাড়ি থেকে 'এল' প্লেটটা খোলার অনুমতি মিলেছে।

'বাঃ তোমার হাত তো বেশ তৈরি হয়ে গেছে হে।'

মেজমামা পেছন থেকে নাকিসুরে বললেন। সুর নাকি হবার কারণ আছে। মেজমামা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একা একা। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, 'কাম শার্প। ব্রাদার ইল'। বড়মামা ছুটলেন, সঙ্গে গেলেন কম্পাউণ্ডার দাদা। পরের পরের দিন ফিরে এলেন মেজমামাকে নিয়ে। খুব কাহিল অবস্থা মেজমামার। কোমরভাঙা দ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মুখে লেগে আছে করুণ বীরের হাসি। কারুর বারণ না শুনে সমুদ্রে চান করতে নেমেছিলেন। ঢেউ এসে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। ডুবেই যেতেন। চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু পিনাকী রুদ্র সেই সময় পুরীতেই ছিলেন। সমুদ্রে চান করছিলেন সুইমিং কস্ট্যুম পরে। মেজমামার নড়া ধরে ডাঙ্গায় তুলে এনেছিলেন। তুলতে তুলতেই নোনা জল খেয়ে মেজমামার ভুঁড়িটি গণেশঠাকুরের মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই নোনাজলের চুবুনিতে সুর নাকি হয়ে গেছে। বড়মামা বলেছেন, 'সারতেও পারে, না-ও সারতে পারে।'

মেজমামা বললেন, 'আহা, হাত আর দুটো পা তোমার বেড়ে সুরে বলছে, যেন কনসার্ট।'

মাসিমা বললেন, 'অ্যাতো আস্তে চালাচ্ছে কেন? এর চেয়ে বেশি স্পিড দেওয়া যায় না?'

মেজমামা বললেন, 'গাড়িটা বৃদ্ধ হয়েচে তো, তাই ধীরে ধীরে চলছে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি। চলছে যে এই না কত! না, না, ধড়ফড় করে দরকার নেই, তুমি ধীরেই চলো। খরগোশও গন্তব্যে পৌঁছোবে, কচ্ছপও গন্তব্যে পৌঁছোবে। একদিন আগে আর পরে।'

আড়চোখে বড়মামার দিকে তাকালুম। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'খরগোশ পৌঁছোতে পারেনি, কচ্ছপই পৌঁছেছিল। স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি উইনস দি রেস।'

মাসিমা বললেন, 'পেছন থেকে অন্য সব গাড়ি হুশ হুশ করে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। হাসছে। আমর ভীষণ অপমান লাগছে।'

'তুমি চোখ বুজে থাকো। চোখ খুলো না। চিড়িয়াখানা এলে আমি বলে দোব।' মেজমামা মুচকি হেসে বললেন।

'দাদা, তোমার ভয় করছে বুঝি?' মাসিমা ভালমানুষের মতো বড়মামাকে প্রশ্ন করলেন।

বড়মামা বললেন, 'একটা অ্যাকসিডেণ্ট হোক, এই বোধহয় চাইছিস কুসি!'

মেজমামা বললেন, 'সে-ভয় নেই বড়দা। তুমি তো একপাশ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছ। তোমার মার নেই। অ্যাকসিডেণ্ট হবে কী করে? একে বলে ওয়াকিং-স্পিডে গাড়ি চালানো।'

বড়মামা শাঁত করে গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ পাশে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, গাড়ির জলতেষ্টা পেয়েছে?'

বড়মামা হাতজোড় করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে নেমে যান। পেছনে বসে বসে আরাম করে কাছা ধরে টানা চলবে না, চলবে না। যেখানে একতা নেই, সেখানে গতিও নেই। ইউনাইটেড উইস্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল। সেই পতনই এইবার হবে, দয়া করে আপনারা দুজনে নেমে যান।'

মেজমামা বললেন, 'কী হবে রে কুসি। বড়বাবু যে খেপে গেছে।'

'তুমি কান ধরে ক্ষমা চাও মেজদা। বলো, আর করব না। অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আমি একা কেন? যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুইও কিছু কম যাস না। তুইও ক্ষমা চা।'

'আমার সঙ্গে বড়দার অন্য সম্পর্ক, স্নেহের সম্পর্ক। তুমি মেজদা চিরটা কাল সুযোগ পেলেই বড়দাকে খোঁচা মারো।'

বড়মামা বললেন, 'তোমরা কেউই কম যাও না। মিটমিটে শয়তান। গাড়িটা কেনার আগে তুই কুসি সবচেয়ে বিরোধিতা করেছিলিস। ঠ্যালাগাড়ি, ছ্যাকরাগাড়ি, যার পাঁঠা সেই বুঝুক, এই সব অনেক চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝেড়েছিলে। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষ্মণ। মেজ তখন তালে তাল বাজিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। সব এক-একটি ধানি-লঙ্কা।'

দুজনে একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বড়দা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। তোমার দয়ার শরীর। সাক্ষাৎ মহাদেব। বাবা ভোলানাথ মাইনাস জটাজূট। ক্ষমা করে দাও প্রভু!'

'না, সম্ভব নয়। এ তো ক্ষমা চাওয়া নয়, এ এক ধরনের ব্যঙ্গ।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি আর-একবার আমাদের চান্‌স দিয়ে দ্যাখো বড়দা, এবার আমরা একেবারে চুপচাপ থাকব।'

'চুপ করে থাকলেই হবে! ভেতরে সব ব্যঙ্গবিদ্রূপ পুষে রাখবে, বাইরেটা সব সাজানো-

গোজানো, চকচকে, চমৎকার। ওতে আমি আর ভুলছি না ভাই। তোমরা নেমে ট্যাকসি-ম্যাকসি ধরে বাড়ি চল যাও। আমি আর আমার ভাগনে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।'

'কেন, তোমার ঈশ্বর!'

'আঃ, চুপ করো না মেজদা। তোমার স্বভাবটা বড় বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।'

'ক্ষমা চাইলে যে-মানুষ ক্ষমা করতে জানে না, সে কেমন মানুষ?'

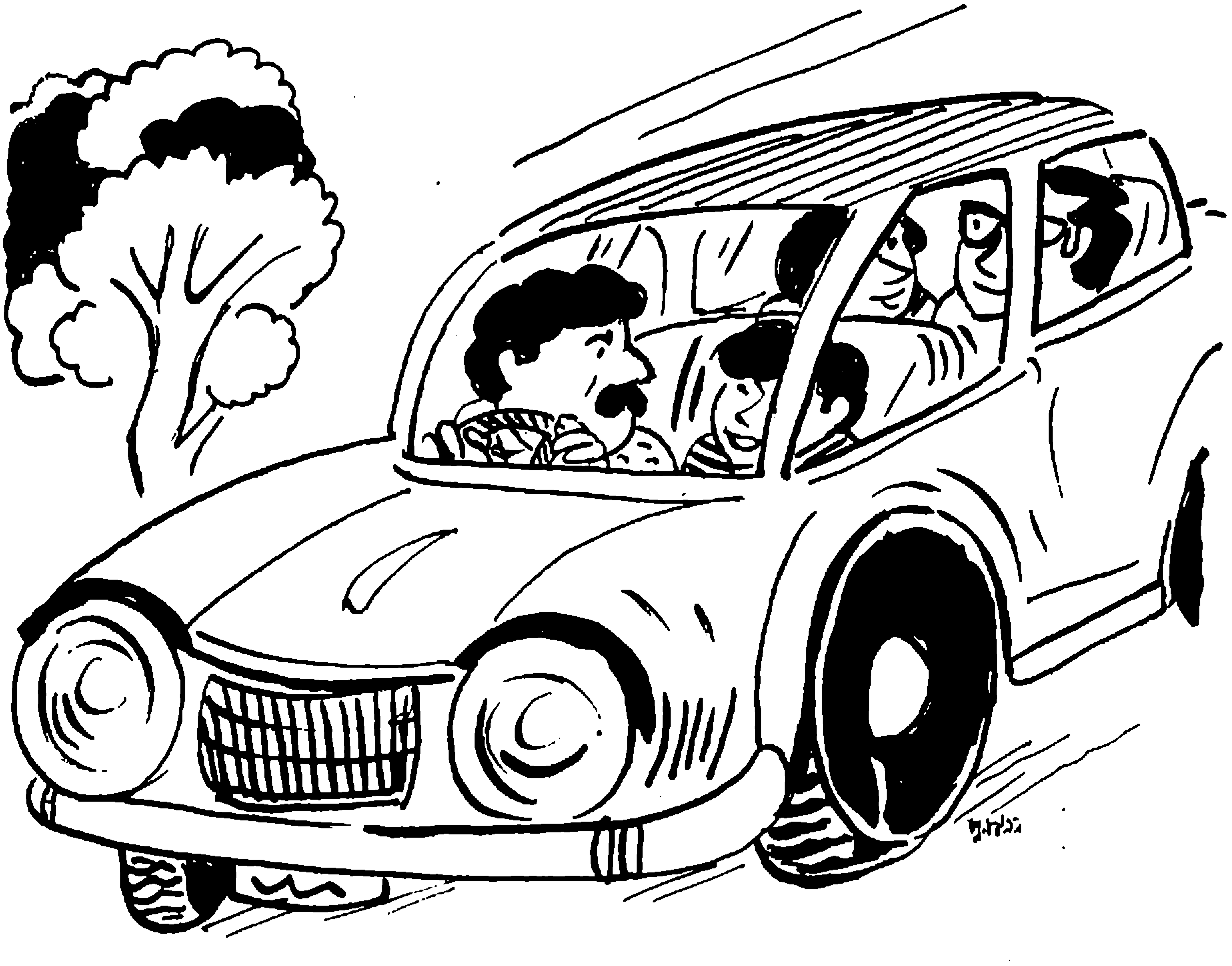

বড়মামা বললেন, 'বনমানুষ। তোমরা হলে সব শহর-মানুষ, আমি একটা শিমপাঞ্জি।'

'শুধু শুধু তোমরা কেন ঝগড়া করছ বলো তো। দিন-দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে? বড়দা, তুমি স্টার্ট দেবে কি-না বলো, এবার কিন্তু আমি নিজ-মূর্তি ধরব। লোক জড়ো হয়ে যাবে। ভাল হবে?'

আড়চোখে মাসিমার দিকে তাকিয়ে বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। চিউয়িংগাম খাবার মতো মুখ নড়ছে। তার মানে কিছু একটা বলতে চান। না বলতে পেরে চিবিয়ে গিলে

ফেলছেন। এবার সব চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মেজমামা হুঁহুঁ করে গানের সুর ভাঁজছেন। গানটা আমার চেনা। বিশেষ সুবিধের গান নয়। বাণীটা বড়মামার চেনা হলে গাড়ি আবার থেমে পড়ত।

মেজমামার হুঁহুঁ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ভাব এসে গেছে। বড়মামা মেজমামাকে চাপা দেবার জন্যে কার-স্টিরিওর দিকে হাত বাড়ালেন। মেজমামা গান থামিয়ে বললেন, 'তুমি কি টেপ চালাচ্ছ? তাহলে কীর্তন নয়, ইংরিজি কিছু চালাও।'

মাসিমা বললেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত নেই?'

আমি বললুম, 'বড়মামা, আধুনিক আছে?'

বড়মামা হাত টেনে নিতে নিতে বললেন, 'আমার কাছে কিছুই নেই।'

মেজমামা বললেন, 'অ, ওটা তাহলে তোমার ডামি-স্টিরিও। খোলস আছে, ভেতরে মাল নেই, ফর শো। কত কায়দাই জানো তুমি! তোমার গাড়িতে ইঞ্জিন আছে তো?'

মাসিমা বিরক্তির গলায় বললেন, 'আঃ, মেজদা, কেন বকবক করছ। এই একটু আগে চুক্তি হল, চুপচাপ বসে থাকবে, ফ্যাচর ফ্যাচর করবে না। এরই মধ্যে ভুলে গেলে!'

বড়মামা বললেন, 'স্বভাব কুসি, স্বভাব। স্বভাব সহজে পালটানো যায় না। দোয়েল কি কোয়েলের মতো ডাকতে পারবে? ছাগল কি ভেড়ার মতো গুঁতোতে পারবে। ঘোড়া কি হাতির মতো স্থির ধীর হতে পারবে?'

'শুনছিস কুসি, শুনছিস? গাড়িধারী বড়লোকের বোলচাল শুনছিস?'

মাসিমা বললেন, 'বড়দা, তুমি গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাই। অষ্টপ্রহর গজকচ্ছপের লড়াই আমার অসহ্য লাগে।'

মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, এই আমি চুপ করছি। স্পিকটি নট। তবে আমিও বলে রাখছি, গাড়ি আমি কিনবই। নতুন গাড়ি, ধ্যাদ্ধেড়ে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড নয়। তখন কিন্তু আমি এই গাড়িতে পা দোব না। এর ত্রিসীমানায় আসব না। সাধলেও না।'

'যখন কিনবে তখন দেখা যাবে, আগেই এত আস্ফালন ভাল নয়। তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে কত টাকা আছে, আমার জানা আছে। তোমার পাসবই তো আমার কাছে।'

'ধার করব।'

'কে তোমাকে ধার দেবে?'

'ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক দেবে।'

বড়মামা হঠাৎ বললেন, 'কে গ্যারাণ্টার হবে?'

'কেন, তুমি। তুমি হবে। তুমি ছাড়া আমার কে আছে?'

বড়মামা হাহা করে হেসে উঠলেন, 'এই জন্যেই তোকে আমি এত স্নেহ করি। বুদ্ধিশুদ্ধি তোর একদম পাকেনি। বুড়োখোকা।'

মাসিমা বললেন, 'আমি বুঝি তোমার কেউ নই?'

মেজমামা বললেন, 'কেন অভিমান করছিস, তুই ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার।'

ঠ্যাং ঠ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং ঘণ্টা বাজিয়ে উলটো দিক থেকে একটা দমকল আসছে। বড়মামা বাঁ পাশে সরতে সরতে বললেন, 'সেরেছে, দমকল যে রে বাবা!'

মেজমামা বললেন, 'ভয় পেও না বড়দা, দমকল আগুন নিবিয়ে ফিরছে। যতই ঘণ্টা বাজাক সে, তাড়া নেই। স্টিয়ারিং সোজা রাখো।'

বড়মামা শব্দ করে হেসে, গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তায় তুললেন। ডান দিক দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা দৈত্য-লরি বেরিয়ে গেল। বড়মামা চমকে বাঁ পাশে আমার দিকে কাত হয়ে পড়লেন। মেজমামা পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'জয় ঠাকুর, প্রাণে বাঁচলে হয়।'

মাসিমা বললেন, 'ভয় পেও না, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে?'

বড়মামা বললেন, 'ঘাবড়াও মাত। তোমরা শুধু লরিগুলোকে একটু কনট্রোলে রাখো।'

মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'কীভাবে?'

'পেছনে যারা আছ, তারা পেছনে তাকিয়ে থাকো। লরি এলেই আমাকে জানাবে।'

'তোমার মাথার ওপর একটা আয়না আছে। কী জন্যে আছে?'

'আয়না দেখে বোঝা যায় না, আসছে না যাচ্ছে। গুলিয়ে যায়।'

গাড়ি চলেছে, গুড়গুড় করে। আর কতদূর! ভীষণ ভয় করছে। বড়মামা গাড়ি চালাচ্ছেন, না কোদাল চালাচ্ছেন, বোঝা শক্ত।

॥ ২ ॥

বড়মামার গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। রাস্তাটা তেমন চওড়া না হলেও, পাকা। নতুন পিচ পড়েছে। দু'পাশে বিশাল দুই কারখানার জেলখানার মতো পাঁচিল। বাঁ পাশের দেয়ালে একটা সাইনবোর্ড। আমরা যেদিকে চলেছি সেই দিকে তীর-চিহ্ন। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ফুলবাগানের ঝিল। উদয়াস্ত মাছ ধরার ব্যবস্থা। পাশের জন্যে যোগাযোগের ঠিকানা, বোকুবাবু, ছোকোন ঘোষের চায়ের দোকান, কুলতলি। দশটা-পাঁচটা। পাশের হার, দশ টাকা।

স্টিয়ারিং নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে, বড়মামার নজরে সাইনবোর্ডটা পড়ে গেল। গাড়ি আড় হয়ে ঢুকেছিল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বাঁ দিকে হেলে, আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বড়মামা বললেন, 'পড় তো, পড় তো,। কী লেখা আছে পড় তো!'

গাড়ির পেছন দিকে দুম করে কী একটা ধাক্কা মারল। সামান্য একটু দুলে উঠলুম আমরা। দুমদাম করে নানা রকমের জিনিস পড়ে যাবার শব্দ হল। শুধু, পড়ল না, পড়ে ছড়াতে শুরু করল। মাছ ধরার নোটিশ আর পড়া হল না। সব কটা মাথা ঘুরে গেল পেছন দিকে। একটা সাইকেল-রিকশা। পেছনের কাঁচে ভাসছে রিকশা-চালকের মুখ। আরোহী আসছিলেন একগাদা বিভিন্ন মাপের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো নিয়ে। ধাক্কার

ঝাঁকুনিতে সব ছিটকে পড়েছে। গড়গড়িয়ে কিছু চলে গেছে নর্দমায়। কালো জলের ওপর ভাসছে সাদা চকচকে কৌটো।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুল নেমে পড়লেন। গাড়ির গায়ে চোট লেগেছ, আর রক্ষা আছে? গাড়ি হল বড়মামার প্রাণ। বড়মামা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামলুম। পেছন দিকে তাকিয়ে মাসিমা আর মেজমামা বসে রইলেন।

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে পেছনের বাম্পারটা দেখে বললেন, 'এটা কী হল?'

রিকশাচালক বললে, 'আমার কী দোষ, আপনি হঠাৎ থামলেন কেন?'

'সামনের গাড়ি থামলে পেছনের গাড়িকেও থামতে হয়। গাড়ি চালাবার ব্যাকরণ না শিখেই সিটে উঠে বসেছ?'

'আপনিও ব্যাকরণ তেমন জানেন বলে মনে হচ্ছে না। জানলে এমন দুম করে মোড়ের মাথায় থেমে পড়তেন না।'

রিকশার আরোহী নামার জন্যে হাঁচড়পাঁচড় করছেন। পারছেন না। অ্যালুমিনিয়ামের হাজার হাজার কৌটো নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে কৌটো-মানব। মুখটি শুধু জেগে আছে। কৌটো-মানব বললেন, 'আপনার আর কী হয়েছে! রিকশার ধাক্কায় মোটর-গাড়ির কিছু হয় না। ক্ষতি হল আমার। নর্দমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমার এত দামের কৌটো খানায় ভাসছে।'

বড়মামা ঢুলুঢুলু চোখে খানার দিকে তাকালেন। কারুর ক্ষতি হলে বড়মামার বুক মুচড়ে ওঠে। মেজমামা নেমে এসেছেন। অবাক হয়ে আরোহীকে দেখেছেন। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, 'কী করে আপনি অমন হলেন?'

'কী রকম?'

'অমন কৌটোময়, কৌটোসমৃদ্ধ! কে আগে উঠেছে? আপনি আগে, না কৌটো আগে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল? দেখলেই তো বোঝা যায়। আগে আমি, তারপর কৌটো।'

'কী করে নামবেন?'

'হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন। সে এক সমস্যা মশাই। আমাকে না নামালে, আমার ক্ষমতা নেই নামার।'

'কেউ যদি না নামায়, সারা জীবন ওইভাবে বসে থাকতে হবে? আপনার তো মশাই আচ্ছা লোভ।!'

'লোভের কী দেখলেন?'

'কৌটোর লোভ অবশ্য আমারও আছে, তবে আপনার চেয়ে অনেক কম। আপনি একেবারে গোটা একটা কৌটো-কারখানা কিনে এনেছেন!'

'উঁহু, উঁহু, বর্তমান কাল নয়, অতীত কাল হবে। কিনেছিলুম, এখন চলেছি ফেরত দিতে।'

'এত কৌটো কিনে সব আবার ফেরত দেবেন? বড় দুঃখ হচ্ছে।'

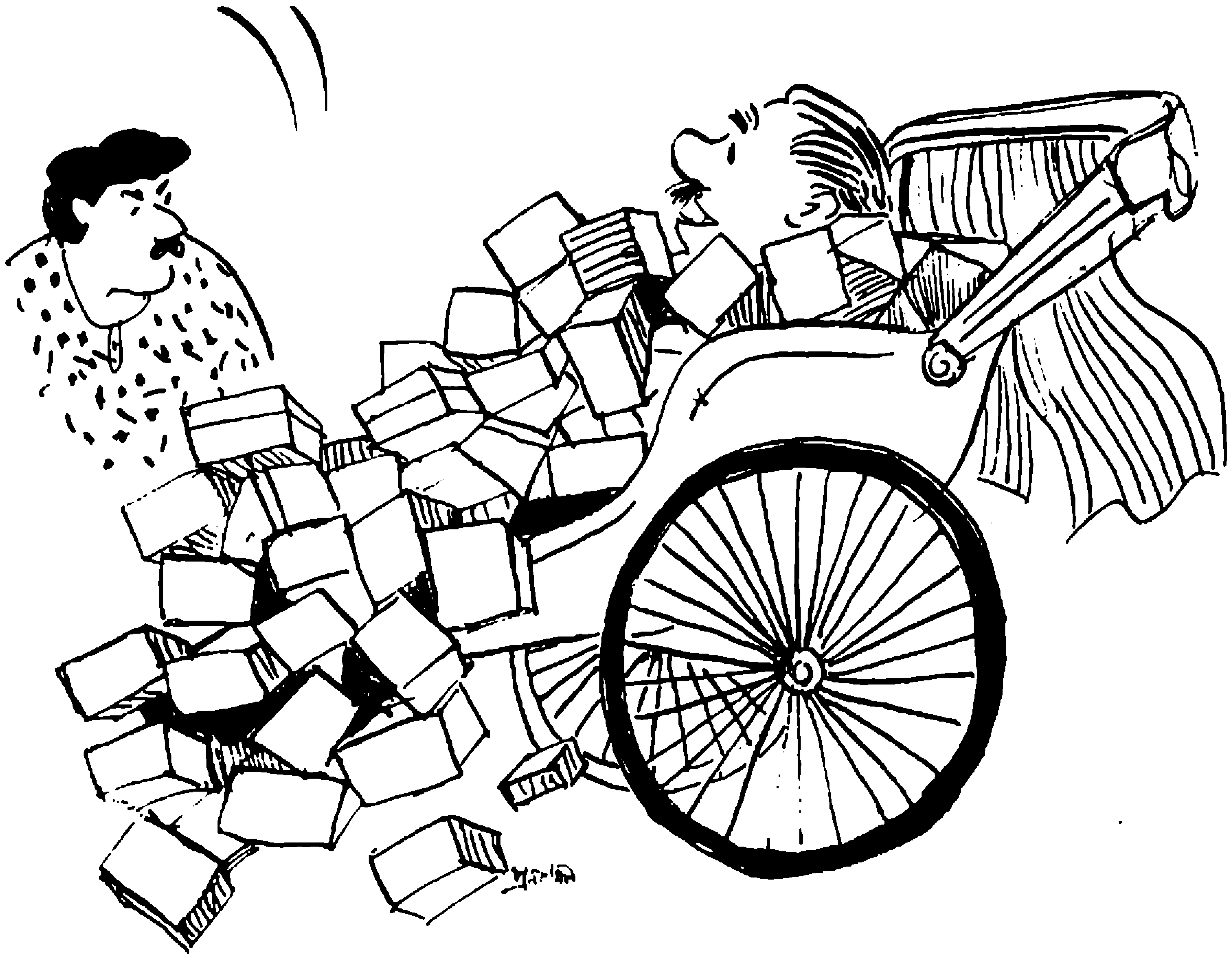

'দুঃখ! আপনি একটা কৌটোরও ঢাকনা খুলতে পারবেন না। যদি পারেন, আমার কান কেটে ফেলে দোব।'

'সে কী? কোথা থেকে কিনেছিলেন?'

'কে এক মশাই, ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, কুলতলিতে দুঃস্থ মহিলা সমিতি খুলেছেন, এ হল সেই সমিতির কারখানায় তৈরি ডিফেকটিভ মাল। মহিলা সমিতির নামে চালাতে চেয়েছিল। কৌটোর ধর্ম কী?'

'আজ্ঞে টানলেই ঢাকনা খুলবে।'

'এ সব হল বিধর্মী কৌটো।'

'ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে আপনার সামনে দণ্ডায়মান।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি? আপনিই সেই পরোপকারী ডাক্তাবাবু?'

বড়মামা লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, 'নমস্কার, নমস্কার।' 'আমাকে নমস্কার করে আর লজ্জা দেবেন না, আপনাকেই আমার শত কোটি প্রণাম করা উচিত। কী জিনিস বানিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মানুষের প্রাণ ভরে রাখলে, যমেও ছুঁতে পারবে না। দেখা হয়ে ভালই হয়েছে।

রিকশাটাকে ছেড়েই দি। মাল সব গাড়ির পেছনে ভরে দেওয়া যাক। নর্দমায় যে কটা ভাসছে, নিজেই গুনে নিন। আমার এদিককার হিসেব ঠিক আছে।'

মোটাসোটা চৌকো ধরনের ভদ্রলোক কৌটোর স্তূপ ঠেলে রিকশা থেকে নেমে এলেন। মালকোঁচা মারা ধুতি। গায়ে শার্ট। বুক-পকেটে অ্যাতো কাগজপত্র ঠেসেছেন, ফেটে বেরিয়ে না যায়। গায়ের রঙ মিশকালো। দু' পাটি ঝকঝকে সাদা নিম-দাঁতন করা দাঁত। হাসিটা সেই কারণেই বড় স্পষ্ট।

বড়মামার গাড়ির বুটে একে একে সব ঢুকে গেল। ভদ্রলোক পিছনের আসনে জাঁকিয়ে বসলেন। এমন ভাবে বসেছেন, যেন নিজের গাড়ি। মেজমামা মাঝখানে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে মাসিমা আর মেজমামার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার নাম শ্রীআশুতোষ দাস। মোল্লারচকে আমার মিষ্টির দোকান। এই রিসেণ্টলি বেলের মোরব্বার কারবারে 'নেমেছি। ভেরি গুড মার্কেট। মিডল ইস্ট, জাপান, হংকং, হনলুলু, কামস্কাটকা, ফ্রান্স্, আমেরিকা, জার্মানি, কোথায় না, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, এ দাস্স বেঙ্গলকুইন ইন থিক সিরাপ।'

কথা শেষ করে হাত খুললেন। মেজমামার মুখের চেহারা পাল্টে গেল ভদ্রলোকের মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে। বেশ শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছে, অথচ মিষ্টির কারবারি। বড়মামার গাড়ি চলেছে ফুরফুর করে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে মনে হবে বড়দাদু ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খাচ্ছেন।

মেজমামা সুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায়ের শিক্ষাদীক্ষা?'

আশুবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'যৎসামান্য। বায়ো-কেমিস্ট্রিতে পোস্ট-গ্যাজুয়েট করার পর কিছুকাল একটা ফার্মে চাকরি। ভাল লাগল না দাসত্ব। কী করি, কী করি? পিতার মৃত্যুর পর বসে পড়লুম দোকানে। ইনস্টিট্যুট অব কেটারিং টেকনোলজি থেকে একটা ডিপ্লোমা বাগিয়ে আনলুম। শিক্ষার কি শেষ আছে। মিষ্টির জগতেও যে কত কী দেবার আছে!'

'মিষ্টির জগৎকে কী আর দেবেন? সবই তো দেওয়া হয়ে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, রাজভোগ, লেডিকেনি, সীতাভোগ, মিহিদানা, চমচম, দধি, পয়োধি। নতুন আর কী দেবার আছে?'

'আছে, আছে মুকুজ্যেমশাই। সব বিভাগেই রিসার্চের প্রয়োজন আছে। দুব্বোঘাসের কচুরি খেয়েছেন?

'দুব্বোঘাসের কচুরি? জীবনে শুনিনি।'

'দয়া করে আমার দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। দুব্বোর মতো খাদ্যগুণে ভরপুর জিনিস আর দুটো নেই। গোরুরা জানে। সেই দুব্বোকে আমি বাঙালির নোলায় ফেলেছি।'

'নোলা শব্দটা পাল্টানো যায় না আশুবাবু?'

'কেন বলুন তো? নোলা কি খুব খারাপ শব্দ। নোলা শব্দটা মনে হয় ইংরেজি নলেজ থেকে এসেছে।'

'প্লিজ, আপনি আর ভাষাতত্ত্ব নাড়াচাড়া করবেন না। মিষ্টান্নতত্ত্বেই আপনার নলেজকে ধরে রাখুন। আজেবাজে কথা শুনলে আমার ভীষণ ইরিটেশান হয়। সারা গা লাল-লাল চাকা হয়ে ফুলে ওঠে।'

'অ্যাঁ, সে কী? অ্যালারজি! ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক দাগ ওষুধ খেয়ে নিলেই তো সেরে যায়!'

'খেয়ে দেখেছি। কিস্যু হয় না।'

'কিসে সারে তা হলে?'

'গোটা-দুই চড় কষাতে পারলেই সেরে যায়।'

'তা হলে থাক, ভাষাতত্ত্ব না আলোচনা করাই ভাল। গায়ে লাল-লাল চাকা-চাকা হয়েছে।'

'না, এখনও তেমন হয়নি।'

'জয় গুরু!'

'হ্যাঁ, জয় গুরু। আপনার ওই খাবার নিয়ে রিসার্চের কথা বলুন। শুনতে বেশ ভাল লাগছে।'

'খেতে আরও ভাল লাগবে। কচুরিপানা দিয়ে একটা আইটেম বানিয়েছি। ক্ষীরকচুরি, অসাধারণ জিনিস। এক সপ্তাহ খেলে তিন কেজি ওজন বাড়বে। বাড়বেই বাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'ওজন কমাবার কিছু নেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাগজের সন্দেশ।'

'সে আবার কী?'

'উঃ, সে এক অসাধারণ জিনিস। ছানার কোনো ব্যাপার নেই। কাগজের মণ্ড চিনি দিয়ে ভাল করে পাক করে ছাঁচে ফেলে সন্দেশ। একটা খেয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চালিয়ে দিন। ধীরে ধীরে পেট ফুলতে শুরু করবে। এক সময় জয়ঢাক। বুকে আর পেট এক হয়ে যাবে। কম-সে-কম দু'দিন আর হাঁ করতে হবে না।'

'বাঃ, বেশ ভাল জিনিস বানিয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে আমাদের দেশের উপযোগী। এই আক্রা-গণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে প্রাণান্ত। যে বাড়ির দশ-বিশটা মুখ কেবল হাঁ-হাঁ করছে, সেখানে একটি করে এই সন্দেশ আর এক গেলাস কলের জল। দু দিন সব ঠাণ্ডা।'

'খেতে কেমন হয়েছে?'

'অতি সুস্বাদু। একটা খেলে আর একটা খেতে ইচ্ছে করবে, তবে দুটো না খাওয়াই ভাল।'

'এক-একটার দাম কত?'

'মাত্র এক টাকা।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর সেই হাসিই হল সর্বনাশের কারণ। স্টিয়ারিং বাঁ দিকে বেমক্কা মোচড় খেল। গাড়ির সামনের বাঁ দিকের চাকা গোঁত করে পড়ে গেল পথের পাশের খানায়। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বেশ বড় রকমের ম্যাজিক দেখাবার পর ম্যাজিশিয়ান দুটো হাত যেভাবে আকাশের দিকে তোলেন, বড়মামা সেই ভাবে হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে চুপ করে বসে রইলেন।

আশুবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'কী হল স্যার?'

বড়মামা হালকা সুরে বললেন, 'অধঃপতন, পদস্খলনও বলা চলে।'

মাসিমা বললেন, 'এবার তা হলে কী হবে?'

বড়মামা বললেন, 'কিছুই না। কী আবার হবে! স্টার্ট তো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আমার গাড়ি কত ভদ্র দেখেছিস কুসি! যেই দেখলে ভুল পা পড়েছে, অমনি চলা বন্ধ হয়ে গেল। একেই বলে জেণ্টলম্যান।'

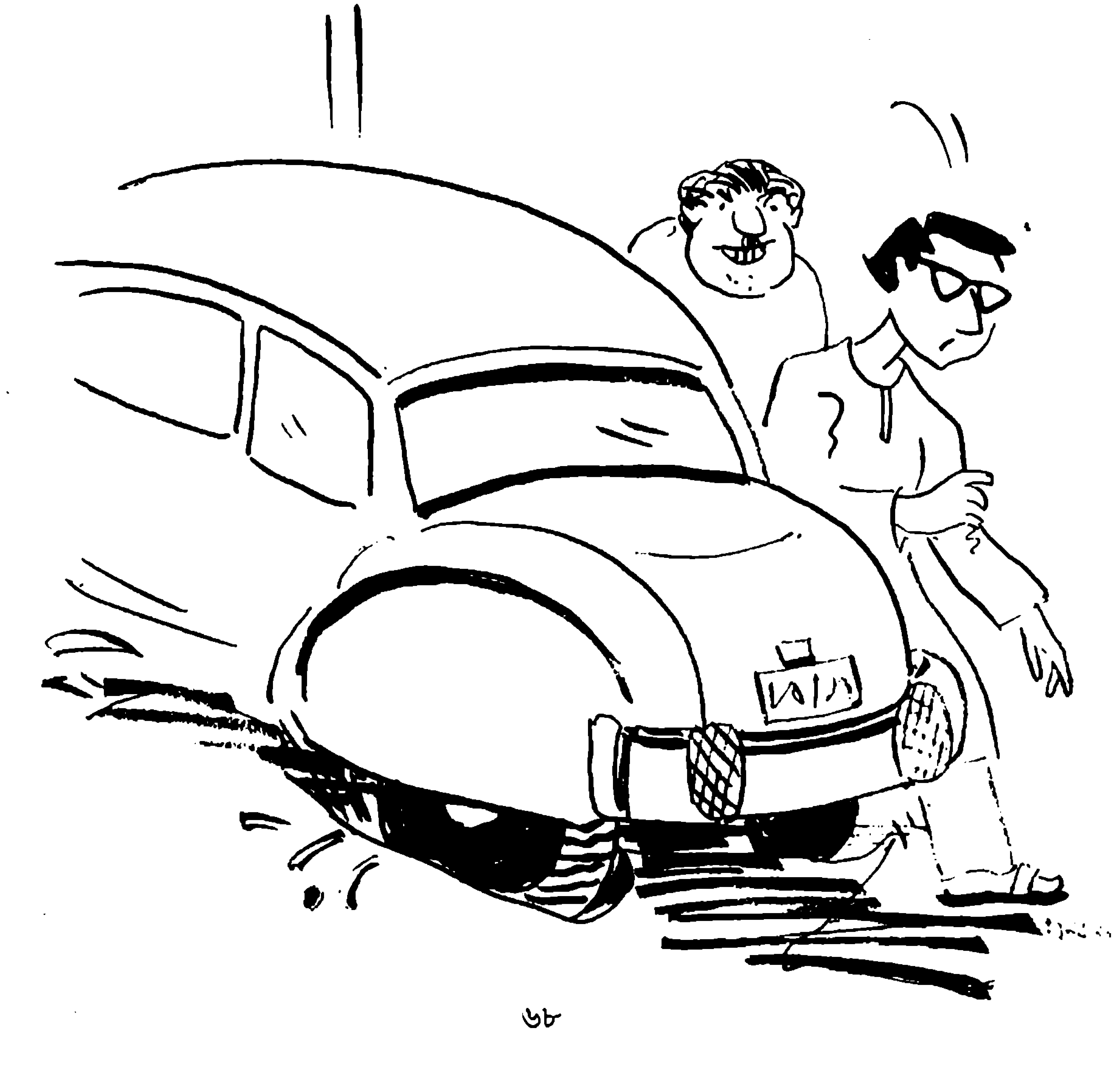

মেজমামা বললেন, ‘তোমার লেকচার বন্ধ করে গাড়িটা ব্যাক করে তোলার চেষ্টা করো।’

‘অতই যদি সোজা হত ব্রাদার! এ তো আর মানুষ নয়, এ হল গাড়ি। পতন আছে, উত্থান নেই।’

‘তুমি এখন তা হলে কী করবে?’

‘তোমাদের সকলকে নামাব। তারপর ঠেলে তোলাব।’

‘আমরা একা সভা করতে যাচ্ছি। আমি হলুম গিয়ে সেই সভার সভাপতি। সভাপতি গাড়ি ঠেলবে?’

‘কেন, যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না! তুমিই না থেকে থেকে বলো, সেল্‌ফ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ। নাও, মেজাজ খারাপ না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো আশুবাবুকে নিয়ে নেমে পড়ো। কিছুই না, একটু পেছন দিকে ঠেলে দিলেই রাস্তায় উঠে পড়বে।’

‘আর তুমি কী করবে?’

‘আমাকে তো স্টিয়ারিং-এ বসতেই হবে ভাই। আমি যে কাণ্ডারী।’

‘এমন জানলে তোমার গাড়িতে কে উঠত বড়দা! তোমার মতো এমন ব্যাড ড্রাইভার কী করে লাইসেন্‌স পেল কে জানে! ঘুষের খেলা।’

‘আমি খুব একটা খারাপ ড্রাইভার নই ব্রাদার। আশুবাবুর হাজারখানেক কৌটো গাড়িকে বেটাল করেছে। গাড়ি কাত হওয়ামাত্রই গড়িয়ে ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে। দোষ আমার নয়, দোষ গাড়ির নয়, দোষ হল কৌটোর। আর দোষ হল তাদের, যারা পথের পাশে গাড়ি ধরার জন্যে নর্দমা পেতে রাখে।’

পেছনের আসন থেকে মেজমামা, আশুবাবু নেমে পড়লেন। মেজমামা সমানে গজগজ করে চলেছেন। আশুবাবুর মুখে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। এমন মুখ দেখলে তবেই মনে হয়, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমিও ঠেলব বড়দা?’

‘না, তোকে আর ঠেলতে হবে না, তুই নেমে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা কর। তোর ভুমিকা হল, ডিরেক্‌টার অপারেশন।’

সামনের আসন থেকে আমিও নেমে পড়লুম। আমাকেও তো একটা কিছু করতে হয়। সামনের দিক থেকে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে পেছোতে হবে। একটা পাশ নর্দমায় ভেতরে গেছে। ডানপাশ উঁচু হয়ে আছে। মেজমামা দেখেশুনে বললেন, ‘অসম্ভব ব্যাপার। ইমপসিব্‌ল। সামনে দাঁড়াবার জায়গা নেই। ঠেলব কী করে?

আশুবাবু বললেন, ‘অসম্ভব বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। সবই সম্ভব। ইচ্ছে থাকলেই উপায় বেরোবে।’

‘আমার ইচ্ছেও নেই, উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। আপনি তাহলে একাই ঠেলুন। অনেক রকম মিষ্টির ফিরিস্তি তো শোনালেন, সে সব নিজেও নিশ্চয় খেয়েছেন। ভেতরে অনেক হর্স-পাওয়ার জমা হয়েছে। আজ তার পরীক্ষা হয়ে যাক।’

আশুবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তবে তাই হোক। আমি এক হাতে পেছনের বাম্পার ধরে টেনে তুলে দোব। একটা গাড়ির ওজন আর কত হবে? বিশ-বাইশ মণ!'

'আমি আমার ওজন জানি মশাই। গাড়ির ওজন জানা নেই।'

'ওই বিশ-বাইশ মণই হবে।'

আশুবাবু ঘুরে পেছনে দিকে চলে গেলেন। আজ আশুবাবুর কপালে গভীর দুঃখ লেখা আছে। ব্যায়ামবীরের কাজ কি সাধারণ মানুষে পারে? হেরে ভূত হয়ে যাবেন। আর মেজমামা তালি বাজাবেন।

আশুবাবু প্রথমে মালকোঁচা মেরে নিলেন। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললেন, 'জয় মহাবীরজি কি জয়!'

চোখ খুলে বললেন, 'আপনারা সেই মন্ত্রটা সমস্বরে, তালে তালে, সুর করে পড়তে পারবেন?'

মেজমামা বললেন, 'কোনটা?'

'ওই যে, সেই শক্তিসঞ্চারী মন্ত্র, ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।'

'ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'খোকাবাবু, তুমি পারবে?'

খোকাবাবু বলায় ভীষণ রাগ হলেও বললুম, 'হ্যাঁ, পারব!'

'দেন স্টার্ট।'

'ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।'

আশুবাবুর ডান হাত বাম্পারে, বাঁ হাত কোমরে। ধীরে ধীরে টানছেন। গাড়ি দুলছে 'আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।' ভদ্রলোকের মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

হঠাৎ কী হল কে জানে! বড়মামার গাড়ি ঘোঁত ঘোঁত করে দু'বার শব্দ করে উঠল। সামনের চাকা দুটো ফর্‌র ফর্‌র করে দুবার ঘুরে গেল অকারণে। একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটে গেল। চরকির মতো নর্দমার থকথকে কাদা ছিটকে উঠে মেজমামাকে স্প্রে-পেণ্ট করে দিলে। সাদা-জামা কাপড় আর সাদা রইল না। হরিণের মতো চাকা-চাকা কালো দাগ সারা শরীরে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ফর্সা মুখে খাড়া উঁচু নাক। চোখে ব্রহ্মাতেজ। পারলে গাড়িটাকে ভস্ম করে দেন। ওদিকে গাড়িটা ঝিঁকি মেরে হাতখানেক পেছিয়ে গেছে। আচমকা। আশুবাবু উল্টে পড়ে আছেন মাটিতে। করুণ সুরে বলছেন, 'আর করব না কক্ষনো করব না। দোহাই মহাবীর, মাপ করো মহাবীর।' মাসিমা গাড়ির আড়ালে ছিলেন বলে বেঁচে গেছেন ছেটকানো কাদার হাত থেকে। মাসিমা ছুটে গিয়ে আশুবাবুকে ভূমিশয্যা থেকে টেনে তুললেন। গাড়ি অবশ্য দুধাপ পেছিয়ে থেমে পড়েছে। নর্দমা থেকে চাকাও উঠে পড়েছে।

'জয় মহাবীরের জয়' বলতে বলতে আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঠেকিয়ে আবার প্রণাম করলেন। মেজমামা ধীরে ধীরে বড়মামার দিকে এগোতে লাগলেন। দাঁত কিড়িমিড়ি করছে।

'এটা কী বল বড়দা?'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে অসসাধারণ দেখাচ্ছে রে! অনেকটা ডালমেশিয়ানের মতো, সাদার ওপর কালোর স্পষ্ট।'

'তোমার রসিকতা রাখো। এটা কী করলে তুমি?'

'আমি কেন করব রে বোকা। করেছে আমার গাড়ি।'

সাইকেলে রাগী-রাগী চেহারার এক ভদ্রলোক আসছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'কী, হল কী? ভিড়িয়ে দিয়েছে বুঝি! বেশ ভাল করে চাবকে দিন মশাই। হাতে স্টিয়ারিং পড়লে কাপ্তেনদের আর জ্ঞান থাকে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে না না, এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। মাথা গরম করবেন না।'

'অ; তাই নাকি, সেমসাইড হয়ে গেছে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ভাই আর মেজ ভাইয়ে হচ্ছে। এখুনি মিটমাট হয়ে যাবে।'

'অ, ভাইয়ে ভাইয়ে হচ্ছে। সহজে মিটমাট হয়ে যাবে ভেবেছেন? কোথায় আছেন আপনি? কোর্ট অবদি গড়াবে। বছরের পর বছর চলবে। ভিটেতে পাঁচিল পড়বে। গাড়ির নাট-বল্টু খুলে খুলে ভাগাভাগি হবে। আছেন কোথায় মশাই? শোনেননি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

মেজমামা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ধ্যার মশাই। বাজে কথা না বলে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। বাঙালির স্বভাবই হল সব ব্যাপারে নাক গলানো।'

ভদ্রলোক তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন, 'কী হল? কথাটা কী হল? খুব মেজাজ লিচ্ছেন মনে হচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে খুব বড়ছোট কথা হচ্ছে? জানেন আমি কে?'

মেজমামা রাগের মাথায় বলে ফেললেন, 'জানি জানি, লাটসাহেবের নাতি।'

'মুখ সামলে। খুব সাবধান।'

'আরে মশাই যান, সব করবেন আপনি!'

'দেখবেন তা হলে?'

'হ্যাঁ দেখব।'

বড়মামা নেমে এলেন, 'কী হচ্ছে কী? তিল থেকে তাল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিল মানে? এটা তাল। তালকে আমি তাল-তাল করে ছাড়ব।'

আশুবাবু দু'ধাপ এগিয়ে এসে বললেন, 'নাঃ, আর সহ্য হচ্ছে না। এবার একটু হাত লাগাতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে আশুবাবুকে থামিয়ে বললেন, 'মুখটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, চেনাই তো! তোমার নাম সরোজ মাইতি না! আজ থেকে বছর-তিনেক আগে মাঝরাতে তোমার অ্যাপেন্ডিক্স ফাটো-ফাটো হয়েছিল, মনে পড়ে? তোমার মা এসে কেঁদে পড়েছিলেন। সেই রাতেই তোমাকে অপারেশান করেছিলুম। অপারেশান না করলে মরে ভূত হয়ে যেতে এত দিনে! অপারেশানের ফি-টা অবশ্য এখনও বাকি আছে! তোমার বোলচাল তো বেশ ফুটেছে কার্তিক!'

লোকটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। মুখে আর কথা সরছে না। নাকি সুরে বললে, 'কে, ডাক্তারবাবু? চিনতে পারিনি স্যার। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছেন তো, চেহারাটা কেমন যেন পালটে গেছে। ক্ষমা করবেন স্যার। বড় কষ্টে আছি।'

'কষ্টে কেন?'

'ব্যবসাটা লাটে উঠে গেল স্যার।'

'কী ব্যবসা ছিল তোমার?'

'আজ্ঞে, তেলেভাজার দোকান।'

'তেলেভাজা! আহা, বড় ভাল জিনিস! একেবারে উঠে গেল! একটুও নেই?'

'আজ্ঞে না। এমনকি উনুনটাও ভেঙে গেছে।'

'উনুনটা ভাঙলে কী করে?'

'পাওনাদারে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে গেছে।'

'দোকানঘরটা আছে?'

'তা আছে। তালাবন্ধ পড়ে আছে।'

'কী কী তেলেভাজা হত? আলুর চপ হত?'

'ওইটাই তো আমার স্পেশাল আইটেম ছিল স্যার। বনগাঁ, বসিরহাট থেকেও খদ্দের আসত গাড়ি চেপে কার্তিকের লড়াইয়ের চপ খেতে!'

'লড়াইয়ের চপ! বলো কী? লড়াইয়ের চপ! কত টাকা হলে আবার দেকানটা চালু করা যায়?'

মাসিমা বড়মামার হাত খামচে ধরলেন। বড়মামা ঝটকা মেরে মাসিমার হাত সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বেড়ালের মতো আঁচড়াচ্ছিস কেন কুসি? খিদে পেয়েছে?'

মাসিমা ফিসফিস করে বললেন, 'আবার টাকা পয়সার মধ্যে ঢুকছে কেন বড়দা?'

কার্তিকবাবু শুনতে পেয়েছেন ঠিক, বললেন, 'ওঁর যে দয়ার শরীর দিদি। দু'হাতে যেমন রোজগার করছেন, দু'হাতে তেমনি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়েও যাচ্ছেন। জানেন যে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে মূর্খ, সেটা টাকা নয়, বিদ্যে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।'

'মূর্খ আপনি।'

'আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। এ দেখি ধরলে চিঁ চিঁ করে। ছেড়ে দিলে তুড়ি লাফ মারে!'

বড়মামা বললেন, 'আহা বেচারার মাথার ঠিক নেই। হ্যাঁ, কত টাকা হলে দোকান আবার চালু করা যায়?'

'সে অনেক টাকা বড়বাবু। অত টাকা কি আপনি দিতে পারবেন? আপনি দিতে চাইলেও এঁরা কি দিতে দেবেন? হাত চেপে ধরবেন।'

ইলেকট্রিক শক খেলে যেমন হয়, বড়মামা চমকে উঠলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমার টাকা, আমি তোমাকে দোব, কে তাকে বাধা দেবে! হু আর দে! তুমি, আমি আর আমাদের তেলেভোজার দোকান। বলো কত টাকা?'

'আজ্ঞে তা প্রায় হাজার-তিনেক টাকা। হাজার খানেকের মতো দেনা আছে। একটা বড় কড়াই কিনতে হবে। উনুনটাকে ফের বানাতে হবে। তারপর তেল, ব্যাসন, আলু, বেগুন।'

'বেগুন? বেগুন কী হবে? তুমি তো বানাবে আলুর চপ!'

'আজ্ঞে স্যার, বেগুনি ছাড়া তেলেভাজার দোকান জমে না।'

'না, না, বেগুন-ফেগুন চলবে না। বেগুনে আমার অ্যালার্জি আছে।'

'আপনার অ্যালার্জি থাকলে কী হবে স্যার। চিরকাল লোকে চেয়ে আসছে, আলুর চপ, বেগুনি।'

আশুবাবু বললেন, 'লাইই ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার, মিল্ক অ্যাণ্ড হানি, রোজ অ্যাণ্ড থর্ন, সাবজেক্ট অ্যাণ্ড প্রেডিকেট।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে বললেন, 'ব্যাস, ব্যাস, হয়েছে, হয়েছে। বেগুনি হলে আমি একটি ফার্দিংও দোব না। আমি হলুম গিয়ে এক কথার মানুষ। বেগুনের গুণ নেই।'

'তা হলে স্যার পটুলি কি কুমড়ি?'

'হ্যাঁ, তা চলতে পারে। এমনকি ফুলুরিও অ্যালউড।'

আশুবাবু বললেন, 'ফুলুরি খুব টেস্টফুল, তবে কিনা উচ্চারণটা বড় গোলমেলে। মাঝে মাঝে ফুরুলি বেরিয়ে যায়। যেমন বাতাসটা মাঝে মাঝেই বাতাসা হয়ে যায়। যেমন পুঁটি মাছ। সেদিন বাজারে গিয়ে কিছুতেই আর মুখ দিয়ে বেরোল না, কেবলই বলি পুঁচি মাট। যেমন ফুলে ঢোল। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় ঢুলে ফোল! যেমন হাউসফুল আর হাউল ফুস। কী যে সব ডেনজারাস ডেনজারাস মুশকিলের ব্যাপার।'

মেজমামা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলেন। এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধ্যাত তেরি কা। পাগলের পাল্লায় পড়ে জীবনটা গেল। চল্ কুসি, আমরা চলে যাই।'

'আমি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি। শুনলে না, একটু আগেই বলেছে, হু আর দে।'

'ঠিক ঠিক। আমরা হলুম গিয়ে ঠ্যালার লোক। নর্দমায় গাড়ি পড়লে ঠেলে তুলে দিতে হবে"

বড়মামা একগাল হেসে দু'জনের দিকে তাকালেন। 'কেন রাগ করছিস পাগল? ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড। দেখলি না সকলের চেষ্টায় গাড়ি কেমন গাড্ডা থেকে উঠে পডল। গাড়ির শিক্ষা আমাদের জীবনের শিক্ষা। ঐকতান মাস্টার, ঐকতান। অনৈকতানে বাঙালি জাতটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।'

'তোমার লজ্জা করে না বড়দা, এই কাদামাখা অবস্থায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছো! লোকে কী ভাবছে?'

'লোকভয়! এখনও এই বয়েসে তোর লোকভয়! আশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের লেখাটা আর-একবার পড়িস। জীবনে জ্ঞানের আলো ফেল পাগলা, জ্ঞানের আলো ফেল্। নে, গাড়িতে উঠে পড়। ওখানে গিয়ে তোর জামাকাপড় পালটে দোব। তোরটা আমি পরব, আমারটা তুই পরবি।'

'আহা! কী কথাই বললে! তুমি আমার চেয়ে আধহাত লম্বা। তোমার পাঞ্জাবি তো আমার গায়ে লটরপটর করবে।'

'হাতার বাড়তি অংশটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেব। লোকে বলে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আমি বলি হাতে কাঁচি হাতা লটরপটর। নে, উঠে পড়। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। টাইম ইজ মানি।'

'তোমাকে দেখে তা মনে হয় না বড়দা। তোমার কাছে টাইম ইজ গানি।'

'তার মানে? গানি মানে কী?'

'গানি হল চট। তোমার কাছে সময় হল চটের মতোই মূল্যহীন।'

'ওরে পাগলা, চটের দাম জানিস? জানলে আর মানির সঙ্গে গানি মেলাতিস না। চট সায়েবদের দেশে চালান যায়।'

বড়মামা বীরের মতো স্টিয়ারিং-এ বসলেন। আমরা সুড়সুড় করে যে যার আসনে। মাসিমা সিঁটিয়ে বসেছেন মেজমামার স্পর্শ বাঁচিয়ে।

মেজমামা বললেন, 'তুই অমন সিঁটিয়ে আছিস কেন কুসি?'

'তুমি নর্দমা ছুঁয়েছ মেজদা। গায়ে গঙ্গাজল না ছিটোলে শুদ্ধ হবে না।'

'অ, তাই নাকি? অদ্ভুত বিচার!'

'ছোঁয়াছুঁয়ি মানতে হয় মেজদা। তুমি এখন অপবিত্র।'

'আমি না তোর মেজদা!'

'হতে পারো মেজদা, তবে অপবিত্র মেজদা।'

বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছেন। ঘুরর ঘুরর আওয়াজ হচ্ছে, গাড়ি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, স্টার্ট কিন্তু ধরছে না। বড়মামা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন।

আশুবাবু বললেন, 'কী হল, গড়বড় করছে মনে হচ্ছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সেল্‌ফটা কাজ করছে না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন অপয়া আছে।'

পেছনের আসন থেকে তিনজনে সমস্বরে বললেন, 'কে, কে, কে অপয়া?'

'সেইটাই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আমি অপয়া নই তো?'

মাসিমা বললেন, 'অপয়াদের চেনার কোনো উপায় আছে? চেহারা দিয়ে বোঝা যায়?'

আশুবাবু বললেন, 'যেমন ধরুন, আমি দৈর্ঘ্যে সামান্য খাটো, প্রস্থে একটু বিশাল, মুখটা কেমন?'

মেজমামা বললেন, 'গোল আলুর মতো। একটু লালচে রঙ।'

লালচে? বলেন কী, লালচে? তা হলে রক্ত। শরীরে রক্ত বেড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আনন্দের কিছু নেই। এই বয়েসে বেশি রক্ত ভাল নয়। হাই প্রেশারে মরবেন। মাথার মাঝখানে টাক আছে?'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ আছে। চিকচিক করছে।'

'আমি কি তাহলে অপয়া?'

'সকালে আপনার নাম করলে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়? শুনেছেন কিছু?'

না, তেমন অভিযোগ তো কানে আসেনি।

'আচ্ছা আপনি একবার নেমে দাঁড়ান তো, দেখি স্টার্ট নেয় কি না!'

আশুবাবু নেমে দাঁড়ালেন। বড়মামার কেরামতি শুরু হ'ল সেল্‌ফ নিয়ে। কোথায় কী গাড়ি স্টার্ট নিল না। আশুবাবু বড়মামার পাশে সরে এসে বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, আমি কি তাহলে অপয়া?'

বড়মামা বললেন, 'মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে উঠে বসি ডাক্তাবাবু?'

'আর উঠে কী হবে! এবার ঠেলতে হবে। ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। কতটাই বা পথ। বড় জোর এক মাইল!'

মেজমামা বললেন, 'আমি ঠেলতে পারব না। আমার ক্ষমতা নেই।'

'ছিঃ মেজ। সবে মিলে করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। একটু হাত লাগাও ভাই। মানুষ তো চিরকালই গাড়ি চেপে এল, গাড়ির যদি একদিন মানুষ চাপার শখ হয় তাতে মেজাজ খারাপ করলে চলে? একদিনের তো মামলা রে ভাই। ইংরেজ হলে হাসিমুখে নেমে আসত, আমায় কিছু বলতে হত না।'

'আমি বাঙালি, ইংরেজ নই।'

'তা বললে চলে? সব সময় ইংরেজির খই ফুটছে মুখে। নাও, নেমে পড়ো। দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করা যাক। অনেক দেরি হয়ে গেল রে পাগলা!'

'পাগলা বলে যতই আদর করো, গাড়ি আমি ঠেলছি না। দিস জি টু মাচ।'

'এই তো ইংরিজি এসেছে, তার মানে ইংরেজ ভর করেছে। নাও, নেমে পড়ো। ঠেলতে শুরু করলেই দেখবে কী মজা! গাড়ি-ঠেলার যে কত আনন্দ! তখন থামতে বললেও আর থামতে ইচ্ছে করবে না। ঠেলে দ্যাখ, বয়েস তিরিশ বছর কমে যাবে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি বড়দা, জীবনে আর কোনো দিন তোমার গাড়িতে মরে গেলেও পা দেবে না।'

'ছিঃ, প্রতিজ্ঞা করতে নেই মেজ। বাঙালির প্রতিজ্ঞা জানিস তো মেজ, এই করে এই ভাঙে। কাঁচের বাসনের মতো। তিন দিন পরেই তোমার গাড়ির দরকার হবে ভাই। মনে নেই, হাওড়ায় যাবে। প্রফেসার চিদাম্বরম আসছেন সকাল আটটা দশ মিনিটে। নাও, নেমে পড়ো। একটু ব্যায়ামও হবে। শরীরটা দিন-দিন বেঢপ হয়ে যাচ্ছে।'

দু'পাশের দরজা খুলে পেছনের আসন থেকে তিনজন নেমে পড়লেন। তেলেভাজার-দোকান-ফেলে সরোজবাবু এগিয়ে এলেন, 'আমিও একটু হাত লাগাই স্যার!'

মেজমামা খ্যাঁক করে উঠলেন, 'তুমি হাত না লাগালেও টাকা পাবে। এখন বুঝছি অপয়া কে? কাল সকালে উঠেই তোমার নাম করে দেখব, কপালে অন্ন জোটে কি না!'

'ঠিক ধরেছেন স্যার। এতক্ষণ বলিনি কিছু, চুপচাপ ছিলুম। সবাই আমাকে অপয়া বলে। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

বড়মামা সামনের আসন থেকে বললেন, 'তুমি তাহলে ত্রিসীমানায় আর দয়া করে থেকো না। সরে পড়ো। আর সকালের দিকে দয়া করে বাড়িতে যেও না।'

সরোজ মাইতি সাইকেল নিয়ে সরে পড়লেন। ধীরে গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আশুবাবু আর মেজমামা প্রাণপণে ঠেলছেন। মাসিমা আসছেন পায়ে পায়ে ইন্দিরা গান্ধীর মতো গম্ভীর চালে। বড়মামা গান ধরেছেনঃ

মুক্তির মন্দির সোপান-তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।

আমি বনেটে টুকুস টুকুস করে তাল বাজাচ্ছি। বেশ জমে গেছে ব্যাপারটা।

॥ ৩ ॥

বিরাট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। কুলতলি দুঃস্থা মহিলা সমিতি। হলদের ওপর কালো অক্ষরে লেখা। তলায় ছোট ছোট করে লেখা, প্রতিষ্ঠাতাঃ ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। ফুল দিয়ে সাজানো গেট। মোটা মোটা গাঁদার মালা ঝুলছে। একাপাশে একটা বাছুর, আর একপাশে একটা ছাগল মনের সুখে চিবিয়ে যাচ্ছে। মাইকে স্তোত্র পাঠ হচ্ছে, যা দেবী সর্বভূতেষু। কিছুই তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাড়ক্যাড় শব্দ হচ্ছে। গেটের ভেতরে মাঠে একদল মহিলা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকের হাতে শাঁখ।

বেশ স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক গাড়ি দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'এসে গেছেন, এসে গেছেন। স্টার্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। ভদ্রলোক দু'হাত তুলে বড়মামাকে জানালেন, 'এইখানে স্যার, এইখানে স্যার। পার্ক করুন।'

সামনে থেকে বোঝার উপায় নেই, গাড়ি নিজের জোরে আসছে না, আসছে ঠেলার জোরে। গলদ্‌ঘর্ম দুটি মানুষ লেগে আছে পেছনে।

বড়মামা চিৎকার করছেন, 'স্টপ, স্টপ, নো মোর, নো মোর।'

ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, 'ব্রেক মারুন, ব্রেক মারুন।'

মেজমামাদের ঠেলার নেশায় পেয়ে গেছে। মাথা নিচু। ঠেলছেন তো ঠেলছেন। গেট ছেঁচড়ে, মালাফালা ছিঁড়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। তবু থামার নাম নেই। মহিলারা দৌড়ে সমিতির রকে। শাঁখ কিন্তু থামেনি, সমানে বেজে চলেছ। আরও জোরে। যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে।

মাসিমা বলছেন, 'ও মেজদা, থামো থামো।'

মেজমামা বললেন, 'আমি কি আর ঠেলছি। আমি তো শুরু থেকেই থেমে আছি। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। ঠেলছেন আশুবাবু।'

মাসিমা বললেন, 'আশুবাবুকে থামতে বলো।'

'নিজের ইচ্ছেয় আর থামেন কী করে! উনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকছে আর গাড়ি না থামলে আমি সোজা হই কী করে! মুখ থুবড়ে পড়ে যাব যে!'

সমিতির উঁচু রকে গাড়ি গিয়ে ঠেকল। মেয়েরা চিৎকার করে উঠল, 'যাঃ, রকটা বোধহয় ভেঙে গেল!' ভাঙল না, একটা কোণ শুধু থেঁতলে গেল। গাড়ি থেমেছে। মেজমামা সোজা হলেন। আশুবাবু গাড়ির গায়ে ঢলে পড়লেন। গভীর ঘুম। ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকছে। বড়মামা হাসিমুখে নেমে এলেন, 'এই যে আমার মেজভাই। অধ্যাপক শান্তি মুখোপাধ্যায়। আপনাদের স্প্রে পেন্ট করা সভাপতি। আশুবাবু কোথায় গেলেন? আমাদের এক নম্বর পেট্রন। কোথায় তিনি?'

'তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'সে কী, বিছানা পেলেন কোথায়?'

'বিছানার দরকার হয়নি। গাড়ির পেছনে শুয়ে পড়ছেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরিশ্রম হয়েছে। একটু বিশ্রাম করে নিক।'

আশুবাবু ঠিক এই সময় স্বপ্ন দেখে ডুকরে উঠলেন, 'মা মা, আমি কোথায়।'

মাসিমা বললেন, 'খুব হয়েছে, এবার উঠে পড়ুন।'

'অ্যাঁ, ভোর হয়ে গেছে! চা হয়ে গেছে!' ভদ্রলোক তড়বড় করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

'আরে মশাই, ওদিকে চললেন কোথায়?'

'যাই, দাঁতটা মেজে আসি।'

বড়মামা হাত চেপে ধরলেন, 'ধ্যাত মশাই, চোখ মেলে দেখুন কোথায় আছেন।'

কথা শেষ হতে না-হতেই শাঁখ বেজে উঠল।

ফট ফট করে গোটা দশ-বারো পটকা ফাটল। আশুবাবু বললে, 'কী, রে বাবা, কালীপুজো শুরু হয়ে গেল নাকি?'

রকের একধারে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বড় বড় চেয়ার। লম্বা একটা টেবিল। সাদা টেবিল ক্লথ। বড় দুটো ফুলদানি। নানা রঙের ফুল। পেছনে সাদা কাপড় ঝুলছে। তার ওপর বাসন্তী-রঙে সমিতির নাম। তার তলায় লেখা, প্রথম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী। বড়মামা বলতে লাগলেন, 'আহা, কী আয়োজন! একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। সুহাস একেবারে সুযোগ্য সেক্রেটারি...।'

বাকি কথা আর শোনা গেল না। মাইক ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে উঠল, 'হ্যালো, হ্যালো টেস্টিং। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।'

সুহাসবাবু বড়মামার কানে কানে কী বললেন। বড়মামা বললেন, 'কোথায় সে, কোথায় সে?'

'আজ্ঞে পেছন দিকের ঘরে বসে আছে।'

'চলো, চলো, কী বিপদ, কি বিপদ!'

পেছনের ঘরে এক মহিলাকে ঘিরে আরও অনেক মহিলা বসে আছেন। সকলেই বলছেন, 'একটু খোলার চেষ্টা করো। নীচেরটা নীচের দিকে ওপরেরটা ওপরের দিকে, জোরে ঠেলো না। অমন করে বসে থাকলে চলে!'

মাসিমা দু'পা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী হয়েচে, কী হয়েচে?'

'দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।'

'মৃগী আছে বুঝি?'

সুহাস বললেন, 'আজ্ঞে মৃগী নয় দিদিমনি। ক্যাণ্ডি-ফ্লস টেস্ট করতে গিয়ে দাঁতকপাটি লেগে গেছে।'

‘সে আবার কী? ক্যাণ্ডি-ফ্লস জিনিসটা কী?’

‘দেখবেন? আমাদেরই তৈরি।’ কাঁচের বয়াম থেকে ভদ্রলোক পাতলা কাগজে মোড়া চৌকোমতো কী একটা বের করে মাসিমার হাতে দিলেন।

‘এ তো লজেন্‌স দেখছি।’

‘আজ্ঞে ঠিক লজেন্‌স নয়। লজেন্‌স কড়মড় করে চিবিয়ে খাওয়া যায়। এ জিনিস আঠা-আঠা, চটচটে। সর্বক্ষণ চুষতে হবে। দাঁত দিয়ে কেরামতি করতে গেলেই ওপর পাটি, নীচের পাটি জুড়ে যাবে, ওই সীমার যেমন হয়েছে।’

‘ট্রাই করে দেখব?’

চারপাশ থেকে সমস্বরে আর্তনাদের মতো শোনা গেল, ‘না, না, খবরদার না। এখুনি আটকে যাবে।’

‘কী এমন জিনিস মশাই, দাঁতে ভাঙা যায় না!’ আশুবাবু মাসিমার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। ‘এ কি গীতার সেই আত্মপুরুষ! অস্ত্রে

ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে গলে না! কী করে বানালেন এমন জিনিস?'

'করতে, করতে হয়ে গেছে। তেমন কিছু চেষ্টার দরকার হয়নি। একটা মুখে ফেললে এক মাস কেন, মনে হয় সারা জীবন চলে যাবে!'

'ভাল করে প্রচার করুন। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার!'

সুহাসবাবু সবিনয়ে বললেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিমিত্তমাত্র।'

বড়মামা হাঁটু মুড়ে মহিলার পাশে বসেছেন। চামচ এসেছে নানা মাপের। সাহায্য করার জন্যে তিন-চার জন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। বড়, ছোট সব চামচেই ব্যর্থ হল। দাঁতকপাটি খোলা গেল না। বড়মামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'খুন্তি লে আও।'

'খুন্তি? যে খুন্তি দিয়ে বেগুন ভাজে?'

চারজন চার দিকে ছুটলেন। বড় ছোট চার-পাঁচ রকমের খুন্তি এসে গেল। বড়মামা বললেন, 'শুইয়ে দাও।'

আশুবাবু বললেন, 'এখানে সবই দেখছি না-খোলার কেস। কৌটোর ঢাকনা খোলে না, দাঁত থেকে দাঁত খোলে না।'

'আপনি চুপ করুন।' মেজমামা ধমকে উঠলেন।

রুগিকে চার-পাঁচজনে শুইয়ে ফেললেন। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোমার কায়দাটা কী হবে শুনি বড়দা?'

'ভেরি সিম্পল। ঝিনুকের মুখ ফাঁক করে যেভাবে মুক্তো বের করে আনে সেই কায়দায়...।'

'সেই কায়দায়? ইনি মানুষ। সামুদ্রিক ঝিনুক নন। ঠোঁট দুটো আস্ত থাকবে?'

'তা হলে কী করব? এমন কেস তো জীবনে আমার হাতে আসেনি!'

'মাসিমা বললেন, 'একটু মোটা সুতো আর মোম আছে।'

সুহাসবাবু বললেন, 'অবশ্য আছে, অবশ্য আছে।'

মোম আর সুতো এসে গেল। বড়মামাকে সরিয়ে দিয়ে মাসিমা চিকিৎসায় লেগে গেলেন। প্রথমে মোটা সুতো জলে ভিজিয়ে দু'সার দাঁতের ফাঁকে ধরে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগলেন। সকলে হাঁ করে দেখছেন। বড়মামা বলছেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ, খুলে দাও বাবা। হ্যাঁ রে, চিচিং ফাঁক বললে কোনো কাজ হবে?'

মাসিমা বললেন, 'তুমি চুপ করো।'

বেশ কিছুক্ষণ কেরামতি চলার পর ভদ্রমহিলার দাঁত খুলে গেল। সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'খুল গিয়া, খুল গিয়া''

মাসিমা দ্রুত হাতে মোমের টুকরোটা দু দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিলেন।

বড়মামা বললেন, 'ও আবার কী হল?'

'দাঁতে দাঁত ঠেকলেই আবার জুড়ে যাবে। যে সাংঘাতিক জিনিস তৈরি করেছ! যে কটা আছে সব গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে এসো।'

সুহাসবাবু বললেন, 'এঁকে সারা জীবনই কি তাহলে মোমের টুকরো দাঁতে নিয়ে ঘুরতে হবে?'

'তা কেন? এইবার বেশ করে ছাই দিয়ে দাঁত মেজে আসুন। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বড়মামা বললেন, 'কুসি, তোর এই চিকিৎসাটা মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করতে হবে।'

'থাক, এমন ঘটনা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ঘটবে বলে মনে হয় না।'

মেজমামা বললেন, 'এইবার আমার একটা ব্যবস্থা করো। এই কাদামাখা জামা পরে সভাসমিতি করা যায়?'

বড়মামা চনমন করে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক। এক কাজ কর, তুই আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবিটা পর।'

'আবার তোমার সেই এক কথা। তোমার জামা আমার গায়ে বড় হবে।'

বড়মামা সুহাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চুন আছে, চুন?'

'চুন কী করবেন ডাক্তারবাবু?'

'হোয়াইট ওয়াশ। দেয়াল যদি চুনকাম করা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি কেন করা যাবে না। আলবাত যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'থাক বড়দা, খুব হয়েছে। তোমার চিকিৎসা যেমন উদ্ভট, পরিকল্পনাও তেমনি উদ্ভট। আমি আর সভাপতি হতে চাই না। যা পারো তাই করো।'

বড়মামা বললেন, 'তা বললে চলে রে পাগলা! এই সভার প্রধান আকর্ষণ তো তুই। তোর ওই কাতলা মাছের মতো মাথা থেকেই তো পথের নির্দেশ বেরোবে। তোর যা মাথা, একদিন তুই এম. এল. এ. হবি। এম. এল. এ. থেকে মন্ত্রী। তখন আমাদের জোর কত বেড়ে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'আমার মাথায় সাংঘাতিক এক আইডিয়া এসেছে বড়দা।'

'আসবেই তো, আসবেই তো, তুই যে আমারই ভাই। আমার মাথাটা দেখেছিস, আইডিয়ার পিন-কুশন। বল তোর কী আইডিয়া?'

'কাপড়ের কাদামাখা অংশটা তো টেবিলের তলায় থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না। সমস্যা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটা উলটে পরলেই সব সমস্যার সমাধান। কী বলো?'

'বাহা, বাহা, একেই বলে মাথা। কার মাথা দেখতে হবে তো! আমার ভাইয়ের মাথা। এ-সব মাথা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয়।'

'তা হলে পরে ফেলি সেইভাবে?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আর দেরি নয়।'

মেজমামা সমস্যা সমাধানের আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন, 'আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনেছি ওই ভেরি।'

মাসিমা বললেন, 'পাগলামির একটা সীমা আছে, বুঝলে? যা বাড়িতে চলে, তা সভায় চলে না। উল্টো পাঞ্জাবির পকেট দুটো দু'পাশে জপের মালার ঝুলির মতো ঝুলবে, কী সুন্দর দেখাবে, তাই না!'

বড়মামা দরাজ হেসে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে ওটা কোনও সমস্যাই নয়। অ্যাম্পুটেট করে দোব। পরিষ্কার অস্ত্রোপচার। কাঁচি দিয়ে কুচকুচ করে ছেঁটে ফেলে দোব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেঁটে ফেলে দাও। ও তো একটা কাঁচির ব্যাপার।' কথা বলতে বলতে মেজমামা পাঞ্জাবিটা উল্টো করে পরে ফেললেন। তারপর বোতাম আটকাতে গিয়ে গভীর চিন্তায় মাথা নিচু হয়ে গেল, 'দাদা বোতাম!'

'বোতাম?'

'হ্যাঁ গো, বোতাম লাগাব কী করে?'

'কেন? যেভাবে সবাই লাগায়! বোতাম ঘরের মধ্যে খুস্ করে বোতাম ঢুকিয়ে দিবি।'

'তুমি একেবারে গবেট হয়ে গেছ দাদা।'

'কেন, কেন? জানিস আমি ডাক্তার, তোর মতো ছেলেঠ্যাঙানো অধ্যাপক নই!'

'ওই রুগি-মারা ডাক্তারিটাই জানো, উল্টো জামায় বোতাম লাগাবার কিস্যুই জানো না। বোতাম আর ঘর দুটোই যে ভেতর দিকে চলে গেছে। বুকে খোঁচা মারছে।'

'মারছে মারুক। সহ্য করো। সবই কি আর সুখের হয় ভাই রে! জীবন দুঃখময়। যে কারণে রাজার ছেলে গৌতম সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হলেন।'

'আমি গৌতমও নই, বুদ্ধও নই, বোতাম না লাগিয়ে বুক খোলা অবস্থায় অসভ্য ইয়ারের মতো সভায় যেতে পারব না। আমার একটা মানসম্মান আছে।'

'ওরে মূর্খ, সংস্কৃত জানিস! বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নির্বোধেস্তু কুতঃ বলং! চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়। ভাগ্নে আমার হামা দিয়ে পাঞ্জাবির ভেতর ঢুকে বোতাম লাগিয়ে দিক। ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল।'

'তা কী করে হয়?'

'খুব হয় রে ভাই, খুব হয়। গাড়ি কী করে মেরামত হয় দ্যাখোনি? মিস্ত্রি তলায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে খুটুস খাটুস করে তারমার জুড়েজাড়ে দেয়।'

মেজমামা একটু চিন্তা করে বললেন, 'তা হলে শুয়েই পড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়েই পড়ো। একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়ো।'

মাসিমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বললেন, 'তোমরা বাড়ি চলো, বাড়ি চলো, তোমাদের আর সভা করে দরকার নেই, খুব হয়েছে।'

দু'জনে সমস্বরে বললেন, 'বাড়ি চলে যাব? এ তুই কী বলছিস কুসি?'

সুহাসবাবু বললেন, 'আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে।'

'বলে ফেলো, বলে ফেলো।'

'খুব সহজ সমাধান আমার মাথায় এসেছে।'

'এসেছে? এসেছে নাকি? নিবেদন করো, নিবেদন করো। নিবেদনমিদং।'

'আমাদের তাঁত বিভাগ থেকে একটা সাদা চাদর নিয়ে আসি, সেইটি গায়ে দিয়ে...'

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'সুহাস, তোমার আইনস্টাইন হওয়া উচিত ছিল। তুমি আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট। তুমি চেঙ্গিজ খান।'

মেজমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আঃ, উচ্চারণটা ঠিক করো বড়দা। চেঙ্গিজ নয়, জিঙ্গিজ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সারা জীবন চেঙ্গিজ বলে এলুম। ম্যাট্রিক ইতিহাসে লেটার পেলুম। তুই এখন উচ্চারণ শেখাতে এলি! জানিস সায়েবরা আমার নাম কী ভাবে উচ্চারণ করে, সু-ড্যাংশু।'

'করো, তাহলে ভুলে উচ্চারণই করো। শেখালে যখন শিখবে না, অশিক্ষিতই থেকে যাও।'

দু'জনের ঝগড়া আর তেমন এগোল না। পাড় বসানো সুন্দর একটা সাদা চাদর এসে

গেল। উল্টো করে পরা পাঞ্জাবির ওপর চাদর ফেলে মেজমামা হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'চলুন তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক। এদিকে যত রাত হবে ওদিকে তত দিন হবে।'

মাসিমা বললেন, 'তোমারও মাথাটা গেছে। কী বলতে কী যে বলছ? বলো, এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে তত রাত হবে।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে একটা গল্প শোন।'

'এখন আর গল্প শোনার সময় নেই। তোমার গল্প ভীষণ বড় বড় হয়।'

'এটা খুব ছোট। সত্যি ঘটনা কি না!'

'কাল শোনা যাবে।'

'না, আজই শুনতে হবে। তা না হলে এই সভা আমি হতে দোব না।'

মেজমামা বললেন, 'যাঃ-ব্বাবা। বেশ মজার লোক তো! নিজের সভা নিজেই পণ্ড করবে?'

'আমার পাঁঠা আমি যেদিকে খুশি কাটতে পারি। ন্যাজেও পারি, মুণ্ডুতেও পারি।'

সহাসবাবু বললেন, ছোট্ট যখন শুনেই নিন না!' ঝামেলা চুকে যাক।'

'বেশ, বলো তাহলে।'

'এক দিন সকালে চেম্বারে বসে আছি।'

'কত সকালে?'

সুহাসবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'কেন বাগড়া দিচ্ছেন মেজবাবু!'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি বলে যাও।'

'একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, শিগগির চলুন, মা আবার ঢুলে ফোল হয়ে গেছে। বলেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি হাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি ফিরে এল। সেই একই ভাবে উর্ধ্বশ্বাসে, ডাক্তারবাবু, ঢুলে ফোল নয়, ফুলে ঢোল! ছুটতে ছুটতে চলে গেল।'

বড়মামা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কই, তোমরা হাসলে না?'

'হাসব কেন? এটা একটা গল্প হল?'

'গল্প হল না! তা হলে কী হল?'

'ঘোড়ার ডিম হল।'

'এটা গল্পের মতো সত্য।'

'সে আবার কী? বলো সত্যের মতো গল্প।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, সব গুলিয়ে গেল। গল্পের মতো সত্য, সত্যের মতো গল্প। ট্রু স্টোরির ইংরেজি কী হবে?'

সুহাসবাবু বললেন, 'সত্য গল্প।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্য গল্প। সত্য হাসির গল্প।'

মেজমামা বললেন, 'ভেরি সরি। আমাদের কিন্তু হাসি পেল না।'

'তার মানে তোমরা সমঝদার নও। তোমাদের মন তেমন সরল নয়। শিশুর মতো সরল মন না হলে প্রাণ খুলে হাসা যায় না রে পাগলা!'

সুহাসবাবু বললেন, 'আপনি লক্ষ করেননি, আমি কিন্তু ফিক্‌ফিক্ করে হেসেছি।'

'লক্ষ্মী ছেলে। লক্ষ্মী ছেলে।' বড়মামা পিঠ চাপড়ালেন।

'তবে আর বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না বড়বাবু। অনেক সব প্রবলেম আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার স্টার্ট।'

॥ ৪ ॥

ফুল, লতা, পাতা, রঙিন কাগজ, লাল নীল পতাকা। সভা একেবারে জমজমাট। লাউডস্পিকার কাসছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে একজন চিৎকার করছেন, 'টেস্টিং টেস্টিং। বড়মামা বললেন, 'টেস্ট করে আর কী পাবে! এ তো ব্রংকাইটিসের কাসি। বুকে সর্দি জমেছে।'

যে ভদ্রলোক টেস্ট্ করছিলেন তিনি যেই ওয়ান, টু, থ্রি, বলতে গেলেন, মাইক চ্যাঁ করে চিৎকার করে উঠল। বড়মামা বললেন, 'ফেলে দাও, ফেলে দাও। মাচান থেকে নামিয়ে দাও। অসুস্থ, অসুস্থ। হাসপাতালে পাঠাও।'

ফোর, ফাইভ, সিক্‌স। সেভেনে এসে মাইক সুস্থ হল। স্বাভাবিক স্বর বেরোল। বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুললেন। মাইক নিয়ে ধস্তাধস্তি শেষ হল। সভা একেবারে লোকে লোকরণ্য। পুরুষ, মহিলা, ছেলে মেয়ে, কেমন একটা গজর-গজর, ভজর-ভজর শব্দ হচ্ছে। একসঙ্গে অনেক মাছি উড়লে যেমন হয়।

সুহাসবাবু বললেন, 'সাইলেন্‌স্! সাইলেন্‌স্! সাইলেন্‌স্!' প্রায় ধমকে উঠলেন, 'একদম চুপ, একদম চুপ।' ঠিক যেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার! এখুনি পড়া ধরবেন। না পারলে মাথায় ডাস্টার।

সুহাসবাবু বললেন, 'আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।'

গুনুর গুনুর গোলমাল তখনও চলেছে। ছুঁচ পড়লে আওয়াজ হয় এমন নিস্তব্ধ তখনও হয়নি। একেবারে সামনের সারিয়ে দুটো বাচ্চা, এ ওর কান, ও এর কান ধরে কান-টানাটানি খেলা খেলছে। সুহাসবাবু মাইক ছেড়ে লাফিয়ে সভায় নামলেন। প্রথমেই দু'হাতে দুই থাপ্পড়। তারপর দুটোকেই বেড়াল-ছানার মতো নড়া ধরে তুলে ঝোলাতে ঝোলাতে সভার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এলেন। এসেই আবার মাইক ধরলেন, 'আজ আমাদের অতিশয় আনন্দের দিন। গত বছর ঠিক এমনি দিনে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।'

পেছনের সারি থেকে একসঙ্গে অনেকে বলে উঠলেন, 'এবার উঠে যাবে।'

বড়মামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কে বললে? কে বললে উঠে যাবে? কার এত সাহস? উঠে যাবে কেন?'

পেছনের সারিতে পরপর দশ-বারোজন উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা বলেছি স্যার। আজ আমাদের আনন্দের দিন নয়, দুঃখের দিন স্যার।'

'কেন, কেন? দুঃখের দিন কেন? কোনো কিছু জন্মালে কেউ কি দুঃখ করে, না আনন্দ করে? আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমার বাড়ির সবাই হেসেছিল না কেঁদেছিল? আমি অবশ্য ভ্যাঁ, ভ্যাঁ করে কেঁদেছিলুম। সে তো ভাই তুলসীদাসজি বলেই গেছেন—তুমি যখন এসেছিলে, জগৎ হেসেছিল, তুমি কেঁদেছিলে। তুমি যখন যাবে, জগৎ কাঁদবে আর তুমি হাসবে।'

'ডাক্তারবাবু, আমরা সে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলছি না, আমরা এই কুলতলি মহিলা সমিতির কথা বলছি স্যার।'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সেই কথাই তো বলবেন। সেই কথা বলারই তো দিন আজ।'

'তা হলে বলেই ফেলি।'

'উঁহু, আপনারা তো শুনবেন। আমরা আজ বলব। সভাপতি বললেন, প্রধান অতিথি বলবেন। আপনারা শুধু কান খাড়া করে শুনবেন। শোনা শেষ হলে চটাপট পটাপট হাততালি দেবেন।'

'সবই বুঝলুম। তবে আপনারা বলার আগে, আমরা যা বলতে চাই শোনা দরকার। অনেক টাকার ব্যাপার তো।'

'ও, এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা অর্থ দান করতে চান? বাঃ বাঃ, অতি মহৎ প্রস্তাব। পৃথিবীতে দাতা তাহলে এখনও আছেন!'

'ভাল করে শুনুন। আমরা নিতে এসেছি, দিতে আসিনি। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই।'

'ক্ষতিপূরণ! সে আবার কী রে ভাই! আমরা তো কারুর কোনও ক্ষতি করিনি। আমরা তো মানুষের উপকার করার জন্যেই বাজারে নেমেছি।'

'ওই আনন্দেই থাকুন। এদিকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কী রকম, কী রকম?'

'বলছি, বলছি। একে একে বলছি। আমিই প্রথমে বলি, তারপর এরা বলবে।'

বড়মামা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'সুহাস, সব যে বেসুরে বাজছে গো!' মাইকে বড়মামার আস্তে মন্তব্য বড় হয়ে সভায় ছড়িয়ে পড়ল।

মেজমামা বললেন, 'তা তো একটু বাজতেই পারে। সব সময় সবকিছু কি সুরে বাজে?'

মেজমামার মন্তব্যও সবাই শুনে ফেলল।

সুহাসবাবু মইক টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ আমাদের জন্মদিন, বড় আনন্দের দিন, আজ কোনো গণ্ডগোল করা কি ঠিক হবে। আসুন আমরা হাতে হাত মেলাই।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারি থেকে মন্তব্য হল, 'জন্মদিন আর মৃত্যুদিন একই তো হয়ে যেতে পারে।'

'মৃত্যুর কথা আসছে কেন ভাই। এই তো সবে এক বছর হল আমরা জন্মেছি।'

'তা হলে শুনুন, আপনাদের কীর্তিকাহিনী শুনুন। আপনাদের সেই প্যাকেটে ভরা মুড়কি, যার নাম রেখেছিলেন হরিভোগ। সেই মুড়কি আমার দোকানের কী সর্বনাশ করেছে!'

'ভাই, হরিভোগ তো সত্যিই হরির ভোগ। আমরা নিজেরা টেস্ট করে তবে বাজারে ছেড়েছি। ওতে বাদাম আছে, জিবেগজার সুস্বাদু টুকরো আছে, নকুলদানা আছে, আদার কুচি আছে। ভাবলেই আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে রে ভাই!'

'আপনার জিভে জল, আর আমার চোখে জল। যা মাল তুলেছিলুম দুচার প্যাকেট মাত্র বেচতে পেরেছি। এ বাজারে ওসব বৈষ্ণব-পথ্য চলে না মশাই। এ হল মাটনরোল, ফিশরোল, মোগলাইয়ের যুগ। আপনাদের হরিভোগ সব ধেড়ে-ইঁদুর-ভোগ হয়ে গেছে। তাও ইঁদুরে ভোগ করে ছেড়ে দিলে বাঁচতুম। হরিভোগ খেয়ে, ধেড়েরা এমন খেপে আছে, আমার দোকানের সব কাঁচের জার তো ভেঙে চুরমার করেছেই, আমাকেও দোকান খুলতে দিচ্ছে না, তেড়ে তেড়ে আসছে। কামড়েও দিয়েছে পায়ের বুড়ো আঙুলে। তলপেটে এখন ইন্‌জেকশান নিতে হচ্ছে।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'এই ব্যাপার! আপনি আমাদের এই সমিতির তৈরি গোটাকতক আগমার্কা ইদুরকল ওই হরিভোগ দিয়েই পেতে রাখুন, সব ব্যাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'আগমার্কা ঘি হয় শুনেছি, ইঁদুরকলও হয় নাকি?'

'আরেব্বাপু রে, সেরা জিনিস মানেই আগমার্কা। আমাদের ইঁদুরকল বাজারের এক নম্বর। নাম্বার ওয়ান। লিকপ্রুফ। ইঁদুর এদিক দিয়ে পড়ে ওদিক দিয়ে ফুড়ত করে বেরিয়ে যাবে, সে আর হচ্ছে না। আমরা সব জিনিস টেস্ট করে তবে বাজারে ছাড়ি।'

'ইঁদুরকল কী করে টেস্ট করবেন স্যার? ওটা তো খাদ্য নয়। কেক নয়, রুটি নয়।'

'ওই কেক আর রুটির কথা যখন উঠল, তখন বলেই ফেলি।' এবার দ্বিতীয় আর এক ভদ্রলোক। সুন্দর চেহারা। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। বড়-বড় চোখ।

বড়মামা বললেন, 'আপনার আবার কী অভিযোগ? এ দেখছি আমদরবার বসে গেল। অ্যাতো অভিযোগ সামলাই কী করে?'

'আপনাদের ওই কেক আর রুটি স্যার আমার এতকালের ব্যবসার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ও দুটোও কি টেস্ট করে ছেড়েছিলেন স্যার?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি খাইনি, তবে এরা অবশ্যই খেয়েছে। খাবার জিনিস, না খেয়ে পারে?'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়েছে। আমাদের সামনে দয়া করে একটু চাখুন না!'

'তা চাখতে পারি। আমার আবার খাওয়ার ব্যাপারে তেমন লজ্জাটজ্জা নেই।'

'তা হলে সভাপতি, প্রধান অতিথি দু-জনেই একটু একটু টেস্ট করুন। আমরা দেখি।'

মেজমামা লজ্জা-লজ্জা করে বললেন, 'কী যে বলেন?'

সুহাসবাবু কেক আর রুটি নিয়ে এলেন। দেখেই মনে হল বেশ গরম গরম। সুন্দর গন্ধ নাকের পাশ দিয়ে ভেসে চলে গল। যেন ডাকছে—আয়, আয় কপাকপ খেয়ে যা। বড়মামা এক টুকরো কেক ভেঙে মুখে পুরলেন। মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে চটাপট, পটাপট হাততালি। দেখতে দেখতে বড়মামার চোখ কপালে উঠে গেল। কী রে বাবা, এখুনি ফিট হয়ে যাবে নাকি।

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলেন স্যার? নুনে যবক্ষার। জিভ হেজে গেল। তাই না!'

বড়মামা ঢোক গিলে ডাকলেন, 'সুহাস।'

'বলুন স্যার। পাশেই আছি।'

'পাশেই আছ। আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা হতে পারে স্যার। অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, সেজন্যে না। এমন বিদঘুটে স্বাদ হল কী করে? অমানুষিক টেস্ট।'

'হতে পারে স্যার। খুব ভাল কারিগরের তৈরি কিনা!'

'ছাঁটাই করো, ছাঁটাই করো। সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, হাতে পায়ে ধরে আজই বিদায় করো!'

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে, আমার হাজার-পাঁচেক টাকা পাওনা হল। দোকান নতুন জায়গায় তুলে না নিয়ে গেলে, যেখানে আছি সেখানে আর ব্যবসা করে খেতে হবে না। সব খদ্দের ভয়ে সরে পড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'মিথ্যে কথা। এমন কিছু খারাপ খেতে হয়নি।'

'তা হলে আর-একটুকরো খান। আমরা বসছি।'

বড়মামা একটু ঘাবড়ে গিয়ে মেজমামা আর মাসিমার মুখের দিকে করুণ মুখে তাকালেন।

মাসিমা বললেন, 'পাঁচ হাজারের চেয়ে জীবন অনেক দামী বড়দা।'

বাইরে একটা হইহই শোনা গেল। 'কোথায়, কোথায় সেই ডাক্তারবাবু? আমি তাঁকে একবার দেখে নিতে চাই।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওরে কুসি, আবার কে আসছে রে তেড়ে?'

মেজমামা বললেন, 'নাও এবার পরোপকারের ঠ্যালা বোঝো।'

মারমার করে রাগী চেহারার এক বৃদ্ধ সভায় এসে ঢুকলেন। 'ডক্টর মুখার্জী নাকি এসেছেন। তিনি কোথায়?'

পেছনের সারির ভদ্রলোকরা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওই যে, ওই যে মঞ্চে বসে আছেন। বসে বসে কেক খাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেক তো খাবেনই! কারুর সর্বনাশ, কারুর পোষ মাস। ডক্টর মুখার্জী!'

ভদ্রলোক বুক চিতিয়ে পা দুটো ফাঁক করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন যুদ্ধ করবেন!

বড়মামা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার কি সর্বনাশ হয়েছে?'

'কী সর্বনাশ হয়েছে দেখতে চাও ছোকরা? তোমাদের কৌশল কি আমি বুঝি না ভাবছ। সামনের চৈত্রে আমার বয়েস হবে সত্তর। দাঁতের ডাক্তারদের সঙ্গে ষড় করে তোমরা বাজারে টফি ছেড়েচ। ছেড়েচ কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, টফি আমরা ছেড়েচি, তবে দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে কোনও ষড় নেই।'

'তাই যদি হবে মানিক, তাহলে এই বুড়োর বাঁধানো দাঁত দু'পাটির এ-হাল হবে কেন?'

পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা মোড়ক বের করে টেবিলে মেলে ধরলেন। খিঁচিয়ে আছে দুপাটি দাঁত। বাঁধানো সারি থেকে গোটা-দুই খুলে পড়ে গেছে।

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে টফি তো শিশুদের জন্যে, আপনি কেন খেতে গেলেন?'

'এটা কী কথা তুমি বললে হে ডাক্তার! তুমি কি জানো না, আমার এখন দ্বিতীয়

শৈশব চলেছে। টফি আমার নাতিও খায়, আমিও খাই। তুমি কি আইন করে আমার ট্রফি খাওয়া ঠেকাবে? এ তো মজা মন্দ নয়!'

'আমাদের টফি একটু কড়াপাক ধরনের। বেশ পাকলে-পাকলে ধৈর্য ধরে না খেলে দাঁত আপনার ভাঙবেই। এ আপনার নকল দাঁতের জিনিস নয়, আসল দাঁত চাই।'

'দ্যাখো বাপু, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে চেও না। আমি এই দাঁতে এখনও মাংসের হাড় চিবোই বৎস। যৌবনে সত্তর-আশি পাউণ্ড ওজনের বারবেল তুলতুম। এখনও নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে ছাপান্নখানা লুচি মেরে দি। কী উল্টোপাল্টা বোঝাতে চাইছ আমাকে? শোনো ডাক্তার, পাঁচশোটি টাকা আমি গুনে নিয়ে এখান থেকে যাব। আমাকে তুমি চেনো না। আমার নাম চিদানন্দ বণিক। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার দিয়ে ইংরেজদের মুণ্ডু উড়িয়েছিল ক্যাচাক্যাচ।'

বড়মামা ঢোঁক গিলে মেজমামার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। মেজমামা চোখের ইশারা করলেন। কী তার মানে কে জানে। বড়মামা আজ বেজায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। সুহাসবাবু কোন ফাঁকে সরে পড়েছেন।

হঠাৎ আশুবাবু এগিয়ে এলেন। মরেছে, ইনি আবার কৌটো-সমস্যা তুলবেন নাকি? আশুবাবু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনারা এইভাবে আজকের অনুষ্ঠান পণ্ড করবেন না। যার যা পাওনা, ডাক্তারবাবু সবই মিটিয়ে দেবেন। আপনারা একটা করে দরখাস্ত পেশ করুন।'

'দরখাস্ত? তার মানে? এ কি সরকারি দপ্তরে ডোলের আবেদন নাকি? আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আগে বুঝে নোব, তারপর আমাদের অন্য কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

দাঁতভাঙা বৃদ্ধ বললেন, 'অ্যাঃ, সব উল্টোপাল্টা বকছ। এ-কথায় ওই কথা আসে কী করে? ফেলো কড়ি মাখো তেল। এর পরেই মূর্খরা বলবে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

পেছনের সারির ওঁরা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে? আমরা মুর্খ! কী আমার জ্ঞানী, মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ রে! দাঁত ভেঙেছে, দাঁত! প্রমাণ কী, টফি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে! ডাক্তারের সার্টিফিকেট কোথায়?'

'ওরে মূর্খের দল। এর আবার সার্টিফিকেট কী?'

'বাঃ, মানুষ মরলে পোড়াবার আগে সার্টিফিকেট লাগে না!'

'আরে গাধা, মানুষ মরা আর মানুষের দাঁত ভাঙা এক হল?'

'মানুষের দাঁত কেমন করে হল মানিক? ও তো ছাঁচে ঢালাই নকল দাঁত। তাঁর জন্যে পাঁচশো। টাকা যেন খোলামকুচি রে।'

'যা না ব্যাটারা, একবার খবর নিয়ে দেখ না, দু পাটি দাঁত বাঁধাবার খরচ কত? এ তোদের খাতা বাঁধানো নয়, ছবি বাঁধানো নয়, গবেটের দল।'

'যা তা গালাগাল তখন থেকে চলেছে। এবার আমরা আর চুপ করে থাকব না। অ্যাকশান নিয়ে নোব।'

'একবার চেষ্টা করে দ্যাখ না চামচিকের দল।'

'তবে রে!'

মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আশুবাবু বড়মামার কানে কানে বললেন, 'পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ুন। হাওয়া খুব ভাল নয়। এলোমেলো বইছে।'

॥ ৫ ॥

পেছনে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, জোড়া পুকুর। ভাগ্য ভাল, সূর্য অনেক আগেই ডুবে গেছে। আকাশে যেন ঘোর লেগে গেছে। কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কে জানে! চোরের মতো। ছোট চোর, বড় চোর। আমার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপেঝাড়ে বল খোঁজার অভ্যাস আছে। অসুবিধে হচ্ছে মেজমামা আর মাসিমার।

মাসিমার শাড়ির আঁচল। মেজমামার চাদর। কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে ডালপালায়। ওদিকে খুব হই-চই হচ্ছে। ভাগ্যিস দাঁতভাঙা বৃদ্ধ এসেছিলেন।

বড়মামা ফিসফিস করে বললেন, 'টাকা তো আমাকে দিতেই হবে আশুবাবু! ক্ষতি যখন হয়েছে!'

'কারুর কিস্যু ক্ষতি হয়নি। সব হল ধান্দাবাজ। বেড়ালের জাত মশাই। নরম মাটি দেখেছে কি অমনি আঁচড়াও।'

মাসিমা বললেন, 'দেখেশুনে মনে হল, কম-সে-কম হাজার-দশেক টাকার ধাক্কা।

মেজমামা বললেন, 'আজ তোমার মহিলা সমিতি আর পরোপকারের শেষ দিন। আজ ওরা সব একখানা একখানা করে ইট খুলে নিয়ে যাবে।'

আশুবাবু বললেন, 'আপনার সেক্রেটারি সুহাসবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো?'

আমগাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে আমি এখানেই আছি। মশাই সর্ব অঙ্গ জ্বলিয়ে দিয়েছে ডাক্তারবাবু।'

'তুমি আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে এলে সুহাস?'

'আর যে কোনো পথ ছিল না দাদা! জানেনই তো কথায় আছে—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

বড়মামা বললেন, 'এ জায়গাটা তোমার কী রকম মনে হয়, বেশ নিরাপদ? এক কাপ চা পেলে হত।'

'চা? চা এখানে পাবেন কোথায়। সাপখোপ পেতে পারেন।'

'আমরা এখন তাহলে যাই কোথায়?'

'আমি একটা ভাল কাজ করেছি স্যার। কাজের কাজ। ওই ধোবিডাঙার মাঠে আপনার গাড়িটা এনে রেখেছি।'

'সে কী হে! আমার গাড়ি তো বিগড়ে বসে আছে। স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'সে আমি ঠিক করে দিয়েছি। এক ফুঁয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে। কারবুরেটারে ময়লা জমেছিল।'

'লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে। একবার গাড়িতে উঠে বসতে পারলে আর আমাদের পায় কে! চলো চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

ঝোপঝাড় ভেঙে আমরা ধোবিডাঙার মাঠে এসে উঠলুম। একফালি চাঁদ মুচকি হাসছে আকাশে। গোটাকতক তারা এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। আমার তেমন কোনো ভয় লাগছে না। মাঝে-মাঝে আমার কেবল হাসি পাচ্ছে। কী থেকে কী হয়ে গেল! এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

সুহাসবাবু বললেন, 'এ হল ওই ঘোষালের কাজ। ভাল কিছু হতে দেখলেই লোক লাগিয়ে সব পণ্ড করে দেয়!'

'অ, তাই বলো, ঘোষাল কলকাঠি নেড়েছে! ওকে আর কিছুতেই টিট্ করা গেল না!'

'যাবে না কেন? সহজেই যায়। ওকে যদি প্রেসিডেন্ট করে দেন!'

'বেশ তো! এ আর এমন শক্ত কী! আজই করে দাও না।'

'আজ কী করে করবেন। প্রথমে টাকা দিয়ে ওকে সভ্য হতে হবে। তারপর নির্বাচন। সব ব্যাপারেরই তো একটা ইয়ে আছে। আজ ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক। আপনি দিনকতক বরং গা-ঢাকা দিয়ে থাকুন।'

'গা-ঢাকা দোব কেন? আমি কি কাপুরুষ? তা ছাড়া আমার কোনো শত্রু নেই।'

'এখন আপনার এনেক শত্রু। সমাজসেবা অত সহজ নয় ডাক্তারবাবু! বেড অব রোজেস।'

'ভুল বললে। বেড অব থর্ন।'

'আজ্ঞে কাঁটা ছাড়া কি গোলাপ হয়!'

কথায় কথায় আমরা গাড়ির কাছে এসে পড়েছি। ফিকে চাঁদের আলোয় চকচক করছে। আমরা উঠে বসলুম। আশুবাবুও উঠলেন। বড়মামা বললেন 'সুহাস, তুমি?'

'আজ্ঞে, আমি বেশ আছি।'

'বেশ আছি মানে! এই বললে, চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা। ওরা তোমাকে একা পেলে তো ঠেঙিয়ে শেষ করে দেবে।'

'এই তো পাশেই আমার দিদির বাড়ি। সেইখানেই গা-ঢাকা দোব।'

'দেখো মার খেয়ে মোরো না। তুমি আমার রাইট-হ্যাণ্ড।'

স্টার্ট দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিল। গোল একটা বৃত্ত তৈরি করে, সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সুহাসবাবু আপনার কত দিনের চেনা স্যার?'

বড়মামা স্টিয়ারিং-এ পাক মারতে মারতে বললেন, 'এই বছরখানেক হবে।'

'লোক মোটেই সুবিধের নয়, বুঝলেন বড়বাবু? এ হল গিয়ে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ঘোষালের নিজের লোক। ভেতর থেকে সব চুরমার করতে চাইছে।

'কী আশ্চর্য। আমি তো খারাপ কিছু করতে চাইনি। আমি তো সকলের উপকার করতেই চেয়েছি।'

'সেই অপরাধেই তো আপনার বাঘের পেটে যাওয়া উচিত। মনে নেই নবকুমারের কী হয়েছিল।'

'এবার আমি সব ছেড়ে দোব। এমনকি ডাক্তারিও। এ দেশেই আর থাকব না।'

ফাঁকা রাস্তা ধরে বড়মামার গাড়ি ফরফর করে চলেছে। এটা আবার কোন্ রাস্তা কে জানে। মেজমামা বললেন, 'আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলুম। মনে হয় কুসির মুখ দেখে।'

মাসিমা বললেন, 'আমি যে তোমার মুখ দেখে উঠেছিলুম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম?'

'রোজ যা করো। নিজের মুখ দেখেই উঠেছিলে।'

আমি বললুম, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম?'

মেজমামা বললেন, 'তুমি উঠেছিলে বড়মামার মুখ দেখে। ও মুখ দেখলে সারাদিন বড় আনন্দে কাটে।'

আশুবাবু হই হই করে উঠলেন, 'ডানদিক, ডানদিকে চলুন। বাড়ি যাবেন তো।'

'বাড়ি যাব কেন? বাড়ি গেলে আর গা-ঢাকা দেওয়া হল কী?'

মেজমামা বললেন, 'সে কী! তুমি তাহলে কোথায় চললে?'

'সোজা মধুপুর।'

মাসিমা বললেন, 'মধুপুরে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বড়দা?'

'কবে আর ভাল ছিল বোন?'

আশুবাবু বললেন, 'সত্যি মধুপুর?'

'আমি বড় একটা মিথ্যে বলি না আশুবাবু। আমার মন্ত্রই হল করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

মেজমামা বললেন, 'এতে তোমার মরার মতো কী করা হল? তুমি যেখানে খুশি যাও, আমাদের নামিয়ে দাও।'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয় ভাই! আমরা সদলে মধুপুর যাব।'

আশুবাবু বললেন, 'কোথায় থাকবেন?'

'সেখানে আমাদের ফাসক্লাস বাগানবাড়ি আছে। বড় বড় গোলাপ।

'কী মজা।' আশুবাবু আনন্দে আটখানা।'

মাসিমা বললেন, 'গাড়ি থামাও। আমরা নেমে যাই।'

আশুবাবু বললেন, 'মাঈজি আপনাদের আনন্দ হচ্ছে না? কী সুন্দর আমরা চেঞ্জে যাচ্ছি!'

মেজমামা বললেন, 'বাড়ির কথা ভেবেছ?'

'খুব ভেবেছি, দশ দশটা কুকুর পাহারা দেবে। কাকাতুয়া ধমকাবে।'

'ওদের দেখবে কে?'

'লক্ষ্মী আছে, জনার্দন আছে, শামুকাকা আছে।'

'না ফিরলে ওরা ভাববে না?'

'সখি ভাবনা কাহারে বলে, সখি যাতনা কাহারে বলে...।' বড়মামা গান ধরলেন। গাড়ির গতি বাড়ল।

আশুবাবুও হুঁ-হুঁ করছেন। খুব ফুর্তি! হুঁ-হুঁর মাঝেই সুরে বললেন 'এইবার একটু চা হলে ভাল হত। ওই দেখা যায় দোকান দূরে।'

বড়মামা গানের সুরে উত্তর দিলেন, 'গাড়ি থামালেই। গাড়ি থামালেই। ওরা নেমে পালাবে। পালাবে, পালাবে, পালাবে। গাড়ি থামালেই।'

মেজমামা বললেন, 'আমরা চেঁচাব। চিল চেল্লান চিল্লে লোক জড়ো করে তোমাকে ছেলেধরার ধোলাই খাওয়াব। তোমাদের আহ্লাদ তখন বেরোবে।'

'ছেলেধরা?' বড়মামার অট্টহাসি। 'বল বুড়োধরা। তোরা নিজেদের এখনও ছেলে ভাবিস?'

আশুবাবু বললেন, 'ছোড়দা, কেন বাগড়া দিচ্ছেন? কী মজা করে কেমন কোথায় চলেছি। এখন একটু বেশ ছেলেমানুষ হয়ে যান না। একেবারে শিশু।'

'হ্যাঁ মশাই। শিশু হব বললেই শিশু হওয়া যায়? খুব তো লাফাচ্ছেন। ওদিকে আপনার দোকানের সব মিষ্টি তো পচে ভ্যাট হয়ে যাবে।'

'সেই আনন্দেই থাকুন মেজবাবু। আমার মিষ্টি পচে না। সবই তো কাগজের তৈরি।'

হুস করে গাড়ি ছুটছে। বড়মামা বললেন, 'ব্যাণ্ডেল ছাড়ালাম। বুঝলি মেজ। শান্ত হয়ে বোস। বেশি ছটরফটর করিসনি। দুর্গাপুর আসার আগে দুর্গানাম জপ কর। ডাকাতের হাতে না পড়ে যাই। তার আগে শক্তিগড়ে পেট ভরে ল্যাংচা খাব। জয় বাবা তারকেশ্বর।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে আমরা চেল্লাই।'

'চেল্লাও বসে। আমিও গান ছেড়ে দিচ্ছি।'

বড়মামা টেপ ছাড়লেন, 'প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বোল।'

সঙ্গে আশুবাবুর চটাস চটাস হাততালি। ভোঁ ভোঁ গাড়ি ছুটছে। বড়মামার হাত খুলেছে। গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভটাস্ করে একটা শব্দ।

'যাঃ, টায়ার গেল।'

গাড়ি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পথের বাঁ পাশে একটা বটগাছের তলায়। আশুবাবু গেয়ে উঠলেন, 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!'

এরপর যা হল সে আর এক গল্প।

তেঁতুল গাছে ডাক্তার

বিধানবাবুর গলায় ট্যাংরামাছের কাঁটা আটকে গেল। বড়মামা যখন গেলেন তখন হাঁ করে ভদ্রলোক দাওয়ায় বসে আছেন। স্ত্রী আর পুত্রবধূ দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নাড়ছেন প্রাণপণে। বড়মামা গিয়েই ধমক দিয়ে দুজনকে সরিয়ে দিলেন।

বিধানবাবুর নারকেল-তেলের ব্যবসা। প্রচুর পয়সা। তেমনি মেজাজ। সকলকেই ধমকে কথা বলেন। একমাত্র বড়মামাকেই ভয় করেন। বিধানবাবু বোয়ালের মত হাঁ করে আছেন। বড়মামা টর্চ ফেললেন। যেন কুয়োর মধ্যে আলো নেমে গেল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বেতের মোড়ায় বসে বললেন, 'মানুষের কী ভাগ্য! সেলুনওলা সুকুমার লটারিতে সাড়ে চার লাখ টাকা পেয়ে গেল।'

বিধানবাবুর চোখ ছানাবড়ার মত। বড়মামার কথা শুনে আঁক করে একবার আওয়াজ করে পর পর তিনবার ঢোক গিললেন সাপে ব্যাঙ গিললে যেমন হয়, গলার কাছে তিনবার ঢেউ খেলে গেল।

বড়মামা বললেন, 'কী বুঝলেন?'

'সাড়ে চার লাখ! ওরে বাবারে!'

'এখন কেমন লাগছে?'

'নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে ডাক্তার, আমার পোড়া বরাতে একটা পাঁচটাকাও উঠল না!'

'গলার কাঁটার কী খবর?'

'কাঁটা? কী কাঁটা?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের কাজ শেষ। গলার কাঁটা তিন ঢোকে সরে গেছে।

সেই বিধানবাবু আন্দামান থেকে বড়মামাকে একটা সুন্দর কোকো কাঠের ছড়ি এনে দিয়েছেন।

হঠাৎ বড়মামার আজ কী খেয়াল হল, আমাকে বললেন,

'ছড়িটা নামা।'

আলনায় ঝুলছিল একা একা। নামিয়ে আনলুম। বড়মামার কুকুর লাকি টেস্ট করতে চাইল। বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে আমাকে ধমকাতে লাগল।

'আজ ছড়ি নিয়ে মর্নিং ওয়াক হবে?'

'ইয়েস।'

'কেন, কোমরে ব্যথা হয়েছে?'

'আজ্ঞে না। এ কোমর সে কোমর নয়। আজ একটু স্টাইলে বেড়াব। সায়েবদের মত, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে।'

চুড়িদার পাজামা, ফিনফিনে পাঞ্জাবী। হাতে ছড়ি। সাঁই সাঁই করে হাঁটছেন বড়মামা। পথের ধারের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। হাঁটার মত হাঁটা। পেছনে পেছনে আমি প্রায় ছুটছি। বেশিরভাগ কুকুর ভয়ে সরে যাচ্ছে। দু একটা অসন্তুষ্ট হয়ে গোঁ গোঁ করছে।

আজকে বড়মামার চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম। জ্বল জ্বল করছে। এই সময় অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেড়াতে বেড়াতেই ডাক্তারি করতে হয়। কারুর লো-প্রেসার কারুর প্রেসার হাই। কারুর হার্ট মাছের মতন খাবি খায়, কারুর হাই সুগার। ঘুরতে ফিরতে চিকিৎসা। করলার রস খান। নুন বন্ধ করুন। তেল-ঘি-ছেড়ে দিন।

আজ আর রুগীরা বড় মামাকে ধরতেই পারছেন না। তিনি বুলেটের মত ঠিকরে বেড়াচ্ছেন।

গাছের ডালে হঠাৎ একটা কোকিল ডেকে উঠল। অসময়ের কোকিল। চক্কর মারতে মারতে বড়মামা থেমে পড়লেন।

'আহা-শুনছিস।'

'কোকিল। অসময়ের কোকিল।'

'কী মিঠে তান!'

বটতলার বেদীতে আসন নিলেন। মুখে একটা অন্যভাব।

'পাখি প্রকৃতির জীব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাখি সাধক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে কাক ছাড়া।'

'ঠিক। কাক পাখির মধ্যে পড়ে না। যেমন তিমি মাছের মধ্যে পড়ে না।'

'যদিও তিমি-মাছ বলে।'

'তিমি কেন মাছ নয়?'

'ডিম হয় না, বাচ্চা হয়।'

'একশোর মধ্যে একশো। কিছু একটা করতে হবে।'

'ইট কী গুলিত মারা চলবে না।'

'রাইট! খাঁচায় বন্দী করা চলবে না।'

'আপনার কথা কে শুনবে বড়মামা?'

'শোনাতে হবে রে পাগলা। পৃথিবীর সব কাজ ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রথমে চাই প্রচার। তারপর চাই সংগঠন। চাই জনমত।'

'আপনার বাহুবল নেই।'

'ঠিক। আমার ঢাল নেই তলোয়ার-রাইফেল নেই। কিন্তু বৎস আমার মনোবল আছে।

সেই বলে আমি পৃথিবীর সমস্ত খাঁচার পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দেব।'

'পৃথিবী যে অনেক বড় বড়মামা!'

'সো হোয়াট! আমি ছোট করে নোব। নে ওঠ আমার ভেতরটা ছটফট করছে খাঁচার পাখির মতো।'

'চায়ের জন্যে?'

'নারে মুখ্যু। ছটফট করছে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। অ্যাকশন! অ্যাকশন!'

ফেরার পথে ছড়ি বড়মামার কাঁধে। ভীষণ উত্তেজিত। লম্বালম্বা পা ফেলছেন যেন রণপা পরে হাঁটছেন। এক জায়গায় একগাদা মুরগী ছাই গাদায় খাবার খুঁজছে! ফুলকো ফুলকো এক ঝাঁক বাচ্চা।

'বড়মামা মুরগী কী পাখির মধ্যে পড়ে?'

'না। জেনে রাখ, পাখির সংজ্ঞা হল, যাহা আকাশে ওড়ে তাহাই পাখি। যেমন পরান-পাখি। আমাদের প্রাণও একরকম পাখি। দেহ-খাঁচায় অবিরত ছটফট করছে।'

'ঠিক বলেছেন, কেবল কী খাই, কী খাই করে। আর যেই পড়তে বসব অমনি 'বই-এর পাতা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায়।'

'ও হল তোমার মন। আমি বলছি প্রাণের কথা। আমাদের দেহে দুটো পাখি। এক হল প্রাণপাখি। খুব দামী, বড়দরের পাখি। আর ছোটদরের পাখি হল মন পাখি। অনেকটা বদরি, মুনিয়া কি টুনটুনির মতো। ভীষণ ছটফটে। এ সব বোঝার বয়স তোমার হয়নি।'

বাড়ির গেটের সামনে এসে গেছি। বাগানে বকুল তলার বাঁধানো বেদীতে বড়মামা ধপাস করে বসে পড়লেন। বেশ হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত জোরে জোরে হাঁটলুম কেন?'

'তা তো জানি না।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন 'পাখি!'

'পাখি তো হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে? কিছুই হয়নি। এইবার হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ অ্যাট হোম।'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন 'দেখে আয় তো মেজ কোথায়?'

সারা বাড়ি একবার চক্কর মেরে এলুম। মেজমামা বাথরুমে। তারস্বরে চিৎকার চলেছে, যদা যদা হি ধর্মস্য....বেদীতে বড়মামা। আমাকে দেখে চাপাগলায় জিজ্ঞেস করলেন—

'কোথায়...কোথায়? বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

'বাথরুমে যদা যদা হি'...

'তার মানে ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা।'

'কখন ঢুকেছেন তাতো জানি না।'

'ধ্যার বোকা। যদা যদা তো ধরতাই। নে, ওঠ পা টিপে টিপে।'

'কোথায় বড় মামা?'

'প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়। মামানুসর।'

গীতা আর নিজের প্রতিভা মিলে তৈরি, মামাকে অনুসরণ মামানুসর।

পেছন পেছন দোতলার বারান্দায়। দক্ষিণে মেজমামার ঘর। পা টিপে টিপে চলেছি আমরা চোরের মত। বেশ ভয় ভয় করছে। মেজমামার ঘরের সামনে বিশাল খাঁচা। মুনিয়া

আর বদরিতে মিলে গোটা দশেক হবে। কিচিরমিচির করছে। বড়মামা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন।

'তোর সেই গল্পটা মনে আছে?'

'কোনটা?' 'হাজী মহম্মদ মহসীন।'

'হ্যাঁ, নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে তারপর বিধবার ছেলেকে মিষ্টি ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ আমিও তাই করব। আমি আর এক মহসীন। জগৎবাসীকে, ওহে তোমরা পাখি মুক্ত করে আকাশে উড়িয়ে দাও বলার আগে আমি এদের মুক্ত করে দোব।'

'বড়মামা, ও কাজ করবেন না। মেজমামার পাখি, মাসীমার আদরে মানুষ। মাসীমা আপনাকে শেষ করে দেবেন।'

'রাখ তোর মাসীমা। জগাই-মাধাই কলসির কানা মেরে শ্রীচৈতন্যকে থামাতে পেরেছিল? পারেনি মানিক। ধর্মের জয়।'

খাঁচার দরজা খুলে বড়মামা নাটক করার মত করে বললেন 'যাও বিহঙ্গ। অনন্ত নীল আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

অত সুন্দর করে বললেন, কিন্তু একটিও বিহঙ্গ খাঁচার দরজা গলে বেরিয়ে এল না।

বড়মামা রেগে গিয়ে বললেন 'সব ব্যাটাকে বাতে ধরেছে!'

'বড়মামা, দরজা বন্ধ করে দিন। যে কোনো মুহূর্তে মাসীমা এসে পড়বেন। আর মেজমামা জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ হবে।

আমার কোনো কথাতেই বড়মামার কান নেই। পাখিদের বললেন, 'যাও বিহঙ্গ, মুক্ত আকাশে মেল স্বাধীন ডানা।'

তেমনি পাখি। বোকার মত খাঁচাতেই নাচতে লাগল। খোলা দরজা নজরেই আসছে। না।

বড়মামা বললেন, 'ঠিক আমাদের অবস্থা। স্বাধীন করে দিলেও স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারছে না। অপ্রস্তুত মন।'

'ছেড়ে দিন বড়মামা।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দোবই।'

খাঁচার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে পাখি বের করে আকাশে ওড়াতে লাগলেন। এক একটাকে নীল আকাশের দিকে ছুঁড়ছেন আর বলছেন, 'যাও যাও, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন।'

প্রথম পাখিটা ওড়ার চেষ্টা করে নিচের উঠনে পড়ে গেল। একটা বসে ছাদের কার্নিশে। কেউই বেশিদূর উড়তে পারেনি। একটু উড়েই যে যেখানে পেরেছে বসে পড়েছে। শেষ পাখিটাকে বড়মামা কিছুতেই বের করতে পারছেন না। 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ। এ ব্যাটা নিশ্চয় বাঙালী পাখি। মুক্ত জীবনের চেয়ে বন্ধ জীবনই বেশি ভালবাসে।' পাখি আঙুলে এক একবার ঠোক্কর মারছে আর বড়মামা রেগেমেগে জ্ঞানের কথা বলছেন।

কোনো রকমে বের করেছেন খাঁচা থেকে, আকশে ওড়াতে যাবেন, এমন সময় মাসীমা। হাতে চায়ের কাপ।

‘এই নাও তোমার চা। দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। একী একী কী করছ?’ পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বড়মামা যেন স্কুলে আবৃত্তি কম্পিটিশনে কবিতা পড়ছেন—

‘স্বাধীনতা-হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।’

পাখি এক চক্কর উড়ে সাঁ করে মেজমামার ঘরে। মাসীমা, আর্তনাদ করে উঠলেন, ‘মেজদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!’ মেজমামার শুরু আর শেষ এক। ‘যদা যদা হি চলছিল, থেমে গেল। বেরিয়ে এলেন পিঠে ধবধবে সাদা ভিজে তোয়ালে। চুলে মুক্তার দানার মত কয়েক বিন্দু জল। সারা গায়ে বিলিতি সাবানের ভুরভুরে গন্ধ।

মাসীমা হাঁউপাঁউ করে বললেন ‘যদা যদা করছ, ওদিকে ধর্মের কী গ্লানি দেখ। সব পাখি গন।’

'তার মানে?'

'ইনি সব ধরে ধরে উড়িয়ে দিলেন।'

'সে আবার কী? এতকাল টাকা ওড়াচ্ছিলেন। টাকা থেকে পাখিতে চলে এলেন! মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তুমি ওড়ালে না উড়ে গেল? এই তো আমি দানাপানি দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলুম।'

বড়মামা বীরের মতো হাসতে হাসতে বললেন, 'একদিন উড়বে, সাধের ময়না"

'তুমি কি আরম্ভ করেছ। সব পাখি উড়িয়ে দিলে?'

'আমি ত্রাতা। সব বন্দী পাখির স্বাধীনতা আমি ফিরিয়ে দেবো।'

'তুমি উন্মাদ।'

'শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণকে সবাই তাই ভেবেছিল প্রথমে।'

মেজমামার ঘরে একটা ঝটাপটির শব্দ হল। বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি কী একটা মুখে করে ঘর থেকে বেরিয়েই নেচে নেচে বড়মামার ঘরের দিকে চলে গেল। মাসিমা এক ঝলক দেখেই, 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল, বলে পেছন পেছন ছুটলেন।

মেজমামা বললেন, 'ব্যাপারটা কী? আবার আমার চটি? তিন জোড়া চিবিয়ে শেষ করেছে।'

মাসিমা ছুটন্ত অবস্থায় বললেন, 'চটি নয়, চটি নয়, পাখি।'

'অ্যাঁ, পাখি!' মেজমামাও ছুটলেন। কুকুর আবার বেড়াল হল কবে থেকে?'

বড়মামার বীরভাব কেটে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁরে সত্যিই পাখি লাকি ধরেছে?'

'না বড়মামা, লাকি পাখি ধরেছে।'

'তুই দেখলি?'

'হ্যাঁ।'

'ইডিয়েট।'

'কে বড়মামা? আমি?'

'না, তুই না, আমি। আর একবার প্রমাণিত হল, স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। লড়াই করে, বিপ্লব করে ছিনিয়ে নিতে হয়। চল্ চল্ দেখি পাখিটাকে বাঁচানো যায় কিনা।'

বড়মামার ঘরে খাটের তলায় লাকি। মুখে পাখি। মাসীমা আর মেজমামা উঁকি মেরে দেখছেন। তলা থেকে একটা গোঁগোঁ শব্দ আসছে। ডানার ঝটপটানি। ঘরে ঢুকেই বড়মামা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন 'লাকি!!' দরজা-জানলা কেঁপে উঠল। বেরিয়ে এসো। কাম আউট।

লাকি বেরিয়ে এল গুটি গুটি। মুখে সেই পাখি। কী সুন্দর কচি কলাপাতার মত গায়ের রং। আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললুম। অমন সুন্দর একটা পাখি চোখের

সামনে মারা যাবে? আমার কান্না শুনে লাকি ঘাঁউ করে উঠল। লাকি কান্না সহ্য করতে পারে না। ভীষণ বিরক্ত হয়। ডাকামাত্রই পাখিটা মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। ঝট পটিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল পারল না। ঠিকরে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের কোণে।

পাখির চারপাশে গোল হয়ে আমরা। ছোট্ট পাখি নিঃশ্বাস ফেলেছে জোরে জোরে। ছোট্ট বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো। এবার মাসিমাও কেঁদে ফেললেন। মেজমামাও ফোঁস ফোঁস করছেন। এমন কি লাকিও কেঁদে ফেলেছে। ওর কান্নার শব্দ আমি বুঝি। খাবার না পেলে হ্যাংলা ঠিক এইরকম কুঁ কুঁ করে কাঁদে।

বড়মামা ধরা ধরা গলায় বললেন 'আমি ক্ষমা চাইছি। বন্দী পাখির বেদনায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলুম। ভুল করে ফেলেছি আমি। স্বাধীনতা দুর্বলের জিনিস নয়, সবলের। তোরা শুধু দেখ ওর জীবন আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাসীমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন 'তুমি আর কী করবে বড়দা? তুমি তো আর ভগবান নও। ওর গলায় ফুটো করে দিয়েছে।'

'ভগবানের কাছে শক্তি ধার করে আমি ওর ফুটো মেরামত করব। তোরা পরে আমাকে গালাগাল দিস। এখন শুধু প্রার্থনা কর!'

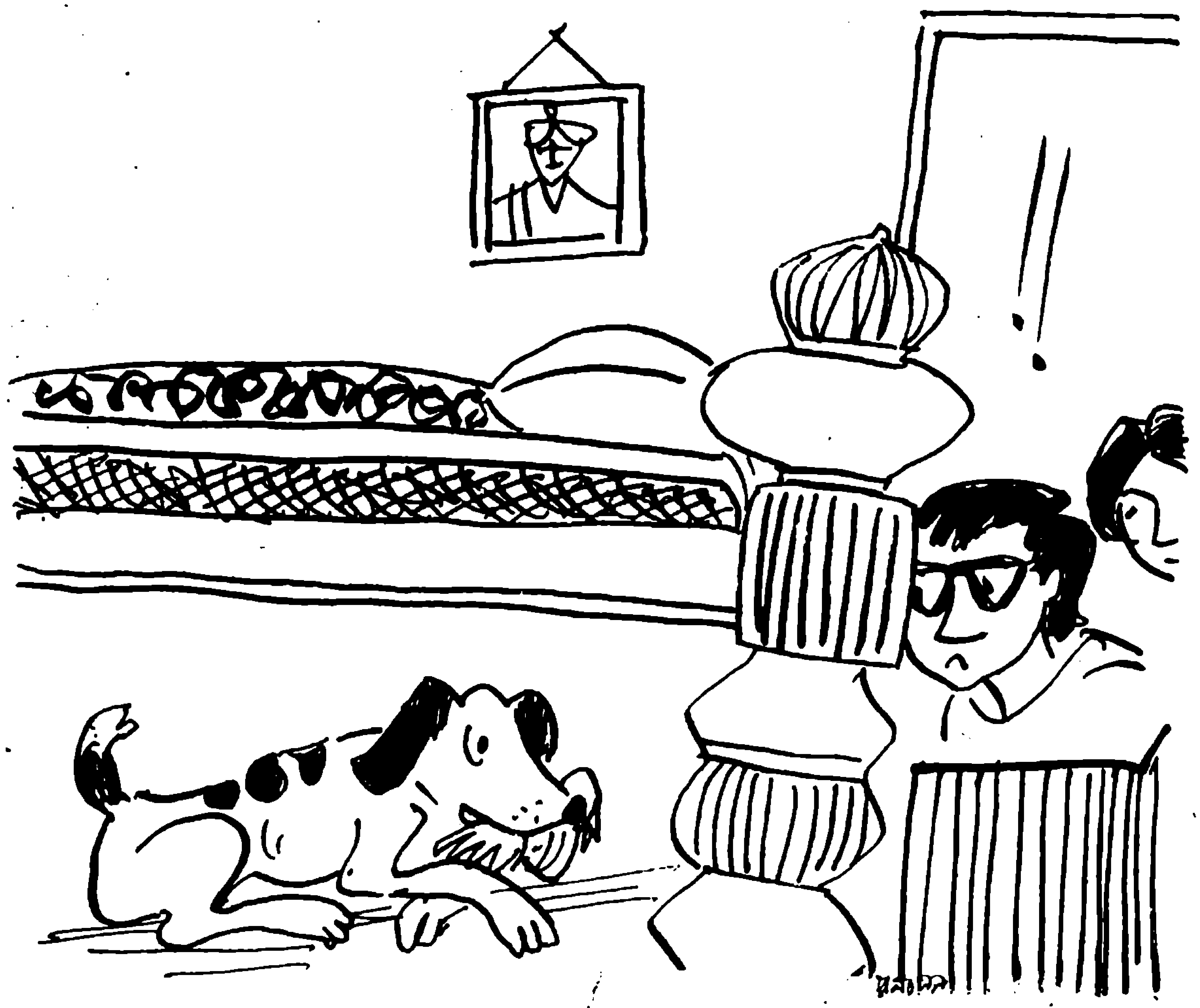

বড়মামার ডাক্তারি শুরু হল। বড় একটা প্লাস্টিকের গামলায় তুলোর বিছানা। বিছানায় পাখি। দুপাশে ডানা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডানার তলায় নরম তুলতুলে শরীরে সরু ছুঁচ দিয়ে পুট করে একটা ইনজেকশন দিলেন। ছোট্ট ফুটো দুটোর মুখে কী একটা লাগালেন। রক্ত বন্ধ হয়েছে। বড়মামা বললেন, 'কুসি, বিছানায় আমার মশারিটা ফেল। পাখি এখন বিশ্রাম করবে। লম্বা ঘুম। লাকি তুমি বাইরে যাও।'

বারান্দায় সভা বসেছে।

বড়মামা বললেন 'মেজ, খাঁচায় কটা পাখি ছিল?'

'এখন আর তা জেনে লাভ কী?'

'রাগারাগি নয়। হাতে হাত মেলাও ব্রাদার। সব কটাকে ধরতে হবে। ধরে খাঁচায় পুরতে হবে। নইলে তোমার অপদার্থ পাখিরা বেড়ালের পেটে যাবে।'

'দায়ী তুমি।'

'অবশ্যই। বিচার পরে হবে। আগে কাজ। চল পাখি ধরতে বেরোই। সেই ছোট খাঁচাটা কোথায়?'

'পাখি ধরবে তুমি? পাখি ধরা অত সহজ?'

'বেশ। আমি আমার দলবলকে ডাকছি।'

উঠে গিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

মেজমামা বললেন 'ও তোমার হাসপাতালের চেলাচামুণ্ডার কাজ নয়।'

'হাসপাতালে করছি না বৎস। ফোন করছি অনামিকা সংঘে। যে ক্লাবের আমি প্রেসিডেণ্ট। এখুনি দু-ডজন ছেলে আসবে। শুরু হবে চিরুনি অভিযান?' মেজমামা উঠে চলে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'বুঝলে, চ্যালেঞ্জ করে গেল। ঠিক হ্যায় মেজো। তোমার চ্যালেঞ্জ আমি নিলুম। ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি জমজমাট। বিভিন্ন মাপের, মেজাজের, বয়সের দু-ডজন সৈনিক বড়মামার ভাষায়। মাসীমার ভাষায় ভূতপ্রেত! মহাদেবের চেলা।

নেতা অতনু বললে, 'পাখি ধরতে হবে। কী পাখি? ডাকপাখি? বক? হরিয়াল? তাহলে গোটা দুই বন্দুক নিয়ে আসি।'

বড়মামার হাত উঠল বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে। 'অতনু, আমি ধরতে বলছি, মারতে বলিনি। ভাল করে শুনে নাও। খাঁচার পাখি। আমাদের পোষা পাখি।'

'পোষা বলছেন কী করে? পোষা পাখি পালায় না।'

'পালাবে কেন? আমি ধরে ধরে উড়িয়ে দিয়েছি।

'তাহলে আবার ধরবেন কেন?'

'সে আমার ইচ্ছে।'

'বেশ, আপনার ইচ্ছে। তা কী জাতীয় পাখি?'

'বদরি, মুনিয়া।'

'কোথায় তারা আছে?'

'আশেপাশেই আছে। কারুর বাড়ির ছাদে। গাছের ডালে। ঘুলঘুলিতে।'

'অসম্ভব। ও আমরা ধরব কী করে?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে তবে না তুমি অতনু।'

'বেশ। চব্বিশটা খাঁচা কেনার দাম দিন।'

'এগারোটা পাখির জন্য চব্বিশটা খাঁচা তোমার মাথা...'

'না মাথা খারাপ নয়। চব্বিশটা ছেলে চব্বিশটা দিকে যাবে। পাখি একটা হলেও চব্বিশটা খাঁচা লাগত। হিসেব মেলাতে হলে আরো তেরটা পাখি কিনে উড়িয়ে দিন। ওয়ান পাখি পার খাঁচা। মাছের জন্যে যেমন ছিপ, পাখির জন্যে তেমনি খাঁচা।'

'অনেক পড়ে যাচ্ছে অতনু।'

'তাতো যাবেই সুধাংশুদা। খাঁচার পাখিকে খাঁচায় ফেরাতে চান। সেরকম বুঝলে নতুন পাখি কিনুন।'

'না না। সেতো পরের পাখি। আমরা চাই ঘরের পাখি।'

'তাহলে শ-তিনেক টাকা ছাড়ুন। যত দেরি করবেন, তত দেরি হয়ে যাবে!'

বড়মামার কম্পাউণ্ডার সুধন্যকাকু পাশে বসেছিলেন। বয়স্ক মানুষ। এক মাথা এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল। তিনি বললেন 'খাঁচা কী হবে? বড় ঠোঙাতেই কাজ হয়ে যাবে। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট এই বাজারে। আর তা না হলে প্লাস্টিকের থলে।'

'কী যে বলেন!' অতনু বিরক্ত হল। একি আপনার ওষুধের পুরিয়া? যে কাজের যা। কথায় বলে খাঁচার পাখি। পাখির খাঁচা। খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া ফিরবে না।'

অনেক বচসার পর তিনশো টাকা নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেল। সুধন্যকাকু মাসীমাকে বললেন, 'এঃ বড়বাবু বাজে পাল্লায় পড়ে গেলেন। একেই বলে খাল কেটে কুমীর আনা!'

মেজমামা ঠিকই বলেছিলেন। জল অনেক দূর গড়াল। খাঁচা কেনার টাকা নিয়ে পাখি ধরার দল হাওয়া হয়ে গেল। বড়মামা সন্ধানে বেরিয়ে বেপাত্তা। একটা বাজল, দুটো বাজল। মাসীমা ঘরবার করছেন। খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠল। রোগীরা অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল। সুধন্যকাকু সাইকেলে সারা পাড়া চক্কর মেরে এসে, এক গেলাস গ্লুকোজ গোলা জল খেয়ে খালি ডিসপেনসারিতে রোগীদের পেট টেপা বেঞ্চে চিৎপাত। চারটে বাজল। সাড়ে চারটের সময় মেজমামা কলেজ থেকে এসে গেলেন। মশারির ভেতর আহুত পাখি মশগুল হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মেঝেতে লাকি ধনুকের মত পড়ে আছে। ছাদের ঠাকুরঘরে দুটো মুনিয়া ঢুকেছিল। মাসীমা আবার খাঁচায় ভরে দিয়েছেন।

মেজমামা বললেন 'এই বড়দার জন্যে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন একটা দিন নেই যেদিন কোনো না কোনো একটা কাণ্ড ঘটায়নি। একা রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।'

সুগ্রীব মানে আমি। আমার কী দোষ? কী বলব। তর্ক করে লাভ নেই। মেজমামা বললেন, 'চল হে, বড়বাবুকে খুঁজে আনি। পাখির শোকে সন্ন্যাসী।'

মেজমামার হাতে টর্চ। একটু পরেই সন্ধে হবে। আর হবে লোডশেডিং। ভুতুড়ে অন্ধকার। আলো আসতে রাত দশটা তো বটেই।

উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ব্যায়লা পাড়া, ধামাপাড়া, ঘোরা হয়ে গেল। খেলার মাঠ থেকে ছেলেরা চলে গেল। পথঘাট নির্জন হয়ে আসছে। মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজতে শুরু করেছে। বৃদ্ধেরা রক ছেড়ে উঠে গেছেন। কোথাও পাত্তা নেই। না বড়মামার না পাখি ধরা দলের।

মেজমামা রেগে বললেন 'ওরা সব সিঙ্গাপুর চলে গেছে।'

'কেন মেজমামা?'

'যে জায়গার পাখি, সেই জায়গা থেকে ধরে আনতে গেছে। মনে নেই, সেই একবার চা কিনতে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল? প্ল্যান করেছিল গোমুখ থেকে গঙ্গাজল আনবে। তোমার বড়মামা সব পারে। ডেনজারাস লোক।'

কথায় কথায় আমরা সাঁই বাগানের কাছে এসে গেছি। বহুকালের পুরনো বাগান। ভেতরে একটা দীঘি আছে। এক সময় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে গেছে। বেওয়ারিশ বাগান। দিনের বেলা দীঘিতে সব নাইতে আসে। কেউ কেউ ছিপ নিয়ে বসে। সন্ধের দিকে বড় কেউ একটা আসে না। ভয় পায়। বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল।

মেজমামা বললেন 'এই সেই সাঁই বাগান। এক সময় কী ছিল আজ কী হয়েছে?'

কথা শেষ হবার আগেই ভেতরের ঝোপঝাড় দুলে উঠল। সাদামত কী একটা জিনিস ঝোপঝাড় ভেঙে তীরবেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে! ভয়ে মেজমামার কোমর জড়িয়ে ধরেছি, 'মেজমামা বাইসন!'

বড়মামা শিখিয়েছিলেন, 'ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি।' সে শিক্ষা ভুলিনি। ধড়াস করে একটা শব্দ হল। মানুষের গলা। চোখ খুললুম। রাস্তায় মুখ থুবড়ে কে একজন পড়ে আছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সন্ধের ঝাপসা আলোয় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মেজমামা টর্চ ফেললেন। চেনা গেল আমাদের রামুদা। গঙ্গার ধারের বটতলায় ইটালিয়ান সেলুন যাঁর। মাঝে মাঝে আমাদের চুল ছাঁটেন।

মেজমামা ডাকলেন, 'রামু, রামু!'

রামুদা বললেন, 'ওরে বাবারে। আর করব না। আমায় ধরো না।' টর্চের আলো না সরিয়ে মেজমামা বললেন 'কে ধরবে?'

'ভূত!'

'আমরা মানুষ। মুকুজ্যে বাড়ির শান্তি।'

রামদা পিট পিট করে তাকালেন।

'কোথায় তোমার ভূত?'

রামুদা উঠে বসলেন, 'ওই যে ওখানে। তেঁতুল গাছে।'

'কী করতে গিয়েছিলে ওখানে?'

'ছাগল খুঁজতে।'

'ভূত দেখেছ?'

'না, গলা শুনলুম। শুধু গাছের ওপর থেকে বললে, ব্যাটা রামু আমাকে নামা।'

'তোমার নাম ধরে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ—স্পষ্ট—তিনবার।'

'ব্যাটা বলেছে?'

'হ্যাঁ মেজবাবু, ব্যাটা বলেছে। আর আমি বাঁচব না। ভূতে ডাকলে আর বাঁচে না মানুষ।'

‘তোমার মাথা! চলো দেখি কোন গাছ?’

‘মেজবাবু, আমি আর নাই বা গেলুম। গরীব মানুষ।’

‘চলো! আমার গলায় পইতে আছে, ভূতে কিছু করতে পারবে না।’

অঘোর কত্তা। বুড়ো পয়সা দিত না বলে ভোঁতা খুর দিয়ে দাড়ি চেচে খুব ফটকিরি বুইলে দিতুম। সেই অঘোর কত্তা তেঁতুল গাছে বাসা বেঁধেছে।’

‘তোমার মুণ্ডু। ভূত কি পাখি? চলো আমার সঙ্গে।’ পাঁচিল টপকে বাগানে। ‘আজ আর আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না। মৃত্যুই লেখা আছে কপালে! শীতের ভোরে গঙ্গা স্নান করা গলায় রামুদা রামনাম করছে।

তেঁতুলতলায় আসতেই মগডাল নড়ে উঠল। বড়মামার ট্রেনিংয়ে। চোখ বুজেয়ে ফেলেছি ঘাড় মটকাক—আমি দেখছি না!

গাছের ওপর থেকে ক্ষীণগলায় কে বললে, ‘কে আছো?’

মেজমামা হেঁকে বললেন ‘কে? বড়দা?’

গাছ বললে, ‘কে? মেজো?’

‘ওখানে কী করছ তুমি?’

‘পাখি ধরতে ডালে ডালে উঠেছি ভাই। আর নামতে পারছিনে!’

'বেশ করেছ। ওইখানেই থেকে যাও। পাকলে আপনিই খসে পড়বে।'

'ভাইরে! একি রাগারাগির সময়? আমাকে নামা ভাই।'

'নামা ভাই!' মেজমামা রেগে উঠলেন, 'নামাবো কী করে? নিজে নিজে নেমে এস।'

'সে আমি পারবো না। পারলে অনেক আগেই নেমে পড়তুম।'

'আমরা কীভাবে নামাবো? এ কী সহজ কাজ?'

'ফায়ার ব্রিগেডে খবর দে ভাই। আর পারছি না। সারাটা দুপুর শালিকে ঠুকরে ঠুকরে মাথার ঘিলু বের করে দিয়েছে। এখন মশা আর লাল পিঁপড়েতে ছিঁড়ছে! এইবার সত্যি সত্যিই আমি ধুম করে পড়ে যাব।'

ফোন করার পনের মিনিটের মধ্যে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল। দমকল আসছে। পেছন পেছন ছুটে আসছে সারা পাড়া—'আগুন লেগেছে! আগুন!'

দমকলের অফিসার গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন 'কোথায় সেই পাগল?'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, পাগল নয়, বড়মামা। মেজমামা আমার মুখ চেপে ধরলেন। বললেন, 'তেঁতুল গাছের মাথায় চড়ে বসে আছে।'

এ মশাই সেই পাগলটা। কাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় চড়ে পাক্কা সাড়ে চার ঘণ্টা আমাদের নাচিয়ে মেরেছে।'

মেজমামা বললেন, 'এ সে নয়, অন্য আরেকটা!'

'সে আমরা দেখলেই চিনতে পারব?'

দমকল ছুটলো সাঁই বাগানের দিকে। পেছন পেছন ছুটছে সারা পাড়ার লোক। বাচ্চারা চেল্লাচ্ছে, 'দমকল আসছে, দমকল।'

বড়মামা নামলেন। পাড়ার লোক চিনতে পেরেছে, 'আরে, এ যে আমাদের ডাক্তাবাবু গো!' হই হই ব্যাপার। সার্চলাইটের আলোয় সাঁইবাগানে উৎসব লেগে গেছে। ঘুম ভাঙা হনুমানেরা হুপহাপ করছে। পিঁপড়ের কামড়ে আর লজ্জায় লাল বড়মামা বাড়ি ঢুকেই বললেন, 'এ তোদের ষড়যন্ত্র।'

মেজমামা বললেন, 'তার মানে? এই ভজঘট করে নামানোটা ষড়যন্ত্র হল?'

'অবশ্যই হল। তোরা ঘণ্টা বাজাতে দিলি কেন? কেন তোরা নীরবে, নিঃশব্দে আমাকে নামালি না? সারা পাড়ার লোক কেন জানবে আমি গাছের মাথায় আটকে গিয়েছিলুম? জানিস আমাকে প্র্যাকটিস করে খেতে হয়।'

পরের দিন সকালে আরও মজা—কে যেন খবরটা সংবাদপত্রে ছেড়ে দিয়েছে—

'তেঁতুল গাছে ডাক্তার'

শাপে বর হল। বড়মামার পসার বেড়ে গেল। চেম্বারে রোগী ধরে না। তবে উল্টো পসার। কেউ নিজেকে দেখাতে আসেননি। সবাই ডাক্তারকে দেখতে এসেছেন।

নিজের ঢাক নিজে পেটালে

বড়মামা বললেন, 'এবার আমি নিজের ঢাক নিজেই পেটাব।'

মেজমামা চায়ের কাপে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'সে আবার কী?'

মাসিমা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'তার মানে লণ্ডভণ্ড আবার একটা কিছু করে ছাড়বে। ইলেকশানে দাঁড়াতে চাইছ নাকি বড়দা?'

'ইলেকশান? ও ভদ্রলোকের ব্যাপার নয়।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে কি ধর্মগুরু হবে?'

'সে শক্তি নেই। ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে ঢাকটা পেটাবে কী করে? কী ভাবে?

'আমি নিজেই আমার জন্মদিন করব। তোরা তো কেউ কিছু করলি না।'

মেজমামা বললেন, 'জন্মদিন! বুড়ো বয়েসে জন্মদিন? লোকে তোমাকে পাগল বলবে।'

'সারা গ্রামের মানুষকে আমি পেটপুরে খাওয়াব। সারাদিন সানাই বাজবে।' ফুল, ফুলের মালা। এলাহি ব্যাপার করে ছেড়ে দোব। দেখি লোকে কেমন পাগল বলে! সেদিন সারাদিন আমি ফ্রিতে চিকিৎসা করব। একটাও পয়সা নোব না। ফ্রি ওষুধ।'

মেজমামা বললেন, 'মরবে, একেবারে হাড়-মাস আলাদা করে রেখে যাবে। তোমার জয়ঢাকের মতো পেট ফাঁসিয়ে দেবে।'

'দেখা যাক।'

মাসিমা বললেন, 'কে রাঁধবে? কে পরিবেশন করবে?'

'তোকে কিছু করতে হবে না। কলকাতা থেকে সাতজন হালুইকর আসবে। আমার বিশজন চ্যালা পরিবেশন করবে।'

'এ করে কী লাভ হবে। এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। লোকে বলবে ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে রুগিমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে।

তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের যত গোরু। আর একদিকে ছাগল। আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর। আর ভোরবেলা পাখি। পৃথিবীর কেউ কোনওদিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে খাওয়ানো মানে ভূত-ভোজন। এ যদি তুমি করতে পার, আমি তোমার দলে আছি।'

বড়মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মেজমামাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তুই আমার ভায়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুমি লক্ষণ।'

মাসিমা বললেন, 'আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য!'

বড়মামা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'কিন্তু মেজো, কীভাবে ওদের নেমন্তন্ন করা হবে! মানুষকে তো চিঠি দিয়ে করে! একটা গোরু, একটা ছাগলে তো জমবে না। একপাল চাই। বাগান যেন একেবারে ভরে যায়। সেটা কী ভাবে হবে?'

'মাথা খাটাতে হবে।'

মাসিমা বললেন, 'কবে হবে।' তার আগের দিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

বড়মামা বললেন, 'সে আমি জানি। কোনও ভাল কাজে তোমাকে পাওয়া যাবে না।'

মাসিমা উঠে চলে গেলেন। মেজমামা বললেন, 'তোমার জন্মদিন কবে?'

'সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা তুমি আগে খুঁজে বের করো। আমি ইতিমধ্যে প্ল্যানটা ছকে ফেলি। জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মেজো, নেমন্তন্ন মানেই তো ভাল-মন্দ খাওয়া। মানুষের খাওয়ার মেনু আমরা জানি। পশুর ভাল খাওয়া কী হবে? মেনুটা কী হবে?'

মেজমামা কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'পাখির ভাল-মন্দ খাবার হল, ফল, মেওয়া। গোরুর হল, ভাল বিচালি, আখের গুড়, ছোলা, সবুজ ঘাস, গাছের পাতা। ছাগলের বটপাতা, কাঁঠালপাতা! কুকুরের হল মাংস।'

বড়মামা বললেন, 'দুধ, বিস্কুট।'

'মেনুটা আমরা পরে ঠিক করে ফেলব বড়দা।'

মেজমামা উঠে চলে গেলেন। কলেজে আজ আবার সকালেই ক্লাস। বড়মামা আমার হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ড্রয়ার খুলে খুঁজে খুঁজে একটা কোষ্ঠী বের করলেন।

'বুঝলি, জন্মতারিখটা খুঁজে বের করতে হবে। তুই কোষ্ঠী দেখতে জানিস?'

'আমি? আমি তো ওসব জানি না বড়মামা!'

'কী জানিস তুই? নে, এটাকে খোল। ধর।'

কোষ্ঠী খুলছে। খুলতে খুলতে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেলুম। কত বড় কোষ্ঠী রে বাবা!

'বড়মামা, ঘর যে শেষ হয়ে গেল! দেয়ালে ঠেকে গেছি। আর যে যাবার জায়গা নেই! একে কী কোষ্ঠী বলে বড়মামা?'

'একে বলে গাছ-কোষ্ঠী। গাছের ডালে বসে ন্যাজের মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দেখতে হয়। ভাটপাড়ার তর্কপঞ্চাননের তৈরি রে ব্যাটা! এতে সব আছে। নে, মাথার দিকটা মেঝেতে পেতে বইচাপা দিয়ে এগিয়ে চলে আয়।'

চাপা দিয়ে চলে এলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল বড়মামার পেয়ারের কুকুর

লাকি। বড়মামা সাবধান করলেন, 'লাকি, কোষ্ঠী নিয়ে ইয়ারকি কোরো না। চুপ করে একপাশে বোসো।'

লাকি ফোঁস ফোঁস করে কোষ্ঠী শুঁকে চেয়ারে গিয়ে বসল জিভ বের করে।

বড়মামা বললেন, 'নে, হামাগুড়ি দিয়ে মাথার দিক থেকে দেখতে দেখতে নিচের দিকে নেমে আয়। দেখবি এক জায়গায় লেখা আছে, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য, প্রথম পুত্র জাতবান। ওই জায়গায় লেখা থাকবে মাস, দিন, সাল, তারিখ, সময়।'

‘এ খুব কঠিন কাজ যে বড়মামা! আপনার মনে নেই কবে, কোন্ দিন, কোন্ সালে জন্মেছেন?’

‘ধুস, নিজের জন্মদিন মনে থাকে? নে নে, হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে আয়। কষ্ট কী রে? হামা দিতেও কষ্ট। ছেলেবেলায় কত হামা দিয়েছিস!’

পড়তে পড়তে নিচের দিকে নামছি। সব কি আর পড়ছি, না পড়া যাচ্ছে? কত রকমের নকশা আঁকা। ছবি আঁকা। ছক কাটা। মানুষের ভাগ্য যে কী ভীষণ জটিল! নামতে নামতে পেটে নেমে এলুম। কোথায় সেই জাতবান! সব আছে, ওইটাই নেই।

‘বড়মামা, তর্কপঞ্চাননমশাই ওটা লিখতে ভুলে গেছেন।’

‘সে কী রে! আমি কি রামচন্দ্র! না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেল!’

‘লিখতে মনে হয় ভুলে গেছেন!’

‘তাহলে এটা কার কোষ্ঠী! ভাল করে দ্যাখ রে গবেট। জন্মতারিখ, দিন, সময় ছাড়া কোষ্ঠী হয় না।’

‘আপনি একবার দেখুন, আমার চোখে পড়ছে না।’

‘এদিকে আয়, ন্যাজটা চেপে ধর। চেপে না ধরলে গুটিয়ে যাবে।’

বড়মামা হামা দিয়ে কোষ্ঠী পড়ছেন, ঘরে এলেন কবি করুণাকিরণ। বড়মামার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। বড় বড় কবিতা লেখেন। মাথায় বড় বড় কাঁচাপাকা চুল। ইদানিং বড়মামার কাছে প্রায়ই আসেন। শরীরে হাজারটা ব্যামো। কখনও পেট ভুটভাট। কখনও মাথাধরা। কখনও বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা। কবি বলে, বয়স্ক বলে বড়মামা খুব খাতির করেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা চলে। ফ্রি ওষুধ। আজ আবার কী রোগ নিয়ে এলেন কে জানে? এখুনি জানা যাবে।

কবি করুণাকিরণ বললেন, ‘কী হে ডাক্তার, আবার নতুন করে হামা দেওয়া শিখছ না কি? দ্বিতীয় শৈশব এরই মধ্যে ফিরে এল?’

‘আজ্ঞে না, নিজের জন্মতারিখ খুঁজছি।’

‘ওটা কোষ্ঠী বুঝি? বাঃ, বেশ পেল্লায় ব্যাপার তো! খুঁজে পেলে?’

‘আজ্ঞে না।’

‘সরো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।’

আমরা তিনজনেই মেঝেতে হামাগুড়ি দেবার অবস্থায়। কবি করুণাকিরণ খুঁজে খুঁজে বের করলেন, বড়মামার জন্মদিন পয়লা আষাঢ়। মেঝে থেকে বীরের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘বড় শুভদিনে জন্মেছ হে ডাক্তার। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, প্রথম পুত্র জাতবান। তোমাকে আটকায় কে? ধর্মে, অর্থে, মোক্ষে তরতর, তরতর করে ওপর দিকে উঠে যাবে।’

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, ‘মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল কেন? ডাক্তার, একবার প্রেশারটা চেক করো তো!’

মেজমামা আজকাল রাতে খই-দুধ ছাড়া অন্য কিছু খান না। ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাতে গুরুভোজন করলে তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে যায়। বেশি রাত অবধি লেখা পড়া করা যায় না। দুধে খই ভেজাতে ভেজাতে বললেন, 'তোমার জন্মদিন তাহলে পয়লা আষাঢ়!'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ। এসে গেল। প্ল্যানটা ভেবেছিস কী ভাবে কী হবে?'

'ক'দিন ধরেই খুব ভাবছি, বুঝলে? পাখি আর কুকুরের জন্যে চিন্তা নেই। জানো তো, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'তুই কাককে পাখির মধ্যে ফেলছিস?'

'ও মা, সে কী! কাক পাখি নয়! দুটো ডানা, উড়তে পারে। পাখি ছাড়া আবার কী?'

'ডাক আর স্বভাব দুটোই ভারী বিশ্রী।'

'তুমি রূপ দেখো না দাদা, গুণটাও দ্যাখো। ইংরিজিতে বলে নেচারস্ স্ক্যাভেঞ্জার। তাছাড়া পায়রা আছে, চড়াই আছে। আমাদের ঠাকুর দালানেই শ-খানেকের বেশি পায়রা আছে। একমুঠো দানা আনলেই সব ফরফর করে নেমে আসবে।'

'আরে দূর, সে তো সব গোলা পায়রা!'

'গোলা পায়রা পায়রা নয়! তুমি যে কী বলো দাদা! তোমার জন্যে জাপান থেকে ন্যাজঝোলা পায়রা কে আনবে দাদা! পাখি বলতে তুমি কী বোঝো?'

'ধর, টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙে, বউ-কথা-কও, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বাবুই, চাতক, শালিক। মানে সব জাতের পাখি, যারা গান গাইতে পারে।'

'দ্যাখো দাদা, অমন দুই দুই কোরো না। সব পাখিই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওই দিন একঝাঁক ছাতারে যদি ধরতে পারি, সভা একেবারে জমে যাবে।'

'প্লিজ মেজো, ছাতারে আমদানি করিসনি। ভীষণ ঝগড়াটে পাখি। চিল্লে বাজারে মাত করে দেবে।'

'আরে, ভোজসভা একটু সরগরম না হলে মানায়! বিয়েবাড়িতে দ্যাখোনি যত না খাওয়া হয় তোর চেয়ে বেশি হয় চিৎকার।'

মাসিমা তাড়া লাগালেন, 'তোমরা দয়া করে টেবিল ছেড়ে উঠবে? রাত কটা হল খেয়াল আছে?'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুই সব সময় অমন অসহযোগিতা করিস কেন কুসি? তোর সামান্য একটু সহানুভূতি পেলে, আমরা দু'ভাই পৃথিবী জয় করতে পারি।'

'থাক, তোমাদের আর পৃথিবী জয় করে কাজ নেই। সব মাথায় তুলে এখন জন্মদিন হচ্ছে। তাও কী রকম জন্মদিন, না পশুভোজন। লোকে শুনলে তোমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে দিয়ে আসবে।'

মেজমামা বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ো বড়দা। এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। কুসিটার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই। একেবারেই স্টিরিও।'

দুই মামা ছাদে এসে ঢাউস দুটো বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। মাথার ওপর

এক-আকাশ তারা। কোণের দিকে এক-ফালি চাঁদ ঝুলছে। মনে হচ্ছে, কে যেন ছবি এঁকে রেখেছে। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে। দূরে, বহুদূরে একপাল কুকুর চিৎকার করছে।

মেজমামা বললেন, 'বড়দা, শুনছ। এই গ্রামে ওই রকম কয়েক পাল কুকুর আছে।'

'তুই ওদের নেমন্তন্ন করবি নাকি?'

'নিশ্চয়। তাছাড়া তুমি কুকুর পাবে কোথায়?'

'ওরা তো লেড়ি রে?'

'তোমার বড়দা বড় জাতিভেদ। বর্ণবৈষম্য দূর করো। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান।'

'ওদের স্বভাব তুই জানিস না মেজো, ম্যানেজ করতে পারবি না। শেষে পুলিশ ডাকতে হবে।'

'হ্যাঃ, পুলিশ ডাকতে হবে! কী যে তুমি বলো বড়দা। স্রেফ ইট মেরে ভাগিয়ে দোব।'

'গোরু আর ছাগলের জন্যে তা হলে কী করবি?'

'নিমন্ত্রণপত্র ছাড়ব। বয়ানটা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি। ভাগনে!'

'বলুন মেজমামা?'

'লেখ তো।'

কাগজ আর কলম নিয়ে বসতেই মেজমামা বলতে শুরু করলেন ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হবে মদীয় ভবনে সাড়ম্বরে, যথোচিত উৎসব সহযোগে। উক্ত পুণ্যদিবসে এই উপলক্ষে আয়োজিত পশুভোজসভায়, স-শাবক আপনার গৃহপালিত গোরু-ছাগলকে উপস্থিত থাকার জন্য ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। উপহারের বদলে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-নিয়ন্ত্রণবিধি অনুসারেই ভোজের আয়োজন করা হবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁকে জনসেবার সুযোগ দান করুন।

ভবদীয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট ঃ প্রাতে সানাই-সহযোগে উৎসবের সূচনা। স্নান, পূজাপাঠ, হোম! অনুষ্ঠান-মণ্ডপের উদ্বোধন, মাঙ্গলিক সংগীত। পক্ষী-উৎসব। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় স্বহস্তে পক্ষীভোজন করাবেন। ক্ষণ-বিরতি। দ্বিপ্রহরে, গো ও ছাগ উৎসব। সাড়ম্বরে, গোরু ও ছাগলের সুখাদ্য বিতরণ করা হবে। রাতে কুকুরসেবা। স্বস্তিবাচন। উৎসবের পরিসমাপ্তি।

নিমন্ত্রণপত্র লেখা শেষ হল। বড়মামা গদগদ স্বরে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! তোর মাথাটা মেজো বেশ ভালই খেলে। সাধে তুই নামকরা অধ্যাপক!'

'নাও, এখন শুয়ে পড়ো। বড় বড় হাই উঠছে। কাল সকালে ভোলাবাবুকে প্রেসে দিয়ে আসতে বোলো, আর বেশি সময় নেই। শ-দুয়েক কপি ছাপালেই হবে।'

মেজমামা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

শ্যামল হাজরার খড়ের গোলা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হাজরামশাই ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে, গদির ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। সামনে লাল ক্যাশ বাক্স। মেজমামা আর আমি দোকানে ঢুকতেই, হাজরামশাই ভদ্র হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আসুন, আসুন, মেজবাবু, কী সৌভাগ্য আমার।'

হাজরামশাই কাশতে লাগলেন। একঢোক ধুনোর ধোঁয়া গিলে ফেলেছেন।

মেজমামা গদির ওপর ঝুলে বসলেন। চোখ জ্বালা করছে। মেজমামা বললেন, 'আপনার কাছে একটা খবরের জন্যে এলুম।'

হাজরামশাই কাশি সামনে বললেন, 'কী খবর মেজবাবু?'

'আচ্ছা, আপনার গোলা থেকে যাঁরা খড় নেন, তাঁদের নাম ঠিকানা সব আমায় দিতে পারেন?'

হাজরামশাই সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কেন বলুন তো? আমায় ভাতে মারতে চান?'

‘ভাতে মারতে চাইবে কেন?’ মেজমামা আশ্চর্য হলেন।

‘বলা যায় না, হয়তো পাশাপাশি আর একটা গোলা খুলে বসলেন!’

‘পাগল হয়েছেন? প্রফেসারি ছেড়ে গোলা খুলতে যাব কোন্ দুঃখে?’

‘বলা যায় না মেজবাবু। ছেলে-চরানো, আর গোরু-চরানো প্রায় এক জিনিস। শেষে হয়তো ভাবলেন বিদ্যের বদলে খড় দেওয়াই ভাল। অনেক সহজ কাজ!’

মেজমামা হাসতে হসেতে বললেন, ‘তা যা বলেছেন! ব্যবসা করতে জানলে তাই করতুম। না, সে কারণে নয়। আমি জানতে চাইছি অন্য কারণে।’

মেজমামা সব ভেঙে বললেন। বড়মামার অভিনব জন্মদিন পালনের কথা। গোরুদের সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করতে হলে গোরুর মালিকের নাম-ঠিকানা জানা দরকার। সব শুনে হাজরামশাই হাঁ হয়ে গেলেন।

‘মেজবাবু, আপনি রসিকতা করছেন না তো! এ-রকম কথা কেউ কখনও শোনেনি।’

‘আমার দাদা পশুভক্ত। সারাজীবন গোরু, ভেড়া, ছাগলেরই সেবা করে গেল। সাত-সাতটা কুকুর। সেই ভালবাসা পরিবারের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া আর-কি! বুঝলেন না হাজরামশাই!’

‘সবই বুঝলুম’ তবে এই দুর্মূল্যের বাজার। মানুষই খেতে পাচ্ছে না।’

‘তাহলে বুঝুন, পশুরা কী অবস্থায় আছে? কটা গোরু ভালভাবে খেতে পায়? কটা ছাগল খাবার পর পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে! কটা ছাড়া-কুকুরের খাবার স্থিরতা থাকে? পশু বলে কি তারা মানুষ নয়!’

হাজরামশাই হাসলেন। হাসতে হাসতে মোটা একটা খাতা খুললেন, ‘নিন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে নিন। চা খাবেন মেজবাবু?’

‘তা একটু হলে মন্দ হয় না।’

হাজরামশাই কর্মচারীকে ডেকে চায়ের হুকুম দিলেন। নাম-ঠিকানা লেখা চলতে লাগল। অনেকেরই গোরু আছে। মেজমামার খুব আনন্দ। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, ‘গোরুতেই মাত করে দেবে। কুকুরের আর দরকার হবে না। বাড়িটা বৃন্দাবন হয়ে যাবে। দাদা আমার রাখালরাজা হয়ে গো-সেবা করবে।’

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের পাগলামির দিনটা তাহলে কবে ঠিক হল?’

বড়মামা আর মেজমামা দুজনেই বসেছিলেন। একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, ‘পাগলামি মানে? জীবসেবা মানে শিবসেবা। পড়িসনি?’

‘পড়েছি দাদা। তবে এখন পড়েছি পাগলের হাতে। দিনটা কবে সেইটা শুধু বলে দাও। তার দু’দিন আগে আমি পালাব।’

‘পালাবি মানে! বাড়িতে এতবড় একটা কাজ। শুধু কাজ নয়, সামথিং নিউ। তুই পালালে আমরা যাব কোথায়? তুই আমাদের অনুপ্রেরণা।’

‘আমার ভূমিকা?’

'দর্শক। তুই হবি দর্শক। খবরের কাগজের লোক আসতে পারে। এমন তো হয়নি কখনও। তাদের একটু আদর আপ্যায়ন করবি। 'পশুপ্রেমী বড়দা' বলে আমরা একটা পুস্তিকা ছাপাচ্ছি। সেটাই জনে জনে বিতরণ করবি। মনে রাখবি—এটা সাধারণ বাড়ি নয়। তপোবন। আশ্রম।'

মাসিমা মুচকি হেসে চলে গেলেন। বড়মামা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আমাদের পাগল বলে গেল!'

'আরে এ-পাগল সে-পাগল নয়। এ হল আদরের পাগল। প্রেমিক পাগল। যে-কোনও ভাল কাজ, অভিনব কাজের সূত্রপাতে লোকে পাগলই বলে। তোমার সেই ব্যাঙ-নাচানো সায়েবের গল্প মনে পড়ে? পাগলামি থেকে এল বিদ্যুৎ। পাগলামি থেকে এল বসন্তের টিকে। নাও, এসো, চিঠিগুলো খামে ভরে ফেলা যাক। আজই নিমন্ত্রণে বেরোতে হবে। বেশি সময় নেই।'

'তুই কি সত্যিই 'পশুপ্রেমী বড়দা' ছাপাবি?'

'ছাপাবি কী? ছাপতে চলে গেছে।'

'কী লিখলি, আমাকে একবার দেখালি না ভাই!'

'ছেপে আসুক । পড়লে তুমি অবাক হয়ে যাবে। শুরুটা আমার লাইন-দুয়েক মনে আছে—পশু না হলে পশুকে ভালবাসা যায় না। আমাদের পশুপ্রেমী বড়দা আশৈশব পশুপক্ষীর সঙ্গে বিচরণ করতে করতে এখন পশু-ভ্রাতা কি পশু-পিতার স্তরে চলে গেছেন।'

'এই সব লিখলি? লোকে আমাকে ভুল বুঝবে না তো!'

'কেন, ভুল বুঝবে কেন?'

'ওই সব লিখে আমাকেই তো পশু বানিয়ে দিলি।'

'মানুষের আর কোনও গৌরব নেই দাদা। এখন পশু হওয়াই গৌরবের। গোরু তবু দুধ দেয়। পাখি তবু গান গায়। কুকুর তবু পাহারা দেয়। তোমার মানুষ কী করে দাদা? শুধু বদমাইশি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' বড়মামা খামে চিঠি ভরতে লাগলেন আপনমনে।

সন্ধেবেলা আমি আর মেজমামা বেরিয়ে পড়লুম, ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে। বেশ মজা লাগছে। প্রথম বাড়ি। মেজমামা ডাকলেন, 'হরিদা আছেন, হরিদা?'

হৃষ্টপুষ্ট, কালো চেহারার হরিদা বেরিয়ে এলেন। দেখলেই মনে হয় ডেলি সের দুয়েক দুধ খান। খাবেন না কেন? বাড়িতে তিন-তিনটে গোরু। হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। ভদ্রলোকের দু'হাতের কনুই পর্যন্ত কুচো-কুচো খড় লেগে আছে। মেজমামাকে দেখেই বললেন, 'আরেব্বাবা, কী সৌভাগ্য! মেজবাবু যে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ করতে এলুম। আগামী পয়লা আষাঢ় দাদার শুভ জন্মদিন।'

'বাঃ বাঃ, ডাক্তারবাবুর জন্মদিন! নিশ্চয় যাব। সপরিবারে, সবান্ধবে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ আপনাকে নয়, আপনার তিনটে গোরুকে।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরবেলা আপনার গোরু তিনটিকে বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে অনুগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। বলেন তো গোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথামত ওদেরও বলে যাই।'

'মানুষের ভাষা যে ওরা বুঝবে না মেজবাবু!'

'আপনি তাহলে ওদের বলে দেবেন। চিঠির তলায় অবশ্য লেখাই আছে, পত্রের দ্বারা নেমন্তন্নের ত্রুটি মার্জনীয়। আপনি তাহলে ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে যাবেন, কেমন?'

'আমার গোরু তিনটে মেজবাবু ভিন্‌-জাতের। একটু ভাল খায়।'

'কী খায় হরিদা?'

'পাঁচ কেজি ছোলা এক-একজন...।'

'পেট ছেড়ে দেবে।'

'আজ্ঞে না, ওইটাই ওদের খোরাক, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি আর খড়ের কুচো, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে এক ডজন ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'অ্যাঁ, বলেন কী? মরে যাবে যে।'

'আপনি আপনার পেটের মাপে দেখছেন মেজবাবু। গোরুর পেট তো পেট নয়, জালা। বিদেশী গোরু মেজবাবু, খোরাকটি ঠিক রাখলে তবেই না দুধ ছাড়বে! এবেলা-ওবেলা-ষোল-সতের কেজি।'

'এই সাংঘাতিক খোরাক ম্যানেজ করেন কী করে?'

'দুধ বেচে মেজবাবু।'

'আচ্ছা চলি তাহলে—' বলে মেজবাবু আমার হাতে টান মারলেন। উৎসাহ যেন মরে এসেছে। শ্যামল সাঁপুই বাড়ির রকে বসে কড়রমড়র করে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চুমুকে চুমুকে চা খাচ্ছিল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামল, তোমার কটা গোরু!'

'সে তো একবার আমি বলে দিয়েছি, আবার কেন?'

'কাকে বলেছ?'

'কেন, ওই যে সরকারের লোক এসেছিল, কী বললে—সেনসাস না কী হচ্ছে। পশুগণনা।'

'আমি গণনা করতে আসিনি। নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দাদার জন্মদিনে তোমার গোরুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

শ্যামল সাঁপুই হেসেই অস্থির। ভাবলে আমরা পাগলা হয়ে গেছি। 'এক-আধটা গোরু! আমার সাত-সাতটা গোরু। সব কটাকে নিয়ে যাব? দুটো বাছুরও আছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সপরিবারে, সবান্ধবে যাবে।'

রাত দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা ডিসপেনসারি বন্ধ

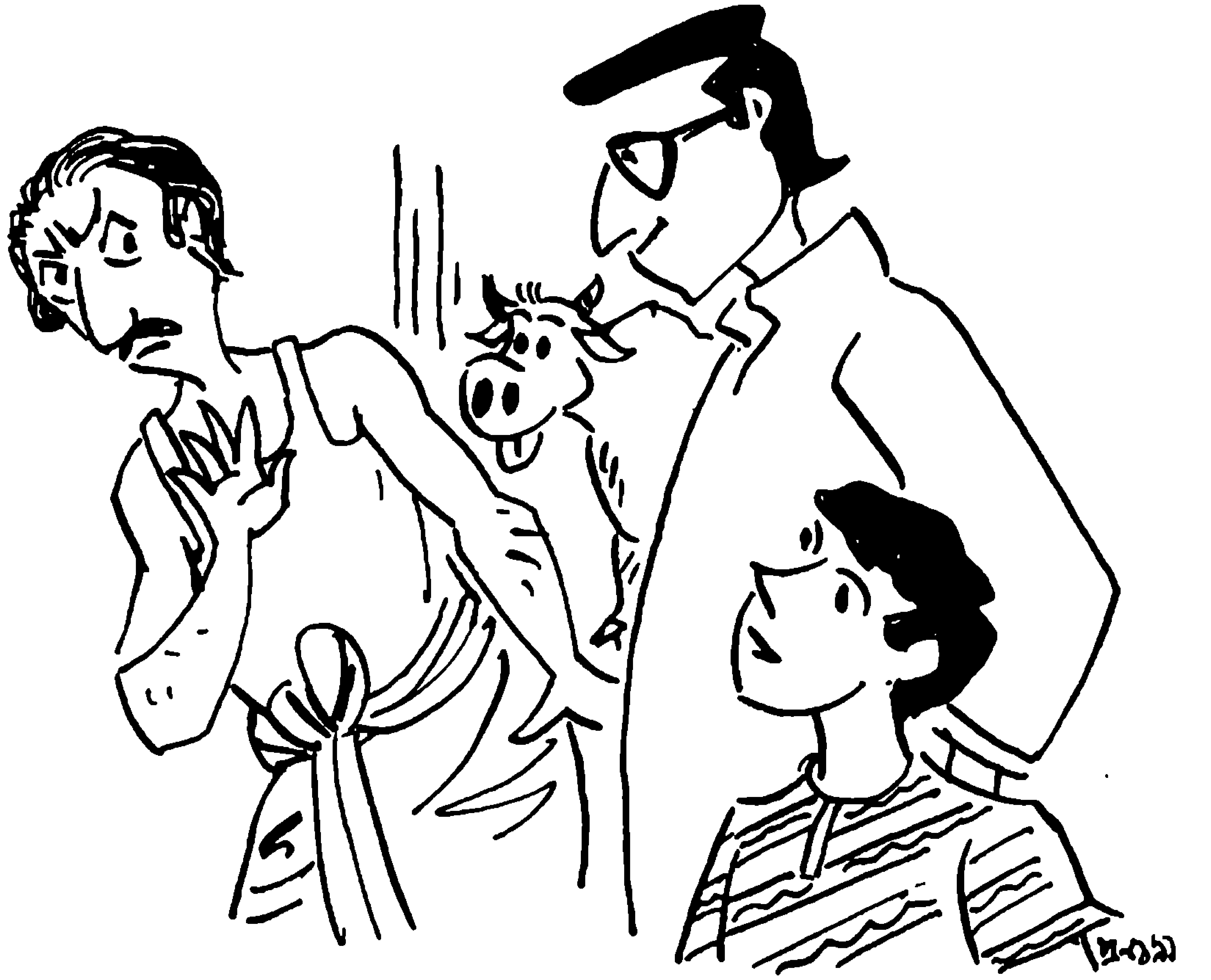

করে ছোট ছাদে বসে বাতাস সেবন করছিলেন। আর গুনগুন করে গান গাইছিলেন—'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা—'

মেজমামা ধপাস করে বেতের চেয়ারে বসে বুকপকেট থেকে নোটখাতা বের করে, বিড়বিড় করে যোগ করতে শুরু করলেন, 'একশো-তিন। বুঝলে বড়দা।'

'আমি যে তোর সঙ্গে যাব...অ্যাঁ, কী বললি?'

'হাণ্ড্রেড থ্রি, দিশি, বিলিতি মিলিয়ে। ধরে নাও শ-খানেক গোরু আসবে। ইয়া-ইয়া সব চেহারা। খোরাক শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।'

'ভালই তো, ভালই তো। পেটপুরে সব খাওয়াব।'

'খোরাক শুনবে? পার হেড পাঁচ কেজি ছোলা, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি, ছোলার চুনি, কুচো বিচলি, ভেলি গুড়—আখের গুড় হলেই ভাল হয়। বারোশো ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'হ্যাঁ, কোথা থেকে শুনে এলি। এসব চালিয়াতির কথা! মানুষই দু'বেলা খেতে পায় না, গোরু খাবে ছোলা, ভিটামিন ট্যাবলেট! এরপর বলবি, ছাগলে রাবড়ি খাচ্ছে।'

'যাদের গোরু তারা বলছে। আমি গোরুর কী জানি বল? একজন বললে, আমার গোরু আধ মাঠ কচি দুব্বো খায়, তা না হলে কনস্টিপেশান হয়।'

'ওসব চালের কথা, রাজনীতি করছে রে মেজ। আমাদের জব্দ করতে চায়। যে যাই বলুক, আমরা আমাদের মেনু অনুসারে খাওয়াব।'

'তা হয় না বড়দা। মানুষ হলে হত। লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, পাঁপড়ভাজা। পশুদের এক-এক শ্রেণীর এক-এক প্রকার খাদ্য। যার যা খাবার তাকে তো তা দিতে হবে। কুকুরকে আলোচাল দিলে খাবে? ছাগলকে তার নিজের মাংস দিলে ছোঁবে? অশান্তি হয়ে যাবে বড়দা।'

'তা হলে তাই হবে। ছোলা কত লাগবে?'

'ধরো, ছশো কেজি। ছশো কেজি খোল, ভুসি, ছোলার চুনি, একশো কেজি ভেলি। বাইশটা বড় ছাগল আর বিয়াল্লিশটা ছানা আসবে। কুকুর আসবে ষাট-সত্তর, বিলিতি আরও দশ-বারোটা। ছটা তার মধ্যে অ্যালসেশিয়ান। বাকি ছটা স্পিৎস। দু'দল, না তিনদল। তিনদলের তিন রকম ব্যবস্থা। স্পিৎস খাবে কিমা। অ্যালসেশিয়ান খাবে খাবা-খাবা মাংস, লেড়ি খাবে হাড়গোড়, ছাঁটছুট। ছাগলের জন্যে চাই পুরো একটা কাঁঠালগাছ আর বটগাছ।'

বড়মামা বেশ যেন নার্ভাস হয়ে গেলেন, 'মেজ, খরচের কথা বাদ দে। সে যা হবার হবে। কিন্তু জায়গা লাগবে বিশাল।'

'ম্যানেজ করার জন্যে অনেক লোকও লাগবে। শ-খানেক কাঠের ডাবর চাই, গোরুর জন্যে।'

'আচ্ছা মেজ, আজকাল তো সবাই খাওয়াবার ভার ক্যাটারারকে দিয়ে দেয়?'

'সে মানুষ হলে হত! পশুদের জন্যে ক্যাটারার নেই, সাপ্লায়ার আছে।'

'কাল ভেটেরিনারি হসপিট্যালের ডাঃ সাহানাকে একবার ফোন করব। দেখি উনি কী ভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

সাড়ে এগারোটার সময় সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা সকালের চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'ডিফিট, গ্রেট ডিফিট।'

মেজমামা এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, 'আমি সারারাত ভেবে দেখলুম, ব্যাপারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো হয়ে যাবে। সামলানো যাবে না। লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। বিশাল জায়গা চাই, বহু লোকজন চাই। আইডিয়াটা ভাল ছিল। কাজে লাগানো গেল না, এই যা দুঃখ।'

মাসিমা বললেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেছে। কদিন ধরে ভগবানকে আমি কম ডেকেছি! যাই, পুজোটা দিয়ে আসি, মানত করেছিলুম।'

মেজমামা বললেন, 'ঝট করে আর-একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে ফেলি। আপনার গৃহপালিত পশু নয়, সপরিবারে আপনারই নিমন্ত্রণ! ভাগ্নে?'

'আজ্ঞে।'

'ঝট করে দু'লাইন লিখে নাও। সবিনয় নিবেদন, অনিবার্য কারণে আগামী পয়লা আষাঢ়, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পশুসেবার পরিবর্তে সন্ধ্যায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতিভোজে আপনার সবান্ধবে উপস্থিতি কামনা করি। ভবদীয়।'

বড়মামা খুঁতখুঁত করে বললেন, 'অ্যাঃ, ব্যাপারটা গেঁজে গেল রে মেজো।'

আজ পয়লা আষাঢ়।

ভোর পাঁচটা থেকে সানাই শুরু হয়েছে। ভোরের সুর বাজছে। বাইরের বিশাল মণ্ডপ ফুলে-ফুলময়। কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ একেবারে ঝলমলে রোদ। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন। পুজোপাঠ, হোম-অর্চনা, শুরু হল বলে। বড়মামার স্নান হয়ে গেছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে উত্তরীয়। রূপ একেবারে খুলে গেছে। কাল থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাম আসতে শুরু করেছে, দূর-দূরান্ত থেকে। সকলেই দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

মাসিমা পুজোর আয়োজন করেছেন। ভোরবেলাতেই বাজার এসে গেছে। বড় বড় মাছ শুয়ে আছে রকের একপাশে। পুঁচকে একটা বেড়াল মাছের আকার দেখে ভয়ে থমকে পড়েছে দেয়ালের একপাশে।

হালুইকর ব্রাহ্মণ হাতা, খুন্তি, ঝাঝরি, লটবহর নিয়ে এসে গেছেন। অ্যাসিসটেন্টরা উনুনে আগুন দিয়েছেন। বাগানের দিকের আকাশে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

ইলেকট্রিকের লোক এসে টুনি ঝোলাতে শুরু করেছে। তিনজন ঝাড়ুদার খচরমচর করে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছে চারপাশে। আজ সব ছবির মতো হয়ে যাবে।

বেলার দিকে ফুলের তোড়া আসতে শুরু করল। হাসপাতাল থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। বড়মামার হাসি-হাসি মুখ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কপালে চন্দনের টিপ। দুপুরে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাবেন। ছোট্ট একবাটি ঘি খাবেন চুক করে চুমুক দিয়ে। সানাই মাঝে-মাঝে থামছে, মাঝে-মাঝে বেজে উঠছে। রান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে সুবাস ছড়াচ্ছে।

সন্ধে হতে-না-হতেই পুটুস-পুটুস করে আলোর মালা জ্বলে উঠল চারপাশে। তেমনি গুমোট গরম নেই। ভিজে-ভিজে বাতাস বইছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার সুবাস। একে একে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করলেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে প্যাণ্ডেল কানায় কানায় ভরে গেল। বড়মামা, মেজমামা অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। 'আসুন, আসুন নমস্কার, নমস্কার' এই চলছে সন্ধে থেকে। কারুর হাতে চা, কারুর হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। আমি বিতরণ করে চলছি 'পশুপ্রেমী বড়দা।' জাফরানি রঙের মলাট। গোটা গোটা অক্ষর। কেউ পড়ছেন। কেউ মুড়ে রাখছেন।

টেবিলে টেবিলে পাতা পড়ে গেল। পাশ দিয়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে খাবার ছুটছে। রাধাবল্লভী, ফিশফ্রাই। বিরিয়ানি গন্ধে পাগল করে দিচ্ছে। বড়মামা আর মেজমামা

হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, 'এবার আপনারা অনুগ্রহ করে আহারে বসুন।'

সভা একেবারে পরিপূর্ণ। কবি করুণাকিরণ মাঝের একটি আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুরুর আগে আমি একটি কবিতা পড়তে চাই, "আজি তব জন্মদিনে, হে রাখাল / বীণা তব বাজে / জীবনের জয়গানে / থেমে থেমে / সেবার মূর্তি তুমি / তোমারে চুমি শতবর্ষ পার করে / হেসে হেসে / তুমি যবে যাবে অমর্ত্যলোকে / অশ্রুজলে সিক্ত হবে / রিক্ত ধরণী।"

ফটাফট ফটাফট হাততালি।

হঠাৎ কোণের দিকে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'ওয়াক আউট। আপনারা সকলে প্রতিবাদে এখুনি এই সভা পরিত্যাগ করুন।'

'কেন? কেন?' সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন।

'কেন? আপনারা এই পুস্তিকাটা একবার পাতা উলটে দেখেছেন?'

'কী আছে, কী আছে?'

এই যত কিছু আয়োজন, সবই আমাদের অপমানের কৌশল। এক জায়গায় জড়ো করে পাইকারি দরে জুতো মারার বড়লোকি চাল।'

'কেন? কেন?'

'একটা অংশ পড়ে শোনালেই বুঝতে পারবেন আপনারা। পড়ছি, শুনুন।

শিবজ্ঞানে, জীব-সেবা যার জীবনের ব্রত, শৈশব থেকেই পশুপ্রেমে সে উতলা। গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, কুকুর, পাখি এদের নিয়ে জীবন কাটাতে পারলে আমার পশুপ্রেমী বড়দা আর কিছুই চায় না। মানবদরদি আমরা দেখেছি, এমন পশুপ্রেমী আমাদের দেশে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সেই পশুপ্রেমী বড়দার অভিনব জন্মদিনের, অভিনব আয়োজন এই পশুভোজসভা। একদিকে গোরু, আর একদিকে ছাগল, অন্যদিকে পাল-পাল কুকুর সেবা করছে, আর তারই জয়গান গাইছে সমস্বরে।'

'অপমান, অপমান!' সভা চিৎকার করে উঠল।

মেজমামা চেঁচাচ্ছেন, 'ছি ছি, ভুল বুঝবেন না, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে।'

বড়মামা বলছেন, 'এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি কখনও অপমান করতে পারি! লেখাটা ভুল হাতে পড়েছে।'

কে কার কথা শোনে! সব লণ্ডভণ্ড করে নিমন্ত্রিতরা বেরিয়ে গেলেন। সানাই তখনও বাজছে করুণ সুরে। রাধাবল্লভীর মহাশ্মশানে দুই মামা হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

বড়মামার মশা মারা

বড়মামার বাগানে চব্বিশটা নারকেল গাছ। আম, জাম, সুপারি, ফলসা, কলা তো আছেই। বারমেসে ফুলগাছেরও অভাব নেই। দুটো বড় পুকুর। বড়মামা বাহার করে নাম রেখেছেন, গোলদিঘি আর পালদিঘি। প্রচুর মাছ ছেড়েছেন। ধরার উপায় নেই। ধরলেই দক্ষযজ্ঞ। মাছ বেড়ে বেড়ে এত মাছ হয়েছে, কোন পুকুরেই নামার উপায় নেই। মাছে গুঁতো মারে, কাঁটা মারে। সেদিন একটা বড় কাতলা মাছ মাসীমার কাপড় ছিঁড়ে ফর্দা ফাঁই করে দিয়েছে। বড়মামার কাণ্ডকারখানায় কেউ সন্তুষ্ট নয়। মেজমামা এত রেগে আছেন, একমাস কথা বন্ধ। বড়মামা আমাকে বলেছেন, 'গীতায় বলা আছে, কাজ করে যাবে, ফলাফলের দিকে তাকাবে না।' মেজমামাকে সে কথা বলেছিলুম। মেজমামা উত্তরে বলেছিলেন, 'গীতা কাজের কথা বলেছেন, উনি সারা জীবন যা করলেন, এখনো যা করবেন, সবই অকাজ।' বড়মামাকে মেজমামার উত্তর বলায়, হো হো করে তিন মিনিট হেসে বললেন, 'কবি বলেছেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।' মেজমামা শুনে বললেন, 'চললে তো বোঝা যেত। উনি তো গোল হয়ে ঘুরেই চলেছেন, বৃত্তাকারে। জীবজন্তু, গাছপালা ধর্ম, ধর্ম, গাছপালা, জীবজন্তু। 'বড়মামা বললেন,' 'আমি তো তবু ঘুরছি। বেশ, না হয় গোল হয়েই ঘুরছি। উনি তো জীবনটা শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলেন। চলার মধ্যে ভুঁড়িটাই বেড়ে চলেছে। হই হই করে ভুঁড়ি বাড়ছে।'

বড়মামারও তো টাক বাড়ছে।

চারপাশে গাছপালা আর ঝোপ ঝাড় থাকলে ভীষণ মশা হয়। সন্ধ্যের সময় আমরা কেউ বসতে পারি না স্থির হয়ে। এই বড় বড় কালো কালো মশা। মেজমামার লেখাপড়ার কাজ থাকে। মাঝে মাঝে উঃ আঃ শব্দ করেন। আর বলেন, নাঃ বাড়িটাকে আফ্রিকার জঙ্গল বানিয়ে ছেড়ে দিলে। হটেনটটদের মত গায়ে ছাইপাঁশ মেখে না বসতে পারলে মশার জ্বালায় এক মুহূর্ত স্থির থাকা যাবে না। সেদিন আচমকা নিজের গালে নিজেই

এমন এক চড় হাঁকালেন, চোখ থেকে চশমা ছিটকে দশহাত দূরে পড়ল। ভাগ্য ভাল, কাঁচ ভাঙল না। অসম্ভব রেগে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় মেজবাবুকে খামোকা পায়চারি করতে দেখে, সকলেরই এক প্রশ্ন, 'হল কি?' সকলকেই এক উত্তর, 'বড়বাবু বাড়িতে ব্ল্যাডব্যাঙ্ক খুলেছেন, আমার দান করার মত অত রক্ত শরীরে নেই।'

'সে আবার কি?'

'পাঁচ মিনিট ভিতরে গিয়ে স্থির হয়ে একটু বসার চেষ্টা করে দেখুন।'

মাসীমাও ভীষণ ক্ষেপে আছেন। সেদিন সন্ধেবেলা সবে গান গাইতে বসেছেন। আছে দুঃখ বলে যেই হাঁ করেছেন, একেবারে টাগরায়। কেশে কেশে চোখ মুখ জবা ফুলের মতো লাল। বড়মামা বললেন, 'এ হল গিয়ে হুপিং কাফ। কালই অটো ভ্যাকসিন দিতে হবে। দই, টক, ঘি, তেলে ভাজাভুজি সব খাওয়া বন্ধ। 'কিছুতেই মানবেন না মশা সেঁধিয়েছে গলায়। বড়মামা মেনে নিলে মাসীমা অত রাগতেন না। মাসীমার অবশ্য সেইদিনই জানা হল মশার স্বাদ কি রকম। আমরাও জানতে পারলুম টক টক ঝাল ঝাল। বেশ ঝাঁঝও আছে।

যে কোনো জিনিসই বড়মামা একটু দেরিতে মানেন। আর মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়। এমন কাজ হয় যে সকলেই তখন স্বীকার করেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। অতটা না হলেও চলত। বড়মামা মানুষের কথা তেমন বিশ্বাস করেন না। যেমন মশা নিয়ে মানুষের হইচই বড়মামা গ্রাহ্যই করতেন না। বললেই বলতেন, 'এটা তো সায়েবদের দেশ নয়। বাঙলাদেশের বনে বাদাড়ে মশা একটু হবেই। আমাদের ছেলেবেলায় আরো আরো মশা ছিল। চলতে ফিরতে মশার সঙ্গে ধাক্কা লাগত। মশারি ফেলে গান গাইলেই হয়। আমাদের বাল্যকালে বড় বড় কালোয়াতি গানের আসর বসত মশারির ভেতরে। ওস্তাদ ফজলু খাঁ, ঝিলমিল বাঈ, হুড়ুমজান গুরুমজান সব মশারির ভেতরে সারেঙ্গিওলা আর তবলচিকে নিয়ে বসতেন। শ্রোতারা থাকত বাইরে। তালে লয়ে চটাস চটাস করে মশা মারত। গান জমে উঠত আপনাআপনি। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস। নেসেসিটি ইজ দি মাদার অভ ইনভেনসান।'

বড়মামার একজোড়া সাদা কাকাতুয়া আছে। সারাদিন কপচায়। রাতে ঘাড় কাত করে দাঁড়ে বসে ঘুমোয়। সেদিন বড়মামা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুনগুন করে গাইছিলেন, ভবে সেই সে পরমানন্দ। আর কাকাতুয়া দুটো থেকে থেকেই পাখা ঝাপটাচ্ছিল। বড়মামা প্রথমে ভেবেছিলেন ওরা গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তালি বাজাচ্ছে। যতই হোক ভক্ত পাখি তো। সকালে 'রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ' করে বাড়ি ফাটায়। কিন্তু পাখি দুটো এলোমেলো ঝটাপটি শুরু করে দিল। তাল, লয়, সম কিছুই মানছে না আর। তখনই বড়মামার সন্দেহ হল। পাখি তাল দিচ্ছে না। ঝটাপটি করছে অন্য কারণে। টর্চলাইট ফেলে দেখলেন। কাকাতুয়ার চোখ ঘুমে উলটে আছে আর রাশি রাশি মশা একেবারে ছেঁকে ধরেছে। পালকটালক সব কালো হয়ে আছে। কিছু কিছু মশা হড়কে হড়কে পড়ে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বড়মামার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। পাখি! আহা কৃষ্ণের জীব? মানুষ কষ্ট পাক ক্ষতি নেই, অবলা জীব মশার কামড়ে ছটফট করবে! সঙ্গে সঙ্গে মশারির ব্যবস্থা। সে এক এলাহি কাণ্ড। দাঁড় তো ঝোলাতে হবে। কিসে ঝুলবে? কেন আলনা? আলনায় দাঁড় ফিট করে তার ওপর ফেলা হ'ল নাইলেকসের মশারি। পাখির পেছন থেকে কিছু বেরিয়ে মোজেকের মেঝে নষ্ট করে দিতে পারে। সে ব্যবস্থাও হল। সারি সারি কাগজ পাতা। মেজমামা কথা বলবেন না। প্রতিজ্ঞা করেছেন। ঘরের বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখে শুধু বললেন, 'হুঁউঃ।' তারপর চলে যেতে যেতে বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলেও কাকাতুয়া কি মশারি ফেলে ঘুমোয়? অ্যানিম্যাল এনসাইক্লোপিডিয়াটা একবার দেখ তো কুসী।' কুসী আমার মাসীমার ডাক নাম।

বড়মামার এক নম্বর অ্যাসিস্টেন্ট হলুম আমি। এটা কর, ওটা কর, সবই আমি মুখ বুজে করি। তাই বড়মামা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। মশারির চারপাশে পাশবালিশ চাপা দিচ্ছিলুম। মেজমামার কথা শুনে কাজ থেমে গিয়েছিল। বড়মামা বললেন, 'কান দিও না একদম। জানবে—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। ঈশ্বরকে পেতে হলে

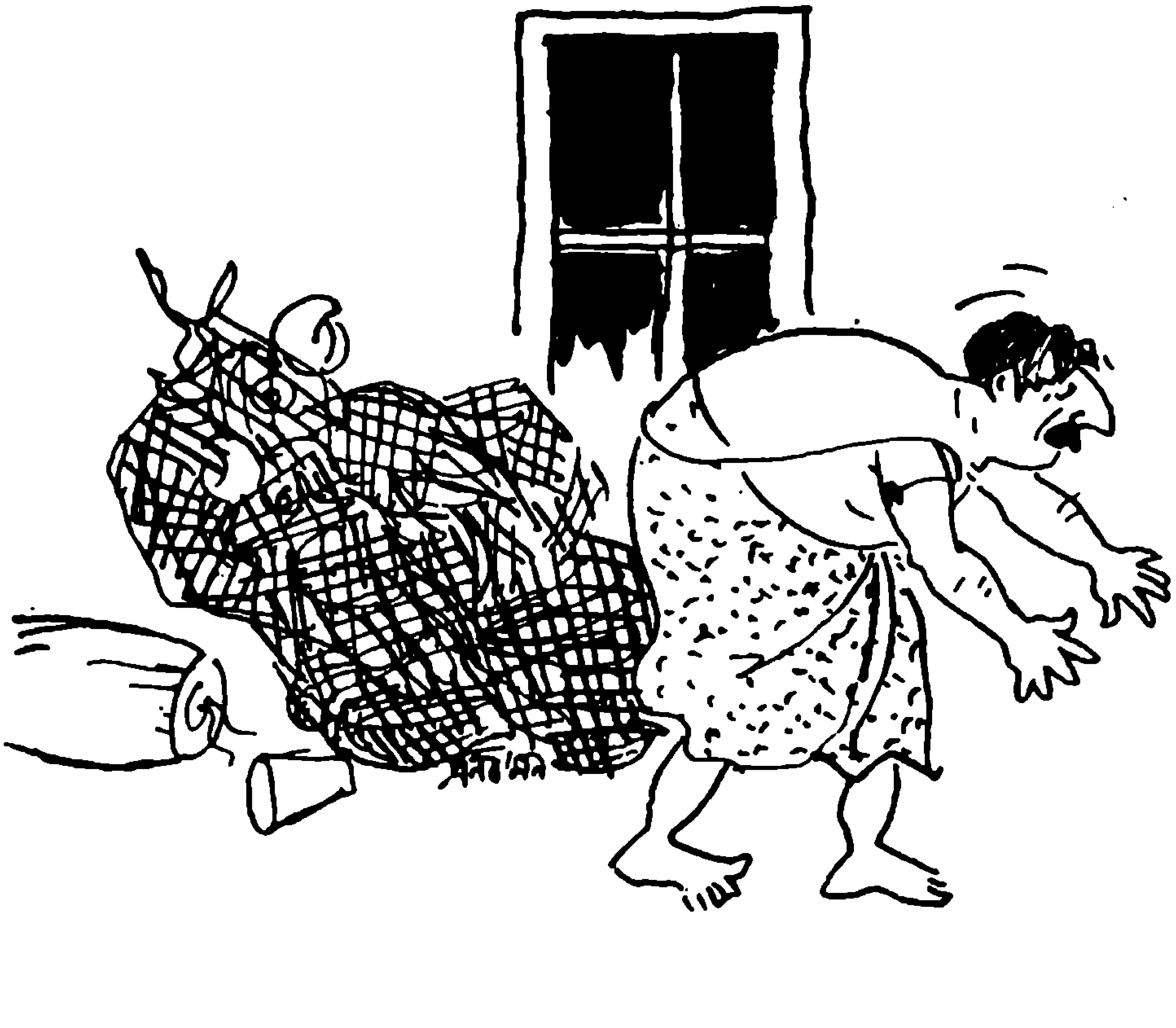

গণ্ডারের গোঁ নিয়ে গোঁ গোঁ করে এগোতে হবে।' যে কাজ করছি তাতে ঈশ্বর আসছেন কোথা থেকে! না বাবা, তর্ক করব না। করলেই বড়মামা রেগে যাবেন।

রাতে বড়মামার ঘরে হুড়মুড় দুড়মুড়, ভীষণ শব্দ। ঠ্যাঙ ঠ্যাঙা ঠ্যাঙ করে গোটা কতক টিনের কৌটোও পড়ল। কাকাতুয়াদের কর্কশ রাত ফাটানো চিৎকার। কি হল? কি হল? বাড়িসুদ্ধ লোক মাঝরাতে বড়মামার দরজার সামনে। মেজমামা প্রতিজ্ঞা ভুলে ডাকছেন, 'ও বড়দা কি হল তোমার? বড়দা?'

অনেক ডাকাডাকির পর বড়মামা ভেতর থেকে কাবু কাবু গলায় বললেন, 'দরজাটা কোন দিকে বলতে পারিস? ঘরে এরা কারা?'

মেজমামা দরজায় টোকা মেরে বললেন, 'এই যে উত্তর দিকে তোমার দরজা।'

টুক করে আলো জ্বালার শব্দ হল। বড়মামা দরজা খুললেন। চেহারা দেখে হাসি পাচ্ছিল। মাথায় মুখে সাদা সাদা কিসের গুঁড়ো। এলোমেলো চেহারা। যেন কলসির মধ্যে থেকে সিল্কের জামা বেরিয়ে এল। ঘর লণ্ডভণ্ড। আলনা ফ্ল্যাট হয়ে মেঝেতে পড়ে। মশারিতে জড়ামড়ি হয়ে বসে আছে হুমদো দুটো কাকাতুয়া। ঘরময় টিনের কৌটো গড়াগড়ি যাচ্ছে। ক্যাপসুল, হজমের পাউডার ছড়াছড়ি।

আকাশ থেকে নভোচর নেমে এলে যে ভাবে সকলে প্রশ্ন করে, আমরাও ঠিক সেই ভাবে বড়মামাকে প্রশ্ন করতে লাগলুম, 'কি হয়েছিল, কি হয়েছিল?'

বড়মামার ঘুমের ঘোরে তখনো কাটেনি। ধীরে ধীরে সব মনে পড়তে লাগল। এতক্ষণ সব গুলিয়ে গিয়েছিল। ঘরের দরজা কোন দিকে তাই মনে ছিল না।

মেজমামা আর একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি করতে গিয়েছিলে?'

'বাথরুমে যাবার জন্যে উঠেছিলুম। খেয়াল ছিল না ঘরের মাঝখানে এই রকম একটা কল তৈরি করে রেখেছি। সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে কি যে হয়ে গেল।'

'যা হল তা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

বড়মামা বললেন, 'ওরে কুসী এক গেলাস জল।'

কাকতুয়া দুটোকে অতি কষ্টে সেই মশারির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হল। সে এক রক্তারক্তি ব্যাপার। দাঁড়ের কাকাতুয়া এক জিনিস। আর মেঝেতে দাঁড়সমেত পড়ে থাকা কাকাতুয়া আর এক জিনিস। ধরতে গেলেই কামড়ে দেয়। যেমন কাঁচির মত ঠোঁট, তেমনি তার কামড়। অনেকটা ক্রিকেট খেলার মতন অবস্থা। প্রথমেই মাসীমা আউট। এক কামড়েই সরে পড়লেন। মেজমামা ভয়ে আর ফিল্‌ডে নামলেন না। আমি আর বড়মামা বহুত কায়দা করে দুটোকে ধরে বারান্দার রিঙে ঝুলিয়ে দিলুম। ঝুঁটিফুটি, পালকমালক চটকে কাকাতুয়া দুটোর অবস্থা তখন কাকতাড়ুয়ার মতো হয়েছে।

সকালে বড়মামা চা খেতে খেতে বললেন,

—বুঝলে, মানুষকে অত খারাপ ভেবো না।

—আজ্ঞে, আমি তো তা ভাবিনি বড়মামা।

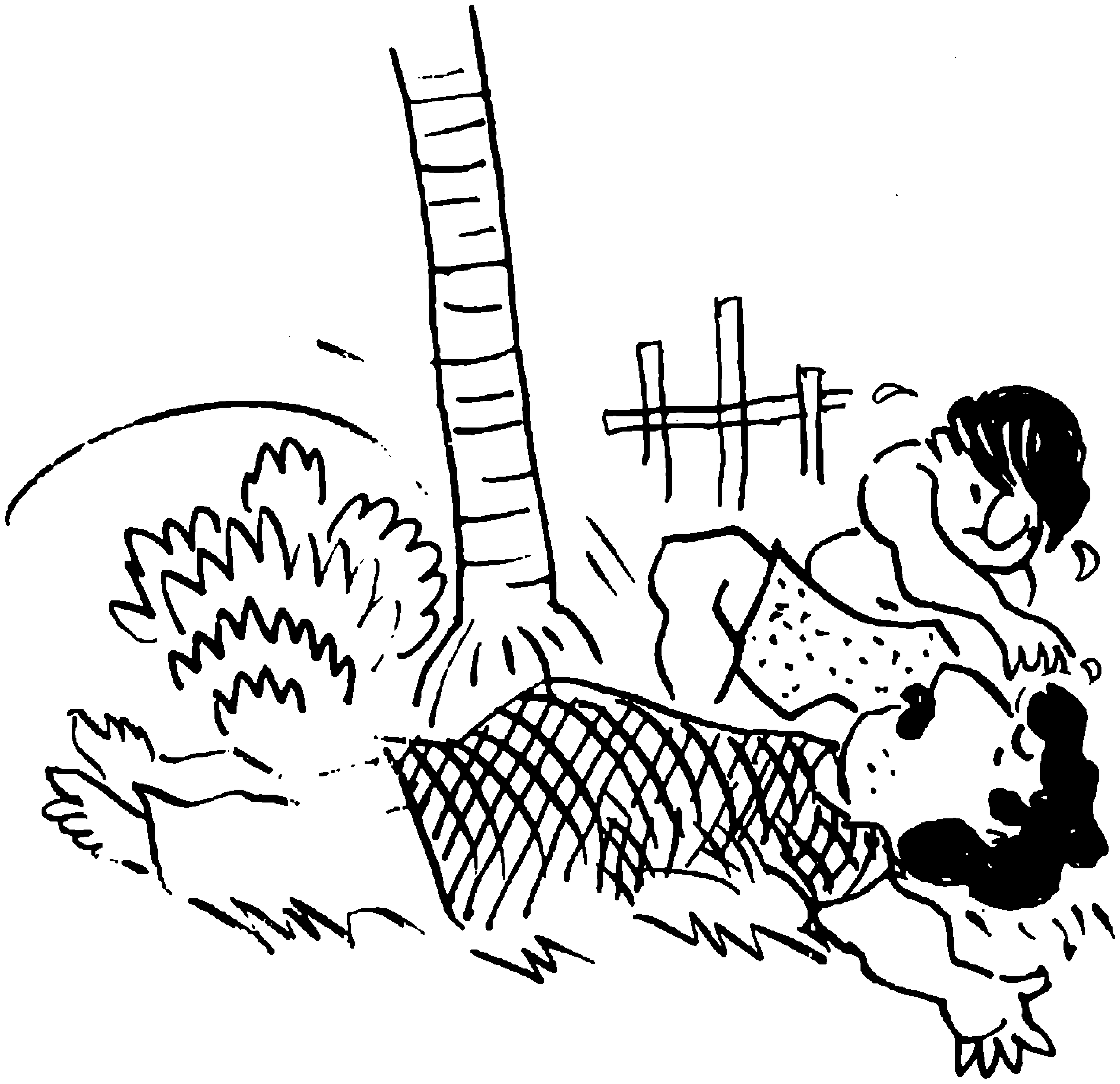

—না ভাববে না। আমি অনেক সময় সেই রকমই ভেবে ফেলেছি। অন্যায় করেছি। আজ আমি তোমাকে বলছি, কুকুর ভাল, বেড়াল ভাল, গরু ভাল, পাখি ভাল, গাছ ভাল, মানুষও ভাল।

—বড়মামা, মশা কিন্তু ভাল নয়।

—'আমি তো সেই জন্যে মশার নাম উচ্চারণ করিনি।' কপালের ডানপাশ গোল আলুর মতো ফুলে আছে। সেই জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন।

—'আজ আমি মশানিধন যজ্ঞ করব। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।' বড়মামা যে ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তাতে আমার ইচ্ছে করছিল, একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে যুদ্ধের বিউৎগল বাজাই ভ্যাঁ পোঁ পোঁ, পিপির পোঁ।

বড়মামার বাগানে কাজ করার জন্যে একজন লোক আছে, যার নাম পুঁটে। বেঁটেখাটো, পুঁটপুঁটে মানুষ। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো আপন মনে নাচে, খেতে দিলে খায়, নয়তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কাজে একবার মন লেগে গেলে রক্ষে নেই। তখন আর তাকে থামায় কে।

হাফপ্যাণ্ট পরে সেই পুঁটে নেমে পড়েছে বাগানে। মেজাজও বেশ ভাল। বাগান পরিষ্কার

করে, পুকুরের পাড় পরিষ্কার করে পাতাটাতা পুড়িয়ে মশক বংশ ধ্বংস করা হবে। বড়মামা একটা সোলার টুপি পরে ওভারসীয়ার বাবুর মতো খুব হাঁকডাক করছেন।

বেশ কাজ এগোচ্ছিল। হঠাৎ পুঁটে নারকোল গাছের দিকে তাকিয়ে বললে, ভোলাবাবু ডাব খাব।

পুঁটে বড়মামাকে ভোলাবাবু বলে ডাকে। বড়মামা বললেন,—কত উঁচুতে ঝুলছে জানিস? অত উঁচুতে ঝোলে বলে আমরা মাঝে মাঝে ডাব কিনে খাই।

—তোরা মানুষ নোস।

পুঁটে যা খুশি তাই বলতে পারে। কেউ কিছু মনে করে না। বড়মামা বললেন, অমন কথা বললি কেন?

তোরা গাছে উঠতে পারিস না গাছ করেছিস বড় বড়।

—তুই পারিস?

—দেখবি?

পুঁটে তড়াক করে গাছে লাফিয়ে উঠল। হাতে পায়ে জড়াজড়ি করে দেখতে দেখতে উঠে গেল টঙে। গাছ থেকে প্রথমেই পড়ল বিশাল একটা পাতা ঝপাং করে। পুঁটে কিছু না নিয়েই উঠে গেছে গাছে। হাতে ধারালো কিছু নেই। কাঁদি ধরে টানলে কি আর ডাব পড়বে? অনেক ওপর থেকে পুঁটে বললে,

—একটা কাটারি পাঠিয়ে দেবে।

বড়মামা বললেন, তুই নেমে এসে নিয়ে যা।

পুঁটে বার কতক নিচের দিকে তাকিয়ে বললে,—'মনে হচ্ছে আমি উঠতে পারি নামতে পারি না। আমাকে নামিয়ে নিয়ে যা।'

—'সে কি রে?' বড়মামার চোখ কপালে উঠে গেল।

দেখতে দেখতে গাছতলায় ভিড় জমে গেল। পুঁটে গাছের মাথায় উঠে বসে আছে। মাঝে মাঝেই হুমকি ছাড়ছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামা আমাকে। নইলে পড়ে মরে যাব।

কেউ বলেন, সার্কাস থেকে জাল আনাও। কেউ বলছেন, দমকল ডাকো। বড়মামা ভয়ে অস্থির; পুঁটে পড়লেই মরবে। মরলেই বড়মামাকে পুলিসে ধরবে। কেন তুমি লোকটাকে গাছে তুলেছিলে? মেজমামা আবার বড়মামাকে খুব বকাবকি করছেন।

হঠাৎ পুঁটে বললে, দেখ আমি কেমন পাখির মতো উড়তে পারি।

নিচের সকলে চিৎকার করে উঠল—ওরে নারে নারে।

কে কার কথা শোনে। পুঁটে মারল পুকুরে লাফ। পুঁটে পড়ল জলে। বড়মামা পড়লেন মাটিতে। পুঁটে জল থেকে উঠে এসে জল নিঙড়ে নিঙড়ে বড়মামার মাথায় থাবড়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

বড়মামা পিট পিট করে চাইছেন। পুঁটে মুচকি হেসে বললে, 'তোরা বড় ভীতু। বড় মানুষরা বড় ভীতু হয়। আচ্ছা আসি রে। তোর ডাব তোর গাছেই রইল। গুনে নিস।'

পুঁটে নাচতে নাচতে চলে গেল।

বড়মামার দাঁত

বড়মামা সাত সকালেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ তেমন সুবিধের নয়। এই সময় কেউ সুপ্রভাত বললে, খ্যাঁক করে উঠবেন। পেয়ারের কুকুর লাকি, সুপ্রভাত জানাবার জন্যে সোফা থেকে নেমে এল তড়াক করে। এতদিন কুকুরের সঙ্গে থেকে কুকুরের ভাষা বুঝতে শিখে গেছি। কুকুরের ভাষা ল্যাজে। মুখ দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে যা বেরোয় তার কোনও মানে নেই। মানুষ যখন ঢেঁকুর তোলে, তার কোনও মানে থাকে? একটাই মানে, পেট খুব ভরে গেছে। কুকুর কথা বলে ল্যাজে।

লাকি সামনের দু'পা তুলে ধেই ধেই করে নাচছে, আর পুটুক পুটুক ল্যাজ নেড়ে বলছে—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।

বড়মামা লাকিকে ইংরেজিতে এক ধমক লাগালেন, স্টপ দ্যাট নুইসেন্‌স। বলেই মনে পড়ল জীবজন্তুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে নেই, তারা মানুষ নয়, ছাত্র নয়, কর্মচারী নয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলেন, সরি, সরি লাকি। লাকি চক চক করে হাত চেটে দিয়ে জানিয়ে দিলে, ক্ষমা করলুম।

বড়মামার ভুরু কুঁচকে আছে। আমার দিকে তাকালেন। এমন মুখ এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। বেশ ঘাবড়ে গেলুম। এ মুখ প্রধান শিক্ষকের হতে পারে, আমার বড়মামার কখনোই নয়।

বড়মামা বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?

—বলুন।

—ওই সাজিটা নাও।

—ফুল তুলতে হবে?

—ব্যস্ত হয়ো না। ওয়েট। কি করতে হবে, আমিই তো বলব।

—না, সাজিতে তো ফুলই তোলে। তাই?

—বড়মামা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, তা হলে, তাই তোলো, আমার উপকার তোমাকে আর করতে হবে না।

—আচ্ছা, বলুন, কি করতে হবে?

—এক সাজি কচি কচি পেয়ারাপাতা তুলে নিয়ে এসো।

—ছাগলকে খাওয়াবেন বড় মামা?

—আবার প্রশ্ন!

বড়দের কথাবার্তা বোঝা দায়। এই বলবেন, যতক্ষণ না বুঝবে ততক্ষণ প্রশ্ন করবে। প্রশ্নের খোঁচা মেরে মেরে সব কিছু জেনে নেবার চেষ্টা করবে। এই তো তোমাদের জানার বয়েস। আবার একবারের বেশি দুবার প্রশ্ন করলেই রেগে কাঁই।

এক সাজি পেয়ারাপাতা এনে বড়মামার টেবিলে রাখলুম। আমার কাজ আমি করেছি। লাকি এসে পরিদর্শন করে গেল। কুকুরের সঙ্গে বসবাস করে আমি নিজেও একটা কুকুর হয়ে গেছি। অগৌরবের নয়, গৌরবের কুকুর। কুকুরের বোঝা আমিও বুঝি। কুকুর চোখ দিয়ে দেখে না, দেখে নাক দিয়ে। আমাদের বোধশক্তি যেমন মাথায়, কুকুরের বোধশক্তি তেমনি নাকে। নাক দিয়ে পাতা দেখে কুকুর সরে গেল, লক্ষ্মী মেয়ের মত।

বড়মামা চোখ বুজিয়ে ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন। পাতা এসেছে শুনে, চোখ খুললেন। বেলপাতায় শিবপুজো হয়। পেয়ারাপাতায় কি পুজো হয়, কি জানি! মুখের যা চেহারা, প্রশ্ন করে জানার সাহস আর নেই।

বড়মামা টেবিলে একটা খবরের কাগজ বিছোলেন, তারপর মুঠো মুঠো পেয়ারা পাতা মুখে পুরে, চোখ বুজিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। এ আবার কি ধরনের আয়ুর্বেদিক ব্রেকফাস্ট! চিবোনো পাতা ফেলতে লাগলেন কাগজে। লাকি পাশের চেয়ারে প্রসাদের লোভে এসে বসেছিল। অবাক হয়ে, বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। লাকি বিস্কুট বোঝে, মাংস বোঝে, এমন সাত্ত্বিক আহার দেখে তার হাসি পাচ্ছে। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি! বড়মামা বাগানের শামুকের মত চিবিয়ে, চিবোনো পাতার একটা স্তূপ তৈরি করে ফেলেছেন।

লাকি ভৌ করে প্রশ্ন করলে, এ তোমার হচ্ছেটা কি?

হঠাৎ বড়মামার কোঁচকানো ভুরু সমান হয়ে গেল। মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ ওঠার মত, মুখে একটা হাসির ভাব খেলতে লাগল। যাক বাবা, বড়মামা এতক্ষণ পরে ফিরে আসছেন তাহলে!

চোখ খুলে বললেন, 'গোইং গোইং গন। চলে গেছে। প্রশ্ন করার সাহস ফিরে এল। কি হয়েছিল বড়মামা? গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল?'

—না।

—তা হলে শোঁয়াপোকা?

আজ্ঞে না। দাঁতের যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। জব্দ করে ফেলেছি। ভেষজের

কি গুণ দেখেছিস? আমি ডাক্তারি ছেড়ে এবার কবিরাজি ধরব। চরক সুশ্রুত। অ্যালোপ্যাথি বোগাস! কাল থেকে আমি মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খেয়েছি। কিছুই হল না। পেয়ারা পাতার গুণ দেখ। দিশি দাওয়াই। বসবাস গাছে। তোরা সব সাহেব, বিলিতি বিলিতি করেই হেদিয়ে গেলি! আঃ মুখটা একেবারে ফ্রেস হয়ে গেল! মুখে যেন দুধের দাঁত ফিরে এলো।

মাসীমা চা নিয়ে এলেন।

বড়মামা বললেন, 'এই নে তোর জন্যে কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি।'

—কি আবার বাঁচালে?

—পেয়ারা পাতা। তোর দাঁত কন কন করছে না?

—শুধু শুধু দাঁত কন কন করবে কেন?

—বলা যায় না কুসী, করতেও পারে। কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। চিবিয়ে রাখ, চিবিয়ে রাখ। ভবিষ্যৎ ভেবে মানুষের কাজ করা উচিত।

চায়ের কাপ রেখে মাসীমা চলে গেলেন। বড়মামার সারাদিনের সব উপদেশ পালন করতে হলে পাগল হয়ে যাবার সম্ভবনাই বেশি।

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে মুখটা কেমন যেন করলেন। আর এক চুমুক খেয়ে বললেন, যার সঙ্গে যে জিনিস। চায়ের সঙ্গে বিস্কুটটাই চলে। পেয়ারা পাতার সঙ্গে চা তেমন জমে না। গাছে গাছে কি শত্রুতা দেখ। চা-ও গাছ, পেয়ারা-ও গাছ, দুজ'নে তেমন মিল নেই। সব মানুষের স্বভাব পেয়ে যাচ্ছে।

ধবাচুড়ো পরে বড়মামা মিলের হাসপাতালে চলে গেলেন। যে কটা পাতা বেঁচেছিল, যাবার সময় পকেটে পুরে নিয়ে গেলেন। বলা যায় না, আবার যদি কন কন করে। দাঁত নাকি মানুষের চেয়েও অপরাধপ্রবণ। সারা জীবনে অনেক পাপ কাজ করে। পাঁঠা চিবোয়, মুরগীর ঠ্যাং ভাঙে, মাছের জীবন নাশ করে। দাঁতের সব কাজই হল নাশকতামূলক। একটাও গঠনমূলক কাজের দৃষ্টান্ত নেই। সারাজীবন খিঁচিয়ে গেল, চিবিয়ে গেল, কামড়ে গেল। আর পাপের বেতন কি?

উত্তরে বললুম, মৃত্যু।

—রাইট। তাই মানুষের আগে দাঁত যায়।

নটার সময় বড়মামা গেলেন। খেল শুরু হল, বেলা এগারোটা থেকে।

প্রথমে এলেন এক ভোজপুরী হিন্দুস্থানী। বিশাল চেহারা। স্যাণ্ডো গেঞ্জি। বুকের ওপর পেতলের পদক। বাজখাঁই গলা। গলা শুনে মাসীমা ভয়ে দরজার আড়াল থেকে বললেন, 'কি চাই?'

—হ্যাঁ, লিজিয়ে, বলে দৈত্যের মত লোকটি কাঁধ থেকে একগাদা ডালপালা উঠনে ফেললেন। 'ডাগ্‌দার বাবুকে লিয়ে দাঁতন। কোঠারি আছে, কোঠারি?'

লোকটির গলা বড়মামার ছটা কুকুরের ছ'রকম ডাকে ভাল করে শোনা যাচ্ছে না। মেজমামা দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে; বারবার জিজ্ঞেস করছেন, 'কি হল কি, ডাকাত পড়েছে। কি হল কি, ডাকাত পড়েছে?'

আমরা যত বার বলছি, 'না না দাঁতন এসেছে,' কিছুতেই শুনতে পাচ্ছেন না। অনেক কষ্টে শোনানো গেল। তখন বললেন, 'বসতে বলো, বসতে বলো।'

কোঠারি কি জিনিস মাসীমার মাথায় ঢুকছে না। কোঠারি তো অবাঙালীদের একটা পদবী। কোঠারি এ বাড়িতে আসবেন কেন। বড়মামার মিলের ম্যানেজারের নাম কোঠারি হতে পারে।

মাসীমা বললেন, 'কোঠারি সায়েব মনে হয় মিলে আছেন।'

—নেহি, নেহি কাটনেকা কোঠারি।

—ওঃ হোঃ কাটারি।

লোকটা কাটারি নিয়ে বসে গেলেন নিম দাঁতন কাটতে। ছটা কুকুর চিল্লে কাবু হয়ে গেল। তিনটে বিরক্ত হয়ে তিন দিকে শুয়ে পড়ল, হাত পা ছড়িয়ে।

পাতা ছাড়িয়ে সাইজ করে কেটেকুটে, বাণ্ডিল বেঁধে, মাল বুঝিয়ে দিয়ে লোকটি উঠে পড়লেন। হাতে ঘড়ি, কাঁধে তোয়ালে। একটা দাঁতন চিবোতে চিবোতে বাগানের রাস্তায় পড়ে বিকট সুরে গান ধরলেন, 'আরে এ রাম ভজুয়ারে।' দাঁতনমুখে সে এক বিকট গান। ঘুমন্ত কুকুর তিনটে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, আবার চেল্লাতে শুরু করল।

আধঘণ্টা পরে ফেজ মাথায় এক ভদ্রলোক এলেন। মুখে চাপ দাড়ি গায়ে চিকনের পাঞ্জাবি। তিনি এলেন স্কুটার চেপে। পেছনে একগাদা ডালপালা।

আমাকে দেখে বললেন, 'হাঁ, লিজিয়ে জনাব, ইয়ে ডক্‌টর সাব্‌কে লিয়ে।' দোতলায় মেজমামাকে দেখে বললেন, 'সালাম আলেকুম প্রোফেসার সাব্‌।'

একের পর এক আসতে লাগল, গাবভ্যারেণ্ডা, আসশ্যাওড়া, নিসিন্দা। উঠনে একটা জঙ্গল তৈরি হয়ে গেল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কি রে কুসী? আজ কি বনমহোৎসব?'

—না, মেজদা, বড়বাবুর দাঁতের যন্ত্রণা, এসব হল রুগীদের ভেট্‌। বড়দাকে তো চেন! যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই হয়তো বলছে, দাঁতের যন্ত্রণায় কি করা যায় বল তো?

—তা ডেন্‌টিস্টের কাছে যাচ্ছে না কেন? দাঁতের যন্ত্রণায় একমাত্র দাওয়াই উপড়ে ফেলা।

—দাঁড়াও, অতই সোজা! বড়দাকে চেন না। কবিরাজি হবে, হাকিমি হবে, টোটকা হবে, সন্ন্যাসী ধরবে, তন্ত্র হবে, তারপর একদিন উপড়ে আসবে। উনি তো ধাপে ধাপে উঠবেন।

মেজমামা বললেন, 'ওকে চিনিস না, ভীতুর ডিম। কাটা ছেঁড়া নিপাতন উৎপাটনের নাম শুনলেই বড়বাবু কাত। নিজের শরীরে ওসব চলবে না, সব চলুক পরের শরীরে।'

লাকি এসে একটা নিসিন্দের ডাল সামনের দুপায়ে চেপে ধরে হাড়ের মত চিবোতে শুরু করলো।

॥ দুই ॥

বড়মামার দাঁতের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। ঠাণ্ডা জল সহ্য হচ্ছে না, গরম জলও নয়। কেবল বলছেন, বডি টেমপারেচার। মাসীমা জল গরম আর ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা আর গরম করতে করতে পাগল হয়ে গেলেন।

খিঁচুড়ি ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য দাঁত নিচ্ছে না।

বসার ঘরে উপদেষ্টারা বড়মামাকে ঘিরে বসেছেন। তাঁদের চা চলছে, বিস্কুট চলছে, পাঁপড় চলছে। বড়মামা শুধু দেখে যাচ্ছেন আর শুনে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দাঁতের গোড়ায় ক্লোভ অয়েল ঠুসছেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, 'ওতে কিছু হবে না ডাক্তার। দাওয়াই আছে আমার বড় বউমার কাছে। দাঁড়াও এনে দি এক দলা।'

রামবাবু বললেন, 'জিনিসটা কি শুনি?'

—তামাকের মাজন।

—ও, গুড়াকু। অতি বাজে জিনিস। ডাক্তার খবরদার, ওর কথা শুনো না। একবার ধরেছ কি মরেছ।

—হ্যাঁ, তুমি সব জেনে বসে আছ? মেয়েরা ব্যবহার করছে।

—সে তো মাতঙ্গিনী হাজরা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। তোমার বউমা বীরাঙ্গনা হতে পারে, সবাই তো আর বীর নয়।

দু'জনে ঝটাপটি বাধে আর কি, বড়মামা উহু, উহু করে উঠলেন।

বসাকবাবু পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে বললেন, 'ডাক্তার গোড়ায় এক টিপ টিপে ধরো। একবারে অব্যর্থ। আমাদের সাধন কি কষ্টই না পাচ্ছিল! সারা ঘরে কেঁউ কেঁউ করে ঘুরছে আর বলছে, এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো। পকেট থেকে এই ডিবে বের করে বললুম, এক টিপ লাগাও, চেপে ধরো দাঁতের গোড়ায়। দুম্ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, এজে র অ। বাঘের নাকে গুঁজে দিলে জঙ্গল ছেড়ে পালাবে। পরের দিন দেখি কি, মোল্লারচকের সাধন মাংসের দোকানে লাইন দিয়েছে। আমাকে দেখেই ছুটে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, মামাবাবু, আপনি ধন্বন্তরি।'

অক্ষয়বাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমার মাথা। সাধন ওপর নিচে ষোলটা দাঁত তুলিয়েছে। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে পারলেই হল।'

রামবাবু বললেন, 'ডাক্তার, তুমি একবার কর্নেল বিশ্বাসকে দেখাও।'

বসাকবাবু বললেন, 'সে হাত আর নেই, বয়েস হয়ে গেছে। দেখাতে হলে বোসই বেস্ট। সিক্সটিতে আমার আক্কেল দাঁত এক ছুরির খোঁচায় এমন করে দিলে, বেরিয়ে এল, যেন খোল থেকে শামুক বেরলো।'

রামবাবু বললেন, 'এটা কত সাল? এইটটি টু। বাইশ বছর আগের হাত আর এখনকার হাত!'

অক্ষয়বাবু বললেন, 'গুপ্তকে দেখাও। ছোকরার যেমন গুণ্ডার মত চেহারা তেমনি অসুরের মত শক্তি। একটানে শেকড়বাকড় সব উপড়ে আনবে।'

বসাকবাবু বললেন, 'পয়সা খরচ করে গুপ্তর কাছে যাবার কি দরকার, গুপে গুণ্ডার কাছে গেলেই হয়। দু চারটে গরম গরম কথা হল ফি। এক ঘুষিতে গোটা ছয়েক ঝরিয়ে দেবে।'

সিদ্ধান্তে আসার আগেই সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা কুঁই কুঁই করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। লাকিও চলল, পেছন পেছন ল্যাজ নাড়তে নাড়তে। ল্যাজের ভাষা, 'কি করতে পারি, কি করতে পারি।'

॥ তিন ॥

রাত আটটা নাগাদ অবস্থা চরমে উঠল।

দাঁতের গোড়া থেকে মন ঘোরাবার জন্যে, বড়মামা প্রথমে চালালেন স্টিরিও রেকর্ডপ্লেয়ার। প্রথমে শ্যামাসংগীত। হল না। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রীন্দ্রনাথ। পরপর এলেন, চলে গেলেন। টপ্‌পা খেয়াল হান মানল। যাত্রাপালা, নটী বিনোদিনী। ওষুধ ধরল না। রাগপ্রধান, কিচ্ছু হল না। এল ইংরিজি, অ্যাবা, ভেনচারম রনগডউইল ওসিবিসা বনি এম। কিছুতেই হল না। টিভিতে বাঙলাদেশ।

মেজমামা এসে বললেন, 'নিউক্লিয়ার অ্যাটাক ছাড়া ও মন ঘুরবে না। যা বলি শোনো। আমার সঙ্গে ডক্টর পালের কাছে চলো। কোনও ভয় নেই।'

মাসীমা বললেন, 'আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। বাচ্চা ছেলেও দাঁত তোলাতে ভয় পায় না।'

মেজমামা বললেন, 'তোলার কথা আসছে কেন? তোলার হলে তুলবে, না হলে ওষুধ দেবে।'

শিশুকে যেভাবে ভোলায়, সেইভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে বড়মামাকে ডক্টর পালের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হল। পেছনে সাহস যোগাতে যোগাতে চললুম আমরা। মেজমামা মাঝে মাঝে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। শরীর হল আত্মার পোশাক। আত্মা এমন এক বস্তু. জলে গলে না, আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রে কাটা যায় না। গুপে গুণ্ডা কিছু করতে পারে না। দাঁত আত্মা নয়। দাঁত হল পোশাকেরই একটা অংশ। দু'চারটে গেলে কিছু এসে যায় না। শেষ বয়েসে দাঁত পড়ে যাবেই। ঠাকুরদার পড়েছিল, বাবার পড়েছিল, মায়ের পড়েছিল, আমাদেরও পড়বে। দাঁত কখনও আপনার জন হয় না। হলে যন্ত্রণা দিত না। ভাগনে যেমন কখনও আপনার হয় না, দাঁতও সেইরকম।

আমাকে আর প্রতিবাদ করতে হল না। মাসীমা-ই এগিয়ে এলেন, 'মেজদা কথা যখন বলবে, একটু ভেবেচিন্তে, বুঝেসুঝে বলবে।'

—কেন, কেন? অন্যায়টা আমি কি বলেছি? আমি শাস্ত্রের কথাই বলেছি। জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা।

—ওটা জন নয়, যম।

—তুই আমার চেয়ে বেশি জানিস? জন মানে তৃতীয় ব্যক্তি, থার্ডপার্সন।

—আজ্ঞে না, ওটা যম।

—আজ্ঞে না ওটা জন।

সারাটা পথ জনে আর যমে জমজমাট লড়াই চলল।

ডক্টর পালের চেম্বার একেবারে ভর ভরাট। কাঁচের শো-কেসে তিনপাটি দাঁত, হাসছে না খিঁচিয়ে আছে বলা শক্ত। দাঁত একবার মুখের বাইরে বেরিয়ে এলে তার ভাব আর ভাষা বোঝা দায়।

বড়মামা গাড়ি থেকে নেমে চেম্বারের সিঁড়িতে পা রাখতেই ডাঃ পাল অ্যাপ্রন পরে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'আরে ডাক্তার এসো, ডাক্তার এসো, কি সৌভাগ্য আমার।'

লম্বা চওড়া, বিশাল চেহারা। আমেরিকার বাস্কেটবল প্লেয়ারদের মত চিউয়িংগাম চিবোচ্ছেন। হাতে এত লোম, মনে হচ্ছে ভাল্লুকের হাত।

বড়মামা ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'দাঁত নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি ডাক্তার।'

—আরে ও তো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার, ধরব আর টকাস করে তুলে দোব।

বড়মামা থেমে পড়লেন। করুণ গলায় ডাকলেন, 'কুসী, এই দ্যাখ, কি বলছে?' মেজমামা সাহস দিলেন, 'আরে উনি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তুললেই হল? আমরা আছি না।'

কোণের দিক থেকে গালফুলো এক রুগী নাকিসুরে ডাকলেন, 'ডাঁকতাঁর বাঁবু।'

ডাঃ পাল ডাকে কোনও সাড়া দিলেন না।

আমরা সদলে তাঁর ভেতরের চেম্বারে ঢুকে পড়লুম। দাঁত তোলার চেয়ারে বেল্ট বেঁধে একজনকে ফেলে রেখেছেন। বড়মামাকে সাধারণ একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'হাঁ করো, দেখি কি অবস্থা করে এনেছ? আমাদের কাছে তো সব শেষের সময় হরিনাম করতে আসে।'

বড়মামা হাঁ করলেন। ডঃ পাল টর্চের আলো ফেলে, লোহার একটা স্টিক দিয়ে দাঁত বাজাতে আরম্ভ করলেন। দাঁত যদি জলতরঙ্গ হত, এতক্ষণে শুরু হয়ে যেত কনসার্ট। রসগ্রহণ করলেও দাঁত বড় নীরস।

বড়মামা হঠাৎ একসময় বাঘের মত আর্তনাদ করে উঠলেন, আঁউ।

'আ, হিয়ার ইজ দি কালপ্রিট। ব্যাটা, তুমি কোণে বসে কেরামতি দেখাচ্ছ। তোর একদিন কি আমার একদিন।'

ভারি ওজন তোলার আগে মানুষ যেভাবে জোর নিঃশ্বাস নেয়, ডঃ পাল বুক চিতিয়ে সেইভাবে নিঃশ্বাস নিলেন। বড়মামা করুণ মুখে আমাদের দিকে তাকালেন।

আমরা সমস্বরে বললুম, 'কোনও ভয় নেই!'

—তোমার ভয় করছে ডাক্তার! তা হলে দ্যাখো।

হাতে একটা যন্ত্র নিয়ে চেয়ারের লোকটির দিকে তেড়ে গেলেন। পেছন দিক থেকে তাঁর মাথাটা চেয়ার-এর উঁচু হেডরেস্টে ঠেসে ধরে, মুখে যন্ত্র পুরে ডালাখোলা বাকসের মত হাঁ করিয়ে দিলেন। পাশের ট্রে থেকে চকচকে সাঁড়াশির মত একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে দাঁত চেপে ধরলেন। কড়াক করে একটা শব্দ হল।

বড়মামা শিউরে উঠে চোখ বুজলেন। কড়মড় মড়ড় শব্দ হতে লাগল আর ডাক্তার রেগে রেগে বলতে লাগলেন, সব শেষ সময়ে এসে মরবে, আসবে একেবারে বারোটা বাজিয়ে।

প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মারলেন। লোকটির শরীর টান টান হয়ে গেল। সাঁড়াশির মুখে ধরা বর্শার ফলার মত দাঁতের অংশ আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন, 'শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

দাঁতটা ঠকাস করে একটা ডিশে ফেলে দিয়ে, মুখে ফ্যাঁসফোঁস করে খানিকটা ওষুধ স্প্রে করে দিয়ে চেয়ার থেকে লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি সামনে কুঁজো হয়ে, টলতে টলতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ডঃ পাল বললেন, 'কি বুঝলে ডাক্তার?'

বড়মামা চোখ ঢেকে বললেন—উঁ।

—এ সব আমাদের কাছে জল ভাত। দাঁত একটা জিনিস! ধরো আর ফেলো। নাউ, কাম হিয়ার।

বড়মামার চোখমুখ ছাইবর্ণ। আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। পরীক্ষা-টরিক্ষা করে ডাক্তার পাল বসলেন।

'দাঁড়াও, একটা ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে ব্যাথাটা আগে কমাই। দাঁতটার অবস্থা তেমন ভাল নয় হে। ভেতর ভেতর বেশ বিগড়ে বসে আছে।'

মাড়ির পাশে পাশে পুট্‌পুট্ করে কয়েকবার চুঁচ ফুঁড়লেন ডাক্তারবাবু। ইন্‌জেকশানেও বড়মামার ভয়। সিঁটিয়ে আছেন।

ইন্‌জেকশান শেষ হতেই বড়মামা বললেন, 'চলি তা হলে?'

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন ডাক্তার! একটু বসে যাও। সারারাত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দু'দশ মিনিট বসে যাওয়া ভাল। তুমি ওই ডেক চেয়ারে বোসো।

বড়মামা বসলেন। ডঃ পাল চেয়ারে টেনে আনলেন এক মহিলাকে। সেই এক ব্যাপার। দাঁত আর দাঁতের মালিককে ধমক ধামক চলল। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। মুখে যন্ত্র পোরা। ডাক্তারবাবু সাট্ করে এক টান মেরেই ইস্ ইস্ করে উঠলেন। তারপর ভদ্রমহিলার দাঁতের সারি থেকে এক হ্যাঁচকা টানে আর একটা দাঁত তুলে আনলেন।

মহিলা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ডাক্তারবাবু বললেন, 'বুঝলে ডাক্তার, অ্যানেসথেসিয়ার এই দোষ, যার তুলছি সেও বোঝে না কি তুলছি, যে তুলছে সেও বোঝে না কি তুলছে! ইস্, মহিলার একটা ভাল দাঁত টেনে তুলে দিয়েছি।'

বড়মামা বললেন, 'আমি এবার উঠি ডাক্তার।'

'উঠবে, উঠবে। জিভ দিয়ে দ্যাখো তো দাঁতের চারপাশটা বেশ অসাড় হয়েছে কি না!'

বড়মামা বললেন, 'জিভ নাড়াতে পারছি না, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে ভাল আর কি হবে?'

—তাই নাকি! কই দেখি, চেয়ারে একবার বোসো দেখি, একটু রুট ক্যানাল ট্রিটমেণ্ট করে দি। অসাড়ে ভাল হলে তো হবে না, সাড়ে ভাল হতে হবে তো।

বড়মামা চেয়ারে বসলেন।

মেজমামা আর মাসীমা দু'জনে ফিস্ ফিস্ করলেন। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। চোখে চোখে আঙ্গুলের ইশারায় কোন একটা পরিকল্পনা পাকা হতে চলেছে। এর মধ্যে একজন কিছুই জানে না, বাকি সবাই জানে। ঘরের বাতাস উৎকণ্ঠায় থম থম করছে। যে কোনও মুহূর্তে একটা খুন হবে। মানুষ নয়। খুন হবে একটা দাঁত। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, বড়মামা, পালান।

ডঃ পাল বললেন, 'দেখি হাঁ কর তো ডাক্তার!'

বড়মামা হাঁ করলেন।

আমার চোখ ডক্টর পালকে অনুসরণ করছে। তাঁর ডান হাতটা ধীরে ধীরে দাঁত তোলা সাঁড়াশির দিকে সরছে। অনর্গল কথা বলে চলেছেন, বড়মামাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে। ধীরে ধীরে সাঁড়াশিটা হাতে তুলে নিলেন। বড়মামাকে মাথার পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন হঠাৎ!

উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সাঁড়াশি উঠতে উঠতে বড়মামার ঘাড় পর্যন্ত উঠেছে।

আর পারলুম না। 'বড়মামা, সাবধান!' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম।

আমার চিৎকার, আর দাঁত তুলে দেবার আতঙ্কে, বড়মামা একেবারে জেমস বণ্ডের মত হয়ে গেলেন। চেয়ার চরকিপাক খেল। কি হচ্ছে বোঝার আগে বড়মামা বাঘের মত লাফিয়ে উঠে সুইংডোর ঠেলে একেবারে রাস্তায়।

বড়মামা ছুটছেন, দু'হাত পেছনে আমি ছুটছি। আমাদের পেছনে ধর ধর করে ছুটে আসছেন সাঁড়াশি হাতে ডেনটিস্ট, মেজমামা, কয়েকজন পেশেণ্ট। প্রাণভয়ের দৌড়ের সঙ্গে মিলখা সিংও পাল্লা দিতে পারবেন না।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে, হাইওয়ে পেরিয়ে আমরা শুকচরে ঢুকে পড়েছি। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ, হেডলাইটের আলো ভেসে এল। বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমার গাড়ি চেপে আমাকেই ধরতে আসছে। কুইক্, নেমে পড়ো ওই মাঠের ঝোপে।'

সাপের ভয় নেই, ব্যাঙের ভয় নেই। আমরা দুজনে ঝোপের মধ্যে। ওপরের রাস্তা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বড়মামার গাড়ি। বড়মামা, ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'তুই আমাকে বাঁচালি। মেজোকে বলিস, ভাগনেই একমাত্র আপনজন।'

বড়মামা, 'আপনার দাঁত?'

'দাঁত? দাঁত এখন মুখ ছেড়ে মাথায় উঠে গেছে রে!'

উৎপাতের ধন চিৎপাতে

জগন্নাথ গোস্বামীর গাড়িটা বড়মামা শেষে কিনেই ফেললেন। বড়মামার যাঁরা ভালো চান, তাঁরা সকলেই বারণ করেছিলেন, 'সুধাংশু কাজটা ভাল করলে না। জগন্নাথ ঘোড়েল লোক। বোকা পেয়ে তোমার মাথায় টুপি পরাতে চাইছে। গাড়িটা পেট্রলে চলে না। ইঞ্জিনের অশ্বশক্তিতে নড়তে দেখিনি। মনুষ্যশক্তিতেই এতকাল চলে এসেছে। কিনতে হয় নতুন গাড়ি কেনো। তোমার কি বাপ অত ঠেলাঠেলির লোক আছে! ধড়ধড়ে জিনিস। খোলটাই আছে। ভেতরে আত্মা নেই।'

জীবনে যে মানুষ কারুর কথাই শোনেননি, শুধু নিজের কথাই শোনাতে চেয়েছেন তিনি বুক ঠুকে গাড়িটা কিনেই ফেললেন।

গাড়ি সোজা চলে গেল কারখানায়। ছিল কালো, ফিরে এল গাঢ় বাদামী হয়ে। ফোম লেদারের ঝকঝকে গদি। বামপারে মরচে ধরেছিল, নিকেল পড়ে ঝকঝকে হয়েছে। হাতল-টাতল সব ঝিলিক মারছে। কার-রেডিও-স্টিরিও। আয়োজনে কোনও খুঁত নেই। পেছনের কাচে আধুনিক স্টিকার। ঘোড়া ছুটছে। বড়মামার ইচ্ছে গাড়ি চলবে কীর্তনের সুর ছড়াতে ছড়াতে।

'তুই একবার ভেবে দ্যাখ পিণ্টু, কারুর পাশ দিয়ে হুস করে গাড়ি বেরিয়ে গেল, কানে ঠোক্কর মারলো ইঞ্জিনের শব্দ নয়, প্রেমদাতা নিতাই। পৃথিবীতে প্রেমের বড় অভাব রে!'

মেজমামা বললেন, 'তোমার এই কীর্তনাঙ্গ গাড়ি চলবে না দাদা। আসল যে ইঞ্জিন সেইটাই তো নেই।'

'কি করে বুঝলি মেজো? তুই তো সারাজীবন ফিলজফি পড়িয়ে এলি। ঈশ্বর আছেন না নেই। আজ পর্যন্ত সে সমস্যার সমাধানও হল না। ইঞ্জিনের তুই কি বুঝিস!'

'সবাই বলছে!'

'আজও তুই প্রতিবেশীদের চিনলি না। প্রতিবেশী মানে প্রতিবাঁশি। বেসুরে বাজাই হল তাদের কাজ। বাগড়া ছাড়া তারা আর কী দিতে জানে? এই গাড়ি চেপে তুই কলেজ যাবি। কুসী স্কুলে যাবে। আমার কুকুর ডগ-হসপিটালে যাবে। ছুটির দিনে আমরা সবাই মিলে পিকনিকে যাবো। জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে। সায়েবদের মতো। লোকের কথায় নেচো না ব্রাদার। কানপাতলা লোক জীবনে সুখী হতে পারে না।'

মেজমামা বললেন, 'ভালো হলেই ভালো, তবে দশ হাজার টাকায় গাড়ি হয় না দাদা। ছ্যাকড়া গাড়ি হতে পারে।'

'আচ্ছা দেখাই যাক না কি হয়। নো রিস্ক, নো গেন। ইংরেজিটা ভোলোনি নিশ্চয়?'

বড়মামা একটা ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে গাড়ির পালিশকে আরও পালিশ করতে লাগলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি পাশে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে। আমার দায়িত্ব লাকির ওপর নজর রাখা। লাকির স্বভাব হল, আদরের জিনিসে সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে জিভ বের করে হ্যাহ্যা করা। মানুষের গায়ে আঁচড় লাগলে হরেক রকম ওষুধ আছে। গাড়ির পালিশে আঁচড় লাগলে একমাত্র ওষুধ আবার পালিশ চড়ানো।

নিকেলের হাতল ঘষতে ঘষতে বড়মামা লাকিকে অনবরত সাবধান করে চলেছেন 'লাকি খুব সাবধান, পা তুলবে না।'

আমার একটাই প্রশ্ন, আজ পর্যন্ত যার সঠিক উত্তর কারোর কাছেই পেলুম না, কুকুরের চারটেই পা, না সামনের দুটো হাত, পেছনের দুটো পা?

প্রশ্নটা বড়মামাকে আবার একবার করতুম, সুযোগ পেলুম না। বাঘাদা এসে গেলেন। বড়মামাকে গাড়ি চালানো শেখাবেন। সাংঘাতিক চেহারা। রয়াল বেঙ্গলের মত গোঁফজোড়া। প্রায় ফুট-ছয়েক লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। বাঘের মত গলা। টাইট প্যান্ট-জামা পরা। আমাকে একটা টুস্‌কি মারলে উলটে পড়ে যাব। লাকি যথারীতি হাত তিনেক পেছিয়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল। বাঘাদা বললেন, 'আপনার কুকুরটা আমাকে দেখলেই অমন করে কেন বলুন তো?'

বড়মামা বললেন, 'ওর তো দৈত্য দেখার তেমন অভ্যাস নেই। দু-একদিন দেখতে দেখতেই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

বাঘাদা বাঘের মত গলায় হেসে উঠলেন। লাকি আরও একপা পেছিয়ে গিয়ে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

মাসিমা দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা সাত-সকালেই কি আরম্ভ করলে? লোকে সকালে প্রভাতী গান শোনে, কীর্তন শোনে, এ বাড়ির যেন সবই অদ্ভুত। রাতে ছুঁচোর কীর্তন, সকালে কুকুরের কনসার্ট।'

বাঘাদা ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারছে না দিদি!'

'তোমাকে নয়,' তোমার ওই কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মত গোঁফ ও সহ্য করতে পারছে না। কাল আসার আগে কামিয়ে এসো।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। বাঘাদা করুণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা সুধাংশুদা, আমার ভেতরে কি একটা চোর আছে? শুনেছি কুকুর মানুষ চিনতে পারে!'

'তুমি কি আচার চুরি করে খাও?'

'ছেলেবেলায় খেতুম।'

'অ্যায়, ঠিক ধরে ফেলেছে। কুকুরের নাক বড় সাংঘাতিক। আমি যেদিন সিরাপ চুরি করে খাই, আমাকে খুব ধমকায়।'

'সিরাপ চুরি?'

'ওই যে গো, ডাক্তারখানায় সিরাপ থাকে না! মিকশ্চার তৈরি হয়। ওই জিনিসটার ওপর আমার অনেকদিনের লোভ। যেই দেখি কম্পাউণ্ডার চা কি সিগারেট খেতে গেছে অমনি বোতল খুলে খানিকটা মুখে ঢেলে দি।'

'সিরাপ তো আপনার নিজেরই জিনিস, নিজে খেলে চুরি হয় না কি?'

'ধুস, সিরাপ তো রুগীদের। মাঝে মাঝে কম্পাউণ্ডার ধরে ফেলে, কি হল, এই দেখে গেলুম আধ বোতল সিরাপ এরই মধ্যে সিকি বোতল হয়ে গেল! আমি ভয়ে চুপ করে থাকি। ফ্যাঁস ফোঁস করে খুব মন দিয়ে রুগীর ব্লাড-প্রেসার দেখতে থাকি। চুরি করে খাওয়ার যে কি আনন্দ কুকুর বুঝবে কি করে!'

বাঘাদা বললেন, 'চলুন এইবার বেরিয়ে পড়া যাক। এরপর রাস্তাঘাট আর ফাঁকা পাওয়া যাবে না।'

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ, বড়মামা পাশে। আমি পিছনে। লাকিও আসার জন্যে বায়না ধরেছিল। বেশ মোটা একটা মাংসের হাড়ের লোভ দেখিয়ে হরিয়ার কোলে তুলে দিয়ে আসা হয়েছে।

গাড়ি বি-টি রোডে বেরিয়ে এল। সবে রোদ উঠেছে। চারপাশ ঝকঝক করছে। দু-চারটে লরি হুসহাস করে আসছে যাচ্ছে। গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ-পাশে দাঁড় করিয়ে বাঘাদার সঙ্গে বড়মামার জায়গা বদল হল। বাঘাদা এক রাউণ্ড বক্তৃতা দিয়ে নিলেন ক্লাচ কাকে বলে, ব্রেক কোন পায়ে, গিয়ার কাকে বলে।

বড়মামা বললেন, 'হাত-পা কেন কাঁপছে বলো তো?'

'ভয়ে। ও ভয় এখুনি কেটে যাবে। ভয়ের কি আছে! একটা জিনিস শিখিয়ে দি, অসুবিধে দেখলেই থেমে পড়বেন। থামার আগে জানালা দিয়ে ডান হাতটা বের করে দেবেন।'

'তার মানে?'

'মানে বুঝবে পেছনের গাড়ি। মানে তোমরা পাশ দিয়ে এগিয়ে পড় আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনাকে রোডসাইনের যে বইটা দিয়েছি সেটা ভালো করে দেখেছেন? নো রাইট টার্ন, নো লেফট টার্ন, ক্রসিং অ্যা-হেড।'

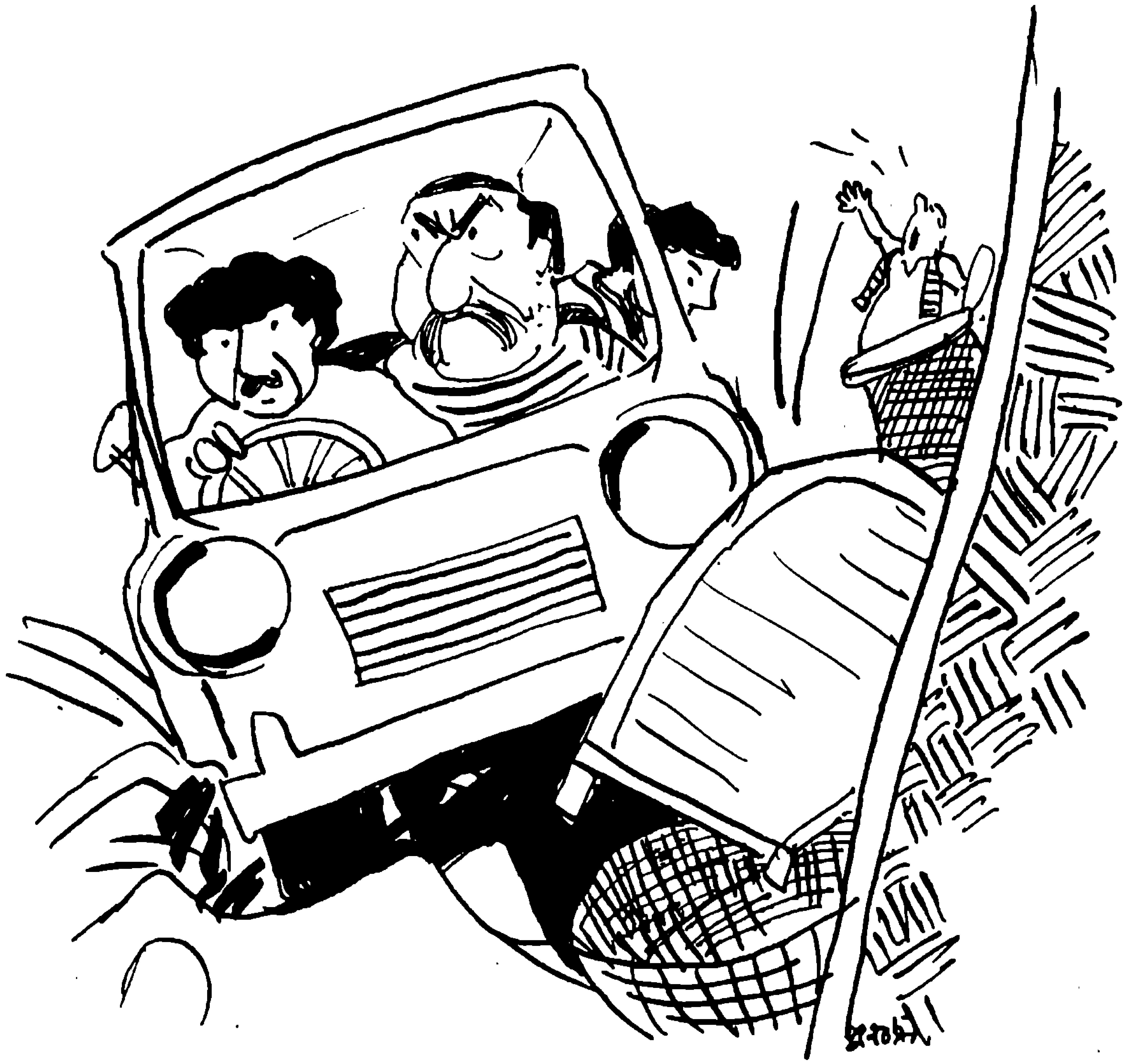

'ও আমি সব দেখে নেবো। এখন তো আর লাগছে না। এখন তো সোজা যাবো, সোজা ফিরে আসব।'

'না না, ওটা আপনি সবার আগে ভালো করে বুঝতে শিখুন। সোজা রাস্তায় সব সময় চলা যায় না। জীবন অত সোজা নয়। পদে পদে বাঁক, ক্রসিং, বাম্প।'

বড়মামা ক্লাচ ছাড়লেন, গাড়ি সাংঘাতিক রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উল্কার বেগে সামনে এগিয়ে আবার একটা ঝাঁকানি মেরে থেমে পড়ল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ঝড়ের বেগে একটা লরি দু-ইঞ্চি তফাত দিয়ে চলে গেল। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম।

বাঘাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি করলেন?'

'কি জানি কি করলুম, কোন্ পা কোথায় চলে গেল!'

'কোন পা কোথায় চলে গেল মানে? একটা পা ক্লাচে, একটা পা ব্রেকে, স্টিয়ারিং-এ গিয়ার। এই তো আপনার মোট তিনটে যন্ত্র। এটা ছাড়াবেন, প্রয়োজন হলে ওটা চাপবেন।'

'আমি ভুলে লেফট-রাইট করে ফেলেছিলুম। অনেক দিনের অভ্যাস তো।'

'এখুনি তো আমরা তিনজনই মারা পড়তুম।'

'তুমি তো আমার পাশে আছ।'

'পাশে আছি, কিন্তু পায়ে তো নেই।'

'নাও, নাও অনেক বকেছ। আর ভুল হবে না।'

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। একটু লগবগ করলেও বেশ চলছে। সোজা রাস্তা চলে গেছে ব্যারাকপুরের দিকে। টিটাগড়ের কাছে এসে গাড়ি হটাৎ গোঁত করে রাস্তার বাঁ পাশ থেকে ছুটে সোজা নেমে গেল পাশে। স্টিয়ারিং নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রের যুদ্ধ চলছে। ধামা, কুলো, ধুচুনি সাজানো ছিল, মড়মড় করে মাড়িয়ে দর্মার বেড়া ঠেলে গাড়ি সোজা ঢুকে পড়ল আটচালায়। চারদিকে গেলো গেলো শব্দ।

একটা উনুনের দু-হাত দূরে গাড়ি থেমে পড়ল। মনে হচ্ছে দরমার বাড়ি। যমদূতের মত গোটা চারেক লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে। নামলেও মারবে, না নামলেও মারবে। এত বিপদেও বাঘাদের সেই এক প্রশ্ন, 'এটা কি করলেন?'

মারমুখী লোক চারটির একজন বড়মামার রুগী। বড়মামা লোক বুঝে, অবস্থা বুঝে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। এ সেই রকম একজন রুগী। বড়মামাকে দেখেই চিনেছে, 'আরে ডাক্তারবাবু যে!'

বড়মামা হাসিমুখে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। যেন প্লেন থেকে পাইলট নেমে এল। বড়মামা বললেন 'রামু হিসেব কর কত টাকা গেল।'

রামু বললে, 'হিসেব পরে হবে। রামজী আপনাকে পাঠিয়েছেন। ওই দেখুন আমার বহু, বোখার হয়ে পড়ে আছে।'

হাত-পাঁচেক দূরে মাচার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। গাড়ি আর কিছু দূর এগোলেই অসুখ সেরে যেত!

রুগীর মুখ দেখেই বড়মামা বললেন, 'ম্যালেরিয়া। পিলে বেশ বড় হয়েছে রে। ডিসপেনসারিতে আয় ওষুধ দিয়ে দেবো। এক পুরিয়ার ব্যাপার।'

রুগী দেখতে দেখতে হিসেবও হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শ-তিনেক টাকা।

বাঘাদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'ছ-টা দরমা আর গোটাকতক ঝুড়ির দাম তিনশো টাকা। ভালোমানুষ পেয়ে টুপি পরাতে চাইছ? ধর্মে সইবে?'

'ধর্মটর্ম বলবেননি বাবু, দিন-কাল কি পড়েছে?'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই। তাতো বটেই!'

'তাতো বটেই?' বাঘাদা হুঙ্কার ছাড়লেন। 'ওই দরমা আর ঝুড়ি সব আমি নিয়ে যাবো।'

'আঃ, বাঘা নীচ হয়ো না।' বড়মামা শাসনের গলায় বললেন।

'রাখুন মশাই আপনার নীচ। মূল্য যখন ধরে দিতেই হবে, মাল আমাদের।'

'কি করবে?'

'পুড়িয়ে দেবো, জ্বালিয়ে দেবো।'

বাঘাদার গোঁ বাবা। দরমা আর ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে গাড়ি বাড়ি ফিরে এলো নটার সময়! এবার আর বড়মামা নয়, বাঘাদাই গাড়ি চালালেন। রাস্তার দুপাশ থেকে বড়মামার যাঁরা চেনা, তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ভালো সওদা হয়েছে ডাক্তারবাবু। তবে একটু দেখেশুনে আস্ত মাল কিনতে পারলে আরও ভালো হত!'

মাসিমা বাগানে খরগোসদের ঘাস খাওয়াচ্ছিলেন; দেখেই হই হই করে উঠলেন, 'এঁকি, একি? মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা তোলা গাড়ি না কি? এ সব কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে?'

বাঘাদা বললেন, 'তুলে আনিনি। কিনে এনেছি দিদি। তিনশো টাকা দাম।'

মেজমামা আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একমনে জগিং করছিলেন। তিনশো মনে হয় এখনও হয়নি। মাঝপথেই থেমে পড়লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মাথায় আবার কি ব্রেন্‌ওয়েভ খেলে গেল, ভাঙা কঞ্চি আর বাঁখারি দিয়ে কি বানাবে, গ্রীন হাউস?'

বড়মামা এতক্ষণে কথা বললেন, 'আরে না রে বাবা। এরা চাপা পড়েছিল। এসব হল ডেডবডি, ক্যাজুয়েলটিস।'

'অ্যাঁ বলো কি! এক চাপাতে অনেক নামিয়েছ তো, প্রায় লরির রেকর্ড।'

মাসিমা বললেন, 'উঃ মানুষ হলে কি করতে? তোমাকে নিয়ে আর পারি না বড়দা! তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার রাতের ঘুম গেছে। মেজদা তুমি বললে কিচ্ছু ভাবিসনি কুসী ও গাড়ি চলবে না। গাড়ি চলছে না শুধু চাপা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

বাঘাদা বললেন, 'চাপা নয়, ভাঙা দিদি। এটা একটা দরমার ছাউনির ভাঙা অংশ আমরা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলুম। আপনি কলও বলতে পারেন। ওঁরা মনে মনে ডাক্তারবাবুকে ডাকছিলেন। গাড়ি একেবারে রুগীর বিছানার পাশে গিয়ে থামল। ডাক্তারবাবু নেমেই রুগীর নাড়ী টিপে ধরলেন। ভালো ডাক্তার তো, শুধু ওষুধের ব্যবস্থা নয়, তিনশো টাকা দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থাও করে দিলেন।'

'ভিটে-মাটির যে-টুকু আছে সেটুকু এবার খেসারত দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাক। তারপর একদিন ভালো করে পাবলিকের হাতে আড়ং-ধোলাই হোক। তবে যদি তোমার চেতনা হয়!'

মেজমামা আবার জগিং-এর জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বললেন, 'তুমি চালিয়ে যাও বড়দা। এইভাবে রেকর্ড করতে করতে একদিন তুমি ট্রাক-ড্রাইভার হতে পারবে। এখন থেকে পাগড়ি বাঁধাটা অভ্যাস করে রাখো' খইনি ধরো, তোমার ব্রাইট ফিউচার।'

মেজমামা লাফাতে শুরু করলেন এক-দুই-তিন।

বাগানের একপাশে ধামা ধুচুনি দরমা ভাঙা পড়ে রইল। গাড়ি ব্যাক করে ঢুকে গেল গ্যারেজে। বাঘাদা হাসি হসি মুখে মাসিমাকে বললেন, 'দিদি অনেক বকেছেন, এবার বেশ বড় এক কাপ চা।'

॥ ২ ॥

দিন পনের হয়ে গেল, বড়মামা গাড়ি চালানো শিখছেন। মাসিমা আমাকে আর বড়মামার সঙ্গে যেতে দেন না। বিপদ হলে কে দেখবে! তাছাড়া সকালে লেখাপড়া করবে না বড়দের সঙ্গে হই হই করে বেড়াবে? বাঘাদা বলছেন বড়মামার হাত পা দুটোই নাকি বেশ ধাতে এসে গেছে।

আজ রবিবার। পড়ার ছুটি। বড়মামা বললেন, 'কুসী, বাঘা সার্টিফিকেট দিয়েছে। আজ আমি পিণ্টু আর লাকিকে নিয়ে বেরোই? ছেলেটা রোজ মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর লাকিটা একদিনও গাড়ি চাপেনি। কুকুর বলে কি মানুষ নয়!'

বাঘাদা বিশাল গলায় বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আজ ওরা চলুক। ঘরে থেকে থেকে সব ঘরকুনো হয়ে যচ্ছে। এ যুগ হল ফাইটিং-এর যুগ। কিন্তু...।'

কিন্তুতে এসে বাঘাদা কেমন যেন কিন্তু কিন্তু হয়ে গেলেন। বড়মামা বললেন 'থামলে কেন, শেষ করো, শেষ করো।'

'কিন্তু লাকি যদি পেছন থেকে ঘাড়ে ঘ্যাঁক করে দেয়!'

'আমার কুকুর সে কুকুর নয় বাঘা। ও মানুষ হলে নেতা হত, বুঝলে! ধমকায়, ভয় দেখায়, কদাচ কামড়ায় না। চলো বেরিয়ে পড়ি। হাত পা নিসপিস করছে।'

মাসিমা হ্যাঁ না বলার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। লাকি চনমন করছে। বেড়াতে যাবার নাম শুনলেই আনন্দে আটখানা! পেছনের ডান পাশের জানালায় লাকির জিভ বের করা মুখ। বাঁ পাশের জানালায় আমার মুখ। ফরফর করে গাড়ি চলছে! জানি না এই কদিনে বড়মামা কি কি করেছেন। তবে অনেকেই দেখলুম, গাড়ি দেখে হয় নর্দমা টপকে রকে, না হয় খুব দ্রুত পা চালিয়ে কোনও দোকানে ঢুকে পড়ছে।

বাঘাদা খালি বলছেন, 'অত শক্ত হচ্ছেন কেন? বেশ নরম হয়ে চালান, নরম হয়ে চালান।'

আজ আবার গান চলেছে, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

শুকচর চলে গেল, চলে গেল সোদপুর। টিটাগড়ের সেই ধামা-ধুচুনি-ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে গেল। লাকি মাঝে মাঝে নেচে উঠছে! বাতাসে ফুরফুর লোম উড়ছে। ফুটফুটে, খুশি খুশি মুখ, ঢুলুঢুলু চোখ। গান চলেছে 'এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।। কণ্ঠ যে রোধ করে...!'

বড়মামা অকারণে মাঝে মাঝে হর্ন বাজাচ্ছেন। বাঘাদা বলছেন, 'শুধু শুধু হর্ন দিচ্ছেন কেন? মিসিয়ুস অফ হর্ন।'

'যাঃ, ওটাও তো রপ্ত করতে হবে। শিখছি যখন সব ভালো করে শিখব। ফাঁকিবাজি আমার কোষ্ঠীতে নেই। সাফল্যের চাবিকাঠি কার হাতে? নিষ্ঠার হাতে।'

কথা শেষ করেই একবার হর্ন দিলেন। বাঁ পাশ দিয়ে ভুঁসকো চেহারার গোটা কতক

ঘোষ যাচ্ছিল ; একটা ভীতু ঘোষ চমকে লাফিয়ে উঠতেই, লাকি বিকট সুরে ঘেউ ঘেউ করে পেছনের আসন টপকে সামনের আসনে।

তারপর পরপর সব ঘটতে লাগল। গাড়ি কোণা মেরে রাস্তা ছেড়ে গড়িয়ে একটা মাঠে নেমে গেল। বাঘাদা বলছেন, 'ব্রেক ব্রেক।'

বড়মামা বলছে 'ব্রেক কোন্‌টা, ক্লাচ কোন্‌টা?'

লাকি বলছে 'ঘেউ ঘেউ।'

স্টিরিও বলছে, 'কণ্ঠ যে রোধ করে সুর তো নাহি সরে।'

ওদিকে হু হু করে এগিয়ে আসছে একটা জলা। কচুরিপানা ভাসছে। আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ইংরেজি সিনেমা দেখছি।

বাঘাদা কোনও রকমে পা বাড়িয়ে, হেলে কাত হয়ে কি একটা করলেন। পুকুরপাড়ে

এসে গাড়ি থেমে পড়ল। চান করা আর হোলো না।
বড়মামা হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কি রকম হোলো?'
বাঘাদা বললেন, 'দারুণ, তুলনাহীন! আর একটু হলেই ভরাডুবি হত।'
বড়মামা, নেমে পড়লেন, 'আঃ কি সুন্দর! সবুজ সবুজ, যেন সবুজের সাহারা। ঘাসের গন্ধ, জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ। মাথার ওপর নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে। ফড়িং দেখেছো ফড়িং?'
বাঘাদা বললেন, 'আপনি প্রাণ খুলে ফড়িং দেখুন। আমি ততক্ষণ বেল ঘর থেকে একটা ক্রেন নিয়ে আসি। টো করে গাড়িটাকে ওপরে তুলতে হবে।'
বড়মামা করুণ মুখে বললেন 'তুমি কখন ফিরবে?'
'তাতো বলতে পারছি না।'
বাঘাদা দূরে ক্রমশ ছোটো হতে হতে একটা পুতুলের মত হয়ে গেলেন। গাড়ির ভেতরে গান বাজছে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।'
বড়মামা হঠাৎ আনন্দে লাফাতে লাফাতে বললেন, 'উঃ! কোথায় নেমে এসেছি দ্যাখ। একবার তাকিয়ে দ্যাখ। রাস্তাটা মনে হচ্ছে পাঁচতলা উঁচুতে।'
ছিপ হাতে দুজন এদিকেই আসছেন। বড়মামা বললেন, 'সেরেছে, চেনা হলেই বিপদ।'
চেনা হবে না মানে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বড়মামার রুগী ছড়িয়ে আছে।
'আরে ডাক্তারবাবু যে!' দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'গাড়ি চান করাচ্ছেন?'
'না হে না, এসেছিলুম মাছ ধরতেই, তোমাদের চিন্তায় আজকাল সব ভুলে যাই। এখন দেখছি ছিপ আনতেই ভুলে গেছি।'
'আর তার জন্যে মাছ ধরা আটকাবে? আমরা কি করতে আছি! একস্ট্রা ছিপ আছে। চলুন বসে যাই। আপনার খুব সাহস ডাক্তারবাবু, গাড়ি নিয়ে নামলেন কি করে?'
বড়মামা বীরের মত হাসলেন, হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে পুকুর ধারে চলে গেলেন। হয়ে গেল আজ। বড়মামার সাংঘাতিক মাছ ধরার নেশা। একবার বসে পড়লে সহজে আর উঠছেন না।
'লাকি, আজ আমাদের উপোস।'
লাকি উত্তরে আমার গাল চেটে দিল। কখন যে বাঘাদা আসবেন ক্রেন নিয়ে, ঈশ্বরই জানেন। মাসিমার কথা শুনলে এই দুর্ভোগ আর হত না। এতক্ষণ ছাদে উঠে চাঁদিয়াল ঘুড়িটা ওড়াতুম ফড়ফড় করে। বড়মামা ওদিকে চার করে ছিপ নিয়ে বসে পড়েছেন। চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। আকাশ একেবারে ঘন নীল! হাত নেড়ে রঙ-বেরঙের ঘুড়িকে— আয়, আয়, উঠে আয় আমার বুকে। পকেটে একটা চকোলেট আছে। মুখে ফেলতে পারছি না লাকির জন্যে। ও বেচারা কি খাবে?
মনে মনে বাঘাদাকে ডাকতে লাগলুম। বাঘাদা এসো, বাঘাদা এসো। ডাকের কোনও জোর নেই। ঘণ্টা ছয়েক পরে বাঘাদা এলেন পান চিবোতে চিবোতে। সঙ্গে ক্রেন নয়,

ভীম ভবানীর মত চারটে লোক, মোটা একটা কাছি। আমার কাছে এসে বললেন, 'ফাসক্লাস'

'কি ফাসক্লাস?'

'তরুণের দোকানের ফিসফ্রাই। এক একটা প্রায় আধ হাত চওড়া। স্যালাড আর রাই দিয়ে খেতে যা লাগল না, টেরিফিক। অনেক ঝামেলা তো, তাই গায়ে একটু জোর করে নিলুম। পেটে খেলে পিঠে সয়। সুধাংশুদা গেলেন কোথায়?'

'ওই তো মাছ ধরতে বসে গেছেন।'

'অ্যাঁ, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। যাক আমার কাজ আমি করে যাই।'

পেছনের বাম্পারে দড়ি বাঁধা শুরু হল। সে এক এলাহি ব্যাপার। লাকি তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। এক দৈত্যতেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সামনে পাঁচ-পাঁচটা দৈত্য।

একজন দৈত্য বললে, 'ইতনা চিল্লাতা কেঁউ।'

লাকি উত্তর দিল, 'ঘেউ ঘেউ।'

বেলা বারোটার সময় আমরা তিনজন বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা পুকুর ধারেই রয়ে গেলেন। কার ক্ষমতা ওঠায়। মাসিমার ভয় দেখালুম, তাতেও কোনও ফল হল না। হাত নেড়ে বললেন, 'তোমার মাসিমাকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি, এ লস্ট চাইল্ড!'

মাসিমা শুনে বললেন, 'দাঁড়া, আমি ওই গাড়ি টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দোবো। বড়কত্তার বড় বাড় বেড়েছে!'

মেজমামা বললেন, 'কি করে খুলবি?'

'হাতুড়ি মেরে তাল তুবড়ে দোবো। এতবড় সাহস বলে কিনা তোমার মাসিকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি। হারাচ্ছি দাঁড়াও, আমাকে চেনে না?'

তিন সেন্টিমিটার একটা মাছ হাতে সন্ধ্যের মুখে বড়মামা বাড়ি ঢুকলেন। সারাদিনের রোদে আর মাসিমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুসী কোথায়?'

'বাথরুমে চান করছেন।'

'মেজাজ?'

'ফায়ার। বলেছেন, নিলডাউন করিয়ে রাখবেন আপনাকে, আর গাড়িটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে দেবেন জলে।'

'এসে কি বলেছিস?'

'যা বলেছিলেন।'

'ইস্ এখন কি হবে? কে আমাকে বাঁচাবে? মশারি ফেলে শুয়ে পড়ি। খোঁজ করলে বলবি, হাই ফিভার। তোর কাছে রসুন আছে?'

'রসুন কি করবেন?'

'সেই যে ছেলেবেলায় যেমন করতুম। চেপে শুয়ে থাকব। দেখতে দেখতে জ্বল এসে যাবে।'

বাঘাদা বটতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাঃ, আপনার হাত মোটামুটি ভালই তৈরি হয়েছে। এখন দরকার সাহস।'

বড়মামা হাসলেন, 'সাহস? পৃথিবীতে কুসীকে ছাড়া আমি কাউকে ভয় পাই না বাঘা।'

গাড়ির পেছনে একটা এল অক্ষর লেগে গেছে, বড়মামা লাইসেন্স পেয়ে গেছেন।

'আপনাকে ব্যাকগিয়ারটা আর একটু ভাল করে সাধতে হবে।'

'এখন থেকে দিনকতক তাহলে অনবরত পেছন দিকেই চালাই।

'না, তার দরকার নেই। সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। গ্যারেজ থেকে বার করতে গ্যারেজে ঢোকাতে ঢোকাতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আজ গাড়িটা আপনি একা বের করুন। দেখি কেমন পারেন।'

গ্যারেজের উল্টো দিকে নিত্যবাবুর বাড়ি। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। বাঘাদা একবারেই গোঁত করে বের করে ফেলেন। বড়মামা স্টার্ট দিলেন। স্টিয়ারিংকে নমস্কার করলেন। বাঘাদা সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ভঙ্গি করে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বাঘাদা যেভাবে বের করেন, বড়মামা সেইভাবে ওস্তাদী কায়দায় সাঁৎ করে ঘুরে বেরবার চেষ্টা করলেন। হলো না। বাঘাদা লাফিয়ে সরে গেলেন। গাড়ি ত্যারাচে হয়ে নিত্যবাবুদের দেয়ালে ধাক্কা মারার আগেই বড়মামা ব্রেক কষলেন। গাড়ি টুক্ করে দেয়ালে ঠোক্কর মারল।

সাহসী বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করলেন। এবার গাড়ির পেছন দিকটা গ্যারেজের দেয়ালে লেগে গেল। তারপর সামনে পেছনে পরপর এমন সব কায়দা করলেন, দুবাড়ির দেয়ালের মাঝে গাড়ি কোণাকুণি আটকে গেল। এগোতেও পারে না, পেছতেও পারে না।

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ বসে নানাভাবে চেষ্টা করলেন। ঘেমে নেয়ে গেছেন। 'অসম্ভব। কি করে এমন করলেন?' বড়মামা হেসে বললেন, 'সে এক রকমের কায়দা।'

'কায়দা? সারাজীবন গাড়ি এই কায়দাতেই পড়ে থাক।'

'অ্যাঁ, সে কি?

হ্যাঁ, সে কি!'

'কেন তুমি একে ম্যানেজ করতে পারবে না? তোমার তো পাকা হাত।'

'স্বয়ং ঈশ্বর এলেও পারবেন না।'

বাঘাদা গাড়ি থেকে নেমে এলেন। বড়মামা চিন্তিত।

'বাঘা, কী হবে তাহলে? ওই নিত্যবাবুর বাড়িটাকে ঠেলে একটু পেছিয়ে দিতে পারলে বেশ হত।'

'গাড়ি ঠ্যালা যায় সুধাংশুদা, বাড়ি ঠ্যালা যায় না।'

গাড়ির এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে দুজনের নানা রকম গবেষণা চলেছে। বড়মামা মাঝে মাঝে হতাশ মুখে নিত্যবাবুর নতুন তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন, পারলে ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে উড়িয়ে দিতেন। এদিকে সারি সারি সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে দু পাশে! মানুষের লাইন পড়ে গেছে। কারুর হাতে বাজারের ব্যাগ, কারুর মাথায় ঝাঁকা, কারু কাঁধে ফুলঝাড়ু। পিঠে কাগজের বস্তা। একটি দুঃসাহসী ছেলে গাড়ির চাল টপকে চলে গেল। বড়মামা হাঁ হাঁ, করে উঠলেন।

সোনপাপড়িঅলা হাঁকছে, 'চাই সনপাপড়ি!'

কাগজওয়ালা হাঁকছে, 'পুরানো কাগজ।'

ফুলঝাড়ু হাঁকছে, 'চাই ঝাড়ু।'

এরই মধ্যে একটি সাইকেল রিকশায় মাইক নিয়ে বসে কবিরাজী দাঁতের মাজন। তিনিও চুপ করে বসে নেই, 'দাঁত কন কন, গরম খেতে পারেন না, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, এই কবিরাজী কালো দাঁতের মাজনটা...।'

রিকশা, সব কটা হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করছে!

'কি হোলো দাদা!'

বাঘাদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'এ তো দেখছি ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম! গ্যারেজটা ভাঙা ছাড়া উপায় নেই।'

'তাহলে যে দোতলাটাও নেমে আসবে বাঘা?'

'উপায় কি? কতক্ষণ এদের আটকে রাখবেন?'

হই হট্টগোলে মাসিমা আর মেজমামা এসে গেছেন।

মাসিমা বললেন, 'যা চেয়েছিলুম তাই হয়েছে। বাঘাদা এই আপদটাকে খণ্ড খণ্ড করে লণ্ডভণ্ড করে দাও!'

বড়মামা আর্তনাদ করে উঠলে, 'না, কুসী, না!'

'না মানে? এছাড়া আর কি উপায় আছে? বাড়ি তুমি ভাঙতে পারবে না। তোমার এই ভাঙা গাড়ি কিন্তু ভাঙা যায়। উৎপাতের ধন চিৎপাতেই যাক।'

বড়মামার সেই গাড়ি আজও আছে। সবটাই আছে। গ্যারেজেই আছে। জুড়ে নিলেই হয়। চারটে চাকা চার দেয়ালে চলতে চায়, পারে না, কারণ ইঞ্জিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একপাশে। গাড়ির খাঁচায় আমাদের পুষি ছটা বাচ্চা নিয়ে চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। সামনের আর পেছনের গদি বড়মামার ঘরে। লাকি চাখাচাখি করছে। ফোম লেদার তেমন সুবিধে করতে পারছে না। ব্যাটারিটা খুব সার্ভিস দিচ্ছে। আলো চলে গেলে দুটো ফ্লোরেসেণ্ট বাতি জ্বলে।

সবই আছে। নেই কেবল বড়মামার উৎসাহ। তিনি এখন রিসার্চ করছেন অন্য বিষয় নিয়ে। গোটা তিরিশ বাঁদর এনে বারান্দায় রেখেছেন, সার সার খাঁচায়। যুগান্তকারী একটা কিছু করবেন। নোবেল পুরস্কার নাকি আর বেশি দূরে নেই।

অবতার

সাদা শর্ট, সাদা টি-সার্ট, সাদা মোজা, সাদা কেডস পরে বড়মামা দোতলা থেকে একতলায় নেমে এলেন। এই কিছুটা আগে ভোর হয়েছে। বাড়ির সব জায়গা থেকে অন্ধকার এখনো সরেনি। পরপর তিনটে খাঁচা ঝুলছে। কালো কাপড় ঢাকা। পাখিদের ঘুম এখনো ভাঙেনি। মেজমামা শিলে একটা নিমদাঁতন ফেলে নোড়া দিয়ে একটা মাথা থেঁতো করছেন। ভেতরে গেলেই দাঁত মাজা শুরু হবে। ব্রাশ ব্যবহার করেন না। দাঁতন দাঁতের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় উপকারী। খরচও কম। মেজমামা ক্রমশই কৃপণ হচ্ছেন। বুঝতে পারেন না। আমরা পারি। এখন সদাই বলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই কিছু সঞ্চয় প্রয়োজন। গ্রীষ্মের পরেই আসে বর্ষা।'

বড়মামা নাম রেখেছেন, 'স্মল সেভিংস।'

মেজমামা বড়মামার পায়ের শব্দে তাকালেন, 'বাবা! এ আবার কী! মর্নিং স্কুলে ভর্তি হলে বুঝি! কেজি ওয়ান!'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এই নতুন কাজের লোকটা কোথা থেকে এল রে! সকালেই বাটনা বাটতে বসে গেছে। শিল-নোড়া ভেঙে না ফেলে। যে ভাবে ঠুকছে! কত্তা আগে কোথাও কাজ করছে? না এই বাড়িতেই প্রথম হাত পাকাচ্ছ।'

মেজমামার গায়ে লেগেছে। ফোঁস করে উঠলেন, 'দেখ বড়দা, তোমাকে আমি অপমান করিনি, তুমি কিন্তু আমাকে ইনসাল্ট করলে!'

'কাজের লোক বললে ইনসাল্ট করা হয়! কোন মানুষকে প্রশংসা করার সময় আমরা বলি না! লোকটা ভীষণ কাজের লোক!'

'তুমি সে ভাবে বলোনি! সে কাজের লোক আর এই কাজের লোক সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি আমাকে চাকর বলেছ।'

'তুমি আমাকে শিশু বলেছ।'

'সরল শিশু, শিশুর মতো সরল এটা একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রশংসা। আমরা বলি লোকটা শিশুর মতো সরল। কত বড় গুণ!'

'তুমি শিশু মিন করোনি ভাই, তুমি বলতে চেয়েছ, বুড়ো খোকা! তোমার এই সূক্ষ্ম খোঁচাটা না বোঝার মতো মোটা বুদ্ধি আমার নয়।'

'বেশ করেছি, যাও।'

'আমিও বেশ করেছি যা।'

'বেশ' করব বললেই করা যায় না।'

'তুমি বেশ করতে পারো, আর আমি বেশ করতে পারি না?'

'আমি কী বেশ করেছি?'

'কেউই যদি কিছু করিনি তাহলে এত কথা আসছে কোথা থেকে?'

মাসিমা এসে গেছেন, 'বাপরে বাপ, সাত সকালে এ কী আরম্ভ হল? দিন দিন বয়েস সব কমছে, না বাড়ছে? বলি, সব কচি খোকা হচ্ছ! কী নিয়ে হচ্ছে শুনি! দুটো হুলোর কী নিয়ে এই তর্জন গর্জন! আমার শিলে আবার তুমি নিম দাঁতন থেঁতো করছ! আবার বাসী কাপড়ে শিল ছুঁয়েচো?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটলেন, 'জাত-জন্ম, শুদ্ধাচার আর কিছুই রইল না।'

মাসিমা বললেন, 'থামো, তুমিই বা ওটা কী করছ?'

'কেন? আমি আবার কী করলুম! আমি তো জগিং করতে যাচ্ছি?'

'সে তুমি যাও, জুতো পরে তুলসীমঞ্চে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কোন্ আক্কেলে?'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে জুড়লেন, 'এই অনাচারের জন্যেই এ-বাড়িতে তুলসী গাছ আর বাঁচতে চাইছে না। জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।'

মাসিমা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তোমরা দুটোতেই আমার চোখের সামনে থেকে সরে পড়ো। তোমাদের দেখলেই আজকাল আমার হাড় পিত্তি জ্বালা করে। চামড়ার চটি পায়ে শিল ধরেছ তুমি? চটিতে নোড়াতে এক হয়ে আছে? কি সর্বনাশ।'

মেজমামা নোড়াটা পায়ের কাছে রেখেছিলেন অতটা খেয়াল করেননি। অপরাধীর সাফাই গাওয়ার গলায় বললেন, 'কুসী এটা চামড়ার চটি নয়, স্যাণ্ডাক।'

বড়মামা তুলসীমঞ্চের কাছ থেকে সরে এসেছেন অনেকটা। বড়মামা বললেন, 'আফটার অল চটি ইজ এ চটি। সে চামড়ারই হোক আর ভেলভেট-এরই হোক, জাতিতে চটি।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি ক্রমশ সরতে সরতে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? দেখেছ, পায়ের কাছে কী আছ?' বড়মামা তাকালেন, 'কী বলতো! কালো মতো কী যেন একটা রয়েছে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছে! ঠাকুরের বাসন মাজার তেঁতুল। একজন শিলের ওপর উঠে বসে আছেন, এইবার তুমি বাইশ-শো-বাইশ জুতো দিয়ে তেতুলটার পিণ্ডি চটকে দাও। তোমরা দয়া করে বিদেয় হও না।'

বড়মামা মনে হয় একটু বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। উঠোন থেকে জগিং করতে করতে বাগান, বাগান থেকে রাস্তায়। প্ল্যানটা মনে হয় এই রকমই ছিল। জগিং শুরু করলেন, ধিনিক ধিনিক। মট করে শব্দ। একেবারে ছাতু। পায়ের চাপে ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে গেল প্ল্যাস্টিকের চামচে।

মেজমামা বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেল। মুকুজ্যে ফ্যামিলির স্থাবর অস্থাবর আর কিছু রইল না।'

বড়মামা আমাকে ইশারা করলেন, 'পালিয়ে আয়।' ধীর লয়ে ছুটতে ছুটতে বাগানে। বাগানে গোলাপ ফুটেছে। গাছের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল দেখতে দেখতে স্পট-জগিং। জগিং-এর একটা নেশা আছে, আমিও ধিতিং ধিতিং করছি। সেখান থেকে নাচতে নাচতে রাস্তায়। পথ বাঁদিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে গেছে গঙ্গার দিকে। আমেরিকায় সবাই জগিং করে, মাইলের পর মাইল্। আমেরিকার প্রেসিডেণ্টও জগিং করেন। ওসব দেশের নিয়ম খুব কড়া। খাটো খাও। বেলা আটটা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি। ঘুম যে আর ছাড়েই না।

থ্যাসথ্যাসে শরীর। দেশের দরজা খুলে দূর করে দেবে—গেট আউট। লেজি লোকের নো প্লেস হিয়ার। বাঘের মতো শরীর চাই, সিংহের মতো সাহস, গণ্ডারের মতো গোঁ। হেলথ ইজ ওয়েলথ। বয়েস যত বাড়বে ব্যায়াম তত বাড়াতে হবে, তা না হলে খিলে জং ধরে যাবে। মাথা বোদা মেরে যাবে। শরীরে মোষের চর্বি জমবে। সামান্য পরিশ্রমেই দরদর করে ঘামবে। একতলা থেকে দোতলায় উঠতে হাপরের মতো হাঁপাবে। রোজ রাতে বড়মামা আমাকে এক নাগাড়ে এইসব উপদেশ দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েন। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ নাসিকা গর্জন। বোধহয় স্বপ্ন দেখেন। কোন কোন দিন ঘুমোতে ঘুমোতেই বলে ওঠেন, তন্দুর, তন্দুর।

বড়মামা তন্দুরি রুটি আর মটন চাঁপ খেতে খুব ভালবাসেন। হাজির দোকান থেকে কিনে আনেন বড়মামার কম্পাউণ্ডার অক্ষয়বাবু। হার্টের দিকে কিছু একটা ঝামেলা হওয়ায় এখন সেটা বন্ধ আছে। সেই কারণে খাওয়াটা মনে হয় স্বপ্নেই হয়। বড়মামার আর একটা প্রিয় খাদ্য চৌসা আম। একসঙ্গে দশ-বারোটা এক সিটিং-এ। পাতের পাশে আঁটির পাহাড়। বিহারের বালক নরেশ বড়মামার প্রিয় সেবক। সে-ই মাল সাপ্লাই দেয়। মাসিমার এইসব অসহ্য। রাক্ষুসে খাওয়া দেখলে মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগে।

বালতিতে আম ভিজছে। বড়মামা হাঁকছেন, 'নরশুয়া, লাগাও ঔর একঠো।' মেজমামার পরিপাকশক্তি দুর্বল। ভাস্কর লবণ মুখে ফেলতে ফেলতে আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। স্মরণ করিয়ে দেন, 'বেশি যদি খেতে চাও, তাহলে কম খাও।'

বড়মামা খপং খপং করে ছুটছেন, পেছনে আমি। আমার আবার আস্তে ছোটা আসে না। মাঝে মাঝে তরতরিয়ে এগিয়ে যাই। খেয়াল থাকে না। বড়মামা হিস্ হিস্ করেন। তখন দাঁড়িয়ে পড়ে স্পট জগিং। বড়মামা এগিয়ে আসেন। আবার সেই ফর্মেসান, বড়মামা আগে, আমি পিছে।

আড়াল থেকে আওয়াজ—'দেখ, দেখ আগে নাচছে কুমড়ো, পেছনে চালকুমড়ো। আগে যায় হাতি, পিছে যায় নাতি।'

বড়মামা ওই সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কান দিতেন না। কোনো ভালো কাজ, মহৎ কাজ করতে গেলে লোকে টিটকিরি দেবেই। সব কথায় কান দিতে নেই। নিজের কাজ করে যাও। এখন আর কিছু বলে না। তবে আমার খুব লজ্জা করে। আমার কী, আমি তো দৌড়তেই পারি। ছোট ছেলে। বডমামা বিশাল এক মানুষ, তাঁর কী দৌড়ানো সাজে! পাছে বড়মামা একা হয়ে যান, তাই সঙ্গে আসা।

ঋষি বঙ্কিম রোড দিয়ে আমরা চলেছি। একটা বাড়ির দোতলার বারান্দায় এক ভদ্রলোক দঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বডমামাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে ডাক্তারবাবু। একটু দাঁড়ান প্লিজ। ডাক্তারবাবু একটু দাঁড়ান প্লিজ।'

বড়মামার তো থামার উপায় নেই। লাফাতে লাফাতে ধীরগতিতে সামনে এগোতে এগোতে বলতে লাগলেন, 'অসুখ বিসুখ সব পারে, দশটার সময় চেম্বারে।'

'জ্বরটা কিছুতেই যাচ্ছে না যে। রোজ ঠিক মাঝরাতে আসছে।'

'মেরে তাড়াতে হবে। আর ওষুধ নয়, এইবার চৌকিদার।'

'এটা একটা কথা হল ডাক্তারবাবু। বুঝিবে সে কিসে...'

আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, ভদ্রলোক মুখ ঝুলিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু গলায় শেষ করলেন।

'কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'

বড়মামা অমাকে বললেন, 'এত কিছুর সেন্টিনারি হয়, এই কথাটার সেন্টিনারি হওয়া উচিত।'

হঠাৎ একটি ছেলে আমাদের পাশে পাশে ছুটতে শুরু করেছে। ছোটা তো নয় জগিং। দুলকি চালে ঝুপুং ঝুপুং করে লাফাতে লাফাতে সামনে এগোনো। ছেলেটির বয়েস কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।

ছেলেটি বলছে, 'প্রায় একমাস হল ডাক্তারবাবু, ওষুধ খাচ্ছি অম্বল একটুও কমল না।'

'ভুগছ কত দিন?'

'বছর তিনেক।'

'তিন বছরের ব্যায়রাম এক মাসেই সেরে যাবে?'

'যা খাই, খাওয়ামাত্রই পেটটা ফুলে ওঠে। আর ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর!'

'একই ব্যাপার! আমারও তাই। পরশু ধোঁকা খেয়েছিলুম, আজও বসে আছে পেটে ঘাপটি মেরে।'

'লিভারের কাছে টেরিফিক পেন।'

'টেণ্ডার লিভার। সাইজে আনতে হবে।'

'মাথা! সব সময় মাথা ধরে আছে।'

'পেটটাকে ক্লিয়ার করতে হবে।'

'গাঁটে গাঁটে ব্যথা।'

'ইউরিক অ্যাসিড জমেছে।'

'পাগল হয়ে যাব ডাক্তারবাবু।'

'হতে পারলে ভালো। একমাত্র দাওয়াই। পাগলদের কোনো রোগ থাকে না।'

ছেলেটা আমাদের সঙ্গে অনেকটা চলে এসেছে। আমরা কেদার ব্যানার্জি রোডে পড়ে গেছি। সামনেই মোহনদার চায়ের দোকান। মোহনদা চামচে ফেলে বেরিয়ে এলেন। লাফাতে লাফাতে আসছেন।

'ডাক্তারবাবু! ধরে ফেলেছি। চেম্বারে যা ভিড়। সোনোগ্রাফি করিয়েছি।'

'বেশ করেছ। কিছুই পাওয়া যাবে না।

'ঠিক বলেছেন।'

'ওটা গলব্লাডার নয়, কোলাইটিস।'

'উপায়!'

'দু'মাইল।'

'মানে?'

'মানে রোজ সকালে আমার সঙ্গে এই ভাবে দু' মাইল ধপরধাঁই।'

দেখতে দেখতে আমাদের দল বড় হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর চলমান চেম্বার। একটু দৌড়তে পারলেই ফ্রি-অ্যাডভাইস। পেট, মাথা, বুক, গাঁট এই চার সমস্যার নাম মানুষ। ভোলাদার

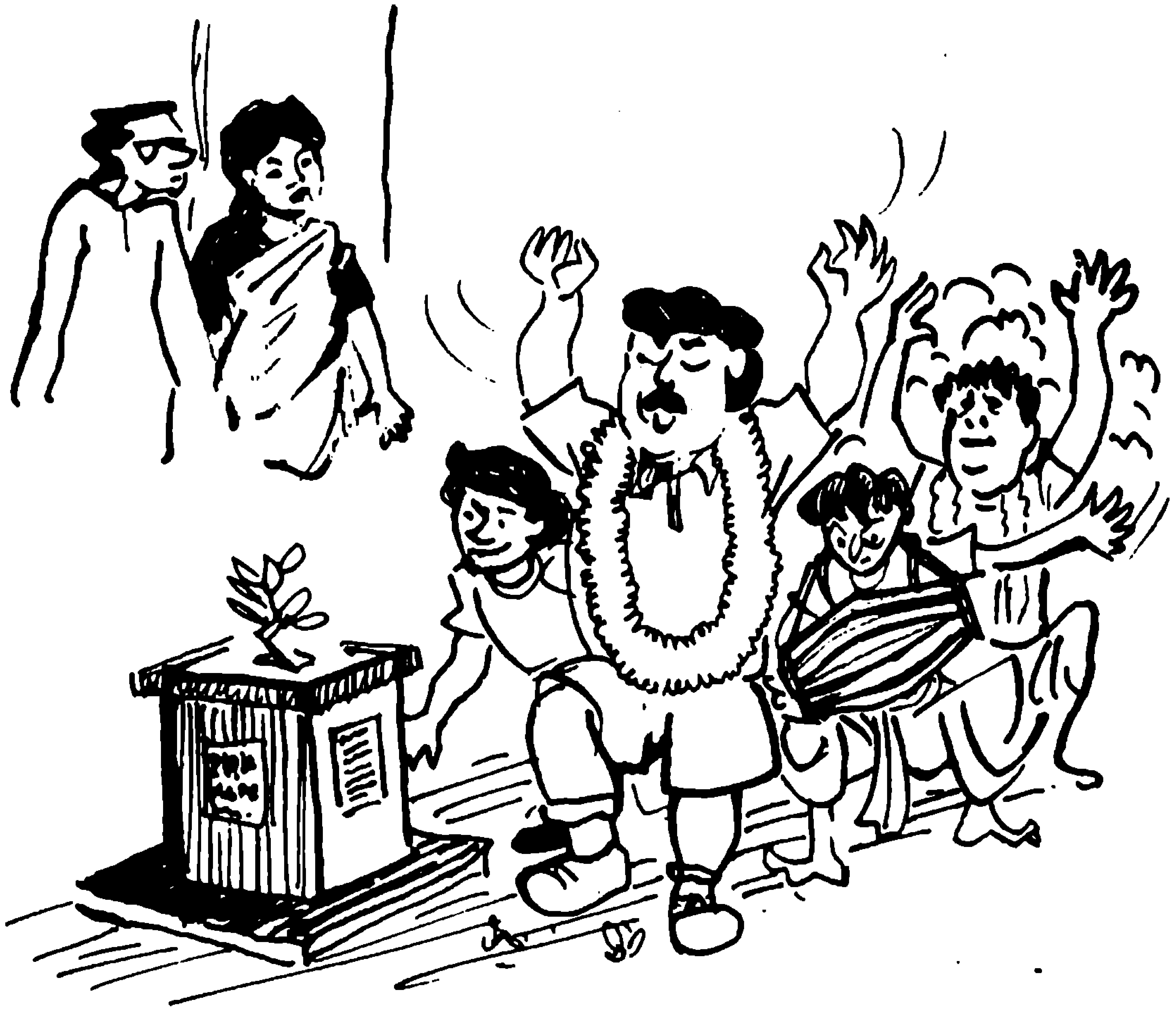

মিষ্টির দোকান। তিনিও বিশাল শরীর নিয়ে তাল রাখার চেষ্টা করছেন। সমস্যা একটাই, কিছুই তেমন খান না, কিন্তু ক্রমশই ওজন বাড়ছে। যৌবনের সেই ঝরঝরে চেহারা দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। পঁয়ত্রিশে শরীরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে চল্লিশে তো গুজরাটি হাতি। প্রেসক্রিপশন একটাই—দু'মাইল।

বীরেন শাসমল রোডে পড়া গেল। বড়মামার ভীষণ সুনাম তল্লাটে। ভাল মানুষ, ভাল ডাক্তার।

হঠাৎ দেখা গেল উল্টো দিক থেকে হরিনাম সংকীর্তনের দল আসছে। এই রাস্তার ওপরেই পাঠবাড়ি। মহাভক্ত বৈষ্ণব সাধকের সিদ্ধ সাধনক্ষেত্র। আজ মনে হয় কোনো অনুষ্ঠান। সংকীর্তন বেরিয়েছে। নাচতে নাচতে আসছেন সবাই—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, রাম রাম হরে হরে।

রাস্তা জুড়ে আসছেন সবাই স্রোতের মতো। আমাদের জগিং-পার্টি তো ভেদ করে যেতে পারবে না। নামের এমন গুণ, বড়মামার ভাব এসে গেছে। শর্টস, কেড্‌স, টি-শার্ট—দু'হাত তুলে নাচছেন তিনি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। উদ্দাম নৃত্য। দলের পরিচালক যেন বড়মামাই। ভক্ত গলায় দুলিয়ে দিয়েছেন সাদা ফুলের গোড়ের মালা। খোল বাজছে জোড়ায় জোড়ায় উচ্চ রোলে।

বড়মামার পেছন পেছন দল নাচতে নাচতে এসে গেল আমার মামারবাড়ির বিশাল উঠোনে। আনন্দনৃত্য, মহানৃত্য, হুঙ্কার, মহাভাবে মূর্ছা। মাসিমা, মেজমামা, নরশুয়া, কাজের লোকজন সকলেরই চক্ষু ছানাবড়া। প্রতিবেশীরা দলে দলে ছুটে আসছেন।

কেন্দ্রে হাফ প্যাণ্ট পরা বড়মামা ভাবে টলছেন। ভাবে মত্ত সংকীর্তনের দল। এক একজন তিন-চার হাত লাফিয়ে উঠছেন। বড়মামা ভাব সম্বরণ করে বললেন,—'কুসি তোর তুলসীমঞ্চ অপবিত্র করেছিলুম, এইবার দেখ, আজ কত হরি মহাপ্রভু পাঠিয়েছেন। শুচি, অশুচি, সব মনে রে ভাই। বলো, প্রেমদাতা?' বড়মামার তুড়ি লাফ। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের নৃত্য। গলার মালা দুলে দুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে।

বড়মামা হুঙ্কার দিলেন—'কুসি, ভক্তদের জন্যে ভোগের ব্যবস্থা করো। মহাভোগ।' চার জোড়া খোল, ছ'জোড়া করতাল, সঙ্গে সংকীর্তন, তেমনি নৃত্য। প্রায় পঞ্চাশজন। সারা উঠোনে কলরোল, মত্ত মাতামাতি, বাতাসার হরির লুঠ। মেজমামা ভয়ে একেবারে তিনতলায়। মাসিমা হতভম্ব।

বেশি রাতে সব মিটে যাওয়ার পর মাসিমা ক্লান্ত শরীরে বৈঠকখানার চেয়ারে কিছুক্ষণ এলিয়ে থেকে বললেন, 'বড়দা, তোমাকে আমরা এতদিন চিনতে পারিনি। তুমি হলে অবতার। আজ একেবারে ভক্তির ধারা বইয়ে দিলে। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল!'

মেজমামা বললেন, 'চিনতে পেরেছিস তো। ইনি হলেন যবন হরিদাস। মামলেট আর মালপো, পলান্ন আর পায়েস দুটোই চলে।'

বড়মামা তেড়েফুঁড়ে উঠলেন, মাসিমা করুণ মুখে বললেন, 'আজ থাক না, অনেক রাত হয়েছে। দুজনেই একটু তাঁর চিন্তা করো না। বলো, প্রভু! আমাদের একটু মানুষ করো।'

দুই মামা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'আর মানুষ হতে চাই না, তাহলেই অমানুষ হয়ে যাব।'

ঘড়ি বাজছে। এক, দুই...বারো।

আবিষ্কার

বড়মামা বসে আছেন তাঁর সাধের গোয়ালঘরের সামনে ভীষণ চিন্তিত। কপালে তিনটে ভাঁজ। গোয়ালে তিনটে বিশাল আকারের জার্সি গোরু মশমশ শব্দ করে তাদের খাবার খাচ্ছে। গোরু তিনটে বেশ আদুরে-আদুরে দেখতে। যত্নে থাকে, ভাল খায়। ক্ষীরের মতো শরীর। দুধও দেয় তেমনই। দুধের বন্যা বয়ে যায়। বড়মামা দুধ বিক্রি করেন না। বিলিয়ে দেন। এক বালতি হাসপাতালে। এক বালতি আশ্রমে। এক বালতি স্কুলে বিলোবার পরও অনেকটা থেকে যায়। বড়মামার কুকুরের সংখ্যা এখন দশ। তারা দুধ খেয়ে খেয়ে এক-একটা কেঁদো বাঘ। মেজোমামা দুধ ভালবাসেন না। তাঁর জন্য পায়েস হয়। মাসিমা ভালবাসেন সন্দেশ। ছানা কাটিয়ে সন্দেশ তৈরি করেন। আর বড়মামা! দুধে অ্যালার্জি, খেলেই পেট খোলে। তিনি দুধ দেখে আনন্দ পান। বালতি-বালতি সাদা দুধ।

বড়মামার একপাশে আমি বসে আছি। আমার মুখে কোনও কথা নেই। কথা বলার ইচ্ছেও নেই আমার। কাল রাতে মশারি ফেলা নিয়ে বড়মামার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। একই বিছানায় আমরা দু'জনে শুই। মশারিটা আমাকেই ফেলতে হয়। আমি একটু আগেই শুয়ে পড়ি। বড়মামার শুতে বেশ রাত হয়। ডাক্তার তো! রুগিরা ছেঁকে ধরে থাকে। চেম্বার থেকে উঠতে দেয় না। কাশি, জ্বর, পেটব্যথা, মাথা ঘোরা। মানুষের অসুখের শেষ নেই। তার ওপর বড়মামার গল্প করার বাতিক আছে। কেউ কিছু বললেই হল। শুরু হয়ে গেল যুক্তি, তর্ক, গল্প। সে চলছে তো চলছেই। আর রুগিরা নানা সুরে শব্দ করছে "ও ডাক্তারবাবু!" কে কার কথা শোনে! নেহাত খুব হাতযশ, তাই সব ছুটে আসে।

কাল বড়মামা কত রাতে ফিরেছিলেন জানি না, মাঝরাতে মশারির একপাশের দড়ি খুলে চাল ঝুলে গিয়েছিল। বড়মামার আবার ভীষণ ভূতের ভয়। তাঁর আবার একটা ভূতের ডিকশনারি আছে। মশারির চালেও নাকি ভূত থাকে। বড়মামার গোঁ গোঁ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চালটা ঝুলছে দেখে আমারও ভয় লেগে গেল। অন্ধকার ঘর।

ভুসভুস বাতাসের শব্দ। ঘড়ির টিকটিক। বাইরে বেড়ালের ঝগড়া। কোথায় একটা বাচ্চা ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদছে। ভয় তো পেতেই পারে। তবে আমি তেমন ভিতু নই। আমার মাস্টারমশাই বলেছেন, 'ভূত বলে কিছু নেই। ভূত আছে মানুষের মনে। আর কোনও-কোনও মানুষ আছে ভূতের মতো, তাদের বলে অদ্ভুত।'

শুয়ে-শুয়ে ভাবলুম অনেকক্ষণ, ব্যাপারটা কী হতে পারে! মশারির একপাশের দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। ছিঁড়েছে বড়মামারই জন্য। খুব খারাপ শোয়া। দুড়ুম-দাড়াম হাত-পা ছোড়ে। খাটের বাইরে পা ঝুলে যায় কোনও-কোনওদিন। ধাক্কা-টাক্কা মেরে জাগাতেই ভীষণ রেগে গেলেন আমার ওপর, 'তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। ভগবানের সঙ্গে আমার ডায়ালগ চলছিল, দিলি তো সব বারোটা বাজিয়ে!'

আমি বললুম, 'মশারির দড়িটা যে ছিঁড়ে বসে আছেন।'

বড়মামা বললেন, 'এ তো তোর রোজের কেস। মশারিটাও ভাল করে খাটাতে পারিস না! অপদার্থ! তুই তা হলে তাঁবু খাটাবি কেমন করে! মশারিতেই যার এই অবস্থা!'

'তাঁবু খাটাতে যাব কেন?'

'ধর যদি কোনও দিন এভারেস্টে যাস এক্‌স্‌পিডিশানে!'

'আপনার মতো শোয়া হলে তাঁবু কেন পাকা দেওয়ালও ধ্বসে পড়ে যাবে। আপনি তো শুয়ে-শুয়ে ব্যালে নৃত্য করেন।'

'যে-কোনও জ্যান্ত মানুষ এভাবেই শোয়। শোয়া মানে তো আর মরে যাওয়া নয়। তোরা যাকে শোয়া বলিস, সেটা আসলে আর-একটা প্লেনে দাঁড়ানো। প্লেন বুঝিস না, অ্যাঙ্গল বুঝিস না, ডাইমেনশান বুঝিস না। টপ থেকে একটা ছবি তুলে খাড়া করে দিলে কী দেখবি, আমি দাঁড়িয়ে আছি খাটের ব্যাকগ্রাউণ্ডে।'

শেষে বললেন, 'কাল থেকে আমি আমার বিছানা আলাদা করে নেব। একটু খেলিয়ে শোওয়ার স্বাধীনতা নিশ্চয় আমার আছে! আমি অমন মড়ার মতো কাঠ হয়ে শুতে পারব না। আমি কি কফিনে শুয়ে আছি! চিতায় শুয়ে আছি!'

রাত আড়াইটের ঝগড়া তিনটেয় শেষ হল। গজগজ চলল আরও কিছুক্ষণ। 'শুয়ে শুয়ে ভাবতে হবে অপারেশান টেবিলে অ্যানাসথেসিয়া নিয়ে পড়ে আছি চিতপাত। এর নাম দেশ স্বাধীন হয়েছে। কাল থেকে আমি মেঝেতে শোব!'

গম্ভীর গলায় বললুম, 'আপনি কেন মেঝেতে শোবেন। আমিই শোব।'

'তুই কেন শুবি! তোর তো এটা মামার বাড়ি, আমার তো আর মামার বাড়ি নয়।'

সকালবেলা ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। শুধু মেজোমামা একবার চা খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাঝরাতে কি শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চলছিল! বাড়িতে আরও দুটো প্রাণী যে ঘুমোচ্ছে, সেটুকু সিভিক সেন্স তোদের এখনও হল না? একজনের তো আর আশা নেই। পাকা বাঁশ। ও আর নুইবে না। তা ছাড়া সঙ্গদোষ। কুকুর, বেড়াল, ছাগল, গোরুর সঙ্গে মিশলে মানুষের কি আর মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে! কিন্তু তোমার

ওপর আমার একটা হাই হোপ ছিল। তুমি তো আবার বড়মামা ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে চেনো না ভাই!'

মেজোমামা অধ্যাপক। অধ্যাপকের মতোই কথা। কয়েকদিন আগে বিলেত ঘুরে এসেছেন। সেখানে নাকি হর্ন থাকলেও গাড়ি হর্ন দেয় না। মানুষ কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শোনে। কেউ চিৎকার করে কাউকে ডাকে না। মেজোমামার এমনই একটু অহঙ্কার আছে, সেই অহঙ্কার আরও কয়েক ডিগ্রি চড়েছে। মেজোমামার ক্যাঁটকাঁ্যাট কথায় বড়মামার ওপর আমার ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। সহজ-সরল, আত্মভোলা। সমবয়সী এক বন্ধুর মতো।

চেম্বার থেকে ফিরে গোরুদের খেতে দিয়ে বসে আছেন। বিষণ্ণ ভীষণ ভাবনা।

বড়মামা অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কী রে আমার সঙ্গে ঝগড়া! কথা বলবি না!'

হেসে ফেললুম, 'আপনার সঙ্গে কথা না বলে থাকা যায়! ইউ আর মাই ফ্রেণ্ড, বেস্ট ফ্রেণ্ড।'

বড়মামার চোখে জল এসে গেল, এই সামান্য কথায়। বললেন, 'তা হলে বোস আমার পাশে।'

'এত কী ভাবছেন তখন থেকে!'

'জানিস তো, আমার মাথাটাই হল উচ্চ ভাবনার বাসা। মন সব সময় গবেষণার দিকে ছুটছে। বিরাট কোনও আবিষ্কার। যে আবিষ্কার জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে। সৃষ্টি থমকে যাবে। স্বয়ং বিধাতা নড়েচড়ে বসবেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানুষ একসঙ্গে এমন হাততালি দেবে, মনে হবে প্রলয় এসে গেছে।'

'তা সেটা হবে কীভাবে!'

'অ্যায়! সেই আইডিয়াটাই আমার মাথায় স্ট্রাইক করেছে, বজ্রের মতো, বিদ্যুতের মতো, গোলার মতো, স্কাড মিসাইলের মতো।'

'জিনিসটা কী?'

'তোর মনে আছে নিউটন আপেল পড়া দেখেছিলেন।"

'মনে আছে।'

'তারপর! তিনি আপেলটা তুলে কচকচ করে খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বাড়ি চলে গেলে মানুষ চাঁদে যেতে পারত! মহাকাশে পাড়ি দিতে পারত! আবিষ্কারের আগে দর্শন, দর্শনের পর ভাবনা। আমি এখন সেই ভাবনার স্টেজে আছি।'

'আপনি কী পড়তে দেখলেন? তাল, না নারকেল?'

'পড়াপড়ির ব্যাপারে শেষ। ও-পথে আর নো হোপ।'

'তা হলে?'

'আমি আজ ক্ষেত্রবাবুর বাড়িতে রুগি দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে আর একটা জিনিস দেখলুম। বললে বনসাই। একটা ছোট্ট টবে বটগাছ। বললে ছ'সাত বছর বয়স। এই এতটুকু, এক ফুটের মতো বড়। মোটা গুঁড়ি। ঝুরি নেমেছে ঠিক বটের মতো। ডালপালায় ছোট্ট একটা পাখির বাসা বসিয়েছে। ফ্যাণ্টাস্‌টিক!'

'ও-আবিষ্কার তো হয়ে গেছে বড়মামা!'

'আরে ধুর, ওইটা থেকেই তো আমার আইডিয়াটা এল। সামনে কী দেখছিস?'

'তিনটে জবরদস্ত গোরু।'

'এক-একটা কতটা জায়গা নিয়েছে! লম্বায় ফুট ছয়েক তো হবেই। গোল ব্যারেলের মতো পেট। হাইট পাঁচ ফুট তো হবেই। পৃথিবী কী ক্রাউডেড। মানুষেরই থাকার জায়গা নেই। কিলবিল করছে পোকার মতো। তার মাঝখানে বিশাল-বিশাল শরীর নিয়ে ভোঁস-ভোঁস করছে। কোনও মানে হয়! তাও যদি মানুষের মতো, গাছের মতো খাড়া ওপর দিকে উঠত তা হলে কিছু বলার থাকত না। এরা সব শুয়ে-শুয়ে পেল্লায় হচ্ছে। এ আর চলে না। অসহ্য!'

'তা এর আপনি কী করবেন? আপনার হাতের বাইরে। ভগবান যেমন করেছেন!'

'সে তো বটগাছকেও ভগবান বিশাল বড় করেছেন। মানুষ তাকে কায়দা করে ছোট করেছে। খোদার ওপর খোদকারি। আমিও সেইরকম "বনসাই গোরু" করব।'

বড়মামা ভাবের জগতে চলে গেলেন। নিজের মনেই বলতে লাগলেন, "এই দু'ফুট

সাইজের ধবধবে সাদা গোরু আমাদের ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। বড়-বড় চোখ। লোটা লোটা কান। কালো ঝকঝকে খুর। মাঝে-মাঝে পালিশ করে দেব।”

বড়মামার ভাব চটকে দিয়ে বললুম, ‘সে গোরু দুধ দেবে তো!’

‘অফকোর্স! গোরুর ধর্ম দুধ দেওয়া। দুধ দেবেই। বালতি-বালতি দেবে না। তবে এমন কায়দা করে দেব, কল ঘোরালেই জলের মতো গেলাস ধরলেই দুধ। আর পরিমাণে কম বলে আরও ঘন, একবারে ক্ষীরের মতো। আর তেমনই মিষ্টি। এই গোরুর জন্য গোয়ালের প্রয়োজন হবে না। আমরা আমাদের বিছানায় নিয়েও শুতে পারব। সে এক বিপ্লব! সে এক রেভলিউশান।’

‘হবে না বড়মামা। এ হতে পারে না। অসম্ভব!’

‘দাঁড়া, দাঁড়া। তোর গলায় সন্দেহবাদীর সুর। মেজোটার সঙ্গে বুঝি খুব মিশছিস। ও তোর ফিউচার ক্র্যাক করে দেবে। শোন, নেকড়েবাঘ থেকে মানুষ তৈরি করল শেপহার্ড ডগ, অ্যালসেশিয়ান। তারপরে যেমন-যেমন প্রয়োজন হল করে নিল সেইরকম কুকুর। মানুষ পাখি মারবে গুলি করে, সেই পাখি পড়বে জলায়। উদ্ধার করে আনতে হবে। তুলে আনবে, কিন্তু খাবে না। এসে গেল গোল্ডেন রিট্রিভার। সাইবেরিয়ার তুষার প্রান্তরে রাতের অন্ধকারে বরফচাপা পড়ে আছে পথিক। পথ ভুলে গিয়েছিল, এল সেন্ট বার্নাড কুকুর। বিশাল তাগড়াই, প্রায় ঘোড়ার মতো। বরফ থেকে উদ্ধার করে আনবে মানুষকে। চার্চের ফাদার তার গলায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেবেন। সাইবেরিয়ায় রাতের বেলা পাল-পাল নেকড়ে বেরোয় শিকারের সন্ধানে। ঝোড়ো বাতাস, মাইনাস তিরিশ চল্লিশ টেম্পারেচার। অসহায় মানুষ দেখছে, লণ্ঠনের আলো দোলাতে দোলাতে আসছে সেন্ট বার্নাড। নেকড়েরা থমকে গেছে। কুকুর এসে মানুষটিকে পিঠে তুলে নিল। আরও বড়-বড় কুকুর আছে, গ্রেট ডেন, পেরিয়ার মাউন্ট। আবার কোলে-কোলে থাকবে, আদর খাবে, এল ল্যাপ ডগ, পিকিনিজ, পুড্‌ল। কুকুর যদি বড়-ছোট করা যায়, গোরু কেন যাবে না! জানিস, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে ছোট-ছোট ঘোড়া তৈরি হয়েছে। মানুষের বৈঠকখানায় খুটখুট করে ঘুরে বেড়ায়। ছোট-ছোট ছেলেরা পিঠে চেপে এ-ঘর, ও-ঘর করে। হবে না বলে কোনও শব্দ মানুষের অভিধানে নেই। এই তো সেদিন ওড়িশায় গিয়ে ভ্যাগোল দেখে কজনকে জিজ্ঞেস করলুম। বললে, ‘ভ্যাগোল। ভেড়ার ভ্যা আর ছাগলের গোল মিলিয়ে তৈরি। আমিও ওইরকম ছাগলের ছা আর গোরুর রু যোগ করে তৈরি করব ছারু। করব চুরগি।”

“চুরগিটা কী বড়মামা?”

“সে এক মজার প্রাণী। চড়াইয়ের চু আর মুরগির রগি নিয়ে চুরগি। ছোট-ছোট টেবিল, চেয়ারে ঘুরবে। ড্রয়ারে থাকবে। রোজ সকালে টেবিলের ওপর পুটপুট করে মুক্তোর মতো এক ডজন ডিম পেড়ে দেবে। সে-ডিমের সবটাই হবে হলদে, সাদা একদম থাকবে না।”

"তা কি সম্ভব বড়মামা!"

"আবার সন্দেহ! তিমির মতো বড় মাছ যেমন আছে আবার জিরের মতো ছোট মাছও আছে। হাতি যেমন আছে, ছুঁচোও তেমনই আছে। ছুঁচো হল চোট হাতি। শোন, কল্পনা থেকেই আসে আবিষ্কার। আমি এখন কল্পনার স্তরে আছি।"

মাসিমা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি আমরা। মাসিমা বেশ রাগের গলায় বললেন, "বাঃ, বেশ আছ তোমরা! বেলা তিনটে হয়ে গেল, আর কখন খাবে! আমি বসেই আছি, বসেই আছি, আর দুই পাগলে মুরগি, চুরগি হচ্ছে। দয়া করে খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার করো।"

বড়মামা উদার গলায় হেসে বললেন, "আজকে আমাদের এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিস তো, পরে পস্তাবি। যখন সারা বিশ্বের মানুষ এই বাড়িতে এসে ভিড় করবে। হই হই পড়ে যাবে। ছাদে এসে নামবে হেলিকপ্টার। সেই দিন আসছে, যখন আজ আমি আমেরিকায় তো কাল আমি ভিয়েনায়।"

মাসিমা বললেন, "সে যখন তখন হবে। তখন তোমাকে আমরা উঠতে-বসতে সেলাম করব। হ্যাঁ, শুনে রাখো, তোমার পেয়ারের পঞ্চাননের মা এসে যা-তা বলে গেছে।"

"কী যা-তা?"

"তুমি নাকি এত দুধ পাঠাচ্ছ, সেই খেয়ে হোল ফ্যামিলির পেট ছেড়েছে। যাও, পরোপকার করো। পরসেবা, পরপ্রেম।"

বড়মামা বললেন, "আমি মহাপ্রভুর চেলা। মেরেছ কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না! মানে দুধ দেব না। আচ্ছা, দুধ যখন সহ্য হচ্ছে না, তখন ছানা করে পাঠালে হয় না! খাঁটি দুধ অনেকেরই সহ্য হয় না।"

মাসিমা রেগে চলে গেলেন।

রাত্তির বেলা। বড়মামা আজ সকাল সকাল প্র্যাকটিস থেকে ফিরেছেন। মনে হয় অনেক রুগিকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। টেবিলে বসে আছেন, টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। আমি পড়ছি। বড়মামা ভীষণ চিন্তিত। হঠাৎ বললেন, "তোর কোনও আইডিয়া আছে?"

"কি আইডিয়া?"

"মানে কীভাবে করা যায়! বড়কে কতভাবে ছোট করা যায়! এক, ধর কেটে করা যায়, সেটা চলবে না। মরেই যাবে। আর এক, যদি বাড়টা কোনওভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়! ধর বাছুর। বাছুরটাকে যদি আগাপাশতলা ব্যান্ডেজ কি প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। কী ধর, খাপে ভরে রাখা হল।"

"খুব অবৈজ্ঞানিক হয়ে যাচ্ছে বড়মামা। মানে খুবই বোকা-বোকা। তা ছাড়া এক একটা বাছুরের সাইজ দেখেছেন। আপনি তো জিনিসটাকে ছাগলছানার সাইজে আনতে চাইছেন।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"তা হলে!"

"ও হবে না বড়মামা। হলে এতদিনে হয়ে যেত। বৈজ্ঞানিকরা কি এতদিন বসে থাকতেন!"

"একবার নিউজিল্যাণ্ড গেলে কেমন হয়। ওরা তো ঘোড়াটাকে বাগে এনেছে।"

"কী দরকার বড়মামা! যে যেমন আছে সেইরকম থাক না!"

বড়মামা উঠে সারা ঘরে পায়চারি করলেন কয়েকবার, তারপর বললেন, শোন, সমস্ত বড় আবিষ্কারই হয়েছে হঠাৎ। এক করতে গিয়ে আর এক হয়েছে। অনেক সময় স্বপ্নেও অনেক কিছু পাওয়া যায়। চল, আমরা শুয়ে পড়ি স্বপ্নে কিছু আসে কি না দেখা যাক।"

আমরা শুয়ে পড়লুম। মশারির দড়ি আজ আরও দুর্বল। জপের মালার মতে গাঁটের মালা। যতবার ছিঁড়েছে ততবার একটা করে গিঁট পড়েছে। মাসিমার কাছে দড়ি চেয়ে বকা ঝকা খেয়েছি, "আমার দড়ির কারখানা নেই। এইবার তোমার বড়মামাকে বলো, চেন কিনে আনতে।"

বড়মামা দু'বার এপাশ-ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফুরফুর করে নাক ডাকছে। বড়মামার নাক ডাকার শব্দটা ভারি সুন্দর, যেন নাকের ফুটোয় কেউ পাতলা কাগজের পরদা ঝুলিয়ে দিয়েছে। খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম বললে ভুল হবে, চলে গেলুম আবিষ্কারের জগতে। স্বপ্নের ল্যাবরেটারিতে বড়মামা আগেই চলে গেছেন সেখানে। হয়তো শুরু করে দিয়েছেন পরীক্ষা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না। হঠাৎ টিপ করে একটা শব্দ হল। শব্দটা এত জোরে হল যে, ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারছি না। মশারির চালটা মুখে নেমে এসেছে। মশারি আর মশারি নেই। জাল হয়ে গেছে। বড়মামার দিকটা চলে গেছে মেঝেতে। সেখানে জালে জড়ানো মাছের মতো বড়মামা। ঘুমের ঘোরে বলে চলেছেন, "ইউরেকা, ইউরেকা।"

ঘরের বাইরে থেকে মেজোমামা আর মাসিমা চিৎকার করছেন, "কী হল! কী হল! আজকের খেলাটা কী! বুড়ো খোকা!"

কোনও রকমে নিজেকে জালমুক্ত করে প্রথমে আলো জ্বাললুম। তারপর দরজা খুলতেই প্রথমে ঢুকলেন মাসিমা, পেছনে মেজোমামা। মশারি-ফসারি নিয়ে বড়মামা মেঝেতে। খাটের একটা ছতরি টিভির অ্যান্টেনার মতো হেলে গেছে একপাশে। একটা টুল ছিল, উলটে গেছে। টুলের ওপর ছিল রেডিয়ো। ছটকে চলে গেছে ঘরের কোণে। কীভাবে, সুইচ অন্ হয়ে গিয়ে কড়াইভাজার মতো আওয়াজ করছে। আর বড়মামা নাগাড়ে বলে চলেছেন, "ইউরেকা, ইউরেকা।"

মেজমামা প্রথমেই বললেন, "এ তো আর্কিমিডিস কেস! একে এখনই তুলে বাথরুমে ফেলে দাও।"

মাসিমা বড়মামাকে ভীষণ ভালবাসেন। মুখে খ্যাচম্যাচর করলে কী হবে। নীরবে জাল ছাড়িয়ে বড়মামাকে তুলে বসালেন। বড়মামা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন, ""আমি কোথায়?"

মেজমামা বললেন, "তুমি এখন রোমে ভাই! রোমিং ইন রোম। আস্ত আছ না ভেঙে গেছ।"

বড়মামা ছেলেমানুষের মত হেসে, "পেয়ে গেছি।"

মেজোমামা বললেন, "কী দুর্লভ জিনিস পেলে ভাই?"

বড়মামা মাসিমার হাত দুটো ধরে বললেন, "ভালবাসা! তোমাদের ভালবাসা।"

মাসিমা ঝাঁ-ঝাঁ করে বললেন, "কাল থেকে তোমাদের বিছানা হবে মেঝেতে। এই বোম্বাই খাট আমি বিদায় করে দেব বাড়ি থেকে।"

সব শান্ত হয়ে যাওয়ার পর বড়মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আসল জিনিসের কী পেলেন?"

বড়মামা বললেন, 'জানিস, বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। তিনি বললেন, "এত ভাবছ কেন? সমাধান তো খুবই সহজ। গোরুটাকে বাঙালি করে দাও। তা হলে দেখবে নিজের চেষ্টাতেই ছোট হয়ে যাবে। আর কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। লিখে রাখো, ছোট যদি হতে চাও বাঙালি হও তবে।'

ঘুস

মেজমামার বই বাড়ছে, বড়মামার বাড়ছে জীবজন্তু আর মাসিমার চড়ছে মেজাজ। আজ মাসিমার স্কুল বন্ধ। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে বললেন, 'চলো লেগে পড়ি। আমাদের লাইফে তো বসার কোনও সময় নেই।'

লেগেপড়া মানে দু'জনে মিলে খুঁজে খুঁজে বের করা বড়মামার জীবজন্তুরা কি কি অপকর্ম করেছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কতটা। বড় মামার কুকুরের সংখ্যা আপাতত সাত। শোনা যাচ্ছে আরও দুটো আসছে। একটা গোল্ডেন রিট্রিভার, আর একটা হাউণ্ড। গোল্ডেন রিট্রিভারের রূপের বর্ণনা শুনে শুনে আমাদের এখন মনে হতে শুরু করেছে—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ নয়, গোল্ডেন রিট্রিভার। বড়মামাকে প্রশ্ন করেছিলুম—'বড়মামা, সব কিছুর একটা সীমা আছে তো! এত কুকুর কি হবে? সাতটা আছে, দেখতে দেখতে নটা হবে। এরপর তো কুকুর রাখার আর জায়গা থাকবে না।'

'সে তুমি বুঝবে না। আমি গবেষণা করছি। আমার গবেষণার জন্যে কুকুরের প্রয়োজন।'

'গবেষণার তো কিছু দেখছি না। ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘেউ ঘেউ করছে আর দুষ্টুমি করছে। আর আপনি একে বিস্কুট ছুঁড়ে দিচ্ছেন, ওর মাথায় চাঁটা মারছেন। এর নাম গবেষণা!'

'শোনো-শোনো, এ তোমার মেজবাবুর গবেষণা নয়। আমার এই গবেষণা সমস্ত কুকুর জাতির স্বভাব পাল্টে দেবে। এই যে কুকুরে কুকুরে দেখা হলেই খেয়োখেয়ি সেই খেয়োখেয়ি আর হবে না। সব কুকুর ভাই ভাই হয়ে যাবে। মানুষ যেটা ভুলে গেছে। আমার এইটা হল কুকুরদের ট্রেনিং ক্যাম্প। ধরো এখানে সাতশো কি আটশো কুকুরকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিলুম। সেই ট্রেইনড কুকুর তখন এক এক এলাকার কুকুরকুলকে মানুষ করে দেবে। একেবারে মানুষ।'

মেজমামা পরিকল্পনা শুনে বলেছিলেন, 'একেবারে মানুষ হলে তো সেই একই হয়ে গেল। আবার খেয়োখেয়ি। তুমি কি করতে চাইছ? কুকুরকে মানুষ, না মানুষকে কুকুর, না কুকুরকে কুকুর! আগে ঠিক করে নাও।'

'থাক তোমাকে আর গুলিয়ে দিতে হবে না। তুমি হলে সেই কথামালার শৃগাল, বাঘকে যে খাঁচায় বন্দী করে ছেড়েছিল। আমি আমার মত চলি তুমি তোমার মত। তোমার ছাইপাঁশ গবেষণায় আমি নাক গলাই!'

মাসিমা বললেন, 'এই দ্যাখ বড়দার খরগোস মেজদার অক্সফোর্ড ডিক্সনারির এ থেকে ডি পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছে। মেজদা একবার দেখলেই ক্ষেপে যাবে। আর ক্ষেপে যাবারই তো কথা।'

'এই দ্যাখো মাসি, বড়মামার সেই ধেড়ে বেড়ালটা এমন সুন্দর সোফার ফোমটাকে আঁচড়ে কি রকম দাগ দাগ করে দিয়েছে।'

'সে কি রে, এই তো পরশু দিন নতুন করে দিয়ে গেল। আর পারি না। এ বাড়িতে ওই কুকুর বেড়াল ছাগলই থাক চল আমরা পালাই।'

তিনটে চাদর বড়মামার কুকুরে ফালাফালা করেছে। আমি জানি বড়মামা বলবেন, 'ও কিছুই না। সাতটা কুকুরের উচিত ছিল সাতটা চাদর ফালা করার।' তারপর গলাটাকে গম্ভীর করে বলবেন—'কি হয়েছে কি, চাদরের ঝোলা অংশে তো বেশ ভালই ঝালর মতো করে দিয়েছে। ডেকরেশান।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে, এ সপ্তাহে বড়বাবুর পেয়ারের জন্তুরা কি কি উপকার করল— তিনটে চাদর খতম। সোফার ফোমলেদারে বেড়ালের নখের নকশা। মেজবাবুর ইংরেজি ডিক্সনারির এ থেকে ডি হজম। শিকার ধরতে গিয়ে বড়বাবুর পেয়ারের হুলো আমার বাঁয়া তবলাটা চুরমার করেছে। সবচেয়ে শয়তান ছোট কুকুরটা তোর হাওয়াই চপ্পলটাকে সজনে ডাঁটার মতো চিবিয়েছে। একটা সপ্তাহের পক্ষে যথেষ্ট, কি বলিস বুড়ো।'

'এখনও তো তুমি গরু আর ছাগলের দিকে যাওনি মাসি। ও পাড়ায় কি হয়ে আছে কে জানে?'

ও ছেড়ে দে, বাগানে তো একদিকে চলেছে বৃক্ষ রোপণ উৎসব, আর একদিকে বৃক্ষ হনন। বড়কর্তার পেয়ারের লক্ষ্মী তো বিশ্বপেটুক। সব কটা কলাগাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। আর প্রাণের ছাগল রামু তো দেখি আজ দুপুরে বাগানের বেড়াটাকে টেস্ট করার চেষ্টা করছে। আর তিন দিন। তিনটে দিন পরে দেখবে বেড়া ফাঁক। বড় কর্তাকে বললেই বলবে, রিসার্চ হচ্ছে গবেষণা। ছাগলের হজম শক্তি দেখেছিস কুশি। ওদের হজম-রস থেকে একটা ওষুধ যদি কোন রকমে বের করতে পারি তো, মার দিয়া কেল্লা। মানুষ তখন ছাতার বাঁট খেয়ে হজম করবে। দুটো পাগলে আমার জীবনটা শেষ করে দিলে!'

'মেজমামা অতটা নয়।'

'ওই একই। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বাড়িতে বই রাখার আর জায়গা আছে? সেদিন বলছে, আলমারি থেকে সব কাপড়-জামা বের করে দিয়ে বড় মাপের বইগুলো রাখবে। যুক্তিটা শুনবি, কাপড়-জামা পুটলি করে যেখানে হোক রাখা যায়, দামী দামী বই তো আর পুটলি পাকানো যায় না। বই হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। গুচ্ছের জামা-কাপড়ে কি হবে।'

‘মেজমামা বলছিলেন, জানিস বুড়ো, বই দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনা, অথচ জানিস শেষ মাসে না আমার দশপয়সার মুড়িও জোটে না।’

‘রাখ তো ওসব বাহারের কথা। দিন দিন ভুঁড়িটা কি রকম বাড়ছে দেখছিস, না খেলে ভুঁড়ি হয়?’

‘না, সে ভুঁড়ি হবার অন্য কারণ আছে। সে কথাও আমাকে বলেছেন। কি কষ্ট রে বুড়ো! একেবারে ডবল টানা। ডবল টানাটা কি জানো! সকালে খেতে বসে দু’জনের খাবার খেয়ে নেন। দুপুরে টিফিন আর খেতে হয় না।’

‘সে না হয় সকালে। আর রাতে? সেদিন রাতে গল্প করতে করতে পঞ্চাশখানা লুচি খেয়েছে। ভাবতে পারিস বুড়ো! পঞ্চাশখানা লুচি!’

‘সে কথাও আমাকে বলেছেন। বললেন, লুচি মানে কি? লুচি মানে এয়ার, বাতাস। ফক্কিকারি জিনিস। একশোটা ফুলকো লুচিতে কতটা ময়দা থাকে? তুই লুচির সংখ্যা দেখবি, না ময়দার ওজন দেখবি! তোর বিজ্ঞান কি বলে?’

‘ওসব ছেলেভোলানো কথা তুই শুনিস; আমাকে বোঝাতে আসিস নি। মেজদা চিরকালই ভোজনবিলাসী। আমি সেদিন লণ্ড্রীতে জামা পাঠাতে গিয়ে বুক পকেট থেকে রেস্তোরাঁর একটা বিল পেয়েছি। বাষট্টি টাকার চিকেন তন্দুরি খেয়েছে।’

‘যাকগে কারুর খাওয়া নিয়ে কথা বলতে নেই।’

‘না আমি তা বলছি না; তবে কি জানিস বেশি খাওয়া ঠিক নয়। শরীর তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, এই আর কি?’

‘এইবার আমি একটা নোটিশ দেবো। এ বাড়িতে বই আর বাড়বে না, জীবজন্তুও বাড়ানো চলবে না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।’

‘মাসি, জ্ঞান যে অসীম!’

‘তুই থাম। কটা বই পড়ে রে!’

‘মেজমামা বলেন বইয়ের মলাটে হাত দিলেই অর্ধেক পড়া হয়ে যায়।’

‘আর বাকি অর্ধেক? সেই হিসেবে তো হাজার কয়েক বই পড়তে হবে।’

আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে কে খুব চিৎকার করে ডাকছে, ‘বাবু’ বাবু।’

আমরা ছুটে গেলুম। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কাঁধে ঝুলছে এক তারের খাঁচা। খাঁচায় অনেক পাখি কিচির মিচির করছে।

মাসিমা বললেন, ‘কি ব্যাপার!’

‘ডাগদার সাব।’

‘ডাগতার সাব বাড়ি নেই।’

মাসি বেশ রেগে রেগে উত্তর দিচ্ছে।

লোকটি বললে, ‘ডাগদার সাব ভেজিয়েছেন। এই যে চিঠি।’

মাসিমা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললে, 'পড়।'

আমি জোরে জোরে পড়লুম, 'কুশি, বোনটি আমার, রাগ করিস নি। জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এর পর আর মনে হয় কিছু বলার থাকে না। খাঁচাটার ডেলিভারি নিয়ে নিস। তোর হিসেব থেকে লোকটাকে এখন তিনশো টাকা দিয়ে দিস। আমি তোকে সুদ সমেত চারশো টাকা দেবো। মনে রাখিস জীবে দয়া। জিভে দয়া নয়। যা মেজ-র ধর্ম।'

মাসিমা সাধারণত ইংরেজি বলেন না, আজ এত রেগে আছেন, যে চিঠিটা শেষ হওয়া

মাত্রই লোকটিকে বললেন, 'গেট আউট'।

সে 'গেট আউট'-এর কি বুঝবে। সে হাসি হাসি মুখে বললে, 'হ্যাঁ মা।'

মাসিমা তখন বললেন, 'বেরোও, দূর হও।'

লোকটি বেশ মজার মানুষ। সে একটু নাচের ভাব করে বলল, 'দূর হটো ভাই দুনিয়াওয়ালে হিন্দোস্তাঁ হামারা হায়।'

মাসিমা বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, ‘এটাকে হাটা না বুড়ো।’

‘ও হটবে না মাসি, বড় মামা যা বলেছেন তুমি তাই করে দাও।’

পাখিগুলো দারুণ দেখতে। আমিই বুদ্ধিটা বড় মামাকে দিয়েছিলুম। উত্তরের বারান্দাটা বেশ করে জাল দিয়ে ঘিরে মুনিয়া আর বদরি পাখি পুষুন। মনে হবে স্বর্গে আছি। আর ওদের বাচ্চা হবে। ছোট ছোট বাচ্চা ফুর ফুর উড়বে। মাসি খুব গজগজ করতে করতে তিনশোটা টাকা লোকটির হাতে দিলেন।

‘খাঁচাটা কোথায় রাখবো মা?’

‘আমার মাথায়।’

‘মা আমার রাগ হয়েছে।’

আহা কি বাংলা! লোকটি আপনমনে বাগানে ঢুকে গেল। গান চলছে কিন্তু। গান থামে নি। খাঁচাটাকে ভেতরের বারান্দায় রেখে সবে কি একটা বলতে যাচ্ছে, আর বড় মামার সাত সাতটা বড় ছোট কুকুর একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করে তেড়ে এল। লোকটি কি ভাল ছুটতে পারে! আবার কি সুন্দর লাফাতে পারে! এক লাফে বাগানের বেড়া টপকে সোজা পুকুরে। জল থেকে উঠে এসে বললে, ‘নাইতে বেশ ভালো লাগেতো বাবু।’

‘তুমি আগে কখনো চান করোনি?’

‘সে দশ বছর আগে। যেবার গঙ্গাসাগর গিয়েছিলুম। চান করবার সময় কোথায়?’

‘তোমার কি এমন কাজ?’

‘বা বা আমার কাজ নেই? আমাকে তো সব সময় পাখি পাহারা দিতে হয়।’

‘কেন?’

‘বাঃ বেড়াল খেয়ে নেবে না?’

লোকটি বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বড়মামার কুকুরগুলো কিছু দূর তেড়ে এসে আর আসেনি। ওরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে মজা পায়।

লোকটি বললে, ‘আবার ঠাণ্ডা না লেগে যায়! হঠাৎ চান করলুম তো!’

‘এই গরমে ঠাণ্ডা!’

‘ছেলেবেলায় আমার একবার বক্কা হয়েছিল।’

‘বক্কা আবার কী?’

‘সে তুমি বুঝবে না, ডাক্তারবাবু জানেন। সে খাঁশি, খালি খাঁশি। আরেব্বাপ। তা জানো, আমি চান করলুম, আর আমার মায়ের দেওয়া তিনটে নোটও চান করল।’

নোটটাকে ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, ‘যাঃ ব্যাটা বরাত ভালো।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ‘চারটে তো বাজল?’

‘তা বাজুক না! চারটে বাজলে কি হয়?’

সুর করে বললে, ‘বাবুদের বাড়িতে চা হয়। হ্যাঁ গো তোমাদের চা হয়ে গেছে? দেখো না, একটু ম্যানেজ করো না। তোমাদের কুকুরের জন্যেই তো আমি জলে পড়ে

গেলুম। আমি চেনা তাই। অচেনা হলে চিৎকার করতুম। চিৎকার করলে লোক জড়ো হলে জুলুম হত। দিনকাল তো ভালো নয়। দেখো না, আদা দিয়ে এক কাপ চা যদি হয়।'

বাবা, লোকটা তো খুব চালু! বড় মামার সব পার্টিই সমান।

'তাহলে খুচরো একটা টাকা দাও। দোকানে চা খাই। আমার তো আবার সব একশো টাকার নোট।'

আমার পকেটে একটা টাকা ছিল, লোকটাকে দিলুম। যেতে যেতে বললে, 'দোকানের চা ঠিক বাড়ির মতো হয় না।'

ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, ধরধর, ধরধর করে একটা টেম্পো এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বললে, 'মুখার্জি বাড়ি?'

'হ্যাঁ মুখার্জি বাড়ি।'

ড্রাইভার তার চেলাকে বললে, 'মোড়ের মাথায় লোকটা ঠিকই বলেছিল। দেখবেন যে বাড়ির ছাদের আলসে থেকে মুখ ঝুলিয়ে সাত আটটা কুকুর জিভ বের করে হ্যা হ্যা করছে, সেই বাড়িটাই মুকুজ্যে বাড়ি! প্যালা ছাদের দিকে একবার তাকা! দৃশ্য। দৃশ্য। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, দশ বারোটা কুকুর। বড়লোকদের কি দশা প্যালা!'

মাসিমা বেরিয়ে এসেছেন, 'এবার আবার কি?'

'বোঝা যাচ্ছে না মাসি!'

ড্রাইভার ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'লেটার আছে, লেটার, পড়লেই বুঝতে পারবেন দিদি।' আবার একটা চিঠি। এবার মেজমামা। 'কুশি, বোনটি আমার, রাগ করিস নে বোন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, হঠাৎ, সেই পরমকরুণাময়ের দয়ায়, আমার হাতের মুঠোয়, হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ, এসে গেল, আর আমি জয় মা বলে খপাত করে ধরে ফেললুম। আজ একটা প্রাচীন লাইব্রেরি বিক্রি হয়ে গেল। আমি বেছে বেছে কিছু প্রাচীন পুঁছি আর গ্রন্থ এই টেম্পা করে তোর কাছে পাঠালুম। তুই করুণাময়ী। তুই জগদম্বা, তোকে পুজোর সময় আমি বোম্বাই নিয়ে যাবো। আমি বড়কত্তা নই। আমার কথার দাম আছে। তুই মালটা ডেলিভারি নিয়ে, টেম্পো ভাড়া তিরিশ টাকা দিয়ে দিস। ত্রিসংসারে আমার কে আছে বল তুই ছাড়া। আপাতত আমার ট্যাক গড়ের মাঠ। খুব সাবধানে নামাস। অধিকাংশই জরাজীর্ণ। জোরে নিঃশ্বাস লাগলেও ড্যামেজ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মনে কর এক গাড়ি পাপর ভাজা। এর মধ্যে একটা পুঁথিতে নানা টোটকার কথা লেখা আছে। মনে হয় চুল পড়া বন্ধেরও টোটকা আছে। একদিন তোকে পড়ে মানে করে দোব যদি সময় পাই। সোনা মেয়ে। আমার সণ্টুটা আমার মণ্টুটা। আমি এখনও বেছে চলেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মনে হয় আরও এক টেম্পো পাঠাতে পারবো। বই, শুধু বই। কি ঐশ্বর্য! ইতি, তোর মেজদা।'

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে, 'এই জঞ্জাল কোথায় ফেলবো দিদি?'

'ডাস্টবিনে।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। আমি মাথা খাটিয়ে কয়লার ঘরটা দেখিয়ে দিলুম।

প্রথমে এলেন বড়মামা। দুহাত সামনে বাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে অন্ধ মানুষের মতো হাঁটছেন। একটা করে পা অনেকটা উঁচুতে তুলে সাবধানে ফেলছেন। মাঝে, মাঝে টলে যাচ্ছেন। যাব্বাবা! এ আবার কি হল। জলাতঙ্কের মতো ভূমি আতঙ্ক নাকি? বড়মামার কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। সেটা ওইভাবে লেফট রাইট করে চলার জন্যে ধপাক ধপাক করে দুলছে। বড়মার তো মেজমামার মতো সাইডব্যাগ নেন না, বরং ঠাট্টা করেন। প্রফেসারদের জার্সি হল, কড়া মাড় দেওয়া পাঞ্জাবি আর সাইডব্যাগ আর তার চোখ খারাপ হোক আর না হোক, মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই বড়মামার কাঁধে ব্যাগ!

আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাসিমাকে ডাকলুম। বড়মামার বোধহয় স্ট্রোক হচ্ছে। মাসিমাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। বড়মামার ওইভাবে এগিয়ে চলেছেন উঠান দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে। ওঃ মাসিমার লক্ষ্য বটে! আমি অতটা নজর করে দেখিনি। বড়মামার চোখে চশমা। প্রথম চশমা। মাসিমা এগিয়ে গিয়ে একটান মেরে চশমাটা খুলে নিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় বাইফোকাল'।

বড়মামা বললেন, 'বাঁচালি, কুশি। বাইফোকাল। কি অবস্থা রে! সব যেন ঢেউ খেলছে। এই তো দেখছিস সব সমান, চশমাটা পর, দেখবি সব উঁচু নিচু। শীতলাতলার কাছে তো দুম করে পড়েই গেলুম। ওই যে দেখছিস তলার দিকে গোল চাকা দাগ কাঁচের ওপর ওইটাই মারাত্মক। তুই বল, ওইটুকু জায়গা দিয়ে চোখ চালানো যায়।'

'পড়ে না গিয়ে চশমাটা তো চোখ থেকে খুলে নিলেই পারতে।'

'যাঃ তো কখনো হয়। চশমা তো পরার জন্যে, পড়ার জন্যে।'

'তুমি তো পড়ার বদলে পড়ে গেল। তোমার কাঁধে কি?'

'ও কাঁধে!' বড়মামা লাজুক লাজুক হাসলেন, 'মেজোকে উপহার দোবো ; কিছু বই রে কুশি।'

'আবার বই!' মাসিমা প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি।

আর তখনই ঢুকলেন মেজমামা। তাঁর কোলে ভারি সুন্দর একটা বাচ্চা কুকুর।

মাসিমা বললেন, 'এ কি, কুকুর! কুকুর তো তোমার সাবজেক্ট নয়!'

'আমার এক ছাত্র দিলে। বড়দাকে প্রেজেণ্ট করবো।'

'কি ব্যাপার বল তো। দু'জনে এত ভাব! বড়দা তোমার জন্যে বই এনেছে। ঝেড়ে কাশো তো। এ যেন দু'জনেই দু'জনকে ঘুস দিচ্ছে।'

বড়মামা বইয়ের ঝোলাটা মেজমামার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ফ্যাণ্টাসটিক কিছু বই। ফর ইউ!'

মেজমামা কুকুরছানাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ফ্যাণ্টাস্টিক কুকুর, চিওয়া ওয়া।'

বড়মামা বললেন, 'বেশ এবার তুমি তাহলে কাজের কথাটা বলো!'

'তুমি আগে বলো।'

'আমি উত্তরের বারান্দাটা জাল দিয়ে ঘিরে পাখি রাখবো। ওই দেখ খাঁচা।'

'আমি তোমার ঘরের দুটো দেয়াল চাই। র‍্যাক ফিট করে বই রাখব। ওই দেখ এক-টেম্পো বই।' এদিকে ওদিক তাকালেন। 'আমার বই!'

আমি বললাম, 'কয়লার ঘরে রাখা হয়েছে।'

'কয়লার ঘরে! কয়লার ঘরে মা সরস্বতী!'

মেজমামা পড়ি কি মরি করে ছুটলেন। সেখানে বড় মামার পেয়ারের গরু লক্ষ্মী এক খাবলা মা সরস্বতী মুখে পুরে চোখ বুজে চিবোচ্ছে, আরামসে, আর চামরের মতো ন্যাজটা দুলিয়ে দুলিয়ে মশা তাড়াচ্ছে।

বড়মামার মিনেজারি

হাড়ের নস্যির ডিবে। আগে কখনো দেখিনি। পুরী থেকে স্পেশাল আমদানি। বড়মামার এক রোগী পুরী থেকে এনে প্রেজেণ্ট করেছে, পুরস্কার। ভদ্রলোক একদিন বেদম হাসছিলেন। চোয়াল আটকে হাঁ হয়ে গেল। কোনো ডাক্তারেই কিছু করতে পারে না। শেষে বড়মামা। বড়মামা সেই সময় বাড়িতে সিল্কের লুঙ্গি পরে পেয়ারের কুকুর লাকিকে ওঠবোস করাচ্ছিলেন। ভদ্রালোক হাঁ করে রিক্সা থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বড়মামাও হাঁ। ভদ্রলোকের বাড়িতে সেদিন মাংসের ঝোল হয়েছিল। চোয়াল আটকে গেলে খাওয়া যায় নাকি? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ঝোল জুড়িয়ে জল। এখন শেষ ভরসা বড়মামা।

লাকিও ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে হাঁ। আশে পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও হাঁ। বড়মামা মিনিট খানেক কি ভাবলেন! তারপর ঠেসে এক চড় ভদ্রলোকের গালে। খুট্ করে একটা শব্দ হল। ভদ্রলোকের চোয়াল নিমেষে খুলে গেল। এক মুখ হাসি। বড়মামাকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদর! বড়মামা যত বলেন, 'ছাড়ুন ছাড়ুন, কাতুকুতু লাগছে,' আদর যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে! শেষে লাকি যখন রেগে গর গর করে উঠল ভদ্রলোক তাঁর উচ্ছ্বাস সংযত করলেন।

—মশাই, পাঁচকড়ি বসে বসে তারিয়ে তারিয়ে আমার মাংস আমারই চোখের সামনে খেয়ে যাবে, বলুন সহ্য করা যায়! পাঁচকড়ি ভদ্রলোকের বেকার ভাই। বড়মামা বললেন,—আজকের দিনটা লিকুইড খেলেই ভাল হয়। —লিকুইডই তো, মাংসের ঝোলটাই তো বেশি, পাঁচশো মাংস আর ক'টা টুকরো বলুন। ঝোলের সঙ্গেই গিলে নেবো। কড়কড়ে আটটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েই পাঁচকড়ির দাদা সাতকড়ি রিক্সায় উঠলেন। চড় মারার ফি। সেই সাতকড়িবাবুই নিস্যর ডিবেটা দিয়েছেন।

নস্যির ডিবেটা সিল্কের লুঙ্গি দিয়ে পালিশ করতে করতে বড়মামা বললেন,—তুই আমার কাছে শুবি। ফাস্ ক্লাস তিন তলার ঘর। বড় বড় জানালা। ফুর ফুর করে হাওয়া

খেলে যাচ্ছে। দুজনে মজা করে পাশাপাশি শোবো। গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো। বড়মামা এক টিপ নস্যি নিলেন সশব্দে। মেজমামা জানালার কাঁচ পালিশ করছিলেন। মেজমামার হল পরিষ্কার বাতিক। সব সময় কাঁধে ঝাড়ন নিয়ে ঘুরছেন। আসা-যাওয়ার পথে এটা ওটা সেটা ঝাড়ছেন। সিঁড়ির হাতল, খাটের মাথা, টেবিল, ফুলদানি। তখন পড়েছিলেন জানালার কাঁচ নিয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শোবে শোও, তবে অপঘাতে মরলে আমাদের দোষ দিও না।' আমি অবাক হয়ে বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। বড়মামা ইশারায় নিজের মাথার উপর একটা আঙুল বার কতক গোল করে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মেজর মাথার গণ্ডগোল আছে। জানালার কাঁচে বড়মামার হাত ঘোরানো মেজমামা দেখতে পেয়েছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—'হ্যাঁ, আমার মাথার গোলমাল তো হবেই, তোমার মাথাটা খুব ঠিক আছে, তাই তো। বাড়িটা তো একটা চিড়িয়াখানা বানিয়েছ! ছটা গরু, কোনোটার দুধ নেই। খাচ্ছে দাচ্ছে, নাদা নাদা হাগছে। মশার চোটে বাড়িতে টেঁকা যাচ্ছে না। চার চারটে কুকুর, ঠাকুর ঘরে চুরি হয়ে গেল! দুটো কাকাতুয়া সারাদিন চেল্লাচ্ছে। কার্নিসে একঝাঁক পায়রা অনবরত মাথায় পায়খানা করছে। 'বড়মামা খুব রেগে গেলেন,—'তাতে তোর কি, তোর কি অসুবিধে হয়েছে?' মেজমামার কাঁচ পরিষ্কার বন্ধ হয়ে গেল,—'আমার কি? আমার কি তাই না? তোমার লাকি সকাল বেলা কার্পেট ভিজিয়েছে। তোমার গরু লক্ষ্মী, সকালে আমার বাগানে ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। তোমার কাকাতুয়া সকালে ডানার ঝাপটা মেরে আমার চোখের চশমা ফেলে কাঁচ ফাটিয়ে দিয়েছে।'

বড়মামা আবার এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—'লাকি, লাকির পেচ্ছাপ গোলাপ জল, জানিস ও রোজ ডগসোপ মেখে চান করে। তুই তো সাত জন্মেও চান করিস না।' মেজমামা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপরই বিস্ফোরণ—'ওঃ গোলাপ জল, তাই না! এবার থেকে বিয়ে বাড়িতে ওটাকে নিয়ে যেও, কাজে লাগবে। ভাড়া খাটাতে পার তো, গোলাপ জল ছিটিয়ে আসবে। কার্পেট তুমি পরিষ্কার করবে, আমি পারবো না।'

—'আমার সময় কোথায়, জানিস আমার গর্জমান প্র্যাকটিস।' বড়মামা রোরিং-এর বাঙলা করলেন গর্জমান। প্রতিজ্ঞা করেছেন, যখন বাংলা বলবেন 'পিওর বাংলা' যখন ইংরেজী তখন 'খাঁটি ইংলিশ।'

—'তোমার প্র্যাকটিস আমার জানা আছে, যত চড়-চাপড় মেরে বুদ্ধু লোকের কাছ থেকে টাকা বাগাও।' মেজমামা সেই সাতকড়ির চোয়ালআটকে যাবার কেসটা বললেন।

—'তুই ডাক্তারির কি বুঝবি। এ কি তোর ফিলজফি!' বড়মামা মেজমামার দর্শন নিয়ে এম. এ. পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

—'তোমার গরু যদি কাল আমার বাগানে ঢোকে, আমি খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবো।' মেজমামা এইবার গরু দিয়ে বড়মামাকে কাবু করার চেষ্টা করলেন।

—'ঠিক আছে, খাঁটি ক্ষীরের মত দুধ হলে তোকে দেখিয়ে খাবো।' বড়মামা লোভ দেখালেন।

—'দুধ! মেজমামা একখানা নাটকীয় হাসি ছাড়লেন।—কার দুধ? লক্ষ্মীর দুধ! ওর পেটে দুধ ভরে বাঁটের কাছে একটা কল ফিট করে দিলে তবে যদি দুধ পড়ে, বুঝেছো? ছ'বছরেও যে দুধ দিলে না, তার দুধ তুমিই খেও। ডুমুরের ফুল দেখেছো, সাপের পা দেখেছো, সোনার পাথর বাটি দেখেছো, কুমিরের চোখে জল দেখেছো!' মেজমামা মনে হয় উপমার বন্যা বইয়ে দিতেন যদি না সেই সময় ঘরে ছোটোমাসী ঢুকতেন!

ছোটোমাসীর হাতে একটা শাড়ি। মেজাজ একেবারে সপ্তমে।—'বড়দা এটা কি হয়েছে?' শাড়িটার একটা দিক টুকরো টুকরো। মনে হয় কেউ চিবিয়েছে। বড়মামা নস্যির ডিবেটা নাচাতে নাচাতে বললেন,—'ছিঁড়ে ফেলেছিস?'

বারুদে যেন আগুন লাগলো,—'আমি ছিঁড়েচি! তোমার খরগোসের কীর্তি।'

—'যাঃ, খরগোসে তোর শাড়ি চিবোতে যাবে কেন?' বড়মামার অবিশ্বাস।

—'যাবে কেন? তোমার খরগোস কোনো কিছু আস্ত রেখেছে। স্টেনলেস স্টিলের বাসনগুলোও চেষ্টা করেছিল, পারে নি।' মেজমামা মনে হল বেশ খুশী। মেজমামা বললেন,—'খরগোসের পেটে সব কিছু যাবার আগে রোষ্ট করে ওগুলোকে পেটে পুরে দে।' বড়মামা যেন শিউরে উঠলেন।—'কাপড় তুই যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস কেন, কেয়ারলেসের মত?'—'যেখানে সেখানে!' মাসীমা তেড়ে এলেন,—'বাসকেটে রেখেছিলুম ছাড়া কাপড়ের সঙ্গে, সেখানে গিয়ে ঢুকেছে শয়তানগুলো।'—'বাসকেটে কেউ কাপড় রাখে?'—বড়মামা দোষটা মাসীমার ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন।—'ছাড়া কাপড় বাসকেটেই রাখে বড়দা, চিরকাল তাই রাখা হয়।' বড়মামা হাল্কা চালে বললেন,—'আর রাখিস নি। ছাড়া কাপড় একটু উঁচুতে রাখিস।'—'কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখবো, কিংবা মাথায় করে নিয়ে ঘুরবো এবার থেকে।' মাসীমা রেগে বেরিয়ে গেলেন।

মেজমামার আবার আক্রমণ,—'তোমার খরগোস সেদিন আমার চটি জুতো খেয়েছে। বলো, চটি এবার থেকে মেঝেতে খুলে না রেখে মাথায় করে ঘুরে বেড়াস?' বড়মামা ফাইন্যালি এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—'দেখ মেজো, আমার বাবার বাড়িতে আমি যা খুশী তাই করতে পারি, তোদের পছন্দ না হয় আমার কিছু করার নেই। গরু আমার থাকবে, কুকুর থাকবে, কুকুর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, বেটার দ্যান মেন, পাখি আমার দাঁড়ে ঝুলবে, খরগোস আমার নেচে নেচে খুরবে। পৃথিবীর পশু জাতি আমার বন্ধু, আমার ফ্রেণ্ড।' মেজমামা কি বলবেন একটু যেন ভেবে নিলেন, তারপর ছাড়লেন তাঁর উত্তর—'বাড়িটা তোমার একলার নয়, বুঝেছো। জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে একটু মিলে মিশে থাকতে হয়। এরপর তুমি একটা কেঁদো বাঘ আমদানী করবে, তারপর একটা বিটকেল ভাল্লুক। একদিন বাড়ি ফিরে দেখলে আমরা সব ক'টা চলে গেছি পেটে, হাড় ক'খানা পড়ে আছে। তোমার বাঘ বসে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। তখন কি হবে! বলো কি হবে!'

'ঘোড়ার ডিম হবে', বড়মামার নির্বিকার উত্তর।—'ভাল্লুক কেউ পোষে না, কথার কথা বললেই হল, না! আসলে তোরা ভীষণ মিন মাইণ্ডেড, আত্মসুখী, তোদের কোনো ক্যারেকটার নেই!'

—'কি বললে? আমরা চরিত্রহীন! তোমার ভারি চরিত্র আছে, না? জোচ্চোর ডাক্তার। তুমি আর কথা বোলো না। রামকৃষ্ণ কি বলে গেছেন জানো, ডাক্তার আর উকিলরা কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' মেজমামা এক নিঃশ্বাসে কথা ক'টা বলে গেলেন। বলে যেন বেশ তৃপ্তি পেলেন।

বড়মামা এক টিপ নস্যি বেশ সশব্দে নাকে গুঁজে বললেন, 'পশু-পক্ষী নিয়েই আমি থাকবো। তোরা হলি বিষাক্ত সাপ।' 'তারপর আমাকে বললেন,'—তুই আমার একমাত্র ভাগ্নে। তুই এইসব নোংরা আদমিদের সঙ্গে একদম থাকবি না, আমার তিন তলার ঘরে আরামে ফুরফুরে হাওয়ায় আমার পাশে ঘুমোবি, সকালে আমার সঙ্গে বেড়াবি। বিকেলে লাকির সঙ্গে খেলবি। 'মেজমামা কান খাড়া করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ,—ভাগ্নে তোমার একলার নয়, আমাদের সকলের, আমরা সকলেই তার ভাগ পাব। তুমি বেচারাকে

তিন-তলার ঘরে পুরে সারারাত ফুটবল খেলবে, তা হবে না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আই প্রোটেস্ট।'

—তোর প্রোটেস্ট? 'বড়মামা হাসলেন,—' 'তোর মত অমানুষের হাতে একে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

অমানুষ বলায় মেজমামা ফিউরিয়াস।—'অমানুষ কাকে বলে জানো? পশুদের কাছাকাছি যারা থাকে তারাই অমানুষ। পশুদের নিয়ে এ বাড়িতে কে থাকে? তুমি থাকো। সুতরাং অমানুষ তুমি, আর তাই ছেলেটা তোমার হেফাজতে যাতে চলে না যায়, আমাদের দেখতে হবে!'

এইবার বড়মামার হাসবার পালা,—'তুই দেখবি! তোকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুই দেখবি! তুই সারা বাড়ির ধুলো আর নোংরা ছাড়া তো কিছুই দেখতে পাস না, আগের জন্মে বোধহয় ধাঙড় ছিলিস।' মেজমামাও ছাড়বার পাত্র নন,—'তোমার মত অপদার্থরা বাড়িতে থাকলে আমাদের মত পদার্থওয়ালাদের তো খাটতেই হবে। তোমার পাখি, তোমার পেয়ারের কুকুর, তোমার শুকনো গরু, তোমার বোকা রুগীর দল চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িটাকে ডাস্টবিন বানিয়ে যাচ্ছে। আমি আছি বলে বাস করতে পারছো, চলে গেলে বুজবে ঠ্যালা। Cleanliness is next to godliness, বুঝেছো। আমি হলুম সেই God!'

বড়মামার বিস্ময়।—'তুই হলি গিয়ে God আর আমরা হলুম Demon', বড়মামার সে কি প্রাণখোলা হাসি।—'গায়ত্রী জপ করতে জানিস? গলায় তোর পৈতে আছে? সেটাকে তো বহুকাল ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিস।' বড়মামার কথা শেষ হবার আগেই মাসীর তাড়া খেয়ে সবচেয়ে বড় খরগোসটা, যেটাকে আমরা পালের গোদা বলি, সেটা ল্যাংচাতে ল্যাচাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ফেদার ডাস্টার তুলে সেটাকে পেটাতে যাচ্ছিলেন। বড়মামা খরগোসটাকে তুলে নিয়ে বললেন,—'এই যে God, জীবে দয়া করার কথাটা বুঝি তোর শাস্ত্রে লেখা নেই! শুধু জিভে দয়াটাই বুঝেছিস, না?'

বড়মামা এক বগলে খরগোস অন্য বগলে আমাকে নিয়ে বাগানে চলে এলেন। বড়মামা জুট মিলের ডাক্তার। মিলের দুটো জোয়ান ছেলে বড়মামার চাকর কাম এডি-কং কাম কনফিডেনসিয়াল এড্ভাইসার। একজনের নাম রতন আর একজনের নাম প্রফুল্ল। রতনের মুখের ডানদিকে একটা গভীর কাটা দাগ লম্বা হয়ে ভুরুর কাছ থেকে দাড়ি অবধি নেমে এসেছে। মিল এলাকায় কে যেন ছোরা মেরেছিল বছর ছয়েক আগে। বড়মামা খুব জোর চোখটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রতনের ভগবান বড়মামা। প্রফুল্লর একবার কার্ডিং মেশিনে হাত ঢুকে প্রায় ছিঁড়ে গিয়ে কনুইয়ের কাছ থেকে ঝুলে গিয়েছিল। বড়মামা খুব কায়দা করে জোড়াতালি মেরে হাতটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

মেজমামার সখ ফুলবাগান। বড়মামার ফল বাগান। রতন আর প্রফুল্ল তার মালি। শ'খানেক নারকেল গাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। কেরালার গাছ। মাথায় বেশি বড়

হয় না। ছোটো ঝাঁকড়া গাছ। কাঁদি কাঁদি ডাব নেমে এসেছে। রতন তারই একটায় উঠে, পাতার আড়ালে ঢুকে ছিল, পা দুটো খালি দেখা যাচ্ছিল। প্রফুল্ল ছিল বাগানে। কোদাল পেড়ে মাটি কোপাচ্ছিল। বড়মামা বাগানে আসা মানে তিনটে কুকুরও পেছনে পেছনে এসেছে। এর মধ্যে লাকি সবার আগে, কারণ সে হল পেয়ারের কুকুর। তার সাতখুন মাপ।

বড়মামা বললেন,—'ওই দ্যাখ, রতন তোর জন্যে ডাব পাড়ছে। এক একটা ডাবের কতটা জল জানিস, ফুল দু' গেলাস, আর ইয়া পুরু নারকেল। তোর মেজমামার ক্ষমতায় কুলোবে, পারবে তোকে কেরালার ডাব খাওয়াতে? ওই তো বাগানের ছিরি, ক'টা দোপাটি, কলা ফুলের ঝাড়! প্রফুল্ল'—বড়মামা হাঁক ছাড়লেন। প্রফুল্ল কোদাল ফেলে, মিলিটারি কায়দায় এগিয়ে এল,—'শোন্, শিগ্‌গির্ মোল্লার হাটে যা, দু' কেজি ফাস্ ক্লাশ মাংস নিয়ে আয়, আর আনবি দই। জানিস কে এসেছে, হামারা ভাগনে।' প্রফুল্ল দৌড়লো হুকুম তালিম করতে। বড়মামার এক মুখ হাসি,—'এখান থেকে যখন ফিরে যাবি, তোর ওজোন চার কেজি বাড়িয়ে তবে ছাড়বো। তোকে মালটি ভিটামিন খাওয়াবো, ফেরাডল খাওয়াবো, বোতলে ভরা নেবুর রস খাওয়াবো, দুধটা এবার খাওয়াতে পারবো না, গরুগুলো খুব শয়তানি করছে।' তারপর ফিস ফিস করে বললেন.—'মেজোটার নজর লেগে দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, তার বদলে তোকে মোল্লারচকের দই খাওয়াবো।'

রতনের দাঁতে ছুরি কোমরে দড়ি বাঁধা, হনুমানের লেজের মতো ঝুলে এসেছে। কাঁদি কাঁদি সবুজ ডাব দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল।

মেজমামার যে কেন ঠিক এই সময়ে বাগানে আসার দরকার পড়ে গেল কে জানে। মেজমামার আবার সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। বিশেষত বড়মামার ব্যাপারে। দোপাটি গাছের চারায় বাঁশের কঞ্চির গোঁজ দিতে দিতে কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন বোঝা গেল না,—'এরা সব দেশের শত্রু, কচি কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। কেরালার কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। কেরালায় কচি ডাব পাড়া সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। ঝুনো হলে নারকেল হয়, ছোবড়া হয়। দেশের কাজে লাগে। তা না, বাবুরা ডাবের জল খাবেন। ডাবের জলে কি আছে! ঘোড়ার ডিম আছে!'

বড়মামা বেশ বড় করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—'বুনো ফুলগাছ করেছিস, তাই নিয়ে থাক। ডাব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ডাব আমি বুঝবো।'

—'তোমার ডাব মানে? গাছ আমাদের সকলের। জানো, তুমি কি অনিষ্ট করছ? দেশের কত বড় ক্ষতি করছ? নারকেল শুকিয়ে 'ফোপরা' হয়, সেই 'ফোপরা' থেকে নারকেল তেল হয়। নারকেল তেলের কিলো জানো?'

—'যা যা, তোর ফোপরা আর তেলের নিকুচি করেছে। ডাবের জল খেয়ে পেট ঠাণ্ডা হয়। 'বড়মামা একটা কাঁদির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন। মেজমামা বললেন,—'মাথা জোড়া যার টাক সে আর তেলের কি মর্ম বুঝবে! ছোবড়া থেকে কতরকম

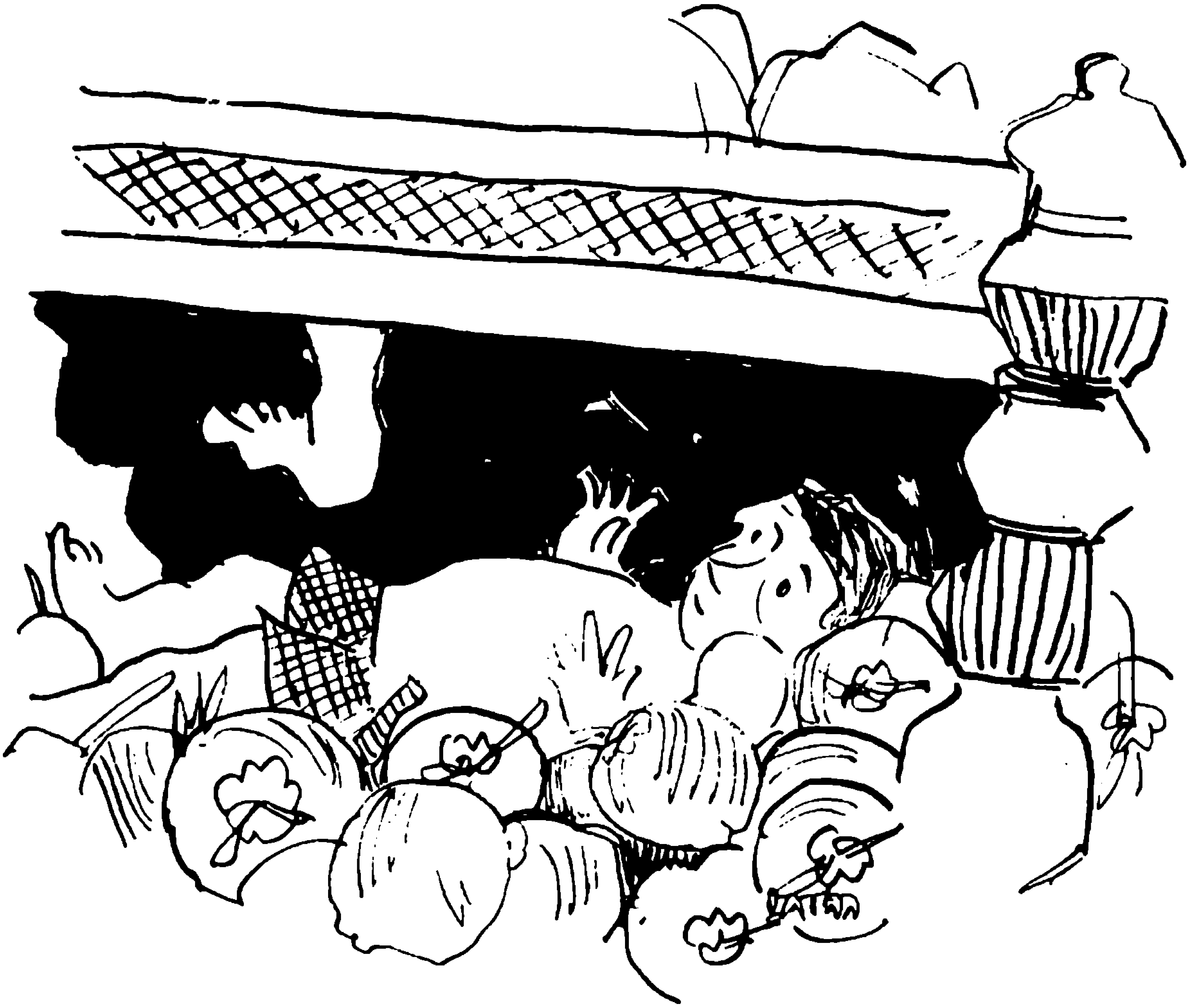

শিল্প হয় জানো? বিদেশে রপ্তানি করে কত টাকা রোজগার করা যায় জানো?'

—'আমার জেনে দরকার নেই। আমাতে আর আমার ভাগ্নেতে মিলে গেলাস গেলাস জল খাবো, দুরমো নারকেল খাবো ফুলো ফুলো মুড়ি দিয়ে।'

মেজমামা আগাছা পরিষ্কার করতে করতে বললেন,—'তাই নাকি? বার করছি তোমাদের ডাব খাওয়া, আমি কোর্ট থেকে ইনজাংসান দেওয়াবো।'

—'ইনজাংসান! বড়মামা হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন,—পাগলের পাগলামী বাড়িতে চলে বুঝেছিস্, কোর্টে চলে না। ঘাস ওপড়াচ্ছিস ওপড়া, অন্যের চরকায় তেল দিতে আসিস নি।'

রতনের উপর হুকুম হল,—'যা, সমস্ত ডাব তেতলায় আমার ঘরে খাটের তলায় নারকোল পাতা বিছিয়ে সাজিয়ে রেখে আয়। আর এখন থেকে বলে রাখছি তোর মেজোবাবু যদি কোন দিন বলে রতন পেট-গরম হয়েছে রে, একটা ডাব কাট তো। সোজা বলে দিবি, বাজারে গিয়ে খেয়ে আসুন। গাছের ডাব একটাও দিবি না। আমাকে আইন দেখাতে এসেছে, কোর্ট দেখাতে এসেছে।'

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো কে জানে, হঠাৎ বড়মামার এক রোগী এসে গেল। একটা বাচ্চা ছেলে নাকে ন্যাপথালিনের বল ঢুকিয়ে ফেলেছে। বড়মামা প্রথমে পাত্তা দিতে চান নি।—'ন্যাপথালিন, আরে ভালই তো, আস্তে আস্তে উড়ে যাবে, ভয়ের কি আছে।' ছেলের মা নাছোড়বান্দা,—উড়ে যেতে যেতে ছেলের এদিকে প্রাণ যায়, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। —'হাতের কাছে ওসব রাখো কেন?' বড়মামার ধমক। —'উপায় কি না রেখে। আমাদের যে ন্যাপথালিনের কারবার! সারা বাড়িতেই ছড়ানো।' বড়মামা বললেন,—'তাহলে বাড়িতে তো সব সময় একজন ডাক্তার রাখা উচিত, যেই বের করে দিয়ে আসবো পেছনে ফিরতে না ফিরতেই তো আবার ঢোকাবে।' ছেলের মা করুণ গলায় বললেন,—'আর একবার ঢুকিয়েছিল, নাকে চিমটে ঢুকিয়ে বের করে দিয়েছিলুম, এবার আর বেরোচ্ছে না, আপনি একটু দয়া করুন, ছেলেটাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, বড় হলে তারপর আনবো।'

পাড়ার কলে বড়মামা সিল্কের লুঙ্গির উপর একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি পরেই বেরিয়ে পড়েন। রতন পাঞ্জাবি আর ডাক্তারি ব্যাগটা নামিয়ে আনলো। বাড়িরই সাইকেল রিক্‌শা রেডি ছিল। রহমতুল্লা চালায়। বড়মামা কলে বেরিয়ে গেলেন। বাগানে আমি একা। লাকিটা তখন শুঁকে শুঁকে আমাকে টেস্ট করছে, আমার স্বভাব কি রকম। শুনেছি কুকুররা নাকি শুঁকেই বলে দিতে পারে মানুষটা চোর না সাধু।

মেজমামার আবার কুকুর দু চোক্ষের বিষ। নিজের ফুল বাগান থেকে হেঁকে বললেন,—'এদিকে আয়। একলা আসবি, ওই শয়তানটাকে আনবি না।' কুকুর যদি সঙ্গে সঙ্গে আসে আমার কি দোষ! মেজমামা এক দাবড়ানি দিলেন,—'তোকেও এবার কুকুরে পেয়েছে!'—'আমি কি করবো? পেছনে পেছনে আসছে যে!'—'ঠিক আছে তুই ওইখান থেকেই শোন, তুই কার দলে?'

কি উত্তর দেব, বললুম,—'নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্রও বলতে পারেন।'

—'নিরপেক্ষ তো বড়র পেছন পেছন ঘুরছিস কেন?' একটু ভেবে বললুম।

—'ঘোরাচ্ছেন তাই ঘুরছি।' মেজমামা বললেন,—'ঘুরবি না, চুপ করে বসে থাকবি ঘরে, তুই আমাদের কমন ভাগ্নে।' এমন জানলে কে আসতো মামার বাড়িতে! দরকার নেই বাবা, মামার বাড়ির আদরে। আমি যে এখন কোন দলে যাই! মাসীর কাছে যে ভিড়বো তারও উপায় নেই। তিনি তো সারাদিন রবীন্দ্রসংগীত আর নাচ নিয়েই ব্যস্ত। আর মাঝে মাঝে সময় পেলেই খরগোসে লাথি। লাথি মারার মত খরগোসের অভাব বড়মামা রাখেননি।

সকালের খাওয়া যেমন গুরুপাক হল, রাতের খাওয়াও কিছু কমতি হল না। দুপুরে আবার গোটা দুই ডাবের জল! সব মিলিয়ে টইটম্বুর ভরা নদীর মত অবস্থা। রাতের খাবার পর একটা বিশাল দাঁড়ানো টেবল ল্যাম্প জ্বেলে মেজমামা মোটা একটা দর্শনের বইয়ে ডুবে গেলেন। সংসারে তখন কে কার। দু'বার পাশে ঘুর ঘুর করলুম, মনে হল

মেজমামা যেন চেনেনেই না। দিশি কাপড়ের কোঁচার খুঁট কারপেটে লুটোচ্ছে। বড়মামার সবচেয়ে বড় খরগোসটা সোফার তলায় শরীর ঢুকিয়ে কোঁচার খুঁট চিবোচ্ছে। মেজমামাকে বললুম। গ্রাহ্যই করলেন না। শেষে বললেন, যা বললেন তার মানেও বুঝলুম না, সংসারে কিছুই চিরকাল থাকে না। শরীরটাই যখন চলে যাবে তখন তুচ্ছ কোঁচার খুঁট। আবার সকালেই চায়ের টেবিলে মেজমামার অন্য রূপ দেখবো। কাঁধে ঝাড়ন। এটা ঝাড়ছেন ওটা ঝাড়ছেন। তখন এই চিবোনো কাপড় নিয়ে বড়মামার সঙ্গে ধুম লেগে যাবে। মাসীমাকে হুকুম হবে, 'আজই খরগোসের রোস্ট বানা।'

রাত ১১টা নাগাদ বড়মামা বললেন,—'চল এবার শোয়া যাক।' আমি একটা শোফার উপর ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। ঘুম চোখেই সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে তিন তলায় উঠে এলুম। পিছু পিছু লাকি। বড়মামার হাতে পাঁচ সেলের একটা টর্চ। বড়মামার ঘরটা বেশ বড়ই। বিশাল একটা খাট। খাটের তলায় ডাবের গোডাউন। চারিদিকে বড় বড় জানালা। দুটো জানালা ছাদের দিকে। সারা ছাদ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে। পিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

ছাদের দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিলেন।—'বন্ধ করছেন?'

—'তোর তো আবার সর্দির ধাত।' বড়মামার উত্তরে অবাক হয়ে গেলুম, —'কে বললে আমার সর্দির ধাত।' বড়মামা বললেন,—'আমি জানি। জানিস আমি ডাক্তার।' 'তা জানি, কিন্তু আমার সর্দিকাশি বহু বছর হয়নি।' আমি একটু প্রতিবাদ করে ফেললুম। বড়মামা বললেন,—'দেখি তোর নখ।' অবাক হয়ে হাতের দশটা আঙ্গুল টর্চের আলোর তলায় মেলে ধরলুম।—'এই দেখ', 'বড়মামা দেখালেন,—দেখছিস নখের উপর সাদা ফুল। ক্যালসিয়ামের অভাব। সর্দি তোর হবেই, হতে বাধ্য। দাঁড়া, আমার গরুর দুধ হোক। দুধ খাইয়ে তোর সর্দি সরিয়ে দেবো।'

বিছানার উপর কেমন চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ছিল। জানালা বন্ধ করে বড়মামা চাঁদের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিলেন।—'কেমন চাঁদের আলো আসছিল সমুদ্রের জলের মত,' আমি খুঁতখুঁত করে উঠলুম।—'চাঁদের আলো!' বড়মামা চমকে উঠলেন,— 'চাঁদের আলো গায়ে লাগলে কি হয় জানিস।' কি হয় কে জানে! বড়মামার ব্যাখ্যা,— 'চাঁদের আলো বেশি গায়ে লাগালে চর্মরোগ হয়।' তর্ক না করে শুয়ে পড়লুম। পাতলা মশারি নেমে এল। দুটো বালিশের মাঝখানে টর্চলাইট। লাকি চলে গেল ঘরের কোণে তার নিজের জায়গায়।

বড়মামার হাই উঠলো।—ঘুমোলি নাকি?—না।—ভূতের ভয় আছে! গা-টা একটু ছম ছম করে উঠলো।—ভয় নেই, আমি আছি, টর্চ আছে।—ভূত আছে নাকি? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম। 'থাকতে পারে, তাই তো ছাদের দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিলুম।' বড়মামার আর একটা হাই উঠলো।—'আজ তুই পাশে আছিস, ভূত এলে দু'জনে

লড়বো। অন্যদিন একলা থাকি তো, একটু ভয় ভয় করে। স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ আর খাইনি।'

বড়মামার কথায় ঘুম চমকে গেল। টর্চটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিলুম। ভূত তাড়াবার দাওয়াই। আমার ঘুম আসার আগেই, বড়মামার নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। বেশ মিঠে ডাক। ফুড়ুত, ফুড়ুত, ফুড়্, ফুড়্, ফুড়ুত। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নিজেই জানি না। হঠাৎ কোঁক করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুকের উপর দুম করে এটা কি পড়ল! ভয়ে ভয়ে হাত দিলুম। বড় বড় লোম। কি এটা! ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে যাবার জোগাড়। শেষে আবিষ্কার করলুম বড়মামার হাত। হাতটাই দমাস করে বুকে পড়েছে। হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলুম। একবার ঘুম ভেঙে গেলে ঘুম কি আর আসতে চায়! ছাদে যেন একটা খড় খড় আওয়াজ হল। ক'টা বাজল কে জানে! চোখ চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ বড়মামার হাতটা উপরে উঠলো, এইবার পড়ছে, পড়ছে, উরে বাবা, আমার বুকের দিকে নেমে আসছে, তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে খাটের সীমানায় সরে গেলুম। হাতটা দুম করে পাশে পড়ল। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলুম। এরপরই দুম করে বড়মামা একটা পা ছুঁড়লেন। নেহাৎ সীমানার বাইরে ছিলুম। তা না হলে ফুটবল হয়ে যেতুম।

আড়ষ্ট হয়ে, সেই খাটের সীমানায়, বড়মামার হাত আর পায়ের ধাক্কা থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে আবার কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন ছোটনাগপুরের কোনো এক প্রান্তরে অজস্র টিলার উপরে শুয়ে আছি। সবটাই অসমতল, ভীষণ লাগছে। মাঝে মাঝে ছুরির ফলার মত কি যেন ঘাড়ের কাছের নরম জায়গায় খোঁচা মারছে। ঘুম ভেঙে গেল। এ কি! আমি কোথায় শুয়ে আছি। মাথা উঁচু করতে গেলুম। উঃ! মাথা ঠুকে গেল। ঘরের ছাদটা মাথার এত কাছে নেমে এল কি করে। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো। আমি পড়ে আছি খাটের তলায়। ডাবের গাদার উপর। নারকেল পাতার খোঁচা লাগছে ঘাড়ের কাছে। বড়মামার বিশাল একটা পা মশারি ভেদ করে খাটের পাশে ঝুলছে। মানে, বেশ মোক্ষম লাথিই আমাকে খাট থেকে ডাবের গাদায় ফেলে দিয়েছে।

খাটে ওঠার আর চেষ্টা করলুম না। বড় বিপজ্জনক জায়গা। বড়মামার দুটো হাত আর পা'র মহড়া নেবার মত শক্তি আমার নেই। তার চেয়ে কেরালার ডাবের উপর শুয়ে থাকাই ভাল। একটু অসমতল। তা আর কি করা যাবে। ভোর হতে আর কতই বা দেরী। বেশ আরামেই ঘুমিয়ে পড়লুম আবার। মাথার উপর খাটের ছাদে বড়মামা সারা রাত অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠলেন! আমি তখন ছাদে হাওয়া খাচ্ছি।

হাড়ের নস্যির ডিবে থেকে এক টিপ নিস্য নিতে নিতে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন,—'কেমন ঘুমোলি বল, ফাস্‌ক্লাশ।' লাকি বেড়ে লেজটা দু'বার নাচিয়ে দিল।

বড়মামার সাইকেল

বড়মামা সাইকেলের বল বেয়ারিং-এ তেল দিচ্ছিলেন। মেজমামা রকে জলচৌকির উপর আয়না রেখে ছোট মত একটা কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন। আমি একটা বেতের মোড়ায় বসে বড় মামার সবচেয়ে বড় খরগোসটার অপকর্ম দেখছিলাম। সেটা একটা জুতো পরিষ্কার করার বুরুশ কুড় কুড় করে খাচ্ছিল! ভেবেছিলাম সরিয়ে নেবো। তারপর মনে হল কাজটা ঠিক হবে না। এ বাড়ির পশুদের স্বাধীনতায় বাধা দেবার মত ডিক্‌টেটার যখন কেউ নেই, আমি তো একটা নেহাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার।

তেল দেওয়া শেষ। বড়মামা চাকা দুটোকে বাঁই বাঁই করে বারকতক ঘুরিয়ে সাইকেলটাকে দেওয়ালে ঠেসিয়ে রাখলেন। তেল দেবার কেলে ডিবাটাকে পাঁচিলের ফোকরে রাখতে রাখতে বললেন—'সাইকেল চাপবে সব ব্যাটা, তেল দিয়ে মরবে সুধাংশু ব্যাটা। কেন? কেন শুনি!' বুঝলাম কথাটা বলা হচ্ছে মেজমামাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। মেজমামার হাতের কাঁচির কুটকুট শব্দ থেমে গেছে। কান দুটো খাড়া খাড়া। কাঁচিটা চৌকির উপর রেখে বললেন—'তেল ছাড়াই সাইকেল চলে। তেল দেওয়া যাদের অভ্যাস তারা কিছু না পেলে সাত সকালে সাইকেলেই তেল দেবে। মানুষের নেচার। নেচার তো আর পাল্টানো যাবে না।'

কিছুদূরে কলকলায় বড়মামা হাতে সাবান ঘষতে ঘষতে শুনলেন। শুনে সাবান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—'গোঁফ ছাঁটচিস ছাঁট। সুধাংশু মুকুজ্জের চরকায় তেল দিতে আসিসনি। সুধাংশু মুকুজ্জে কবে কাকে তেল দিয়েছে রে! আই অ্যাম এ সেলফ্‌মেড ম্যান।'

মেজমামা কাঁচিটা হাতে তুলে নিলেন। ফুঁ দিয়ে কুঁচো ওড়াতে ওড়াতে বললেন—'মিথ্যে বল না। এইমাত্র সাইকেলে তেল দিচ্ছিলে। বরং বলতে পার আমি একটা লোক যে কাউকে তেল দেয় না, এমন কি সাইকেলেও নয়।'

মেজমামার কথার কেরামতির সামনে বড়মামা প্রায়ই একটু অপ্রতিভ মত হয়ে পড়েন। ঠিক পেরে ওঠেন না। আজও তাই হল। সত্যই তো তেল দিচ্ছিলেন সাইকেলে। এই মাত্র, একটু আগে। নিজেই মেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন—তেলের ব্যাপারটা তাঁরই। বড়মামা কলের তলায় হাত পেতে চারদিকে ছেলেমানুষের মত খানিক জল ছিটোলেন তারপর তারে ঝোলান তোয়ালের এক কোণে হাত মুছতে মুছতে দেরিতে হলেও জবাবটা যেন খুঁজে পেলেন—'তুইও একটি জায়গায় তেল দিস এবং ভাল করেই দিস।'

মেজমামার হাতের কাঁচি আবার থেমে গেল। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—'আমি! আই নেভার টাচ অয়েল।'

—'হ্যাঁ, তুমি। 'বড়মামা গলাটা একটু বিকৃত করে বললেন—'তুমি রোজ সকালে চানের আগে তোমার নাইকুণ্ডুলে আধবাটি তেল ঢাল। সকলে জানে। জিজ্ঞেস করে দেখ তুমি সকলকে!'

—'সে তো নিজের শরীরে, স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। এ তেল কি সে তেল নাকি। অয়েলিং মাই ওন মেশিন।' —'ওই হল রে। নিজেকে নিজে যারা তেল দেয় তারা ভয়ঙ্কর লোক। ভয়াল, ভয়ংকর অজগর সর্প' বড়মামা মুখটাকে হাঁ মত করে হাত-পা নেড়ে মেজমামার ভয়ঙ্কর চরিত্রটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

এইবার বড়মামার নজর পড়ল আমার দিকে। মোড়ার উপর পা গুটিয়ে বসে বসে মজা দেখছিলুম। খরগোসটা জুতো-ঝাড়া বুরুশটাকে টানতে টানতে প্রায় পায়ের কাছে এনে তিনের চার অংশই মেরে দিয়েছে। গোঁফের সঙ্গে বুরুশের চুল জড়িয়ে আছে।

—'তুই এখানে বসে বসে চোরের মতো কি করছিস? তোকে আমি সেই সকাল থেকে গরু খোঁজা খুঁজছি।'

—'আমি তো সারা সকাল এখানেই বসে আছি। দেখতে পান নি।'

—'দেখার কি উপায় আছে। অতবড় একটা পর্বতের আড়ালে বসে আছিস। তিন ঘণ্টা ধরে শুধু গোঁফই ছেঁটে যাচ্ছে। গোঁফের জন্যে জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

মেজমামা হাঁটু খুলে মেঝে থেকে উঠতে উঠতে একটু টাল খেয়ে পড়ে যাবার মত হলেন। অনেকক্ষণ পা মুড়ে বসে থাকার জন্যেই বোধহয়। সেই টাল খাওয়া অবস্থাতেই মেজমামা বললেন,—'তুমি গোঁফের মর্ম কি বুঝবে বল? তোমার তো সব চাঁছা ছোলা—প্লেন। পুরুষের মত পুরুষ যারা তাদের সব ইয়া ইয়া গোঁফ। গোবর, গামা, বড়ে গোলাম আলি, আখতার সিং, অবতার সিং, স্বর্ণ সিং। তুমি সুধাংশু মুখুজ্জে, তোমার না আছে গোঁফ, না আছে দাড়ি। 'মেজমামা বেকায়দা অবস্থা থেকে কথা বলতে বলতে সটান উঠে দাঁড়ালেন, এক হাতে আয়না অন্য হাতে কাঁচি। এতক্ষণ আমার উপর নজর পড়েনি, এইবার পড়ল।

—'তুইও আমার মত গোঁফ রাখবি! গোঁফ না রাখলে পুরুষ মানুষকে মেনি বেড়ালের মতো দেখায়।'

বড়মামা জুতো পরছিলেন। এক পায়ে জুতো, অন্য পা রকের কোণায় ঘষে ঘষে ধুলো ঝাড়ছিলেন। মেজমামার মন্তব্যে উত্তর না দিয়ে পারলেন না,—'ডাক্তারদের তোর মত গুঁপো হলে চলে না বুজেছিস। আমার মুখ দেখে রোগীদের আদ্দেক অসুখ সেরে যায়। আমার মুখখানা দেখেছিস! অনেকটা যিশুর মত। এ মুখ দেখলে মানুষ ভরসা পায়, তোর মুখ দেখলে ভিমরি যায়।'

মেজমামা একটা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, তারপর একখানা সংস্কৃত ছাড়লেন—'অমৃতং বাল ভাষিতং। 'দুম্ দুম্ করে এগিয়ে গেলেন কলের দিকে, যাবার সময় একহাত দিয়ে তার থেকে তোয়ালেটা টেনে নিলেন। গোটা কয়েক হ্যাঙার ঝুলছিল। পাকা আমের মত টপাটপ পড়ে গেল। বড়মামার কুকুর লাকি এক পাশে মৌজ করে শুয়েছিল। একটা পড়ল তার ঘাড়ে। সে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। খরগোসটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাল।

জুতো পরা শেষ। বড়মামা বললেন—'চল। তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিলুম।'—'কোথায় যাবেন?'

—'চল চল। কলে যাবো। সাইকেলের কেরিয়ারে বসতে পারবি তো?'

—'কেন পারবো না?'

মেজমামা মুখে জল থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন,—'কেন ছেলেটাকে খানায় ফেলবে। তোমার তো ব্যালেন্স নেই। বেশ বসে আছে চুপচাপ। কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোবে।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন—'যাবি না তুই?'

মহা বিপদে পড়লাম। কার কথা শুনি। আমি কিছু বলার আগেই মেজ-মামা বললেন,—'না না, তোমার সঙ্গে ও কোথায় যাবে? ওর জীবনের দাম আছে।'

বড়মামা গম্ভীর গলায় বললেন—'উত্তরটা আমি ওর কাছ থেকেই শুনতে চাই। নট ফ্রম এনি থার্ড পার্সন। 'বড়মামা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন,—'আশু ময়রার বাড়িতে কল আছে। এই বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবে। একলা আর কত খাবো। তুই তবু কাছে থাকলে খাওয়ার ব্যাপারে একটু হেলপ্ করতে পারবি। চল, উঠে পড়। রোদ চড়ে যাচ্ছে।'

মোল্লারচকে আশু ময়রার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। লোভ সামলানো মুশকিল। উঠে পড়তে হল। মেজোমামা বললেন,—'ডাক্তার আমি অনেক দেখেছি, তবে এমন পেটুক ডাক্তার বড় একটা দেখা যায় না। সেদিক থেকে তুমি অবশ্যই দর্শনীয় বস্তু। ডাক্তার না হয়ে বামুন হওয়াই উচিত ছিল।'

'ডিস্‌পেপসিয়ায় সারা জীবন ভুগলে সুস্থ মানুষকে পেটুক বলেই মনে হবে। তোর দোষ নেই রে, তোর ভাগ্যের দোষ। সারা জীবন ঘুমিয়েই কাটালি। একটু ব্যায়াম করলি না। বদ হজমে মানুষের মাথায় ঠিক থাকে না। আর পাগলে? পাগলে কিনা বলে। বাকিটা তুই বল?' বড়মামা আমার ডান কানটা মুচড়ে দিলেন।

'ছাগলে কিনা খায়—বলে পাদ-পূরণের সাহস হল না। মেজমামাকে ছাগল বলাটা খুব গর্হিত কাজ এই বুদ্ধিটা অন্তত আমার আছে। বড়মামা ইতিমধ্যে সাইকেলটাকে হাঁটাতে

হাঁটাতে বাড়ির বাইরে বাগানে গিয়ে পড়েছেন। সামনের রডে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকানো কালো রঙের ডাক্তারি ব্যাগ। গলার দু'পাশে বুকের উপর ঝুলছে বুক-দেখা যন্ত্র। লম্বা চওড়া ফরসা চেহারা। মুখে সব সময় একটা হাসি লেগেই আছে।

বড়মামা পকেট থেকে কাগজে মোড়া দুটো পিপারমিণ্ট লজেন্স বের করলেন। একটা আমাকে দিলেন। মোড়ক খুলে অন্যটা নিজের মুখে ফেলে দিলেন,—'বুঝলি, সব সময় নিজেকে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত রাখবি। একদম আইড্‌ল থাকবি না। যখন কোন কাজ নেই তখন লজেন্স খাবি। নে উঠে বস। দু'পাশে পা ঝুলিয়ে দে আর কেরিয়ারের

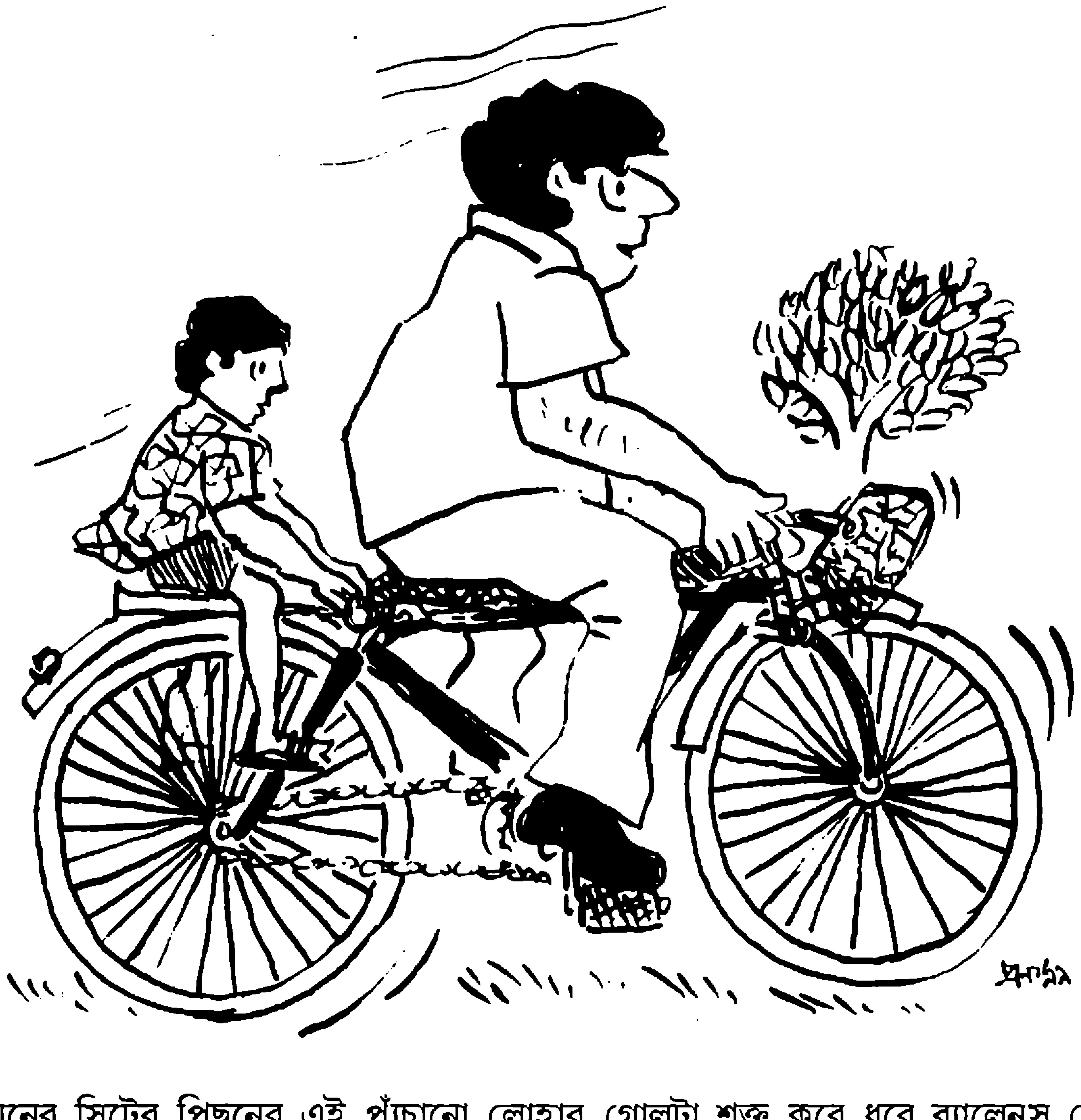

সামনের সিটের পিছনের এই প্যাঁচানো লোহার গোলটা শক্ত করে ধরে ব্যালেন্‌স রেখে বস। ছটফট করবি না। বারে বারে ঘাড় ঘোরাবি না।'

বড়মামার সাইকেল চলল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। ঝাঁকুনিতে হ্যাণ্ডেলের বেলটা টিন টিন শব্দ করছে। মাঝে মাঝে সাইকেলটা লগবগ করে উঠছে। বড়মামা বলছেন,—'ভয় পাবি না একদম।' দূরে রাস্তা জুড়ে একটা গরুর গাড়ি আসছে। দু'পাশে বিশাল

নর্দমা। আমি একটু মিনমিনে গলায় বললুম,—'বড়মামা নর্দমা।' বড়মামা বললেন,—'স্টেডি থাক, দেখ-না নর্দমার পাশ দিয়ে কায়দা করে সুট করে বেরিয়ে যাবো। তুই বরং চোখ বুজে থাক।'

চোখ বুজতেই মেজমামার কথা মনে পড়ে গেল—'কেন ছেলেটাকে মারবে।' বড়মামা বললেন,—'পা দুটোকে ছড়াসনি, গরুর গাড়ির চাকায় ঘষে যাবে, ক্লোজ করে রাখ।' পাশ দিয়ে হাওয়ার মত কি একটা বেরিয়ে গেল। চোখ বুজলাম। গরুর গাড়ি পেরিয়ে এসেছি। সামনে ফাঁকা রাস্তা সটান বেরিয়ে গেছে। বড়মামা সাইকেলে স্পিড দিলেন। বললেন,—'দেখলি তো, একে বলে সাইকেল চালানো। আমিও চোখ বুজে ছিলুম। ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। আমার ঠাকুমা শিখিয়ে গিয়েছিলেন।'

—'আপনি চোখ বুজিয়ে ছিলেন?'

—'হ্যাঁ রে। তা না হলে তো খানায় পড়ে যেতুম। ঠাকুরমার শিক্ষা আজো ভুলিনি।'

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সাইকেলের পিছনে বসে রইলুম। ঠাকুমা কি মারাত্মক শিক্ষা বড়মামাকে দিয়েছিলেন! বড়মামা এখন গুন গুন করে গান গাইছেন,—'কি রে ঘুমোলি নাকি?'

—'সাইকেলে বসে কেউ ঘুমোয় নাকি?'

বড়মামা হাসলেন,—'আমি তখন তোর মত ছোটো। বাবার সাইকেলের পেছনে বসে তুই যেমন চলেছিস আমিও চলেছি বাবার সঙ্গে কলে। সময়টা কেবল তফাৎ। সকাল নয় রাত্রি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হাত আল্‌গা হয়ে ধপাস্! ওদিকে বাবাও চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। টের পাননি আমি পড়ে গেছি। বাবার আবার ভীষণ ভুলো মন। রুগীর বাড়ি গিয়ে খেয়ালই হয়নি যে আমি সঙ্গে ছিলুম। রুগীটুগি দেখে ঘুর পথে বাবা বাড়ি চলে এসেছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন—ন্যাড়াকে কোথায় রেখে এলে? বাবা তখন খেতে বসতে যাচ্ছেন। লাফিয়ে উঠলেন—তাই তো?'

ঝগড়া করতে করতে দুটো কুকুর সাইকেলের সামনে চলে এসেছে। বড়মামা কায়দা করে কাটাতে গেলেন। ভীত কুকরটা পালাল। মোটা কেলে কুকুরটা সামনের চাকায় এসে পড়ল। তারপর কি হ'ল বোঝা গেল না, কুকুরটার একটা পা জড়িয়ে গেল স্পোকের সঙ্গে। বড়মামা, আমি এবং কুকুর তিনজনেই ডিগবাজী খেয়ে রাস্তার ধারের ঘাসের উপর পড়ে গেলুম। সাইকেলটা ঘাড়ের উপর শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়েই বড়মামা বললেন—'আমার দোষ নেই। দেখলি তো কেলে ব্যাটা চাকায় জড়িয়ে গেছে। তুই বলতে পারবি না যে আমি ফেলে দিয়েছি। 'বড়মামা প্রথমে উঠলেন ধুলোটুলো ঝেড়ে। আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন। সাইকেলের চাকায় পা জড়ানো অবস্থায় কুকুরটা তখন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে চলেছে।

রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে বড়মামা কুকুরটার অবস্থা ভাল করে দেখলেন। আমি বড়মামার চেয়ে আর একটু দূরে দাঁড়য়ে দেখলুম, ডান পা'টা চাকার স্পোকে পাকিয়ে গেছে,—'বড়মামা?'

—'বল?'

—'দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ তো ছাড়ানো যাবে না। ছাড়াতে গেলেই কামড়ে দেবে।'

—'হুঁ, বলেছিস ঠিক। এ রকম ঘটনা আগে কখনো দেখেছিস?'

—'না বড়মামা। এ জিনিস দেখা যায় না। পা'টা বোধ হয় অ্যামপুট করতে হবে।'

বড়মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন,—'কি যে বলিস? ডাক্তার হয়েছি কি করতে? দেখছিস কুকুরটার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে?'

—'তুমি ওর চিৎকারটা বন্ধ করতে পার?'

বড়মামা উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে আবার দুটো লজেন্স বেরোলো। একটা আমার। একটা বড়মামার। লজেন্সটা চুষতে চুষতে বড় মামা বললেন—'আমার কেরামতিটা একবার দেখ।'

—'হাত দেবেন নাকি?'

—'দেবো, তবে একটু পরে।'

সাইকেল থেকে ডাক্তারি ব্যাগটা খুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে বেরোলো ইঞ্জেকসানের সিরিঞ্জ, ওষুধের অ্যাম্‌পুল। শুনেছি, কুকুরে কামড়ালে পেটে ইঞ্জেকসান নিতে হয়। ভাবলুম, বড়মামা বোধহয় আগেই নিজের পেটে ছুঁচ ঢুকিয়ে তারপর কুকুরটাকে ধরবেন। কারণ ধরা মাত্রই কুকুর কামড়ে ছিঁড়ে দেবে।

না। বড়মামা করলেন কি, কুকুরটার পাছায় পুট্ করে ছুঁচটা ঢুকিয়ে দিলেন।

—'কি লাগালুম বল তো? মরফিয়া, কুকুরটা ঘুমিয়ে পড়বে দেখবি।' কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরটা লটকে পড়ল। বড়মামা আস্তে আস্তে পা-টা বের করে আনলেন। শোচনীয় অবস্থা। পা-টা পেঁচিয়ে গেছে।

—'একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে আনতে পারিস?'

দূরে একটা বেড়ার ধারে জিওল গাছ হয়েছিল। একটা ডাল তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে নিয়ে এলুম। বড়মামার ব্যাগ থেকে চওড়া ব্যাণ্ডেজ বেরোলো। ডাল দিয়ে টাইট করে কুকুরটার পা ব্যাণ্ডেজ করা হল।

—'নে, ধর।'

চ্যাংদোলা করে একটা ঝোপের ধারে কুকুরটাকে শুইয়ে দেওয়া হল। কখন জ্ঞান হবে কে জানে। বড়মামা বললেন—'চড়া ডোজ দিয়েছি। বিকেলের আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গিয়েছিল। সামনের চাকার উপর ঘোড়ার মত বসে দু'হাত দিয়ে বড়মামা হ্যাণ্ডেলটা ঠিকঠাক করলেন। সাদা প্যাণ্টে খাবলা খাবলা ধুলো। বড়মামাকে তখন ডাক্তার নয়, মিস্ত্রীর মত দেখাচ্ছিল।

—'বিকেলে আবার কুকুরটাকে দেখে যেতে হবে। জায়গাটা মনে রাখিস। কালভার্টের ধারে ভাঁট ফুলের ঝোপ।'

সাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন—'ইস্, ভীষণ দেরি হয়ে গেল রে, আমার রুগী বোধহয় এতক্ষণ টেঁসে গেল।'

বড়মামার সাইকেল এবড়োখেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে হুড়মুড় করে চলল। আমি ভয়ে সিঁটকে বসে রইলুম। একবার আছাড় খেয়েছি, আর একবার খেতে কতক্ষণ! হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে, বেশ জ্বালা করছে। ঘাড়টা মটকে গিয়ে ভীষণ ব্যথা করছে।

—'তোর কোথাও লেগেছে নাকি রে।'

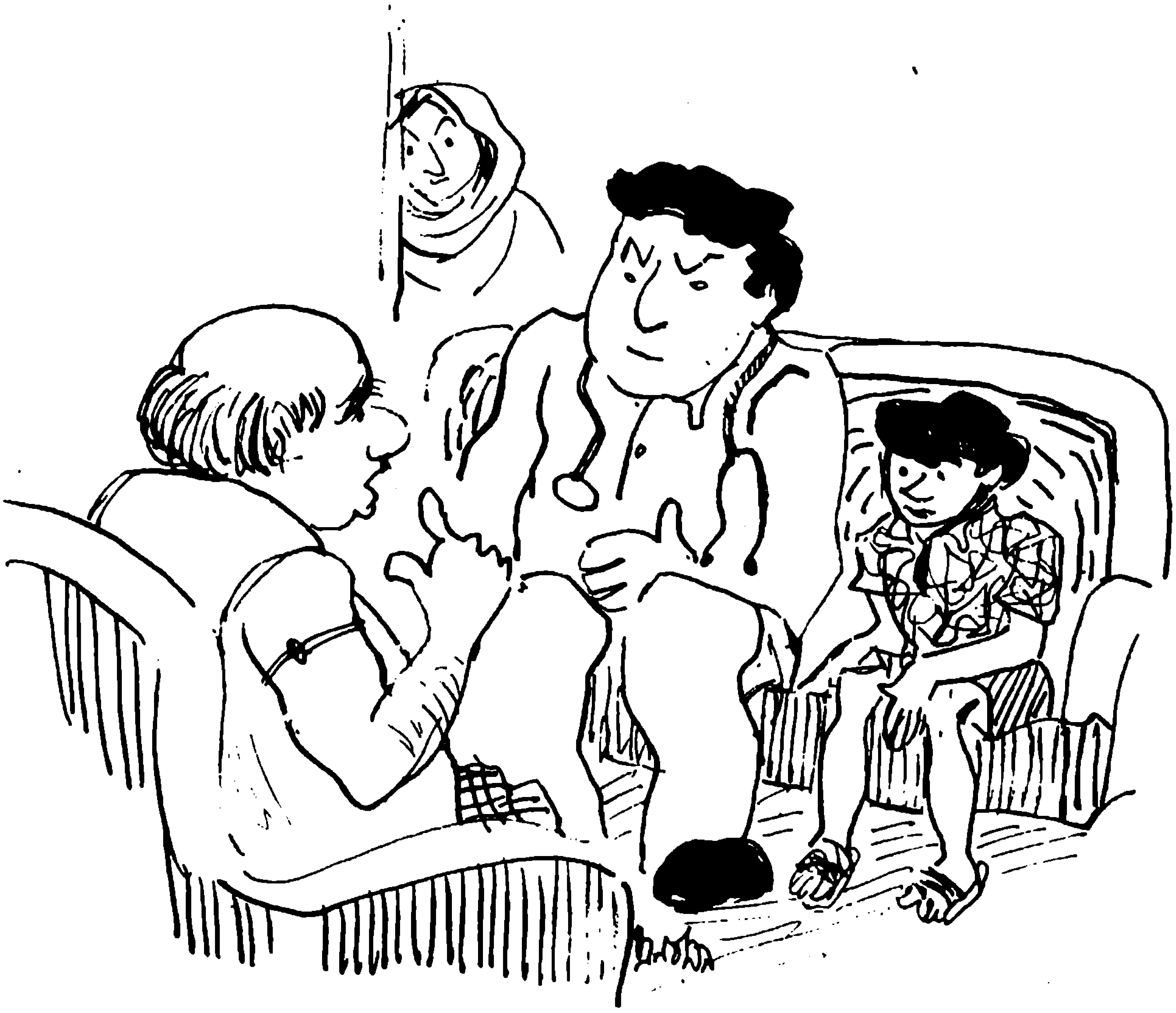

হাসি হাসি গলা করে বললুম—'না বড়মামা। খুব একটা লাগেনি।'

—'লাগবে কি করে বল, আমরা তো আস্তে আস্তে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লুম, তাই না? মেজোকে কিন্তু একটা কথাও বলবি না। বললে হৈ হৈ করে বাড়ি মাথায় করবে।

একটা লাল রকওলা বড় বাড়ির সামনে বড়মামা সাইকেল থেকে নামলেন। মার্বেল পাথরের ফলকে লেখা, 'পঞ্চী লজ'। রকের পাশে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে আমের আঁটি চুষছিল। বড়মামাকে দেখে, 'ডেক্তার এসেছে, ডেক্তার এসেছে'—

বলে বাড়ির ভেতর দৌড়ল। বড়মামা সাইকেলটা ঢোকাচ্ছেন, বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, মিশকালো বিশাল মোটা এক ভদ্রলোক। বেঁটে, মাথার চুল কাঁচাপাকা, পালোয়ানের মত ছাঁট। পাকা পুরুষ্টু দু'জোড়া গোঁফ ঠোঁটের উপর কাঠবিড়ালীর ল্যাজের মত বসে আছে। পরনে লাল গামছা, গায়ে একটা হলদেটে রঙের টাইট ফতুয়া। ভুঁড়িটা ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। খালি পা।

—'এস এস, ডাক্তার এস,' গরিলার থাবার মত দুটো হাত তুলে বড় মামাকে সাইকেল সুদ্ধ জড়িয়ে ধরেন আর কি! বড়মামা কোনো রকমে রক্ষে পেলেও আমি পেলুম না।

—'খোকাটি কে?' যেই বড়মামা বললেন,—'ভাগ্নে,' ভদ্রলোক আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জমি থেকে ফুটখানেক উপরে তুলে দুম করে ছেড়ে দিলেন।—'কোনো ওজন নেই ডাক্তারবাবু। এক্কেবারে দুবলা। খায়-টায় না নাকি।'

সাইকেলটা উঠোনের কোণে দাঁড় করাতে করাতে বড়মামা বললেন,—'আর বলবেন না, আমাদের বংশের কলঙ্ক। খাচ্ছে দাচ্ছে, কোথায় যে সব যাচ্ছে। গায়ে কিছুই লাগছে না। ব্যাটার পেটে বোধহয় ক্রিমির বংশ আছে। দাঁড়ান না, আমার পাল্লায় পড়েছে, ক্রিমির বংশ ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

—'ক্রিমি!' আশুবাবু শব্দটাকে এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যেন তাঁর পায়ের কাছেই গোটা কতক ঘুরে বেড়াচ্ছে।—'রোজ সকালে এক গেলাস করে নিমপাতার রস খাওয়ান না। আমার ছোট নাতিটার হয়েছিল। সারাদিন খাই খাই করত, এখন রোজ দশটার বেশি সন্দেশ খায় না।'

আশুবাবুর সারা গায়ে একটা টকটক ছানার জলের গন্ধ। ছানার জিনিস সুস্বাদু, কিন্তু গন্ধটা সহ্য করা শক্ত।

—'কার অসুখ, আশুবাবু!' এবার ডাক্তারের মত গম্ভীর গলা বড়মামার!

আশুবাবু হাত কচলে অপরাধীর মত গলায় বললেন,—'আমার অসুখ।'

চলমান পাহাড়ের মত আশুবাবুর গামছা আর ফতুয়া পরা শরীরের দিকে বড়মামা অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে রইলেন। আশুবাবু বড়মামার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন, ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করছেন না।

উঠোনের চারদিকে চওড়া লাল রক, চকচকে তেলা। একদিকে গোটাকতক দামী পুরু সোফা। আশুবাবু বড়মামা আর আমাকে নিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন। বসতে বসতে বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন,—'কি, হয়েছে কি?'

—'মেয়েরা বলছে, ভূতে ধরেছে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে অন্য রকম। ওরা সব রোজাও এনেছিল। ওই ব্যাটা দক্ষিণ পাড়ার পরশুরাম। অনেক টাকার ধার খেয়ে রেখেছে আমার দোকান থেকে। সেই ঝালটাই আমার উপর রোজা সেজে ঝাড়ল। কি ঝ্যাঁটাটাই যে পিটেছে আমার পিঠে, এই দেখো ডাক্তার।' আশুবাবু ছলছলে চেখে পিঠ খুলে বড়মামাকে দেখালেন। কালো কুচকুচে চওড়া পিঠে দাগড়া দাগড়া ঝ্যাঁটার দাগ।

—'ঝাঁটাটা নতুন ছিল, না পুরানো?' বড়মামার অন্য ধরনের প্রশ্ন।

—'পুরানো ঝাঁটা ডাক্তার। এক্কেবারে মুড়ো খ্যাংরা। আমার নিজের পরিবার উঠোনের কোণ থেকে নিজে হাতে করে সেই শয়তানটার হাতে তুলে দিলে। এও এক প্রতিশোধ।'

পিছনে দরজার পাশে চুড়ির শব্দ হল প্রথমে, তারপর শোনা গেল একখানা গলার মত গলা। মনে হল, আট রকমের বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে আট রকমের সুরে বাজছে,—'বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে। প্রতিশোধের কি হয়েছে। আত্মায় ভর করল, ভালর জন্যে রোজা ধরে আনলুম। কথা দেখ! বলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

—'শোনো ডাক্তার, তুমিই এর বিচার কর।'

আশুবাবু চোখের জল মুছে তেড়ে মেড়ে উঠলেন,—'তুমি তিথি করতে যাবার জন্যে টাকা চেয়েছিলে—হ্যাঁ কি না।' সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেল।

বড়মামা বিচারকের আসনে।

উত্তর এল দরজার পাশ থেকে—'হ্যাঁ।'

—'আমি কি বলেছিলুম?'

—'হাতে টেকা নেই, তিথি এখন মাথায় থাক। গঙ্গার ধারে শিবের মন্দিরে জল ঢাল। তারপর গুন গুন গ্যান গেয়েছিলে—গয়া গঙ্গা পেভাসাদি ক্যাশী ক্যাঞ্চি কেবা চায়।'

—'তুমি কি বলেছিলে?'

—'কিপটে বুড়ো, মলে ট্যাকা কি সঙ্গে যাবে?'

—'আর কি বলেছিলে?'

—'আর কিছু বলিনি।'

—'বল নি? মিথ্যেবাদী! এই নারায়ণের মাথায় হাত রেখে বল তো, আর কিছু বলিনি।' আশুবাবু সোফা থেকে আমাকে খামচে তুলে ধরে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন। অন্য সময় হলে রেগে যেতুম, যেহেতু নারায়ণ বলেছেন তাই....।

দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা বললেন—'আর বলেছিলুম চোরের ধন বাটপাড়ে খায়!'

—'আমি চোর'!—আশুবাবু সপ্তমে চিৎকার করে উঠলেন। বড়মামা চোখ বুজিয়ে ছিলেন। আচমকা চিৎকারে চমকে উঠলেন। হাত থেকে বুক-দেখা যন্ত্র ছিটকে পড়ল। বড়মামা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে বললেন, 'বাস্ বাস্, নো মোর।'

বিচারকের গলায় ইংরেজী শুনে আশুবাবু শান্ত হলেন। আমি দরজার কাছে ভোঁদার মত দাঁড়িয়ে ছিলুম। বড়মামা ডাকলেন,—'চলে আয়।' বড়মামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারী ব্যাগ খুললেন। বেরোলো অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে একটা কৌটো। আশুবাবু আড়চোখে তাকিয়ে বললেন,—'পান নাকি ডাক্তার, জর্দা দেওয়া?'

বড়মামা খুব রেগে আছেন মনে হল, কোন উত্তর নেই।

কৌটো হাতে আবার সোফার উপর চেপে বসলেন। পান খাবার লোভে আশুবাবুর চোখ চকচক করছে।

—'একটা দেবে নাকি ডাক্তার?'

কৌটো খুলতে খুলতে বড়মামা বললেন,—'দেবার জন্যেই তো এসেছি।'

কৌটো থেকে পান বেরোলো না, বেরোলো ইঞ্জেক্সানের সিরিঞ্জ। আশুবাবু যে এত ভাল দৌড়তে পারেন জানা ছিল না। নিমেষে একটা কালো তাল উঠোনের ও মাথায় বাথরুমের দিকে গড়িয়ে গেল। দড়াম্ করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। বড়মামা সিরিঞ্জের পেছনে ধীরে ধীরে পিস্টনটা পরালেন। মুখে একটা লম্বা ছুঁচ ফিট করে উঠে দাঁড়ালেন। বড়মামার চোখ দেখে মনে হল যেন বাঘ শিকারে যাচ্ছেন। দরজার দিকে মুখ করে বেশ ভারী গলায় আশুবাবুর পরিবারের উদ্দেশ্যে বললেন,—'কথাটা শোনা আছে নিশ্চয়—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। ইঞ্জেকসানটা তাহলে আপনাকেই নিতে হচ্ছে। কত্তা তো ভয়ে বাথরুমে পালালেন।' বড়মামার কথা শেষ হবার আগেই দুটো মোটা হাত দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের গতিতে ছিটকিনি খুলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বড়মামা

আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'নাউ হোয়াট টু ডু? সহজে ছাড়ছি না। ডাক্তার ডেকে ইয়ার্কি! এক ইঞ্জেক্‌সানে ভূত ছাড়িয়ে দোবো।' বড়মামা বন্ধ বাথরুমের দরজার কাছে সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে গেলেন। আশুবাবু বাথরুমে বন্ধ। দরজায় একটা টোকা মেরে বড়মামা বললেন,—'কতক্ষণ বসে থাকবেন? আমিও রইলুম বাইরে দাঁড়িয়ে, ইঞ্জেক্‌সান আপনাকে নিতেই হবে।'

—'আমার কিছু হয়নি ডাক্তার। মিছিমিছি বলেছিলুম।'

—'কি বলেছিলেন শুনি?'

—'ওই পরিবরকে জব্দ করার জন্যে। একমাস কথা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন? তাই তো বলেছিলুম।'

—'কি এমন বলেছিলেন যে রোজা ডাকতে হল ভূত ছাড়াবার জন্যে?'

—'বলেছিলুম, রোজ রাতে ঘর অন্ধকার করে শুলেই কে যেন কানের কাছে বলছে, আশু, আর কেন, তোর দিন তো শেষ হয়ে এল রে! আর বলেছিলুম, কানের কাছে অষ্টপ্রহর কে যেন কাঁসর ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সব মিছে কথা ডাক্তার। ভয় দেখাবার জন্যে বলেছিলুম।'

—'সব বুজেছি, এখন দয়া করে বেরিয়ে আসুন, পিঠের যা অবস্থা, পাঁচলাখ পেনিসিলিন ঠুকে না দিলে বিষিয়ে মারা যাবেন!'

—'ইঞ্জেকসান আমি নেবো না ডাক্তার, তোমার পায়ে পড়ি। ইঞ্জেকসানে আমার ভীষণ ভয়। আমার বাবা ওইতেই মারা গিয়েছিলেন।'

—'তা বললে তো চলবে না। দেখেছি যখন আমায় ডাক্তারের কর্তব্য করতেই হবে।'

—'তোমাকে আমি ডবল ফী দোবো ডাক্তার। একমাস বিন পয়সায় বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবো, যত পার।'

—'ঘুষ আমি খাই না আশুদা।'

আশুবাবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন,—'দয়া কর ডাক্তার। তোমার আর কি? তুমি আছ ফাঁকা হাওয়ায়, আমি এদিকে গরমে, গন্ধে মারা যেতে বসেছি।'

—'সেই জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি। বেরোনো মাত্রই ফ্যাঁস।'

আশুবাবুর আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বড়মামা আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। বাথরুমের ভেতর ভারী কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ হল।

—'কি হল বল তো!'

—'বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।'

—'হার্ট ফেল করেনি তো!'

—'দেখতে তো পাচ্ছি না বড়মামা, তবে ভয়ে অনেকে হার্টফেল করে।'

—'সে কি রে? পুলিশ কেস হয়ে যাবে যে! চল পালাই।' বড়মামা ছুটে সাইকেলের কাছে গেলেন। আমিও ছুটলুম পেছনে পেছনে।

বড়মামার সাইকেল ছুটেছে হাওয়ার বেগে। ঝড় ঝড় ঝড় ঝড় শব্দ করছে। ইটে পড়ে মাঝে মাঝে বেমক্কা লাফিয়ে উঠছে। কেনো রকমে কেরিয়ারে ঝুলে আছি।

কিছু দূরে গিয়ে বললেন,—'কোথায় যাই বল তো! চল্ পালাই। একটু পরেই তো পুলিস আসবে। তারপর অ্যারেস্ট। ওরে বাবারে!' বাবারে বলা মাত্রই বড়মামা টাল সামলাতে না পেরে সাইকেল সুদ্ধ উল্টে পড়ে গেলেন! আমিও কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লুম।

ধুলোর উপর শুয়ে শুয়েই বড়মামা বললেন,—'চল থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি। তুই আমার সাক্ষী। উল্টোপাল্টা কিছু বলবি না।'

ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। মনে হল, গলা ছেড়ে মেজমামা-আ বলে চিৎকার করি।

থানা অফিসার টেবিলে মোটা রুল-কাঠ ঠুকতে ঠুকতে বড়মামার বক্তব্য শুনলেন। কিছু বুঝলেন বলে মনে হল না। ব্যাপারটাকে বোঝার জন্যে আগাগোড়া নিজেই একবার বলে গেলেন—'আশু ময়রা বাথরুমে ঢুকেছে। বেশ, ঢুকলো, ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। ছুটে গেল কেন? ও বুজেছি। ভীষণ বেগ এসেছিল। আসতেই পারে, আমারও আসে, সকলেরই আসে। ভারী কিছু পড়ে যাবার শব্দ শুনলেন? ভারী, ভারী।' ভারীর জায়গাটায় এসে অফিসার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তা দেখে আমরাও কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

হটাৎ অফিসার চিৎকার করে উঠলেন,—'বুজেছি। বেগ যখন প্রবল তখন শব্দও তো ভারী হবে। দুই আর দুয়ে চার। সেই শব্দ শুনে ব্যাগ-ট্যাগ ফেলে আপনি দৌড়ে চলে এলেন থানায়। কেন এলেন?'

বড়মামা বললেন,—'আমার মনে হচ্ছে, আশুবাবু ইজ ডেড।'

'ডেড!' অফিসার হো হো করে হেসে উঠলেন,—'বাথরুমে আশু ডেড। বেশ ডেড। ধরে নিলুম ডেড। এতে আশুর অপরাধটা কোথায়? অ্যারেস্ট করার মত অপরাধটা সে কি করেছে? আমি তো মশাই কিছুই বুজছি না। এতে পুলিশ আসে কোথা থেকে?'

বড়মামা বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ কোনো তরফেই কোনো কথা নেই। শেষে অফিসার হাসি হাসি মুখে বললেন,—'পাবেন না, কিচ্ছু খুঁজে পাবেন না। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের কোথাও লেখা নেই—বাথরুমে ছুটে যাওয়া অপরাধ, কিংবা, শব্দ করে মল ত্যাগ করা অপরাধ। ইনডিসেণ্ট বলতে পারেন? তাই বা বলি কি করে নেচারস্ কল।' অফিসার উঠতে যাচ্ছিলেন, বড়মামা বললেন, 'আর একটু। আর একটা কথা।' অফিসার বসে পডলেন,—'বলুন। তবে যা-ই বলুন, যে ভাবেই বলুন, কোর্টে প্রমাণ করতে পারবেন না। আশুকে জব্দ করতে চান, অন্যভাবে করুন, বাথরুম থেকে কায়দা করে বের করে এনে রাস্তায় করান, পাঁচ আইনে ফেলে দোবো।'

বড়মামা বললেন,—'সে কথা নয়। ধরুন, কেউ এসে বলল, আশুবাবুকে আমি মেরে ফেলেছি। তা হলে?'

অফিসার রুল নাড়া বন্ধ করলেন—'সে তো মশাই সাঙঘাতিক কথা! না, দাঁড়ান, হঠাৎ লোকে এমন কথা বলবে কেন? আর বললেই বা আমি বিশ্বাস করব কেন? আমরা কি কান-পাতলা লোক?'

—'না, ধরুন যদি বলে?'

—'বললেই হল! আচ্ছা বেশ, বলল। তখন আমরা ইনভেসটিগেশানে যাব। দেখবো কি ভাবে মার্ডার করেছেন। পোস্ট-মর্টেমে পাঠাবো। ফরেনসিক রিপোর্ট আসবে। ফিঙ্গার প্রিন্ট নেবো। সেই প্রিন্টের সঙ্গে আপনার হাতের প্রিন্ট মেলাবো। মার্ডারের জায়গায় দেখবো খুনী কিছু ফেলে গেছে কিনাই! মার্ডার কি মশাই ছেলে খেলা নাকি! অনেক জল ঘোলা করে তবে খুন হয়। অত সোজা নয় মশাই। ও সব আপনার কম্ম নয়। ভুলে যান ওসব।' কথা শেষ করে অফিসার একটা হাঁক ছাড়লেন,—'রাম খেলোয়ান!' দূর থেকে উত্তর এল,—'যাই হুজুর।'

—'টিফিন কেরিয়ার লে আও, আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি মশাই, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, খেতে বসব, আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

বড়মামা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন—'একটা কথা।'

—'একটা একটা করে অনেক কথা সেই থেকে বলে গেলেন, আর একটাও কথা নয়।'

—'না না, কথা নয়। একটা পারমিশান। আমরা এই থানার কাছে ঘুরে বেড়াতে পারি?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরুন না, যত খুশি ঘুরুন। কত চোর ছ্যাঁচোড় ঘুরছে, আপনারা তো সৎ নাগরিক।'

আমরা দু'জনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।—কিছু দূরেই একটা বটতলা। বটতলায় এসে আমরা পাশাপাশি বসলুম। পাশে সাইকেলটাকে দাঁড় করানো রইল। বড়মামা আমার কানে কানে বললেন,—'কোনো আশা নেই রে। নির্ঘাৎ প্রমাণ হয়ে যাবে। আমার ব্যাগটা আশুর বাড়িতে ফেলে এসেছি।' আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমারও চটি দু'পাটি ফেলে এসেছি।

—'বড়মামা, এখানে বসে থেকে কি হবে?'

—'তুই বুজছিস না। যে কোনো মুহূর্তে আশুর বাড়ির লোক থানায় এসে যেতে পারে। এলেই আমি অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। এতে সাজা অনেক কমে যাবে।' বটতলায় বসে বসে দেখছি লোকজন আসছে যাচ্ছে। গাড়ি বেরোচ্ছে ঢুকছে। সারাদিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। বড়মামার পকেটে লজেন্সও আর নেই। সূর্য ক্রমশ পশ্চিমে ঢলে পড়ল। বটের ডালে ডালে পাখিদের কিচির-মিচিরও থেমে গেল।

—'বড়মামা, আর কতক্ষণ?'

—'আর একটু দেখি রে! বলা যায় না। প্রথমে দরজা ভেঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তারপর ওই পিঠে ঝাঁটার দাগ! দেখবি আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে। সাংঘাতিক জাঁহাবাজ

মেয়েছেলে। একটা দিন একটু কষ্ট কর না আমার জন্যে। আমি ওই গারদে ঢুকলেই তুই চলে যাবি। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় কোর্টে।'

থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজল। আমি বোধহয় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বড়মামা বোধহয় ঢুলতে ঢুলতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। পেটা ঘড়ির কানফাটানো শব্দ আর মেজমামার ডাক ও ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসলুম। প্রথমে ঘুম-চোখে বুঝতেই পারছিলুম না কোথায় আছি। বড়মামা ভেবেছেন ভোর হয়েছে, শুয়ে শুয়েই চোখ না খুলে বললেন—'রেখে যা।'

—'কি রেখে যাবো?'

—'তুই চা নিয়ে এলি কেন? কষ্ট করে তোকে আবার কে আনতে বললে?'

—'চা নয়, চা নয়, উঠে বোসো।' মেজমামা ধাক্কা মারলেন।

বড়মামা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন,—'সারেণ্ডার।' মেজমামার কাছে সারেণ্ডার করায় মেজমামা খুব খুশী হলেন। আমি তো জানি ব্যাপারটা কি?

মেজমামা বললেন,—'সারেণ্ডার করে ভালই করলে ; কিন্তু তোমার আক্কেলটা কি? বটতলায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ, এদিকে আমরা ভেবে মরি। আশু ময়রা সেই দুপুরবেলাই লোক দিয়ে তোমার ব্যাগ, ফী'র টাকা, এক চ্যাঙারি ইয়া বড় বড় সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে।

লোকটি বললে, ডাক্তারবাবুর বড় বাইরে পেয়েছে বলে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। তোর চটি দু'পাটিও দিয়ে গেছে। কি হয়েছিল তোমাদের? থানায় ডায়েরী করতে এসেছিলুম, অফিসার বললেন, খুঁজে নিন কাছাকাছিই আছেন, বড়টির মাথাটা গেছে, ছোটোটাকে বোবা বলেই মনে হল।'

বড়মামা লাফিয়ে উঠে বললেন,—'আশু বেঁচে আছে?'

'বেঁচে আছে মানে? বহাল তবিয়তে আছে। আসার সময় দেখে এলুম গরম গরম রসগোল্লা ছাঁকচে। বেশি না, গোটা আষ্টেক খেলাম। বেশি মিষ্টি খাওয়া ভাল নয়। সকালে ওই সন্দেশ থেকে গোটা আষ্টেক খেয়ে ফেলেছি খাবো-না খাবো-না করে।'

বড়মামা করুণ চোখে তাকালেন।—'বড্ড খিদে পেয়েছে রে মেজো।'

—'চল, বাড়ি চল, কিছু জোটে কিনা দেখি।'

বড়মামা জুতো খুলে রেখেছিলেন। দাঁড়াবার আগে পা গলাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন,—'আমার জুতো।' ঝুঁকে পড়ে আমরা সবাই দেখলুম, জুতো নেই, মিসিং। এর পরের লাফটা আরো বড়,—'আমার সাইকেল!' বটতলাটা গোল হয়ে প্রদক্ষিণ করা হল, সাইকেলও নেই।

—'বুঝেছি!' বড়মামা বললেন, আমরা না বুঝে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। মেজমামা বললেন,—'কি বুঝলে?' উত্তর পাওয়া গেল না, বড়মামা হনহন করে থানায় গিয়ে ঢুকলেন। আমারা পেছনে পেছনে। অফিসার চেয়ারে একটা পা তুলে ভীষণ চিৎকার করে ফোনে কথা বলছিলেন—'দুটোর মাথা ঠুকে দে। পেটে গোটাকতক রুলের গোত্তা মার।' কথা আর শেষ হতেই চায় না। ফোনে নামাতেই বড়মামা বললেন,—'আমার জুতো আর সাইকেলটা দিন স্যার, এইবার বাড়ি যাই।'

অফিসারের মুখের নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। জীবনে আমি কাউকে এমন অবাক হতে দেখিনি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তারপর বড়মামার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললেন,—'আমি কালই ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি। দয়া করে আমায় মুক্তি দিন। সকালে ছিল খুন, এখন জুতো আর সাইকেল। আমাদের সারাদিন বড্ড খাটতে হয়, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।'

বড়মামা অফিসারের বিনয়ে একটু ঘাবড়ে গেলেন,—'না, ঠিক ইয়ারকি নয়, সাইকেল আর জুতোটা পাচ্ছি না। ঘুমোচ্ছিলুম তো, তাই ভাবলুম যদি তুলে রেখে থাকেন।'

—'আমাদের কি দায় পড়েছে মশাই ধরে ধরে লোকের জিনিস তুলে রাখবো? কাল সকালে এসে খুঁজে নেবেন। আজ অন্ধকার তো।'

বড়মামা বললেন,—'তাই হবে।'

থানার বাইরে এসে বড়মামা বললেন,—'জুতোটা না হয় বুঝলাম ছোটো জিনিস। কুকুরও নিতে পারে। কিন্তু সাইকেল একটা বড় জিনিস। সেটা কেন খুঁজে পাচ্ছি না? কাল ভোরে এসে দেখতে হবে।' উত্তরে মেজমামা খুক খুক করে একটু কাশলেন।

বড়মামা খুব নিরীহের মত প্রশ্ন করলেন,—'কি রে, ঠাণ্ডা লেগেছি নাকি? কতদিন তোকে বারণ করেছি পুকুরে স্নান করিসনি। বড়দের কথা শুনবি না তো।'

মেজমামা বললে—'ঠাণ্ডা নয়। গলাটা কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। অনেক মিষ্টি খেলাম তো সারাদিনে।'

ছ'ফুট লম্বা বড়মামা আগে চলেছেন খালি পায়ে। আমরা পেছনে। মেজমামা বললেন,—'নেবে নাকি আমার এক পাটি জুতো? তোমার ডান পায়ে কড়া, আমার বাঁ পায়ে। ভালই হয়েছে। ভাগাভাগি করে পরি।'

—'দে তাই দে। বড্ড লাগছে।' বড়মামার করুণ গলা। দু'মামা ভাগাভাগি করে জুতো পরলেন। বড়র ডান পায়ে, মেজর বাঁ পায়ে জুতো।

—'তোকে তখনই বলেছিলুম, বলিনি সকালে, বাড়িতে থাক, কথা শুনলি না। শুনে রাখ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মেজমামার উপদেশ শেষ হওয়া মাত্র বড়মামা ফুঁসে উঠলেন,—'যাবার পথে আশুকে আমি দেখে নেবো।'

—'থাক, খুব হয়েছে। একবার তো দেখেছ, এখন ক্ষান্তি দাও। সে বেচারা দোকান বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। যাই বল, আশু হল জাত শিল্পী। যেমন রসগোল্লার হাত, তেমনি সন্দেশে। আমাদের পেনেটি গ্রামের গর্ব। হাত দুটো সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত।'

—'রাখ রাখ।' বড়মামা অন্ধকার থেকে উত্তর দিলেন।

—'সুধাংশু মুকুজ্জের নাম ক'টা লোক মনে রাখবে? আমাদের আশু ময়রা অমর।'

মনে হল, বড় মামার চলার গতি বেড়ে গেল। এক পায়ে জুতো, এক পা খালি। হাঁটাটা তাই অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

বড়মামার বেড়াল ধরা

বড়মামা মিলের হাসপাতালের ডাক্তার। রসুল সেই হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়। বড়মামার ডান-হাত বাঁ-হাত। প্রাইভেট সেক্রেটারি। যেমন ইঞ্জেকসান দিতে পারে তেমনি ভাল কাটলেট ভাজতে পারে। ফোঁড়াও কাটে। কচাকচ মুরগীও কাটে। মিল এলাকায় মুরগীর ছড়াছড়ি। বড়মামার ইদানীং আবার মুরগীতে অরুচি। হিসেব করে দেখেছেন হাজারখানেক মুরগী খেয়েছেন। এখন একটু মালপো-টালপোয় রুচি এসেছে! গোবিন্দভোগ চালের ভাত। একটু গাওয়া ঘি। আলুভাতে। ঘন দুধ। আমসত্ত্ব আচার। পায়েস। একটু বৃন্দাবন বৃন্দাবন ভাব। রসুলের মহা দুঃখ। ডাক্তারবাবু মুরগী খাবেন বলে মিল কোয়ার্টার থেকে আগে যখন তখন একটা করে ধরে এনে জবাই করত। এখন সে উপায় নেই। রসুল বলছে, 'কেন এমন হল ডাক্তারবাবু? একটু ওষুধ-টষুধ খেয়ে দেখুন না। মুরগী না খেলে শরীর থাকবে কি করে?'

বড়মামা বললেন, 'দূর বেটা, তুই এসবের বুঝবি কি? আমি বৈষ্ণব হয়ে গেছি, মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুনের নাম আমার কাছে করবি না। পারিস তো এক টিন ভাল গাওয়া ঘি যোগাড় কর। দেখ কে দেহাতে যাচ্ছে, আমার নাম করে বলে দে।' রসুল মনমরা হয়ে লম্বা টেবিলের কাছে গিয়ে চা বানাতে শুরু করল। ডাক্তারবাবু সারাদিনে বার পঞ্চাশ চা খান।

বড়মামা এইমাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস অ্যাটেণ্ড করে নিজের চেম্বারে এসে বসেছেন। আজকাল মেডিকেল লিটারেচার খুব কমই পড়েন। ড্রয়ারে একটা ঢাউস ভাগবত রেখেছেন। সময় পেলেই টেবিলের তলায় পা নাচাতে নাচাতে ভাগবত পড়েন। হাসপাতালের ওয়ার্ডে যে ক'টা বেড়াল ঘোরে সবকটাই বড়মামার বন্ধু। তাদের একটার গোটা চারেক বাচ্চা হয়েছে। বেড়ালটা সব কটাকে বড় মামার চেম্বারে এনে তুলেছে! কোণের দিকে ওষুধের একটা খালি পেটি ছিল! সেটাই হয়েছে বাসা। বাচ্চা ক'টার চোখ ফুটেছে। অনবরত

মিউ মিউ করে। মা'টার দেখা পাওয়াই ভার। সব সময় রান্নাঘরের সামনে ওত পেতে বসে আছে। বাচ্চা সামলাবার ভার বড়মামার! চোখ ফুটেছে। জগৎ দেখতে শিখেছে। প্যাকিং বাক্স ভাল লাগবে কেন? প্রায়ই খচখচ করে গা বেয়ে বেয়ে একটা দুটো করে মেঝেতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে। সারাঘরে থৈ থৈ সাদা বেড়াল। খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে। যেন বেড়ালদের নার্সারী। বড়মামা পা নাচিয়ে নাচিয়ে ভাগবত পড়ছেন। রসুল দুধ গুলছে। বাচ্চা চারটে টেবিলের তলায় বড়মামার পায়ের কাছে গুলতানি করছে। মোটা মোটা দুটো বুড়ো আঙ্গুলের ওপর তাদের নজর। মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠে আঙ্গুলের মাথাটা কুড়কুড় করে কামড়াচ্ছে। যেই বড়মামার সুড়সুড়ি লাগছে অমনি পাটা ঝাড়া দিয়ে বলছেন, 'ডোণ্ট ডিসটার্ব।' বেড়ালগুলো ছিটকে মিউ মিউ করে উঠছে। বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'আহা লাগল নাকি? রসুল, সব কটাকে এক চামচে করে দুধ দে।' রসুল সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তালিম করে আবার নতুন করে দুধ গুলছে। এই রকম বার চারেক হবার পর রসুল বিরক্ত হয়ে বাচ্চা চারটেকে প্যাকিং বাক্সে ভরে ঢাকা বন্ধ করে দিল যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে। বাচ্চাগুলো তারস্বরে মিউ মিউ করছে। বাক্সর ভেতরটা আঁচড়াচ্ছে। বড়মামা ভাগবতে মশগুল হয়ে বলছেন, 'রসুল, দুধ দে, দুধ দে।' রসুল চারবারের চেষ্টায় এই একবার দুধে চায়ে এক করতে পেরেছে। সে বলছে, 'দিয়েছি তো, দিয়েছি তো।' 'দিয়েছিস তো চেঁচাচ্ছে কেন? আরো দে।'

—দুধে হবে না বাবু, মাকে চাইছে।

—রাসকেলটার কান ধরে নিয়ে আয়।

—কামড়ে দেবে যে।

—কামড়ায় কামড়াক। তুই একটা এ-টি-এস নিয়ে যা। আয়, দিয়ে দি।

—না কামড়াতেই এ-টি-এস!

—তুই তো বলছিস কামড়াবে! কতরকম কথা বলিস বেটা?

রসুল বড়মামার টেবিলে চায়ের কাপ ধরে দিতে দিতে বললে, 'বেঠিক কিছু বলিনি বাবু! খেয়ে খেয়ে তার যা চেহারা হয়েছে। ইয়া তাগড়া।'

বড়মামা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘাগরা আবার কি হবে?'

—'ঘাগরা নয়, ঘাগরা নয়, তাগড়া।'

—'কে তাগড়া?' বড়মামা আগের কথা ভুলে গেছেন। বড়মামার এই বড় দোষ। এমনি একটু অন্যমনস্ক, তার ওপর ভাগবতে মন!

রসুল বেশ জোরে জোরে ঘরফাটানো গলায় বললে, 'বেড়ালটা খেয়ে খেয়ে এই ক'দিনে ইয়া তাগড়া হয়েছে!'

বড়মামা বই থেকে মুখ তুলে রসুলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চেঁচাচ্ছিস কেন রাসকেল? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি কি কালা?'

রসুল গলাটা আগের চেয়ে একটু খাটো করে বললে, 'আপনি যে শুনছেন না।'

‘শুনছি না? সব শুনেছি। তুই জানিস না। বেশি মোটা হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। হার্ট উইক হয়ে যায়। দেখিসনি গুপ্তবাবুর কি হয়েছে? জেনেশুনেও যখন মোটা হচ্ছিস, হয়ে যা। আমার কি? আমার কাঁচকলা। মরবি ব্যাটা তুই।’ বড়মামা ফড়াস করে চায়ে চুমুক দিয়ে আবার ভাগবতের পাতায় চোখ নামালেন।

রসুল বললে, ‘খুব শুনেছেন! আমি মোটা হব কেন? আমি তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে। দেখুন না, আমাকে কেউ মোটা বলবে?’

বড়মামা মুখ না তুলেই হুঁ হুঁ করে একটু হেসে বললেন, ‘আজ মঙ্গলবার কারুর চেহারায় নজর দিতে নেই, তবু যখন জিজ্ঞেস করলি বলতেই হচ্ছে, তুই যখন চাকরিতে ঢুকলি এই রোগা লিকলিকে ছিলিস, এখন?’ বড়মামা আবার একটু হাসলেন, ‘এখন তুই রিয়েলি ফ্যাটি। ফ্যাটি রসুল। রুগীদের খাবার চুরি করে করে আর দুধ সাবড়ে সাবড়ে ইয়া কেঁদো বাঘ। তুই ভাবিস আমি কিছু দেখি না, না? ওরে আমার চোখ সবসময় খোলা। চারিদিকে আমার চোখ। মাথার পেছনেও আমার চোখ।’

রসুল বললে, ‘কি মুশকিল! হচ্ছে অন্য কথা, আপনি বলছেন আর এক কথা।’

বড়মামা বললেন, ‘কার কথা? তুই কি বলতে চাস আমি মোটা হচ্ছি! তুমি চুরি করে কিচেন থেকে খাবার সাবড়াবে আর মোটা হব আমি, তাই না রাসকেল! তোদের সব অপকর্মের ভাগ আমার! ভুল ওষুধ দিবি, দায় আমার। ইণ্টার মাসকুলার ইঞ্জেকসান ইণ্টার ভেনাস করে দিবি, দায় আমার। আজ বলছিস, তুই চুরি করে খাবি মোটা হব আমি! মামার বাড়ি পেয়েছিস, তাই না? দিস ইজ হসপিটাল, দিস ইজ নট ইওর মামার বাড়ি।’

রসুল বললে, ‘যাঃ বাবা।’

বড়মামা রসুলের কথার উপর দিয়েই মেল ট্রেনের মত কথা চালিয়ে দিলেন, ‘আমি মোটা হচ্ছি আমার নিজের পয়সায়। নিজের রোজগারের পয়সায় ঘি খেয়ে মোটা হচ্ছি। তাতে তোর এত চোখ টাটাচ্ছে কেন? বেরো! গেট আউট? দূর হয়ে যা রাসকেল।’

রসুল বলল, ‘ঠিক আছে আমি আবার প্রথম থেকে বলছি। একেবারে ফার্স্ট থেকে বলছি, তা না হলে আপনি সারাদিন চেঁচাতেই থাকবেন। আমি চা করছিলুম।’ বড়মামা ভাগবত থেকে মুখ না তুলেই বললেন, ‘কে তোকে চা করতে বলেছিল হতভাগা? আমি জানি না ভাবো? তুমি দুধ খাবার লোভে চা করতে আস। এক টিন দুধে ক’ কাপ চা হয় বল্ রাসকেল!’

‘সে হিসেব পরে হবে সাহেব, আমি আগে ফার্স্ট থেকে বলি। প্রথমে আমি চা করছিলুম। জল ফুটছে! আমি দুধ গুলছি, এমন সময় চারটে বাচ্চা বাক্স থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সায়েবের পায়ের আঙ্গুল নিয়ে খেলা করছে। সায়েব মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যেই না পা ছুড়ছেন বাচ্চাগুলো মিউ মিউ করে উঠছে। সায়েব অমনি বলেছেন রসুল দুধ দে। আমি অমনি যেটুকু দুধ গুলেছিলুম দিয়ে আবার চায়ের জন্যে নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম,

সায়েব আবার লাথি মারলেন, বাচ্চাগুলো আবার মিউ মিউ করে উঠল, সায়েব আবার দুধ দিতে বললেন, আমি দিলুম, আবার নতুন করে গুলতে শুরু করলুম, সায়েব আবার লাথি মারলেন বেড়াল বাচ্চা মিউ করে উঠল, সায়েব বললেন দুধ দিতে, আমি আবার দুধ দিলুম, দিয়ে নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম।'

বড়মামা একটু একটু করে মুখ তুলছিলেন এবার পুরো মুখ তুলে রসুলকে ধমকে উঠলেন, 'তুই আমার খাটাল দেখেছিস, তাই না! তোর মামার বাড়ির দুধ। আমিও বললুম, তুইও দিয়ে দিলি! অতবার দুধ খাইয়ে বেড়ালগুলোকে মারবার তাল করে। জানিস না

বেশি দুধ খেলে বাচ্চাদের ইনফ্যান্টাইল লিভার হয়।'

রসুল বললে, 'জানি বলেই তো বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে প্যাকিং বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছি। যাতে বেরোতে না পারে তার জন্যে মাথায় ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি। তখন থেকেই শুরু হয়েছে মিউ মিউ। ওই যে শুনুন এখনো মিউ মিউ করছে।'

বড়মামা কান খাড়া করে শুনলেন। শুনে বললেন, 'সত্যি তো, ভীষণ মিউ মিউ করছে। একটু দুধ দে।'

রসুল বললে, 'না। দুধে হবে না। আগেও আপনি ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তখন আমি বলেছিলুম দুধে হবে না বাবু, ওদের মাকে চাই।'

বড়মামা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। কোথায় সে রাসকেল? বেটাকে কান ধরে নিয়ে আয়!'

রসুল বললে, 'তখনো আপনি এই কথা বললেন। আমি বললুম, সেটা খেয়ে খেয়ে অ্যায়সা তাগড়া হয়েছে কান ধরে টেনে আনতে গেলেই আঁচড়ে কামড়ে দেবে। তখন আপনি সব গুলিয়ে ফেললেন। কে মোটা, কেন মোটা, বেড়ালের মোটা থেকে আমি মোটা, আপনি মোটা তারপর আমাকে চোর বলেছেন, গেট আউট করে দিয়েছেন, সাতবার রাসকেল বলেছেন।'

বড়মামা খুব চিন্তিত হলেন। চিন্তা-টিন্তা করে রসুলকেই প্রশ্ন করলেন, 'কেন এসব বলেছি বল তো! যে ভাগবত পড়ে, যে আজ একমাস মাছ, মাংস ডিম, পেঁয়াজ স্পর্শ করেনি, তার মুখে এসব কথা কেন? তার জানা উচিত কাউকে চুরি করতে না দেখে চোর বলা ভীষণ অপরাধ। তোকে তো আমি চুরি করতে দেখিনি। আমি শুনেছি রসুল চুরি করে। সেই শোনা কথা রাগের মাথায় তোর ওপর চালান করলুম কেন? এত রাগ তো ভালো নয়। যাকগে, যা হয়ে গেছে গেছে। কিছু মনে করিস নি বাবা। এখন কড়া করে দু'কাপ চা কর। আর বিসকুটের টিনটা খোল। যা ঝামেলায় ফেলেছিলি, সব জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এরচে ডাক্তারি সোজা রে!'

বড়মামা আবার ভাগবতে চলে গেলেন। রসুল চলে গেল চায়ে। এদিকে প্যাকিং বাক্সের ভেতরে দক্ষযক্ষ চলেছে। চারটে বাচ্চার মধ্যে দুটো হুলো। সে দুটো মাঝে মাঝে কর্কশ গলায় মিয়াও, মিয়াও করে উঠছে। বাক্সর ধারগুলো খরচ মরচ করে আঁচড়াচ্ছে। ডালাটা খোলার জন্যে গোঁত্তা মারছে। বড়মামা আর থাকতে না পেরে করুণ গলায় রসুলকে বললেন, 'একটা কিছু করনা রে। আর তো পারা যায় না! কানের পোকা বের করে দিলে। তুই দেখ না চুক চুক করে লোভ দেখিয়ে, দুধের লোভ দেখিয়ে মা'টাকে যদি ধরে আনতে পারিস।'

রসুল চা আনছিল। কাপটা রাখতে বললে, 'এ মা সে মা নয় সায়েব। বরং এক কাজ করি, বাক্সটাকে বাইরে মাঠে ফেলে দিয়ে আসি দূর করে।'

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'না না না। চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে! মরে যাবে রে!'

'কিন্তু স্যার ডাক্তারখানায় বেড়ালছানার ডাক খুব ভাল শোনায় না। এই নিয়ে কিন্তু কমপ্লেন হতে পারে।'

'কমপ্লেন!' বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'কে কমপ্লেন করবে রে! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে! জানিস আমি ডক্টর-ইন-চার্জ! মানুষ রুগী হতে পারে, বেড়াল পারে না!'

'পারে। তবে তার জন্যে তো পশু হাসপাতাল আছে স্যার। সেই কথা যদি কেউ বলে?'

'বললে মারবো মুখে এক থাবড়া। এখানে দশ মাইলের মধ্যে পশু চিকিৎসালয় কোথা রে? তুই যখন কমপ্লেনের ভয় দেখালি বেড়াল আমার চেম্বারেই থাকবে, যদ্দিন না বড় হয় তদ্দিন থাকবে। আর তোর মত ওয়ার্থলেসের দ্বারা চা-ই হতে পারে, বেড়াল মানুষ হতে পারে না। আমি নিজেই যাচ্ছি ওদের মায়ের খোঁজে। করপোরেশান সাঁড়াশি দিয়ে পাগলা কুকুর ধরতে পারে আর আমি ডাক্তার হয়ে একটা বেড়াল ধরতে পারব না! চ্যালেঞ্জ।'

এক চুমুকে চা শেষ করে বড়মামা উঠে দাঁড়লেন। দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়লেন। বসে পড়ে বললেন, 'রসুল, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি তাই না?' রসুল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু হয়েছেন বটে।'

'কেন হলুম?'

'ওই বেড়াল স্যার! অনবরত চেল্লাচ্ছে।'

'না, ঠিক নয়। সামান্য বেড়াল আমাকে উত্তেজিত করছে। ভেরি ব্যাড। ভাগবতের কোনো ফল পেলুম না রে! দপ্‌ করে রেগে যাচ্ছি কথায় কথায়। রাগটা যেন আগের

চেয়ে বেড়েই যাচ্ছে। এটা ঘি খেয়ে হচ্ছে বোধ হয়। ডাক্তার, কাল থেকে তোমার ঘি বন্ধ।' বড়মামা নিজেই নিজের ঘি বন্ধ করে আবার ভাগবত নিয়ে বসলেন।

রসুল বললে, 'এই যে বললেন বেড়াল ধরতে যাবেন!'

'বেড়াল ধরতে যাব মানে? ইয়ারকি পেয়েছিস! ডাক্তারের কাজ বেড়াল ধরা, রাসকেল?'

বড়মামা আবার রেগে গেলেন। রসুল বড়মামাকে হাড়ে হাড়ে চেনে।

রসুল কিন্তু ঘাবড়ে গেল না। সে বললে, 'এমনি বেড়াল নয়। মা বেড়াল। বেড়ালের মা। বিল্লী কী মাতাজী!' প্রায় সব ভাষাতেই রসুল বোঝাতে চাইল। ইংরেজীটাই বাকী রইল। বললেই পারত, ক্যাটস মাদার বা মাদার অফ কিটেনস।

বড়মামা বললেন, 'দেখেছিস মাথার কি অবস্থা হয়েছে। এই বলছি, এই ভুলে যাচ্ছি! ঘি খেলে আগে মানুষের স্মৃতিশক্তি বাড়ত। এখন উল্টোটা হয়, কমে যায়। ঘিয়ে ভেজাল আছে রে রসুল। লাগা আজ, লাগিয়ে দে বেশ ঝোল ঝোল।'

বড়মামার কথায় রসুলের চোখ চকচক করে উঠল। গত দু'মাস ভোরবেলা মুরগীর ডাকই খালি শুনছে, একটা ঠ্যাঙও চিবোতে পারছে না। রসুল লাফিয়ে উঠল, 'ইয়াসিন একটা দিয়েই রেখেছে স্যার। কাজে লাগাতে পারছিলুম না। প্রেসার কুকারে মরচে ধরে গেল। আমি তাহলে এখুনি শুরু করে দি? একবার মোল্লার হাটে চলে যাই। ফাইন বাসমতী নিয়ে আসি। কিলোটাক আলু। মশলাও কিছু লাগবে। এখন আরম্ভ করলে সন্ধ্যে সাতটা-আটটার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে।' রসুল ধড়ফড় করে পালাচ্ছিল।

বড়মামা বললেন, 'রোককে! আগে বেড়াল তারপর অন্য কাজ।'

'বেড়াল তো আপনি ধরবেন স্যার। সেই রকমেই তো বললেন।'

'ভুলে গেছিস বোধহয় তুই আমার অ্যাসিসটেণ্ট। আমি যা করব সব সময় তুই আমার পাশে থাকবি পাঁঠা।'

বেড়াল ধরার সাজসরঞ্জাম অনেক। বড়মামার হাতে অফিসের ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। রসুলের হাতে দুটো বিস্কুট, ক্লোরোফর্মের শিশি, একটা বড় ডাস্টার, একটা ইঁদুর ধরা কলে ছোট একটা নেংটি ইঁদুর। বড়মামার প্ল্যান একরকম, রসুলের প্ল্যান আর একরকম। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বড়মামা ঠিক করেছেন হাসপাতালের কিচেনের কাছে গিয়ে, মিনি, মিনি, আয় মিনি করে চুকচুক করে বেড়ালদের গাদা থেকে আসল বেড়ালটাকে ডেকে এনে বিস্কুট খেতে দেবেন। বেড়াল যেই খেতে শুরু করবে ঝপ করে বাসকেটটা চাপা দিয়েই, ডাস্টারে খানিকটা ক্লেরোফর্ম ছড়িয়ে ওপরে চেপে ধরবেন। বেড়ালটা অজ্ঞান হয়ে যাবে তখন সেটাকে চ্যাদোলা করে এনে বাচ্চাগুলোর কাছে চিৎপটাং করে শুইয়ে দেবেন।

রসুলের প্ল্যান অন্য। রসুল ইঁদুরের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ালটাকে ঘর পর্যন্ত টেনে আনবে। তারপর ঘরে ঢুকিয়ে ডাস্টার দিয়ে চেপে ধরে গলায় একটা দড়ি বেঁধে গ্রিলের সঙ্গে আটকে রাখবে। থাকো বেটা বন্দী হয়ে। ছেলেমেয়ে যদ্দিন না মানুষ হচ্ছে তদ্দিন তোমার মুক্তি নেই।

বড়মামা বলছে, 'মরবি রসুল। বেড়ালের গলায় কেউ কখনো ঘণ্টা বাঁধতে পারেনি। ঘণ্টা আর দড়িতে তফাৎ কতটুকু! তোর জন্যে দেখবি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

দু'জন দু'রকম প্ল্যান নিয়ে রান্নাঘরের সামনে। ছ'টা বেড়াল ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'কোন্‌টা বল তো? কোন্‌ রাসকেলটা রে?'

বেড়ালটা মাঝে মাঝেই আসে যায়! কেউই তেমন লক্ষ্য করে দেখেনি। ছ'টা বেড়ালের তিনটে সাদা। দু'টো সাদাতে কালোতে। একটা কুচকুচে কালো! কালোটা নয়। সাদা তিনটের যে কোন একটা। কিন্তু কোন্‌টা? বড়মামা আবার রেগে গেলেন, 'তোর মত গাধা আর দু'টো নেই রসুল। তুই একটা বেড়াল চিনতে পারিস না, রুগী চিনিস কি করে?'

রসুল বললে, 'মানুষের নাম আছে, কার্ড আছে। এক একটা মানুষকে এক এক রকম দেখতে। বেড়াল তো সব এক রকম। খালি যা একটু রংয়ের তফাৎ।'

বড়মামা বললেন, 'জানিস যখন এক, তখন চিহ্ন দিয়ে রাখিসনি কেন? গায়ে অফিসের একটা শীল মেরে দিতে কি হয়েছিল? সবেতেই ফাঁকিবাজি। আমি জানি না, আমার বেড়াল ধরে দাও।'

রসুল ইঁদুর-ধরা কলটা মেঝেতে নামিয়ে একবার চুকচুক করতেই ছটা বেড়াল দৌড়ে এল। একটা ফোঁস ফোঁস করে সামনের জালটা শুঁকছে, একটা কলের ওপরে থাবা মারছে। দু'টো শিকার পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় সেই ভয়ে মুখোমুখি বসে ল্যাজ ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। ফ্যাঁ ফ্যাঁ গড়র গড়র গড়র। দুজনেরই পিঠ ধনুকের মত বেঁকে উঠেছে। বড়মামা পায়ে পায়ে পেছোতে পেছোতে কোণের দিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছেন। আর সরবার জায়গা নেই। কিছু করবারও নেই। একমাত্র রসুলকে গালাগাল দেবার জন্যে মুখটাই যা খোলা আছে। দু'টো হাতই জোড়া।

বড়মামা বললেন, 'রাসকেল, তখনই বলেছিলুম কাঙালদের শাকের ক্ষেত দেখাসনি। একটা ইঁদুর ছ'টা বেড়াল। সামলা এবার ঠ্যালা ইডিয়েট, তোর মাথায় কবে যে ভাগবান একটু বুদ্ধি দেবেন! ও, তোর তো আবার ভগবান নয়, আল্লা।'

রসুল বললে, 'ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিয়ে দেখি।'

'তা দেখবে না! নেংটি ইঁদুরের দৌড় জানিস? ছাড়লেই দৌড়োবে, পেছন পেছন বেড়ালও ছুটবে। তখন ধরবি কি করে! এক বালতি জল এনে গায়ে ছিটো তাহলে যদি মারামারি থামে!'

'জল ছিটোলে বেড়ালের ঝগড়া বেড়ে যায় বাবু। ছেলেবেলায় দেখেছি তো, তার চেয়ে ইঁদুরটাকে নিয়ে ঘরে চলে যাই তাহলে লোভে লোভে সব ক'টা চেম্বারে চলে আসবে আমাদের এরিয়ায়, তখন ঠিক ম্যানেজ করা যাবে।'

'পাগল হয়েছিস। এর মধ্যে দু'টো হুলো আছে না ইডিয়েট, বাচ্চা চারটেকে সাবাড় করে দেবে। তুই ক্লোরোফর্ম ছিটো, সবক'টা অজ্ঞান হয়ে যাক। তারপর যা-হোক একটা কিছু করা যাবে।'

রসুল আর মামা কথা কাটাকাটি করছেন, এদিকে ইঁদুরকে সাক্ষী রেখে তিন জোড়া বিড়াল ফুলছে, গোঁ গোঁ করছে, মাঝে মাঝে থাবার তুলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে উঠছে। বড়মামার এই দুঃসময়ে রণক্ষেত্রে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করলেন হাসপাতালের সিস্টার। সাদা কাপড়, সাদা টুপি। বড়মামার খোঁজে চেম্বার থেকে এই পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। ব্যাপার দেখে মুখের কথা মুখেই আটকে গেছে। রসুল আর বড়মামাকে দেখে মনে হচ্ছে চাঁদে যাবেন। হাতে নানা ধরনের সরঞ্জাম। বড়মামা রসুলকে বলছেন, 'তোর তো মানুষ মারাই কাজ, সাহস করে যে কোন একটা সাদাকে চেপে ধরতে পারছিস না ব্যাটা।' রসুল একপা এগোয় তো দশপা পেছোয়। ইঁদুর কলে ইঁদুরটা ভয়ে সিঁটকে একেবারে ভিতরের দিকে ঢুকে বসে আছে। ছ'টা বেড়ালের গন্ধে আর শব্দে সে ভবিষ্যৎ বুঝে ফেলেছে—রক্তাক্ত মৃত্যু। সিস্টার বলছেন, 'ডাক্তারবাবু শিগগির চলুন, গুপ্তু সায়েবের অবস্থা আবার খারাপের দিকে। শ্বাস নিতে পারছেন না।'

বড়মামা বললেন, 'গুপ্তু সায়েবটা কে? একে আবার কোত্থেকে আমদানী করলেন?'

'ওই তো আমাদের ক্যাশিয়ার বাবু।'

'তার নাম তো গুপ্তো বাবু, গুপ্তু বলছেন কেন? ইংরেজীর উচ্চারণ জানেন না বুঝি!'

'আজ্ঞে উনি যে ডবল ও লেখেন।'

'ডবল কেন, তার ডবল লিখলেও গুপ্ত ইজ গুপ্ত। সিঙ্গল ডিমের ওমলেটও ওমলেট, ডবল ডিমের ওমলেটও সেই ওমলেট।'

'গুপ্তু না বললে উনি রেগে যান। এই তো সেদিন যখন জ্ঞান ফিরে এল কে যেন দেখতে এসে বলেছিলেন গুপ্ত সাহেব, উনি চটেমটে বললেন, আই অ্যাম গুপ্তু, নট গুপ্তওও। এত উত্তেজিত হলেন শেষে আপনি গিয়ে সেই আবার ঘুমের ইঞ্জেকসান দিলেন!'

বড়মামা দার্শনিকের মত বললেন, 'গুপ্ত আর গুপ্তু, মুখার্জি আর মুকার্জি, দাশ আর দশ চিতায় উঠলে সব সমান সিস্টার। কিন্তু আমি এখন যাই কি করে! দেখছেন তো আমার অবস্থা! ডু ওয়ান থিং, অক্সিজেনের নলটা ঠেসে নাকে ঢুকিয়ে দিয়ে রুম কুলারের ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিন। অত খেলে মানুষ বাঁচে? চারদিক থেকে চর্বি এসে হার্টটাকে চেপে ধরেছে। ডাক্তার কি করবে! গবগব করে খাবার সময় গুপ্তুর খেয়াল ছিল না দিন দিন আড়াইমনি কৈলাশ হচ্ছি। যেতে দিন, যো যায়েগা যাউক যো আয়েগা আউক।'

'আজ্ঞে যায়েগা যাউক বললে, আমাদেরই বিপদ। মাইনে হবে না এ মাসে। ক্যাশিয়ার ছাড়া মাইনে দেবে কে?' বড়মামা এতক্ষণে একটু হাসলেন, 'পৃথিবীতে ক্যাশিয়ারের অভাব আছে সিস্টার! এক যাবে আর এক আসবে। গুপ্ত গেলে, ঘোষ, বোস, মিত্তির যে কেউ একজন আসবে।'

'তা হলেও হাতের পাঁচ কি ছাড়া উচিত স্যার? একে তো বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে।'

'তা তো হবেই, খাবার জন্যে বাঁচাতে হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ করার জন্যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। চলুন দেখি।'

যাবার সময় রসুলকে বললেন, 'একটাকে পটকে ফেল তারপর ওই ডাস্টার দিয়ে জড়িয়ে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে চেন দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেল।'

সিস্টার আর বড়মামা পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেলেন। সিস্টার যেতে যেতে শুধু একবার প্রশ্ন করলেন, 'বেড়াল কি করবেন ডাক্তারবাবু?' বড়মামার এক উত্তরে সব কথা বন্ধ, 'আমার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে দান করা হবে।'

বড়মামা চলে যেতেই রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল ইয়াসিন। ইয়াসিনের বাড়ি বিহারে। এই হাসপাতালে রাঁধুনির কাজ করছে বছর দশেক। থেকে থেকে বাংলা শিখেছে! ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। গুণ্ডার সর্দারের মত বিশাল চেহারা। ইয়া মোটা লোমঅলা হাত, গর্দান। লাল গুলি গুলি চোখ। খাকি পোশাক, কাঁধে একটা হাত-টাত-মোছা তোয়ালে। ইয়াসিন একটা বিড়ি ধরিয়ে বেড়ালের যুদ্ধ কিছুক্ষণ দেখে রসুলকে জিজ্ঞেস করলে, 'ক্যা শুরু কর দিয়া। আরে মারো না ইয়ার এক লাথ।'

'মারো না এক লাথ' রসুল ভেংচি কেটে বললে, 'আর হামারা চাকরি চলা যায়গা।'

'আই বাপ্। চাকরি তুমহার যাবে কেন? বিল্লী কো তো এইসি আদমী লাথাতা। হাম ঝাড়েগা একঠো। এক লাথ সে ছেগোকো একসাথ চারদিওয়ারিকা উধার কমপাউণ্ডমে ফেক দেঙ্গে। দেখেগা।' ইয়াসিন এমন একটা ভঙ্গী করল যেন হাবিব পেনালটি কিক নিতে যাচ্ছে।

রসুল বললে, 'লাথ মারতা হায় মারো লেকিন ইসমে ডাগদারবাবুকা একঠো সফেদ বিল্লী হায়, উ চলা যায় তো তুমহারা কেয়া হোকা, আল্লা মালুম।'

ইয়াসিন কোমর থেকে হাত নামিয়ে বললে, 'সাচ্!'

'সাচ্,' রসুল বললে। এদিকে একটা কালো আর একটা সাদায় খুব জমেছে। সাদাটা একটা কোণ পেয়েছে। কালোটা ল্যাজ ফুলিয়ে একেবারে ধনুক। সাদাটাকে দু' একবার থাবা চালিয়েছে। কোষা কোষা লোম খসে পড়েছে। নবাবী আমলের মুরগীর লড়াই দেখা পূর্বপুরুষের রক্ত ইয়াসিনের শরীরে। বেড়ালের লড়াই দেখে তার মহানন্দ। মুঠো পাকিয়ে

ইয়াসিন কালোটাকে উৎসাহ দিচ্ছে, লাগা-লাগা, মার এক থাবা! বহুত আচ্ছা। কালো বেটা জিতে যাবে।

রসুল জানে, যে বেড়াল কোণ নিয়েছে তাকে হারাবার সাধ্য কারুর নেই। সে বললে, 'কালা জিতে তো দশ রুপীয়া বেট।'

ইয়াসিন বললে, 'সাদা জিতে তো বিশ রুপীয়া বেট। চলো, হো যায়।'

রসুল মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'হাঁ হো যায়।'

কালো দশ, সাদা কুড়ি। টাকার লড়াই হচ্ছে। একপাশে রসুল, একপাশে ইয়াসিন। মাঝে মাঝেই দুজনে চিৎকার করে উঠছে, ইয়া, লাগা আওর, থোড়া। আ-আ। ইয়াসিন মাঝে মাঝে গোঁফ চুমড়ে নিচ্ছে। রসুলের সাদাটা ইয়াসিনের কালোটার চোখের কাছে একটা থাবা বসিয়ে দিতেই ইয়াসিন একটু চুপসে গেল। রসুলের ধেই ধেই নাচ, 'লাগা বাহাদুর, লাগা বাহাদুর।' ইয়াসিন কালোটাকে বলছে, 'মছলিকা বড়া দেগা, মার এক থাবা, এক বাটি দুধ দেগা, মার এক থাবা।' রসুল বললে, 'ইয়াসিন, এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। তোমার হাতে রান্নাঘর বলে তুমি মাছের লোভ, দুধের লোভ দেখাচ্ছ। এভাবে জেতালে টাকা পাবে না।' রসুল এমনভাবে বলল বেড়াল যেন মানুষের কথা বোঝে। কালোটা হঠাৎ তেড়ে গেল। ইয়াসিন মছলি মছলি বলে দালান ফাটানো চিৎকার করতেই, রসুল কন্‌ডেন্‌স মিল্ক বলে তার সাদাটাকে লোভ দেখাল। রান্নাঘর থেকে এদিকে আরো অনেকে বেরিয়ে এসেছে। সকলেই রসুলের বিপক্ষে, কারণ ইয়াসিনের জেতার অঙ্ক অনেক বেশি।

কে জেতে কে হারে! সাদাটা কোণ নিয়ে এ্যায়সা বসেছে, কালোটা তেড়ে গেলেও সাদাটার ফ্যাঁস আর থাবার ভয়ে ঝটাপটি লটাপটি করতে পারছে না। ঝটাপটি লটাপটি না হলে লড়াইয়ের ফয়সালাও হবে না। এইভাবে চললে সারারাত কাবার হয়ে যাবে। ইয়াসিন সেটা বুঝেছে। ইয়াসিন বলছে, 'উসকো হুঁয়াসে নিকালো।'

'হুঁয়াসে নিকালো?' রসুল প্রতিবাদ করে উঠল, 'কাহে হুঁয়াসে নিকালবে? মামার বাড়ি পা গিয়া! যে যেই পোজিসানে আছে সেই পোজিসানেই লড়বে।'

ইয়াসিন বললে, 'ফুটবলমে পোজিসান চেঞ্জ হোতা নেই? আবি কালা আয়েগা উধার, সাদা জায়েগা ইধার। নেহিতো দোনা চলা আয়েগা পেনালটি পোজিসানে। এ হামিদ ভাই, উসকো খোঁচাও।'

অ্যাসিসটেন্ট হামিদ সত্যিসত্যিই সাদাটাকে খোঁচাতে গেল। রসুলের মেজাজটা এমনিই ভাল নয়। কথায় কথায় তার হাত ওঠে। রসুল ধাঁ করে হামিদের কলার চেপে ধরে বললে, 'এক পা আগে বাড়ে তো হালত চেঞ্জ কর দেগা।' ইয়াসিন সঙ্গে সঙ্গে রসুলের ঘাড় চেপে ধরে দুবার ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'চোপরাও জমাদার।' এদিকে সাদাটা কালোটাকে আর একটা মোক্ষম থাবা দিয়েছে। রসুল জানে, জিততে হলে এখন তাকে গায়ের জোরে জিততে হবে।

রসুল হামিদের কলার ছেড়ে দিয়ে ইয়াসিনের চিবুকের তলায় একটা ঘুষি ঝেড়ে

বলল, 'চোট্টা কাঁহাকা।' আর বেশি কিছু বলার সে সময় পেল না। মাটি থেকে অল্প একটু উঁচু হয়ে, জমির হাত খানেক ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে যে কোণে সাদা আর কালো বেড়াল দুটো বাজির লড়াই লড়ছিল সেই কোণে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে বেড়াল দুটোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। ক্লোরোফর্ম শিশির ভাঙা গলাটা বাঁ হাতের তালুতে বিঁধে গেল। সারা দালানে ক্লোরোফর্ম উড়ছে। একপাশে ডাস্টার, অন্যপাশে গড়াচ্ছে ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। রসুলকে আর উঠতে হল না। ইয়াসিনের ঘুষি আর ক্লোরোফর্ম যে কোনো একটাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একসঙ্গে দুটো! বেড়াল ছটারও সেই এক অবস্থা। বারকতক ফোঁস ফোঁস করে সবকটাই পালাবার চেষ্টা করেছিল। কেউ একপা কেউ দু'পা গিয়ে লটকে পড়েছে। ইঁদুরটা খাঁচার মুখে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার লম্বা ল্যাজটা ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

বড়মামা তখন গুপ্ত সাহেবকে নিয়ে হিমসিম। আজীবন নস্যি নিয়ে নিয়ে সাহেবের নাকের ছিদ্র দুটো কামানের নলের গর্তের মত। বড়মামা সিস্টারকে বলছেন, 'এ ছেঁদা ছোটো না করলে অক্সিজেন ভেতরে যাবে কি করে। সবই তো লিক করে বেরিয়ে আসবে। চারদিক থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে গোল করে বুজিয়ে আনতে হবে। এ কি আমাদের কম্ম! রাজমিস্ত্রী ডাকুন।'

স্লিপ নিয়ে সিস্টার-ইন-চার্জ এলেন। এমার্জেনসি কেস। তলার চোয়াল ঝুলে গেছে, খুলে গেছে বলেই মনে হয়। বাঁ হাতের চালু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। সেনসলেন। ভিকটিম নিজেই নিজেকে অ্যানেসথেসিয়া দিয়েছে। সারা গায়ে মুখে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। দাগ দেখে মনে হয় বন্য জন্তুর আক্রমণ। অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ানের রিপোর্টটাই পড়লেন। পেশেণ্টের নামটা দেখেও দেখলেন না। বড়মামা বললেন, 'চলুন দেখি। সুন্দরবন তো অনেক দূরে। বাঘে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে!'

সিস্টার-ইন-চার্জ বললেন,—'বুঝতে পারছি না ঠিক, তবে মুখটা ফালা ফালা করে দিয়েছে। চোয়ালটা কব্জা ভাঙা বাক্সর ডালার মত ঝুলে পড়েছে।'

বড়মামা একটু ভেবেচিন্তে বললেন, 'হতেও পারে। সার্কাস কিম্বা চিড়িয়াখানার বাঘ হয়তো।' সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের অপারেশন টেবিলে রসুল মুখে ভেঙচি কেটে শুয়ে আছে। ডক্টর মিত্র ইতিমধ্যে বোতল ভাঙাটা বের করে ছোটো বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে কাঁচের টুকরো বের করছেন। বড়মামা রসুলের মুখটা দেখেই বললেন,—'রাসকেল, অপদার্থ, তখনই বলেছিলুম ছটা বেড়াল একটা ইঁদুর, মরবি রসুল। বেড়াল হল বাঘের মাসী। ইস্ চোয়ালটা পর্যন্ত খুলে নেবার চেষ্টা করেছিল। মুখে মাংসর গন্ধ পেয়েছে। সবক'টা কামড়ে ধরে টানতে শুরু করেছিল বোধহয়!'

ডক্টর মিত্র বুরুশ দিয়ে কাঁচের টুকরো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মাইনর ব্রুইজগুলো বেড়ালের। চোখটা জোর বেঁচে গেছে। আসল ঘটনা ইয়াসিনের ঘুষি। দৈত্যের ঘুষি।

এক ঘুষিতেই চোয়াল খুলে গেছে। ক্লোরোফর্মটা কে ঢেলেছে বুঝতে পারছি না। চব্বিশ ঘণ্টার আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

ক্লোরোফর্মের রহস্য বড়মামা জানেন। বেড়ালের আঁচড়, তাও বুঝলেন। বুঝলেন না ইয়াসিনের ঘুষি। কুক ইয়াসিন রুসুলকে ঘুষি মারবে কেন? চোরাই খাবারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নাকি? জুনিয়ার ডক্টর মিত্রকে যা নির্দেশ দেবার দিয়ে বড়মামা কিচেনের দিকে চললেন। আহা কি দৃশ্য! চোখ জুড়িয়ে যায়। শ্রীক্ষেত্রের মত বেড়াল ক্ষেত্র। ছ'টা তাগড়া বেড়াল ছ'দিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে আছে। রান্নাঘরে সকলেই আছে, ইয়াসিন আছে, বিশু আছে, গদাই আছে, একটা বড় রুই মাছ আছে, ছ'টা মুরগী আছে, এক ঝুড়ি ডিম আছে, ঘি আছে, তেল, মশলা, নুন, মাখন সব আছে। তবে কথা বলার মত অবস্থায় কেউ নেই। ইয়াসিন সব্জী-কাটা লম্বা টেবিলে কাঁচাকলা মাথায় দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। থামের মত একটা পা কিচেন র‍্যাকের ওপর। চায়ের একটা বড় কৌটো, দুটো জ্যামের টিন পায়ের দিকের মেঝেতে গড়াগড়ি। হামিদ ওই দিকেই উপুড় হয়ে আছে। সারা মাথায় চা পাতা। এক এক ভঙ্গীতে সকলেই গভীর ঘুমে। উনুনে কড়ায় একটা কিছু চাপান ছিল। কি বস্তু এখন বোঝার উপায় নেই। কড়াটা উনুনের তাতে ফেটে দু'চাকলা হয়ে দুদিকে সরে গেছে।

কাউকে ঘাঁটাবার সাহস বড়মামার হল না। সারা হাসপাতালের রুগী আর হাউস স্টাফের আজ উপবাস। সব ক'টাকে দাওয়াই দিয়ে চাঙ্গা করতে হবে। ক্লোরোফর্ম সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে রান্নাঘরে আসে কি করে, রসুলকে তার জবাবদিহি করার জন্যে ফতোয়া জারি করতে হবে। পুরো ব্যাপারটার তদন্তের জন্যে কমিটি বসাতে হবে। চেয়ারম্যান বড়মামা—ডক্টর মুকার্জি। সব কিছুর মূলে, বড়মামা—ডক্টর মুকার্জি, তাঁর চারটি বেড়ালছানা আর ছটি বেড়াল।

চিন্তিত বড়মামা বেছে বেছে সাদা একটা বেড়াল বগলদাবা করে চেম্বারে ফিরে এলেন। একটা রবার-স্ট্যাম্প দিয়ে সারা গায়ে দেগে দিলেন। এবার আর গুলিয়ে যাবার উপায় নেই। বেড়ালটাকে মেঝেতে ফেলে মিউ মিউ বাচ্চা চারটেকে ছেড়ে দিয়ে ঘটননার নোট লিখতে বসলেন। রসুলকেও সাসপেণ্ড করতে হবে, নিজেকেও সাসপেণ্ড করতে হবে। বড়মামা একবারও লক্ষ্য করলেন না, মা বলে যে বেড়ালটাকে ধরে এনেছেন সেটা একটা বিশাল হুলো।

মেজকে বড়র জুতো দান

বড়মামার হঠাৎ কি যে হল। হঠাৎ নয়, জিনিসটা বেশ কিছুদিন মাথায় ঢুকছিল একটু একটু করে। যোগী পূর্ণানন্দের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে মাঝে মাঝেই বলতে শুরু করেছিলেন 'জীবনটাকে একেবারে বদলে ফেলতে হবে। আকাশ থেকে শক্তি নামছে, সেই শক্তিকে ধরতে হবে, ধারণ করতে হবে। মৃত্যুকে জয় করতে হবে। তোর মেজমামার মত বিষয়ী স্বার্থপর লোকদের আমি দেখিয়ে দেবো, যোগের শক্তি কাকে বলে!'

'সব ছেড়ে মেজমামাকে কেন? যোগের শক্তি নেমে এলে সবাই দেখবে। শুধু মেজমামা কেন বড়মামা!'

'সেদিন সামান্য একপাটি চটির জন্যে কি সাংঘাতিক অপমান করল, তুই ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি।'

'মেজমামার মাথার ঠিক ছিল না বড়মামা'

'মেজোর মাথা কবে ঠিক থাকে? সব সময়েই তো বাবুর হট হেড!'

'সেদিন কিন্তু আপনার কুকুর ভীষণ অসভ্যতা করেছে।'

'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে। মানুষের কাজ কী তোর মেজমামা কোনও দিন করেছে? কুকুর মানুষ চেনে রে। তোর মেজমামার মত মানুষদের হাড়ে হাড়ে চেনে'

'কুকুর মানুষ চেনে ঠিকই তবে সবচেয়ে ভাল চেনে জুতো। আপনার চটি আর মেজমামার চটি পাশাপাশি খোলা ছিল। চিনে চিনে ঠিক মেজমামার চটিটাই ছিঁড়ে ফালাফালা করল কেন?'

'কৃপণদের ওই অবস্থাই হয় রে। কোত্থেকে এক জোড়া কাঁচা চামড়ার চটি কিনে নিয়ে এল। ওয়ান পাইস ফাদার মাদারদের ওই হালই হয় রে। সস্তার তিন অবস্থা।'

বড়মামার ঘরের বাইরে দিয়ে মেজমামা ঠিক এই সময়েই কি কারণে যাচ্ছিলেন কে জানে! শেষ কথাটা ঠিক কানে গেছে। মেজমামা পর্দা সরিয়ে শরীরের ওপরের অংশটা ঘরে ঢুকিয়ে বললেন ঃ

'জুতোর আবার কাঁচাপাকা কী হে! এ কী পেয়ারা! ডাঁসা পেয়ারা পাকা পেয়ারা!' মেজমামা মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছিলেন। বড়মামা ডেকে বললেন, 'ওহে শোন শোন।'

পর্দার বাইরে থেকে মেজমামা বললেন, 'কি আর শুনবো? তোমার পক্ষপাতিত্ব আমার জানা আছে। কুকুর ছাড়া পৃথিবীতে তোমার আপনজন কে আছে! কুকুরপ্রেমী সুধাংশু মুকুজ্যে!'

'শোনো, শোনো, শুনে যাও। তুমি অধ্যাপক হতে পার, শিক্ষার কিন্তু অনেক বাকি আছে।'

মেজমামা পর্দা সরিয়ে ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন 'আমি না হয় ওয়ান পাইস ফাদার মাদার, তুমি তো দাতা কর্ণ, তা তোমার পেয়ারের কুকুরদের রোজ একপাটি করে নতুন জুতো চিবোবার জন্যে কিনে দিলেই পার, কৃপণের জুতো ধরে টানাটনি না করলেই হয়।'

'ও যত জুতোই দাও, কাঁচা চামড়ার জুতো পেলে ওদের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

'যে কুকুর জুতো খায় সে কুকুর অতি নিকৃষ্ট ধরনের কুকুর, নীচ জাতের কুকুর, নের অধম।'

'তাই নাকি, বুলটেরিয়ার, ফকসটেরিয়ার, এসব হল নীচ জাতের কুকুর, আর তোমার জুতোটা হল উঁচু জাতের!'

'কি বলে রে!'

বড়মামা সমর্থন পাবার আশায় আমার দিকে তাকালেন। দু মামার সঙ্গেই আমার সমান ভাব। একটু পরেই মেজমামা আমাকে মর্নি শোতে ইংরেজী ছবি দেখাতে নিয়ে যাবেন। আবার বিকেলবেলা বড়মামা আমাকে গান্ধীঘাটে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছেন, বড়মামার নতুন মোটর সাইকেলে করে। মহা মুশকিল হয়েছে আমার। কোন পক্ষেই সহজে যাবার উপায় নেই।

মেজমামা বললেন, 'জুতোর জাত-ফাত আমি জানি না। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময়ও আমার নই। জুতো পায়ে দিয়ে ফটাস ফটাস করে হাঁটা যায় ইটুকুই জানি। আর জানি কিছু জুতো আছে, পায়ে লাগে। পরলে কষ্ট হয়। কিছু আছে পায়ে লাগে না।'

'অধ্যাপকদের ওইরকম জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক। জুতো পায়ে দিয়ে নাকে চামড়ার বদগন্ধ পাও না?'

'জুতো থাকবে পায়ে, নাক থেকে পায়ের দূরত্ব মিনিমাম সাড়ে চার ফুট। জুতো তো আর গোলাপ ফুল নয়, নুরজাহানের মত নাকের কাছে কেউ বোঁটা ধরে বসে থাকবে!'

'তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারব না। এই দেখ আমার জুতো। দস্তুরমত পয়সা খরচ করে কেনা। পাকা চামড়ার জুতো। নাকের কাছে ধর...'

বড়মামা জুতোটা পা থেকে খুলে নিজের নাকের কাছে ধরলেন, 'কোনও গন্ধ পাবে না। রোজ পাউডার দি বলে, একটু পাউডারের গন্ধ পাবে।'

বড়মামা জুতোটা নাকের কাছে ধরে আছেন, এমন সময় মাসীমা ঘরে এলেন হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে। মাসীমা ট্রেটা আর একটা টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন 'উঁহু, উঁহু বড়দা, জুতো দিয়ে চা খেও না। বিস্কুট দিয়ে চা খেতে হয়।'

বড়মামা মাসীমার নাকের কাছে জুতোটা ধরে বললেন, 'কোন গন্ধ পাচ্ছিস কুশী!'

মাসীমা মুখটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'একি, একি, পায়ের জিনিস নাকের কাছে কেন?'

'একে কি বলে জানিস? হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। তুই এবার ওর জুতোটা শুঁকে দেখ। আমি এখান থেকে বসে গন্ধ পাচ্ছি। ভাগাড়ের পচা চামড়া দিয়ে তৈরি।'

মেজমামা বললেন 'তোমার ঘরে ডেকে এনে সাতসকালে এভাবে অপমান করার কি মানে হয় বড়দা?'

'অপমান! এতে মান অপমানের কি হল শুনি! তোমাকে আমি শিক্ষা দিচ্চি। জ্ঞান দিচ্ছি। যা এই বাচ্চা ছেলেটা জানে, তুই তা জানিস না।'

মাসীমা বললেন 'তোমাদের দুজনে মুখোমুখি হলেই কী কথা কাটাকাটি! এখন দুজনে শান্তিতে একটু চা খাও দেখি। সাতসকালেই জুতো নিয়ে শুরু হল। এখনও সারাটা দিন পড়ে আছে।'

মেজমামা চটপট শব্দ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজার পর্দার কাঠটা খটাখট শব্দ করে উঠল। বাইরে থেকে হেঁকে বললেন 'কুশী, আমার চা-টা আমার ঘরে দে। আমার জুতোয় গন্ধ, আমার গায়ে গন্ধ। ওনার কুকুরের গায়ে আতরের গন্ধ।'

বড়মামা প্রতিবাদ করে বললেন, 'মিথ্যে বল না। তোমার গায়ে গন্ধ একথা কিন্তু একবারও আমি বলিনি।'

'ওই হল। এরপর তোমার কুকুর যদি আমাকে আমাকে কামড়ে দেয়, তুমি বলবে তোর গাটা পচা চামড়া দিয়ে তৈরি। তুমি হলে ওআন আইয়েড বুল।'

'তুমি হলে টু আইয়েড কাফ।'

মাসীমা বড়মামাকে একটু ধমক দিলেন, 'কি হচ্ছে বড়দা! এবার কিন্তু ভীষণ ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে।'

'তুই বল কুশী, কাঁচা চামড়ার জুতো কিনেছে, কুকুর গন্ধ পেয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে, তার আমি কি করব! আমার জুতো জোড়াও তো পাশে ছিল।'

'কিছু মনে করো না বড়দা, তোমার সবক'টা কুকুরই ভীষণ শয়তান। সারা বাড়িতে একটা না একটা অনিষ্ট করে চলেছে। ওই তো ওঘরে সোফার গদীটা ছিঁড়েছে।'

বড়মামার মুখটা হঠাৎ খুব করুণ হয়ে গেল। মাসীমা চলে গেলেন। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বলেছিলেন, জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর?'

'স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন বড়মামা।'

'তাহলে দ্যাখ, মহাপুরুষের কথা যারা মেনে চলতে চায় তাদের কি অবস্থা হয়। সে

একঘরে হয়ে যায়। তাকে ভাই এসে অপমান করে যায়, তাকে তার বোন এসে বলে আদিখ্যেতা। এই যাঃ।'

বড়মামা চায়ের কাপটাকে বিষের কাপের মত টেবিলে নামিয়ে রেখে, মহা অপরাধীর মত মাথায় হাত দিয়ে বসে, মুখে চুক চুক শব্দ করতে লাগলেন।

'কি হল বড়মামা?'

'আর কি হল, সর্বনাশ হয়ে গেল রে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে গেল।'

'কি প্রতিজ্ঞা?'

'আজ থেকে আমার চা ত্যাগ করার কথা। চা ত্যাগ, মাছ মাংস ত্যাগ। বিলাসিতা ত্যাগ।'

বড়মামা যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন, একটু শান্ত করা দরকার। বললুম, 'তাতে কি হয়েছে বড়মামা? ছুটির দিন আপনি বিশ কাপ চা খান, এখনও উনিশ কাপ বাকি। সেই উনিশ কাপ না হয় খাবেন না!'

'তাহলে এই কাপটা খেয়ে নেবো বলছিস? আর সিকি কাপ মাত্র পড়ে আছে। বড়মামা চোঁ করে চা-টা খেয়ে নিলেন। তারপর চোখ বুজিয়ে বসে রইলেন চুপ করে। অপরাধ করে ফেলেছেন। এখন চোখ বুজিয়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইছেন।

মেজমামার ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে আর এক কাণ্ড চলেছে। মেঝের ওপর বেশ বড় করে খবরের কাগজ বিছিয়েছেন। তার ওপর পাশাপাশি দুপাটি চটি। মেজোমামার হাতে একটা স্প্রেয়ার। মুখের চেহারা বেশ কঠিন। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বারকতক স্প্রে করে ছুটে জানালার দিকে চলে গেলেন, পাছে নাকে ঝাঁজ লেগে যায়। মেজমামার আবার হাঁচির অসুখ আছে। ধুলো, স্প্রে, ফুলের গন্ধ, পাউডার, ধূপের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। বড়মামা মেজমামার এই ব্যামোর নাম রেখেছেন ঘোড়া রোগ। ঘোড়ারা নাকি এইভাবে ফ্যাঁচোর ফ্যঁচোর করে অনবরতই হাঁচে।

মেজমামা শুনে বলেছিলেন, 'গো-বৈদ্যেরা এই কথাই বলবে, তবে প্রকৃত ডাক্তাররা এই অসুখের বেশ সভ্যভব্য নাম রেখেছেন—অ্যালার্জি। মানুষের চিকিৎসা করলে তুমিও জানতে, হাওয়েভার দেশে তো মানুষের সংখ্যা খুবই কম তাই ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে করে খাচ্ছে।'

মেজমামার কথা শুনে বড়মামার অবশ্য রাগ করেননি, হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'গরুরাই গরুদের ভাল চেনে, তাই সারা দেশে তারা মানুষ দেখতে পায় না।'

কিন্তু মেজমামার এ কী কেরামতি।

'মেজমামা, জুতোয় কি ছারপোকা হয়েছে?'

মেজমামা জানলার কাছ থেকেই বললেন, 'আগে এদিকে পালিয়ে আয় তারপর বলছি, ওদিকে কি উড়ছে দেখতে পাচ্ছিস না!'

'ওতে আমার কিছু হবে না মেজমামা।'

'হলে তখন রক্ষে থাকবে না, বিগব্রাদার তেড়ে আসবে।'

মেজমামা রেগে গেলেই বড়মামাকে বিগব্রাদার বলেন! পুবের জানলা দিয়ে ঘরে বাঁকা হয়ে একফালি রোদ এসে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। সেই রোদের রেখায় অজস্র তেল মেশানো কীটনাশক পদার্থের কণা ভেসে বেড়াচ্ছে। খবরের কাগজে তেলের ছিটে ছিটে দাগ ধরেছে।

জানলার দিকে সরে যেতেই মেজমামা বললেন, 'জুতোর গন্ধ মারছি। এরপর ওর ওপর এক টিন পাউডার ঢেলে, একমাস কাগজে মুড়ে ফেলে রেখে দেবো।'

'তাতে কিছু হবে মেজমামা?'

'আলবাৎ হবে। ওর বাবা হবে। পাউডারে ঘামের গন্ধ চলে যায় জুতোর গন্ধ যাবে না?'

'আমাদের সিনেমার কি হবে মেজমামা?'

'হবে, যাওয়া হবে। আমি তো আর বিগব্রাদারের মত নই, কথায় কথায় ব্লাফ। তুমি

রেডি! আমি তো রেডি হয়েই আছি। পাঞ্জাবি চড়াবো, পুরোনো স্লিপারটা পায়ে গলাব, আর বেরিয়ে পড়ব।'

'আমিও রেডি। কেবল জুতোর ফিতে বাঁধতেই যা একটু সময় লাগবে।'

'তুই চটি পরিস না কেন? চটি কত হাল্কা!'

'বড়মামা বলেছেন, জুতো ছেড়ে চটি পরলে পা বাইশ শো বাইশ হয়ে যাবে, যেমন আপনার হয়েছে!'

'কে বলেছে? বিগব্রাদার! বিগব্রাদার বলেছে—তাই না।'

মেজমামার চশমার কাঁচের আড়ালে বড় বড় চোখ আরও বড় বড় হয়ে উঠল। হাতের স্প্রেয়ারটা ঠক করে জানলার গবরেটে রাখলেন।

এই রে, সেরেছে রে! আর এক অশান্তি পাকিয়ে উঠল। কেন মরতে বলতে গেলুম। মেজমামা টেবিলের টানা থেকে একটা স্কেল বের করলেন। স্কেলটা হাতে নিয়ে সোজা বড়মামার ঘরে। আমাকেও পেছন পেছন যেতে হল। কি থেকে কি হয়ে যায়! সামাল দিতে হবে।

বড়মামা চোখে একটা কালো গগলস লাগিয়ে চুপ করে চেয়ারে বসে আছেন। হাত দু'টো কোলের ওপর নেতিয়ে আছে। মনে হয় ধ্যানস্থ! চশমার আড়ালে চোখ দু'টো বোজানো মনে হয়। ঠিক তাই।

মেজমামা দুম করে ঘরে ঢকেতেই শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এলি!'

মেজমামা কাজের মানুষ। উত্তর-টুত্তরের ধার ধারেন না। বড়মামার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে ডান পাটা ধরে টানাটানি শুরু করেছেন। স্কেলের ওপর পাটা তুলতে চাইছেন। মাপ নেবেন। বড়মামা চোখ খোলেননি। সেই একই ভাবে বসে থেকে বলছেন, 'কে সন্তু এলি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে না, আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হ' শরীর ভাল থাক, জীবনে উন্নতি হোক ; ওভাবে পায়ে খোঁচা মারিসনি। নখটা আজ কাটবি। করছিস যখন দু'পায়েই প্রণাম কর। এক পায়ে প্রণাম করলে গোদ হয় না!'

মেজমামা ঝট করে নিজের পাটাও মেপে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এক সেন্টিমিটার কম। বুঝলে, আমার পায়ের মাপ তোমার চেয়ে এক সেন্টিমিটার কম।'

বড়মামা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, জল পড়লে সব কাপড়ই একটু টেনে যায়। তোমার তো তবু এক সেন্টিমিটারের ওপর দিয়ে গেছে। আমার কি হয়েছে জানো, এই সেদিন যে নতুন পাঞ্জাবিটা করালুম, যেই জলে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকে টেনে গিয়ে, হাত দুটো উঠে গেল কনুইয়ের কাছে। আর ঝুল? তুমি অবাক হয়ে যাবে, ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। তুমি এক কাজ কর না, আমার আর একটা নতুন পাঞ্জাবি—ব্র্যাণ্ড নিউ। হাল্কা চাঁপা ফুলের মত রং। ভারি সুন্দর মানাবে তোমাকে। তোমার চেহারাটা পাঞ্জাবিতে খোলে ভাল।'

বড়মামা চেয়ার থেকে উঠে কাপড় আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। মেজমামা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বড়মামা আলমারি খুলে এ তাক সে তাক ঘেঁটে ফিকে হলদেটে রঙের একটা পাঞ্জাবি বের করলেন। বেশ সুন্দর দেখতে। পাঞ্জাবিটা ঝেড়ে পাট খুলে মেজমামার হাতে দিয়ে বললেন, 'এসব জিনিস প্রফেসারদেরই মানায়। রংটা দেখেছিস? তখন ঝোঁকে পড়ে নিজের জন্যে করিয়েছিলুম। একদিনও গায়ে উঠল না। কখন পরব বল? তুই পর। বেশ মানাবে তোকে। ফর্সা টকটকে চেহারা। মনে হবে ঠিক যেন সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছিস।'

মেজমামা পাঞ্জাবিটা হাতে নিলেন। চমৎকার সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে।

বড়মামা জামাকাপড়ের মধ্যে খালি ধূপের প্যাকেট গুঁজে রাখেন।

মেজমামা—'তোমার পাঞ্জাবি আমার গায়ে হবে কি?'

'আলবাৎ হবে। আমাদের দুজনেরই এক হাইট এক বুকের মাপ।'

'কেবল পায়ের মাপটাই যা আলাদা।'

'তা হতে পারে, কিছু মনে করিসনি, তোর পা দুটো একটু অডসাইজ, অনেকটা তুষার মানবের মত।'

'ওইটা তোমার কমপ্লিটলি ভুল ধারণা। চুষার মানবের মত পা হল তোমার। ইয়া বাইশ শো বাইশ।'

বড়মামা একটু শব্দ করে হেসে বললেন, 'এই তো আমার পায়ের ধুলো নিলি। কি মনে হল তোর? মনে হল না যেন গৌরাঙ্গদেবের পায়ে হাত দিচ্ছিস? এসব পা ছবিতে দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পা। তোর পা-টা রামায়ণেই পাবি! তবে এ পক্ষে নয় ও পক্ষে। রাবণ-টাবনের মনে হয় এই রকম পদযুগল ছিল।'

মেজমামার এক হাতে পাঞ্জাবি অন্য হাতে স্কেল। চোখ দুটো আবার বড় বড় হচ্ছে। মেজমামা বললেন, 'দেখছো আমার হাতে কি?'

বড়মামার এতক্ষণে মেজমামার হাতের স্কেলটার দিকে নজর পড়ল।

'স্কেল দিয়ে কি করবি? পেটাবি নাকি?'

মেজমামা যেন একটু লজ্জিত হলেন, 'ছি ছি, পেটাব কেন? স্কেল দিয়ে কেউ পেটায়! স্কেল হল মাপের জিনিস। তুমি যখন চোখ বুজিয়ে বসেছিলে তোমার পা-টা আমি মেপে ফেলেছি।'

'জুতো কেনার জন্যে কেউ স্কেল দিয়ে পা মাপে? ভগবান তোকে কবে একটু সাধারণ বুদ্ধি দেবেন! মাথা বোঝাই অসাধারণ বুদ্ধি। আর আমার এখন জুতো কি হবে? আমার তিন চার জোড়া রয়েছে। জুতো দরকার তোর। আমার ওই কুকুরটা, চার্লসটা, ওর স্বভাবটা বিশেষ ভাল নয় রে। খাস আইরিশ কুকুর হলে হবে কি, পশ্চিমবাংলার আবহাওয়ায় কী রকম বিগড়ে গেল। তা' না হলে তোর জুতোটা ওভাবে চিবোয়! আমি তোকে এক

জোড়া দামী স্লিপার প্রেজেন্ট করব। লি ওয়ার দোকানের হাল ফ্যাশানের স্লিপার। কাগজ কেটে মেপে তোর পায়ের মাপটা খালি আমাকে দিয়ে যা। ও, তুই তো আবার মাপ নিতেই জানিস না। স্কেল হাতে ঘুরছিস। দাঁড়া, আমি মাপটা একেবারে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি।'

মেজমামার আবার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে। বড়মামা একটা ফালি কাগজকে ভাঁজ করে করে সরু মত করে মেজমামার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসেছেন। আমাকে বললেন, 'টেবিলের ওপর থেকে পেনসিলটা দাও তো!' পেনসিলটা হাতে নিলেন। মেজামামাকে বললেন, 'নাও, তোমার ডান পা'টা এই কাগজটার ওপর ফেলো।'

মেজমামা একটু ইতস্তত করছেন।

'কি, হল কি তোমার? রাখো পা-টা রাখো।'

'তুমি গুরুজন। তুমি আমার পায়ে হাত দেবে কী!'

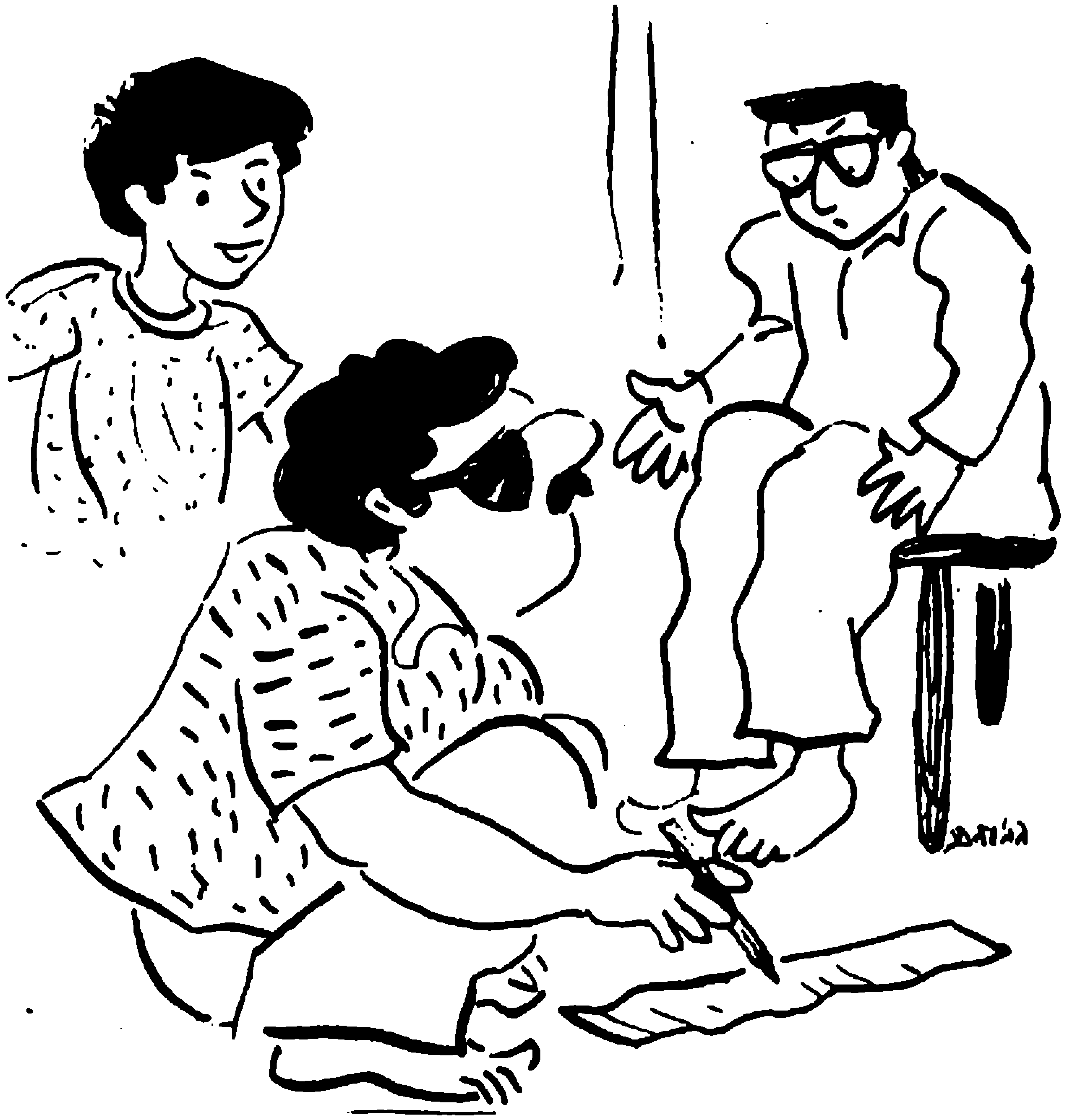

'অদ্ভুত তোর কথা! আমি যেমন তোর দাদা তেমনি তোর বন্ধু। আমার চেয়ে বড় বন্ধু তোর কে আছে রে ব্যাটা। নে, পা-টা রাখ? দেখছিস তখন থেকে উবু হয়ে বসে আছি। ভুঁড়িতে টেরিফিক চাপ পড়ছে।'

মেজমামা অবশেষে ডান পা-টা মেঝেতে পাতা ফালি কাগজটার ওপর রাখলেন।

'গোড়ালিটা একটু পেছাও। অ্যা অ্যা, ঠিক হয়েছে, এইবার দ্যাখো তোমার বুড়ো আঙুলটার মাথায় এই পেনসিলের দাগ দিলুম। নাও, পা তোলো।'

মেজমামা পা তুলে নিলেন। বড়মামা কাগজটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'এই হল তোমার পায়ের মাপ। এইবার আমি লি ওয়ার দোকানে গিয়ে এটা ফেলে দিয়ে বলব—জুতো নিকালো। সব কিছু শিখতে হয় প্রোফেসার! এই কায়দাটা আমি শিখেছি আমার বাবার কাছ থেকে।'

'আচ্ছা, এবার তোমার পা-টা ওর ওপর ফেল তো বড়দা। দাঁড়াও তার আগে তোমাকে একটা প্রণাম করি।'

মেজমামা বড়মামাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'এটা আমি কার কাছে শিখেছি জানো? আমার বাবার কাছে।'

'তোর আর আমার তো একই বাবা রে!'

দু মামা অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কত বড় একটা আবিষ্কার! কিছুক্ষণ পরে দুজনে হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর ঠিক সেই সময় মাসীমা দুকাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বড়মামা বললেন, 'আঃ, জাস্ট ইন টাইম! তুই হাত গুণতে জানিস রে কুশী।'

দুই মামাই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ফুড়ুর ফুৎ করে চুমুকে চুমুকে চা চলছে দু ভায়ের। আমেজে কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। বড়মামাকে আমিই মনে করিয়ে দিলুম, 'বড়মামা, আপনি কিন্তু আজ সকাল থেকে চা খাওয়া ত্যাগ করেছেন।'

ঠোঁটের কাছে কাপটা ধরা ছিল। সবে আর একটু চুমুকের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। থেমে গেলেন। কাপটা নেমে এল। বড়মামার মুখটা ভীষণ করুণ দেখাচ্ছে। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা দুবার চেটে নিলেন।

'ইস! ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি। প্রায় আধ কাপ খেয়ে ফেলেছি রে।'

মেজমামা বললেন, 'এতে কিসের কী আছে? চা তো খাবারই জিনিস।'

'আমি যে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি রে।'

'কেন, তোমার কি লিভার বিগড়েছে? না, রাতে ঘুম হচ্ছে না?'

'না না, ওসব নয়। ধর্মীয় কারণে, ধর্মীয় কারণে।'

'রাখো তোমার ধর্ম। কোন্ ধর্ম চা খেতে বারণ করেছে—এমন সাত্ত্বিক নির্ভেজাল পাতা ফোটানো জল! খেয়ে নাও।' বড়মামা এক চুমুকে চা-টা খেয়ে নিলেন। খালি কাপটা রখতে বললেন, 'জয় গুরু।'

মেজমামা বললেন, 'নাও, জামা কাপড় পর। আমাদের সঙ্গে সিনেমায় যাবে। মর্নিং শো।'

'সিনেমা? সিনেমা যে আর দেখবো না রে। দেখলেও ওই চৈতন্য মহাপ্রভু, কি বামাখ্যাপা কিম্বা যুগাবতার জাতীয় ছবি। আমার গুরু পরমানন্দ...'

'রাখো তোমার পরমানন্দ। এই নিয়ে তোমার সাতজন গুরু হল। কোন গুরুকেই তো শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারো না।'

'না রে, এবার খুব ধরেছি। দুজনেই দুজনকে। মোক্ষম ধরেছি। একেবারে কাছিমের কামড়।'

'ঠিক আছে, সে তোমরা কামড়াকামড়ি কর। এখন পাঁচ মিনিট সময় দিলুম, রেডি হয়ে নাও। নইলে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাবো।'

'হ্যাঁ, বড়মামা'—বলে, আমি কোমর জড়িয়ে ধরলুম। 'যেতেই হবে। যেতেই হবে।'

তিনজনে পাশাপাশি বসে মজা করে সিনেমা দেখা হল। বড়মামা একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমার প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। মেজমামা এক সময় বললেন, 'কার যেন নাক ডাকছে!'

'বড়মামার, মেজমামা।'

আমি বসেছিলুম মাঝখানে। মেজমামা বললেন, 'ডেকে দে। আস্তে একটা খোঁচা মার।'

বড়মামা চোখ চেয়ে বললেন, 'কি করব বল? একটা লাইন ইংরিজী বুঝতে পারছি না। অ্যামেরিকানরা কি ভাষায় কথা বলে বল তো? মেজোকে জিজ্ঞেস কর তো, ফাইটিং-টাইটিং কখন হবে?'

'এইবার হবে, তুমি জেগে থাকো।'

বড়মামা সাঁ করে এক টিপ নস্যি নিলেন। পর্দায় তখন সবে একটা প্লেন উড়ছে। শব্দে শব্দ মিলে গেল। তা না হলে ওপাশের লোকটি বড়মামার উপর বিরক্ত হতেন।

বড়মামা হল থেকে বেরিয়ে বললেন, 'বেশ জম্পেস বইটা।'

মেজমমামা বললেন, 'তুমি আর দেখলে কোথায়? তোমার তো নাক ডাকছিল।'

'দূর, নাক্ ডাকবে কেন? নাকটা বুজে গিয়েছিল। যেই নস্যি নিলুম ছেড়ে গেল। ফাসক্লাশ হয়ে গেল। বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলুম রে মেজো!'

'কি আবার হল?'

'ওই কুকুরটা। কুকুরটা দেখলি? মেমসাহেবের কোলে ছিল। ওই রকম একটা ল্যাপ ডগ কোথায় পাওয়া যায় বল তো?'

আমরা বড়মামার গাড়িতেই এসেছি। গাড়ি স্টার্ট নিল। বড়মামার সেই এক কথা—একটা ল্যাপ ডগ...

গাড়ি বাজারের রাস্তায় ঢুকতেই বড়মামা ড্রাইভারকে বললেন, 'লি ওয়ার দোকানের সামনে দাঁড় করাও তো।'

লি ওয়ার বউ লম্বা টেবিলে চুরি দিয়ে আনাজ কাটছিল। ভেতরের ঘরে সেলাই কল চলার খটখট আওয়াজ হচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'সায়েব কোথায়?'

চীনেরা সবসময় যেন হেসেই আছে। হাসলে ওদের মুখে কী সুন্দর টোল পড়ে! চীনে মেমসায়েব ওদের দেশের ভাষায় তড়বড় করে কি সব বলতেই ভেতরের ঘর থেকে কাঁচি হাতে ঝকঝকে চেহারার এক চীনে সায়েব বেরিয়ে এলেন। বড়মামা বললে, 'এই যে তাই চুং, এই মাপের তোমার তৈরি বেস্ট এক জোড়া চটি লাগাও।'

চুং সাহেব কাগজটা হাতে নিয়ে অ্যালমিনিয়ামের একটা স্কেলের ওপর ফেললেন। স্কেলটার একটা দিকের কোণাটা উঁচু। মেপে-টেপে স্ত্রীকে বললেন—নাম্বার সেভেন ডায়নামো।

মেজমামা বললেন, 'দেখলে তো বড়দা, স্কেল দিয়েই পা মাপে।'

'সে তো অ্যালুমিনিয়ামের একটা স্কেল, নট ইওর প্লাস্টিক।'

মই বেয়ে ওপরে উঠে মহিলা একটা বাক্স ছুঁড়ে দিলেন। চীনে সায়েব খপ করে লুফে নিলেন। আমি শুধু অবাক হয়ে দেখছি, মহিলা কি করে খড়ম পায়ে অমন অক্লেশে মই বেয়ে ওপরে উঠলেন। জুতোটা ভারি সুন্দর। বড়মামা মেজমামার হাতে জুতোটা দিয়ে বললেন 'কী, পছন্দ?'

মেজমামা লাজুক লাজুক মুখে বললেন, 'বেড়ে দেখতে। একটু শুঁকে দেখবো বড়দা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ না, এসব পাকা চামড়ার জুতো।'

মেজমামা জুতো শুঁকছেন, সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি পরবেন বাবু?'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, ওই তো পরবে।'

সায়েব অবাক হয়ে বললেন, 'তাহলে কাগজে মাপ এনেছেন কেন? দেখি, পা দেখি।' পা থাকতে কাগজে কেন?

গাড়িতে বসে বড়মামা বললেন, 'আই অ্যাম এ ফুল।'

মেজমামা বললেন, 'আই অ্যাম অলসো এ ফুল।'

দু'মামার মাঝখানে জুতোর বাক্স।

দুজনে কোরাসে বললেন—'আমরা দুজনেই দুটো পাঁঠা। হে হে হে!'

লঙ্গরখানা

বড়মামা খেতে খেতে বললেন, 'আমি একটা গাধা।'

মেজমামার বাঁ হাতে একটা বই, ডান হাতে ঝোলে ডোবান রুটির টুকরো। এইটাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলবে না। অগাধ জ্ঞান-সমুদ্র, আয়ু অল্প বহু বিঘ্ন। সব সময় পড়ে যাও। সকালের কাগজ বাথরুমে বসে বসেই পড়েন। এখন যে বইটা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ছেন, সেটা কাক সম্বন্ধে। কাকের স্বভাব, কাকের সমাজ, কাকের নিয়মনিষ্ঠা। পড়তে পড়তেই বললেন।

'কি করে বুঝলে? তোমার কান দুটো অবশ্য একটু বড়ই ঝোলা ঝোলা, সাধারণ মানুষের কান অত বড় হয় না। প্রকৃতির ব্যাপার? বোঝা শক্ত। কে যে কি ভাবে জন্মায়। চীনে মেয়েদের শিং বেরোচ্ছে। কলকাতায় ছেলেদের ন্যাজ বেরোচ্ছে।'

রুটির টুকরোটা মুখে ঢোকালেন। কোলের ওপর এক ফোঁটা ঝোল পড়ল। আগেও দু এক ফোঁটা পড়েছে। দৃকপাত নেই। জ্ঞান-তপস্বী।

বড়মামা বললেন, 'স্কুলে অনেকবার আমাকে গাধা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। মানতে রাজী হইনি। তখন বোকা ছিলুম, গাধা ছিলুম না। এখন বোকাগাধা। ও সব কানটান নয়, এ আমার স্বীকারোক্তি। আত্মসমীক্ষার ফল।'

মেজমামা বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'আমি দর্শনের ছাত্র, তর্কশাস্ত্র পড়েছি, অত সহজে মানতে পরব না। তুমি প্রমাণ কর। ডেকে দেখাও। গাধা চেনা যায় ডাক দেখে।'

'আমি চিনেছি গরু দেখে।'

'গরু দেখে গাধা চেনা! অবশ্য দুটো জন্তুরই চারটে পা। চতুষ্পদ। তা হলেও মুখে মেলে না স্বভাবেও মেলে না। তোমার সিদ্ধান্ত ধোপে টিকল না। ধোপে টিকলে তুমি এতক্ষণে এই খাবার টেবিলে না থেকে ধোপার আস্তাবলে বাঁধা থাকতে। খাচ্ছ খেয়ে যাও। তর্কে এস না, হেরে যাবে।'

বড়মামা মাংসর হাড় চুষতে চুষতে বললেন, 'তুই একটা গাধা। দার্শনিক গাধা।'

মেজমামা বইটা কোলের ওপর উপুড় করে রেখে বললেন, 'তুমি একটা ডাক্তার গাধা।' মাসীমা ফ্রিজ থেকে পুডিং বের করতে করতে বললেন, 'হ্যাঁ, এইবার গাধাগাধা করতে করতে হাতাহাতি হোক। খাওয়া মাথায় উঠুক।'

বড়মামা বললেন, 'তুই দেখ কুসী, কি রকম আনসিভিলাইজড। আমি যখন বলছি, আমি গাধা, তখন নিশ্চয় কারণ আছে। সেটুকু মেনে নেবার উদারতা পর্য্যন্ত নেই। উনি দার্শনিক। ঘোড়ার ডিমের দার্শনিক।'

মাসীমা টেবিলে পুডিং-এর ডিশ সাজাতে সাজাতে বললেন, 'মেজদা, তোমারও ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব। তোমার এই সামান্য কথাটা মানতে কি হয়? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

'কি করে মানব তুই বল কুসী। আমার তো স্মৃতিশক্তি এখনও তেমন দুর্বল হয়ে যায়নি। এই তিন দিন আগে, এই টেবিলে বসেই উনি বললেন, আমি ভগবান। লজিক কি বলে? গাধাই ভগবান, ভগবানই গাধা। আমি ভগবান না মানলেও হিন্দুর ছেলে। আমার একটা সংস্কার আছে। গর্দভকে আমি ভগবান বলতে পারব না।'

মাসীমা খুব রেগে গেলেন। 'ওই লজিকেই তোমাকে মেরেছে মেজদা, যেমন ডাক্তারি মেরেছে বড়দাকে। দু'জনকেই আর বিয়ে করতে হল না।'

বড়মামা বললেন, 'একেই বলে মেয়েছেলে! গাধা থেকে বিয়েতে চলে গেলি?'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে বড়মামার সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা, ওটা একটা রিয়েল গাধা।'

মাসীমা বললেন, 'হ্যাঁ রিয়েল গাধা না হলে তোমাদের ভার বহন করবে কে? সকালে কাপের পর কাপ চা, কারুর নরম টোস্ট, কারুর কড়া, কারুর ডিমের ওমলেট, কারুর পোচ, জল গরম, ত্রিফলা, পাঁচন, ইসবগুল, কারুর স্টু। যত রকমের ফ্যাচাং, কে সহ্য করবে। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল। কে গাধা, কে গাধা নয়, এ তর্ক এখন থাক। দয়া করে খাওয়া সেরে উঠে পড়। অনেক রাত হল। পাড়া নিশুতি হয়ে এসেছে।'

মেজমামা বললেন, 'আমি এখুনি উঠে পড়ছি, যারা ভগবানকে গাধা বলে, গাধাকে ভগবান, তাদের আমি ঘৃণা করি। আই হেট দেম।'

বড়মামা চামচে দিয়ে পুডিং-এর মাথা থেকে লাল চেরিটা খসিয়ে নিয়ে বললেন, 'একে বলে গায়ে পড়ে ঝগড়া। অবশ্য ছেলে ঠেঙিয়ে প্রফেসারদের স্বভাবটাই মিনমিনে হয়ে যায়। পাঁচিলের ওপর হুলো বেড়ালের মত। মিঁআও মিঁআও। চলাও চলাও, ঝগড়া করি চাঁদের আলোয়।'

মেজমামা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। কোলের বইটা পায়ের কাছে পড়ে গেল। মাসীমা মেজমামার হাতটা চেপে ধরলেন, 'কি ছেলেমানুষী হচ্ছে মেজদা?'

'ছেলেমানুষী! আমাকে হুলো বলবে, আমি বসে বসে সহ্য করব! ডাক্তারদের মারার লাইসেন্স আছে জানি, যা তা বলার পারমিট আছে কি?'

‘মেজদা, তুমি দয়া করে বড়দাকে গাধা বলে মেনে নিলেই তো লেঠা চুকে যায়। সেদিন ভগবান বলে মানতে পারলে, আর আজ গাধা বলে মেনে নিলে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। যাঁহা রাম তাঁহা কৃষ্ণ।’

‘সেদিনও মানিনি আজও মানব না।’

বড়মামা খুব শান্ত গলায় বললেন, ‘বোস, বোস। অশান্তি করিসনি। স্বভাবটা পালটা। পুডিংটা খেয়ে দেখ। কুসীটা দারুন বানিয়েছে। তোর ওই ভুঁড়ি আরও এক বিঘত বেড়ে যাবে।’

মেজমামা আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। আমি তো জানি, পুডিং মেজমামার ভীষণ প্রিয় জিনিস। রাগ করে ছেড়ে চলে গেলে রাতে নানারকম দর্শনেই বই পড়ায় মন বসবে না। আমাকে একদিন বলেছিলেন, খাব না তো খাব না, খেতে বসে আধাখ্যাঁচড়া খাওয়া হলে মেজাজটা খিঁচড়ে যায়। জানবি মুড়ি আর ভুঁড়ি কানেকটেড। দুটোর মধ্যে ভীষণ যোগ।

বড়মামা বেশি আদর মাখান গলায় বললেন, ‘এবার প্লেটটা কোলের কাছে লক্ষ্মীছেলের মত টেনে নাও। লজ্জা কোরো না। জানই তো আর একবার সাধিলেই খাইব।’

মেজমামা আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, ‘ইমপসিবল। ইনসালট। ব্রুট্যাল অ্যাসলট।’

মাসীমা বললেন, ‘এবার থেকে তোমরা দুজনে একসঙ্গে খেতে বসবে না। নেভার।’

বড়মামা বললেন, ‘তুই অত সহজে খেপে যাস কেন? তর্কে রেগে গেলেই হার। পরাজয়। বোস, বোস। অবশ্য এটাও তোর একটা টেকনিক। ওঠ বোস করে খিদে বাড়ান।’

মেজমামা বসতে গিয়েও আবার উঠে পড়লেন। বড়মামার পায়ের কাছে যেন একটা স্প্রিং আছে। এক একবার একটু করে চাপ দিচ্ছেন আর মেজমামা উঠে পড়ছেন।

মাসীমা খুব রেগেমেগে বললেন, ‘কি হচ্ছে কি বড়দা? তোমার রসিকতা থামাবে, না আমরা উঠে যাব? মেজদা তুমি না দার্শনিক? কোনো কথায় কান না দিয়ে খেয়ে উঠে যেতে পারছ না?’

বড়মামা বললেন, ‘শুরুতেই বলেছি, আমি একটা গাধা। গাধা না হলে প্রফেসারের সঙ্গে কেউ এক টেবিলে খেতে বসে?’

‘আবার শুরু করলে। তখন থেকে কেন গাধাগাধা করছ। আচ্ছা গাধায় পেয়েছে তো।’ মেজমামা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বাঁ হাতটা একবার করে মুঠো করছেন আবার খুলছেন। চেয়ারে বসতে সম্মানে লাগছে। মাসীমা মেজমামাকেও এক ধমক লাগালেন—

‘তোমার ছেলেমানুষী দেখলে রাগ ধরে মেজদা। জানই তো বড়দার পেছনে লাগা স্বভাব! তুমি যতই লাফাচ্ছ উনি ততই তোমাকে উসকে দিয়ে মজা পাচ্ছেন।’

মেজমামা মুখ গোঁজ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। চামচে দিয়ে রাগমাগ করে ইয়া বড় এক খাবলা পুডিং তুলে মুখে পুরলেন।

বড়মামা বললেন, 'আমি গাধা, তার প্রমাণ আমার গরু। আমার মত গাধা না হলে কেউ ওরকম তিনটে গরু পোষে না। তোরাই বল, ওই গরু তিনটে আজ পর্যন্ত ক'ছটাক দুধ দিয়েছে!'

মাসীমা যেন বেশ খুশিই হলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা। গরু দিয়েই প্রমাণ করা যায় তুমি একটা গাধা।'

মেজমামা সব সময় বাঁকা পথ ধরেন। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। বড়মামা বলেন, প্রোটেসটান্ট। মেজমামার উচিত ছিল চুপ করে শুনে যাওয়া। তা আর হল কই। হঠাৎ বলে বসলেন, 'কেন? ওয়ানস আপন এ টাইম তোমার কালো গরুটা হঠাৎ দিন তিনেক দুধ দিয়ে ফেলেছিল। তুমি সেই দুধ দেখে কলতলায় রবারের জুতো পায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে পিছলে পড়ে গিয়েছিলে। একদিন গরুর অনারে সত্যনারায়ণ পুজো হয়েছিল। তুমি বলেছিলে সিন্নি খেয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, দুধে এতই নাকি ফ্যাট। একদিন মেজারিং গ্লাসে করে প্রত্যেককে এক আউনস করে দুধ খাইয়েছিলে। সেই খাঁটি দুধ

খেয়ে আমাদের সব পেট খারাপ হয়ে গেল। গরুর ভাষা নেই। প্রতিবাদ করতে জানে না বলে যা খুশি তাই বলে যাবে?'

'হ্যাঁ দিয়েছিল ঠিকই। তারপর আর দিয়েছে কি?'

'কেন দেয়নি?'

'তোর মত একগুঁয়ে স্বভাব বলে দেয়নি। দিতে পারি তবু দোব না। কি করতে পার কর।' মেজমামা এবার সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন।

'আমি আর তোমার ভুঁসো কালো গরু এক শ্রেণীতে পড়ল। অসম্ভব! আর সহ্য করা যায় না।' মেজমামা বিদ্যাসাগরী চটির ফটাস ফটাস শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। খুব রেগে গেছেন। যাক বাবা, পুডিংটা শেষ করে গেছেন।

মাসীমা বললেন, 'তোমার বড়দা ভীষণ পেছনে লাগা স্বভাব!'

বড়মামা হিহি করে হেসে বললেন, 'ফায়ার হয়ে গেছে। ভেতরে গড়ড়্ গড়ড়্ শব্দ হচ্ছে।'

'গরুর সঙ্গে তুলনা না করলেই পারতে।'

'গাধার ভাই গরুই হয়। আমাদের ভায়ে ভায়ে হচ্ছে তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসিসনি। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার।'

'ও, আমি হলুম থার্ড পার্সন? ঠিক আছে।' মাসীমাও রাগ করে উঠে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'এদের আজ কি হয়েছে বল তো। কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে। সব কটা ব্লাডপ্রেসারের রুগী। আমার যেমন বরাত। গরু তিনটেরও প্রেসার। তোর জানা আছে গরুর প্রেসার কোন পায়ে মাপে? মানুষের প্রেসার মাপি বাঁ হাতে। গরুর তো চারটেই পা। হাতের বালাই নেই।'

বড়মামা ভীষণ ভাবনায় পড়লেন। ব্যাপারটা ডাক্তারির দিকে চলে গেল। আমি বললুম, 'বোধহয় নেজে মাপে।'

কথাটা পছন্দ হল না, 'ধুর্, নেজ আবার একটা জিনিস! দড়ির মত ঝোলে। নেজে কিস্যু নেই। ওটা একটা আব্রু। ওই যেখান দিয়ে গোরব বেরোয় সেটাকে ঢেকে রাখে। নেজ নয়, বুঝলি! দেখি, পশু-চিকিৎসার বই ঘেঁটে দেখতে হবে।'

বড়মামা হঠাৎ চিৎকার শুরু করলেন, 'কুসী, কুসী।'

মাসীমা ঘরের বাইরে খুটুস খুটুস করছিলেন।

'কি হল? চেঁচাচ্ছ কেন।'

'বাঃ চেঁচাব না। আর কিছু দিবি না?'

'আবার কি দোব? পুডিং-এর পর আর বাকি থাকে কি? দি এণ্ড।'

'সে কি রে! ফ্রুটস-ট্রুটস দিবি না।'

'না, দয়া করে উঠে পড় টেবিলটা পরিষ্কার করে নিক।'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার চোখ ঘুমে জুড়ে আসে। ধপাস করে শুয়ে পড়তে

পারলে আর কিছুই চাই না। আজও সেই তালেই ছিলুম। পরিষ্কার বিছানা। নরম মাথার বালিস, কোল বালিস। মৃদু পাখার বাতাস। জানালার বাইরে সাদা ফুলে ফুটফুটে কামিনী গাছ। থমথম করছে মিষ্টি গন্ধ। কোণের দিকে বড়মামার আরাম-কেদারার কাছে তে-ঠ্যাঙা বড় টেবিলে ল্যাম্পের মাথার ওপর হালকা সবুজ রঙের শেড স্বপ্নের মত আলো ছড়িয়ে রেখেছে। ঘুম আয়, ঘুম আয় বলতে হয় না, ঘুম যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় পা দুটো তুলে সবে শুতে যাচ্ছি, বড়মামা 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন।

'খেয়েই সোয়া কি? ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। হজম হবে না, ডিসপেপসিয়া ধরবে। চাঁদ উঠেছে। চলো ছাদে যাই। ঘণ্টাখানেক পায়চারি করে, পেট কমিয়ে, এক গেলাস জল খেয়ে, জল বিয়োগ করে তারপর বিছানা। নট নাও, নট নাও। উঠে এসো।'

ব্যস্ ঘুমের বারোটা বেজে গেল। বড়মামার যখন স্বাস্থ্যের দিকে আজ নজর পড়েছে তখন আর বিছানা না ছেড়ে উপায় নেই।

আজ অবশ্য ছাতটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। হু হু আকাশ। চাঁদের আলো যেন গানের মত ছড়িয়ে আছে। ছোট ছোট তারারা আজ আর ফোটেনি। বড় বড় গ্রহরা এখানে ওখানে পড়তে বসে আমার ঘুম-রাঙা চোখের মত ড্যাবড্যাব করছে।

ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যেতে যেতে বড়মামা বললেন, 'একটা ডেয়ারী হয়ে যেত।'

'সে আবার কি?'

'যত টাকা ওই বাঁদর গরু তিনটের পেছনে ঢেলেছি সেই টাকায় একটা ছোটখাটো ডেয়ারী হয়ে যেত।'

'আজ বুঝি হিসেবে বসেছিলেন?'

'হিসেবে কি রে? এরপর নগেন আমার গলায় গামছা দেবে। হাজার টাকা পাওনা। গত পাঁচ মাসে বাবুরা হাজার টাকার খড় খেয়েছেন। এর উপর ভুসি আছে, ছোলার চুনি আছে, ভেলিগুড় আছে, গোষুধ আছে, দুটো লোকের মাইনে আছে।'

'গোষুধ কি বড়মামা!'

'গরুর ওষুধ।'

ছাতের ও-মাথায় তুলসীগাছের টব ছুঁয়ে আমরা এ-মাথার রজনীগন্ধার টবের কাছাকাছি এসে গেছি। বিশাল ছাত, তিরিশ পাকে এক মাইল তো হবেই।

'ইয়ারকি পেয়ে গেছে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। "দুর্জন গরুনাং তথা শূন্য গোয়ালং শ্রেয়ঃ," পঞ্চতন্ত্রে আছে। কুঁক করে হাসছিস কেন?'

'মানে সংস্কৃতটা কি রকম বায়োকেমিক বায়োকেমিক লাগছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই আমার চেয়ে সংস্কৃত বেশি জানিস। ম্যাট্রিকে লেটার পাওয়া ছেলে আমি। ভাটপাড়ায় টোল না করে ডাক্তার হয়ে লাল জল, নীল জল করছি।'

সংস্কৃত নিয়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করার সাহস হল না। হঠাৎ যদি জিজ্ঞেস করে বসেন, ঠিকটা কি হবে তুই তা হলে বল। সংস্কৃত ছেড়ে গরুর দিকেই থাকা ভাল।

'আপনি গরুগুলোকে তা হলে কি করবেন? ছেড়ে দেবেন?'

'ছেড়ে দোব না, তবে গরু-গরু করে গাধার মত আর নাচানাচি করব না। দুধের আশায়ও থাকব না। তোমরা থাক তোমাদের গোয়ালে, আমি থাকি আমার ঘরে। দুধ দিতে হয় দেবে, না দিতে হয় না দেবে। পয়সা থাকে কিনে খাব, না থাকে চা খাব। আমি কি ডরাই কভু ভিখারি গারবে।'

বাবা! আজ একেবারে সংস্কৃতের ফোয়ারা ছুটছে। পটাস পটাস করতে করতে আবার তুলসী-গাছের টবের কাছে এসে পড়েছি। এবার তো শুয়ে পড়লেই হয়।

'বড়মামা, সব তো হজম হয়ে গেল, এবার একটু বিশ্রাম করলে হয় না।'

'খেপেছিস। এর মধ্যে শুবি কি-রে। একটা ফিউচার প্ল্যান তৈরি করতে হবে না?'

'কিসের প্ল্যান?'

'গরু ছেড়ে দিলুম। আর একটা কিছু ধরতে হবে তো।'

'কেন। কুকুর রয়েছে গোটাছয়েক, পাখি রয়েছে খাঁচায় খাঁচায়, দুটো বেরাল।'

'ধ্যার। ওদের কি ধরব? বড় একটা কিছু ধরতে হবে। মহান, মহৎ, অসীম, অনন্ত।'

'সে আবার কি?'

'আমি একটা লঙ্গরখানা খুলব।'

'লঙ্গরখানা?'

'কিছুই জানিস না? রোজ হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি তৈরি করে দুপুর বেলা দরিদ্র মানুষদের খাওয়াব। রাজা রাজেন মল্লিকের মত। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ফ্রী চিকিৎসা চালাব। একটু একটু করে আমার এই সমাজসেবা এমন চেহারা নেবে হেঁ হেঁ!'

'হেঁ হেঁ মানে?'

'হেঁ হেঁ মানে মাদার টেরেসা! তোর মেজোকে বলে আয় মনের জোর ইচ্ছাশক্তি, তেজ আর ত্যাগ থাকলে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। শুধু পুডিং খেলেই হয় না, পুডিং খাওয়াতে হয়। আমি-আমি করলে নিজের ভুঁড়িটাই বাড়ে। তুমি-তুমি করলে আমিটা পেল্লায় বড় হয়ে বিশ্ব-আমি হয়। বিশ্বামি ভবেৎ।'

'বিশ্বামি?'

'হ্যাঁ, স্বরসন্ধি। অকারের পর আকার থাকিলে উভয় মিলিয়া দীর্ঘাকার হয়। এখুনি জিগ্যেস করবি দীর্ঘাকার কি? দীর্ঘ প্লাস আকার। এও স্বরসন্ধি।'

'মেজমামাকে এখুনি বলে আসব?'

'শিঅর! নাকের ডগায় রাসেল নিয়ে বসে আছে বার্ট্রাণ্ড বানান জানে না।'

যাক বাবা! বড়মামার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গেছে। মেজমামার ঘরে গিয়ে ঘুম লাগাই।

সকালবেলা বড়মামাকে ঘরে পেলুম না। অথচ এই সময়ে ঘরে থাকারই কথা। লাল টকটকে সিল্কের লুঙ্গি? খোলা গা। পিঠের ওপর ইয়া মোটা সাদা পইতে। তাতে আবার

একটা আঙটি বাঁধা। হাতের আঙুলে জায়গা নেই। আঙটি কোমরের কাছে ঝুলছে। চেয়ারে বাবু হয়ে বসা। ছটা কুকুর ঘরময় হ্যা হ্যা করছে। এক একটা পালা করে লাফিয়ে উঠে বড়মামার হাত থেকে বিসকুট ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে হিসেব করে এক একটা বদমাইশকে ধরে ফেলছেন, 'উহুঁ উহুঁ, তোর দুটো হয়ে গেছে, এইবার ওইটার পালা।' কে কার কথা শোনে। সব কটা এ ওর ঘাড়ে লাফাচ্ছে। মাঝে-মাঝে পইতেতে পা আটকে যাচ্ছে। বড়মামা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'এইবার সব কটাকে দূর করে দেব। ইনডিসিপ্লিন্‌ড জানোয়ার।' বলেই পইতের ঝোলা অংশ তুলে কপালে ঠেকাচ্ছেন। কোথায় সেই পরিচিত দৃশ্য!

ঘরময় কুকুরের ছড়াছড়ি। প্রভু বেপাত্তা।

দক্ষিণের জানালায় উঁকি মেরে দেখি বড়মামা বাগানের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের চেহারায় ভীষণ ভাবনা। কি হল কে জানে? হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলেন। বাগানে নামতেই আমাকে বললেন—

'বুঝলি, এইখানেই হবে।'

'কি হবে বড়মামা? নারকোল গাছ?'

'আরে না রে না। তোর কেবল খাবার চিন্তা।'

'তবে?'

'এইখানে হবে সেই লঙ্গরখানা। একপাশে বিশাল উনুন। আর একপাশে সারি সারি টেবিল আর ফোলডিং চেয়ার। এই কোণে কল আর জল। এইখানটায় একটা পেটা ঘড়ি। ঢ্যাং করে যেই একটা বাজবে, খাওয়া স্টার্ট। দুটোর মধ্যে যারা আসবে তারাই খেতে পাবে। একটা থেকে দুটো। কড়া নিয়ম।'

'টেবিল, চেয়ার?'

'তবে না তো কি? দরিদ্রনারায়ণ সেবা,। ভেজিটেবিল খিচুড়ি আর যে কোনও একটা ভাজা। সপ্তাহে একদিন চাটনি। চল, এইবার চট করে হিসেবটা করে ফেলি।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতেই কুকুগুলো মুখিয়েছিল, সকালের বিস্কুট পায়নি। চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। একটা পায়ের কাছে। একটা পেছনের দিকে লাফাচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'উঁ পাওনাদারদের জ্বালায় জীবন গেল।'

বিস্কুট পর্ব শেষ হতে না হতেই মাসীমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সব কটা কুকুরকে এক জায়গায় দেখে বললেন, 'পয়সার কি জ্বালা! কত মানুষ না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে আর কারুর আধডজন কুকুর রোজ এক কেজি হরলিকস বিস্কুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। উৎপাতের ধন এইভাবেই চিৎপাতে যায়!'

'ঠিক বলেছিস কুসী।'

বড়মামার সমর্থন শুনে মাসীমা ভীষণ অবাক হলেন, 'অ্যাঁ ভূতের মুখে রামনাম!'

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'একেবারে অন্য রাস্তায় যাত্রা। কমপ্লিট বিবেকানন্দ। জীবে দয়া করে যেই জন সেই সেবিছে ঈশ্বর! প্রথমে পঁচিশজন দিয়ে শুরু, ধীরে ধীরে একশো, দুশো, তিনশো, পাঁচশো, হাজার।'

মাসীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হাজার কুকুর। অত কুকুর পাবে কোথায়?'

'গবেট! কুকুর নয়, কুকুর নয়, মানুষ। দরিদ্রনারায়ণ সেবা।'

'সে আবার কি। বারোয়ারী পুজো প্যাণ্ডেলে ফি বছর একদিন নারায়ণ সেবা হয়। তুমি তার প্রেসিডেন্ট হলে নাকি?'

'আজ্ঞে না স্যার। এ হবে সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের ফ্রী কিচেন, জাস্ট লাইক রাজা রাজেন মল্লিক অফ মার্বেল প্যালেস। আজই নগেনকে ডেকে বাগানে একটা আটচালা তৈরির হুকুম দিচ্ছি। কালই খগেন এসে উনুন করে দেবে। পরশু আসবে চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, মশলা, তেজপাতা, তরশু বেলা একটা। দেখবি সে কি কাণ্ড। গরমাগরম খিচুড়ি খেয়ে লোক দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলেছে—লং লিভ রাজা, সরি, ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে!'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ কি রে! বিবেকানন্দ বলে গেছেন, জন্মেছিস যখন দেয়ালের গায়ে একটা

আঁচড় রেখে যা। তুই হবি এই নারায়ণ-যজ্ঞের সুপারভাইজার। এক সেকেণ্ড বস তো। তোর পরামর্শে হিসেবটা সেরে নি। ধর পঁচিশ জন।'

মাসীমা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'তুমি দেউলে হয়ে যাবে বড়দা? তুমি নিজে মরবে আমাদেরও মারবে।'

'আমি মরি মরব। জনমিলে মরিতে হবে। তোরা মরবি কেন, বালাই ষাট। নে বল, পঁচিশজনে ডেলি কত চাল খেতে পারে? পেট ভরে খাবে, হাফভরা নয় ফুলভরা!'

মাসীমা বললেন, 'পঁচিশ কেজি।'

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, 'নার্ভাস করে দিচ্ছিস। বল পঁচিশ পো, মিনস ওই ছ'সের। মিনস ব্ল্যাকে কিনলে আঠারো টাকা। এইবার ডাল। ছ'সের চালে কত ডাল লাগে রে? ফর্মুলাটা কি।'

'চালের ডবল ডাল।'

'ভাগ্, ভাঙচি দিচ্ছিস, হাফ ডাল হাফ মিনস তিন কেজি, পনের টাকা। আঠারো প্লাস পনেরো ইজিকলটু তেত্রিশ। ইত্যাদি আরও সাত, মানে চল্লিশ। কয়লা, রান্না ইত্যাদি দশ। রোজ পঞ্চাশ টাকা, নাথিং, নাথিং। চল ভাগনে লেগে পড়ি।'

বড়মামা সে কী উৎসাহ! তড়াৎ করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

মাসীমা বললেন, 'ভাগনে কি ভাবে লেগে পড়বে?'

'যে ভাবে লাগাবে সেই ভাবে লাগবে। ওর মত ছেলে লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।'

'সে তো বুঝলুম, কিন্তু তোমার এই রাজসূয় যজ্ঞে ওকি ঘোড়া ধরতে বেরোবে!'

'আমাদের এখন কত কাজ জানিস! আটচালা তৈরি, রাঁধবার লোক ঠিক করা। উনুন বসান। চাল ডাল কেনা। তারপর প্রচার।'

'প্রচার মানে?'

'প্রচার মানে?' বড়মামা রেগে গেলেন। 'প্রচার মানে প্রচার। লোকে জানবে কি করে? না জানতে পারলে লোক আসবে কি করে।'

'অ। তা সেটা কি ভাবে হবে? কাগজে বিজ্ঞাপন, বিবিধ ভারতী, দেয়ালে পোস্টার, মাইক নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা, সিনেমায় স্লাইড। কোনটা।'

'ভ্যাক্। ওর কোনটাইতেই কাজ হবে না। দুঃস্থ মানুষ যারা পড়তে জানে না, যাদের পয়সা নেই সিনেমা দেখে না, তাদের অন্যভাবে জানাতে হবে। ভোটার লিস্ট তৈরির মত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রকৃত গরিব মানুষ খুঁজে বের করে হাত জোড় করে সবিনয়ে বৈষ্ণবদের মত বলতে হবে—দয়া করে এই অধমের গরীবখানায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন।'

মাসীমা বললেন, 'ডাক্তারি তা হলে মাথায় উঠল!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না, ইডিয়েট। যা, আর এক কাপ চা করে আন। বেরিয়ে

মাসীমা বেশ বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি বললুম, 'বড়মামা হাওয়া খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'রাখ রাখ, ঝোড়ো হাওয়াতেই আমাদের নিশান উড়বে পত পত করে।'

মটরসাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন, 'প্রথমে একবার চক্কর মেরে যাই। তুই শুধু চোখ-কান সজাগ রেখে দেখে যাবি। যেই মনে হবে এই লোক সেই লোক, সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে খোঁচা দিবি। গাড়ি থামিয়ে তাকে যা বলার আমি বলব।'

বড়মামার মটরসাইকেল, তার যেমন রঙ তেমন আওয়াজ। কানে তালা লেগে যাবার মত অবস্থা। শক্ত করে ধরে বসে আছি। পকেটে সেই ম্যাপ। বীরেন শাসমল রোড দিয়ে ঢুকে, রাম চ্যাটার্জী রোডে পড়ে, শরৎচন্দ্র স্ট্রীট হয়ে, কালু শেখ রোড ধরে বিরাট একটা চক্কর মারা হবে। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই বড়মামার অন্নসত্রে আসতে পারবে। বড় বড় হরফে দরমার গায়ে লেখা থাকবে, শক হূন, দল মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন।

সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় বেশ লোক চলাচল। সকলেই যে যার কাজে চলেছেন। কেউ বাজারে। কেউ স্কুলে ছেলে মেয়ে পৌঁছতে। কেউ অফিসে। চারপাশের দোকানপাট খুলে গেছে। জমজমাট ব্যাপার। সাইকেলের সামনে কাগজ ডাঁই করে হকার চলেছেন বাড়ি বাড়ি কাগজ দিতে। চোখে এমন একজনও পড়ছে না যাকে মনে ধরে। বড়মামা বলে দিয়েছিলেন, দেখবি মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। জটপাকান চুল, তোবড়ান গাল, গর্তে বসা চোখ, শির বের করা হাত, সামনে কুঁজো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে, কিংবা উদাস হয়ে রকে কি গাছতলায় বসে আছে, বিড় বিড় করে আপন মনে বকছে, দেখলে বুঝবি এই সেই লোক, দি ম্যান।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বড়মামা একটা বটগাছতলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন।—

'দেশের কি রকম উন্নতি হয়েছে দেখছিস! গরিবী হটাও তো সত্যিই গরিব হটাও, সবাই ওয়েল-টু-ডু ম্যান। একটা লোকও চোখে পড়ল না!'

'বুধবার তা হলে পাল পাল ভিখিরি আসে কোথা থেকে?'

'আরে দূর। বুধবার এ তল্লাটের মিল-ফিল বন্ধ থাকে, পালে পালে সব বেরিয়ে পড়ে উপরি রোজগারের ধান্দায়। ওরা কেউ রিয়েল ভিখিরি নয়।'

'আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'আমরা যাদের খুঁজছি তারা কেউ উঠে-হেঁটে আর বেড়াতে পারছে না। কোথাও না কোথাও ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে।'

'হতে পারে। কিন্তু কোথায় শুয়ে আছে?'

'মনে হয় গঙ্গার ঘাটে, মোচ্ছবতলায়, শ্মশানে পাকুড়তলায় বাঁধান চাতালে।'

বড়মামা খুব তারিফ করলেন, 'মন্দ বলিস নি। উঠতেই যদি পারবে তাহলে তো

পড়ি। তোমাদের মত আলস্য যোগে জীবন ম্যাসাকার হতে দোব না। কর্মযোগ, কর্মযোগ। যোগ কর্মসু কৌশলম্। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন। গীতা পড়েছিস গবেট!' মাসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বড়মামা প্যাণ্ট জামা পরে তৈরি হবার জন্যে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

মাসীমা ঠক করে চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন। বড়মামা চমকে মুখ তুলে তাকালেন। কাগজে দক্ষিণ পাড়ার ম্যাপ আঁকছিলেন। যে যে রাস্তা ধরে আমরা যাব তারই পরিকল্পনা। 'খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে।'

'রাগলে তোমার আর কি? তুমি কার পরোয়া কর? তবে তোমার এই সব ব্যাপার মেজদা জানে?'

'হু ইজ মেজদা! তার দর্শনে জীবে দয়া নেই জিভে দয়া আছে। ভগবান একটা না দুটো, না শূন্য, ভগবান আমি না আমিই ভগবান, তিনি সাকার না নিরাকার, এই গোলকধাঁধাতেই বেচারা সারা জীবন বোকার মত ঘুরতে ঘুরতে ম্যাড হয়ে গেল। তুই যা, তুই যা, আমাদের এখন অনেক কাজ। মেয়েদের সঙ্গে বকবক করার সময় নেই।'

খেটে খাবে। না খেতে পেয়ে সব লটকে পড়ে আছে। ঠিক বলেছিস। বড় হয়ে তুই ব্যারিস্টার হবি। চল, তা হলে মোচ্ছবতলাতেই আগে যাই।'

বড়মামা নেচে নেচে মটর সাইকেল স্টার্ট করলেন। ভু, ভট্-ভট্ শব্দে আকাশ ফেটে গেল। গাছের ডালপালা থেকে পাখি উড়ে পালাল ভয়ে। গঙ্গার দিকে রাস্তাটা যতই এগোচ্ছে ততই ঢালু হচ্ছে। ইঁটের গোলা, বাঁশের গোলা। খড়কাটা কল চলছে ঘস্-ঘস্ করে।

মোচ্ছবতলাতেই আমাদের প্রথম বউনি হল। একটি লোক উদাস মুখে বসে আছে। যেন জীবনের সব কাজ শেষ। হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। মুখে অল্প অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি। কোটরে বসা ঘোলাটে চোখ শীর্ণ-শীর্ণ হাত পা। ভাঙা গাল। বকের মত গলা।

'বড়মামা-আ!'

'দেখছি।'

'সব মিলছে। তবে নাকে তিলক-সেবা করেছে।'

'তা করুক। বৈষ্ণব, বুঝেছিস!' বড়মামা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়লেন। এইবার কথাটা পাড়বেন। লোকটি কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কে তো কে। জগতে কোনও কিছুর পরোয়া করে না। এই রকম একটা ভাব। বড়মামা প্রথমে গঙ্গাদর্শন করলেন। তারপর মোচ্ছবতলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এইবার কি করেন দেখি।

লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার হই।'

লোকটি বললে, 'জয় নেতাই।'

বড়মামা বললেন, 'জয় নিতাই।'

লোকটি বললে, 'দেশলাই আছে?'

'দেশলাই তো নেই।'

'সিগারেট আছে?'

'সিগারেট তো খাই না।' বড়মামা যেন খুব লজ্জা পেলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা হবে?'

বড়মামার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল আশায় আলো ফুটেছে। এতক্ষণে লোকটি এমন একটা জিনিস চেয়েছে যা বড়মামার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা গোল টাকা বের করে লোকটির হাতে হাসি হাসি মুখে দিলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা আবার ফেরত দিতে হবে না কি?'

'না না, পুরোটাই আপনার। এইবার একটা কথা বলব?'

'কি কথা? কেউ মরেচে নাকি?'

বড়মামা চমকে উঠলেন, 'কেউ মরবে কেন?'

আমার সঙ্গে লোকের কথা মানেই তো কেউ মরেচে,—দুখী বোস্টুম চল হে কেত্তন গাইতে হবে।'

'না না ওসব নয়, ওসব নয়, অন্য কথা। আপনি খেতে পারবেন!'

'খেতে? কি খেতে? শ্রাদ্ধ?'

'না না শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ নয়। এমনি খাওয়া। রোজের খাওয়া। ভোগ আর কি!'

'কোন্ আশ্রম? আমি চরণদাস বাবাজীর চেলা অন্য ঘরে নাম লেখাতে পারব না। ধম্মে সইবে না।'

'আশ্রম নয়। আমার বাড়িতে।'

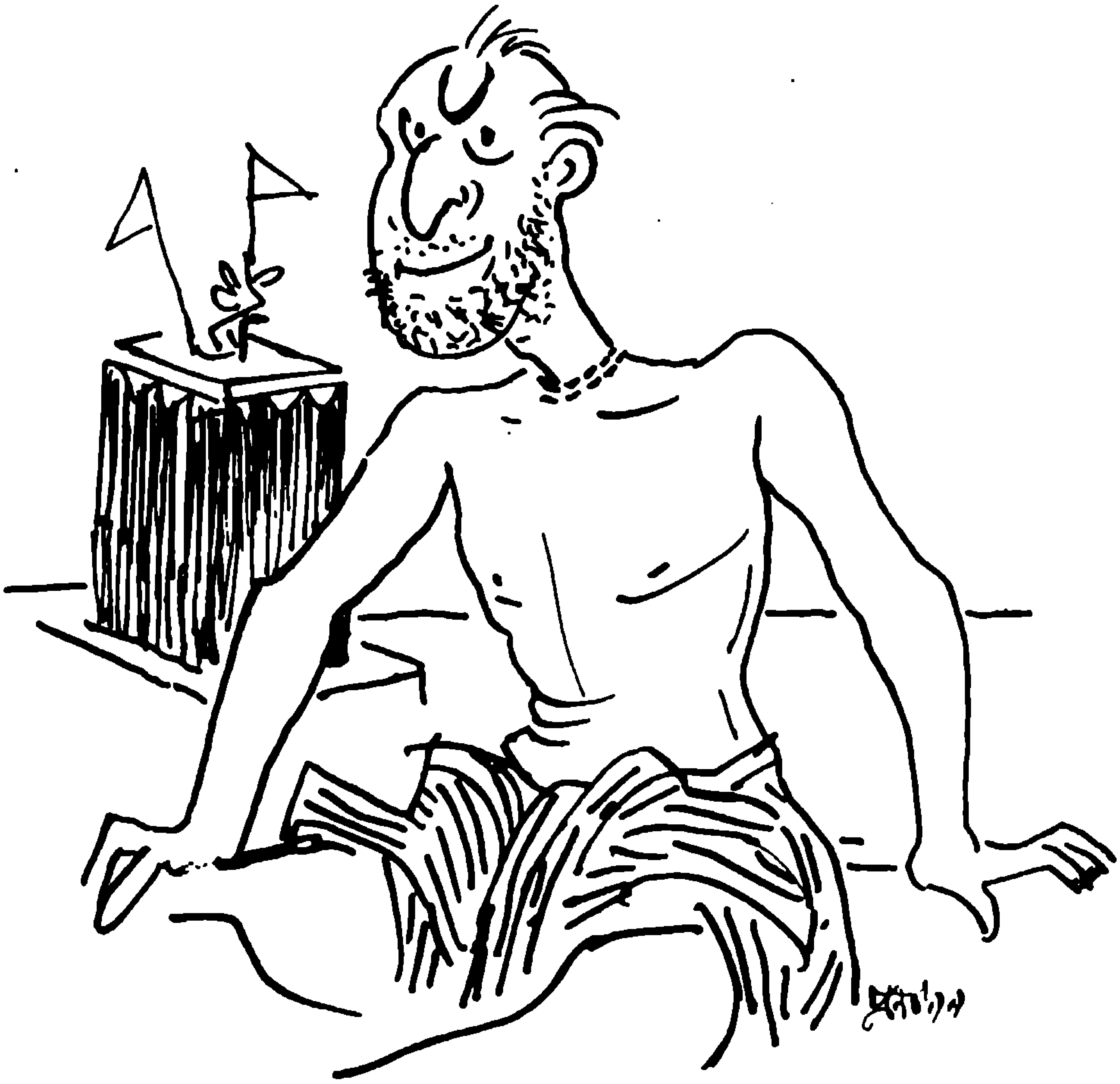

'কার পাচিত্তির? কি অসুখ!'

'পাচিত্তির মানে? ও বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্ত। না না প্রায়শ্চিত্ত নয়। জাস্ট এমনি খাওয়া।'

'বদলে কি করে দিতে হবে? বেড়া বাঁধা, ঘুঁটে দেওয়া, চেলা কাঠ কাটা, খড় কাটা!'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, ও সব কিচ্ছু না। রোজ একটা নাগাদ যাবেন, খাবেন-দাবেন, চলে আসবেন।'

'কি খাওয়া!'

'খিচুড়ি, ভাজাটাজা এই আর কি।'

'কি ডাল? মুসুর ডাল চলবে না। মুগ হওয়া চাই।'

'তাই হবে।'

'কি চাল? আলো না সেদ্ধ?'

ধরুন সেদ্ধ।'

'হ্যাঁ, সেদ্ধই ভাল। আলোতে পেট ছেড়ে দেবে। ও বেধবাদেরই চলে। রেশানের কাঁই বিচি চাল, না বাজারের চাল?'

'বাজারের, খোলা বাজারের ভাল চাল।'

'ঘি পড়বে, না খসখসে খেসকুটে? খিচুড়িতে ঘি না পড়লে টেস্ট হয় না।'

'হ্যাঁ, তা পড়বে।'

'শালপাতায়, না কলাপাতায়, না চটা ওঠা এনামেলের থালায়?'

'না না, ধরুন শালপাতায়।'

'হ্যাঁ, এনামেল হলে খাব না। তা শেষ পাতে একটু মিষ্টি না থাকলে জল খাব কি করে? বোষ্টম মানুষ। একটু পায়েস হলেই ভাল হয়।'

'সপ্তাহে তিন দিন।'

'রোজ হলেই ভাল হয়। যাক মন্দের ভাল। হ্যাঁ, একটা কথা, বোস্টমীকে নিয়ে আমরা সাতটি প্রাণী। সপরিবারে, না আমি একলা?'

বড়মামার মুখ দেখে মনে হল আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছেন, 'সাত জন? বলেন কি? এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। না না, একা নয় একা নয়। সপরিবারে।'

'জয় নেতাই। তা হলে কবে থেকে?'

'আজ হল গিয়ে রোববার। সোম, মঙ্গল, বুধ। হ্যাঁ বুধবার থেকে। বুধ ভাল বার।'

'প্রভুর নিবাস?'

বাব্বা! বড়মামা প্রভু হয়ে গেলেন! মেজমামা একবার শুনলে হয়, জ্বলে যাবেন। বড়মামা বাড়ির নির্দেশ দিতেই লোকটি বললে, 'অ আমাদের কেদারবাবুর বড় ছেলে। সেই ছিটেল ডাক্তার।' বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল,—'ছিটেল বললেন!'

'ছিটেল বলব না? সবাই জানে ডাক্তারটা খেয়ালী।'

'আমিই সেই ডাক্তার।'

'সে আগেই বুঝেচি। হক কথা বলব, ভয়টা কিসের! উকিল আর ডাক্তার শেষ জীবনে পারের কড়ি কুড়োতে চায় ধম্মকম্ম করে। সারা জীবনের অধর্মের পয়সা। একজন মারে মক্কেল, আর একজন মারে রুগী। দেখেন না, আজকাল মন্দিরে আশ্রমে কত ভিড়! সব ওই ভেজালদার, কালোবাজারী, ডাক্তার, উকিল, এম এল এ, মন্ত্রী।'

ভট্-ভট্ করে মটরবাইকে আসতে আসতে বড়মামা বললেন—

'কি রকম ট্যাকট্যাকে কথা শুনেছিস! ওই জন্যে লোকের ভাল করতে নেই। নেহাত সেদিন বইয়ে পড়লুম, লিভ, লাভ অ্যাণ্ড লাফ, তা না হলে অ্যায়সা রাগ ধরছিল। যাক বরাতটা খুব ভাল। এই বাজারে সাত সাতটা লোক পাওয়া! বাকি রইল আঠারটা।'

'ভাববেন না বড়মামা। ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। একবার খবরটা ছড়াতে দিন।'

আরও টহল মারা হল। এবার আর চারে মাছ পড়ল না, যাক সাতটা পড়েছে। ভাল ক্যাচ। বড়মামার বৃদ্ধ কমপাউণ্ডারের নাম সতুবাবু। সতুবাবুকে ভার দেওয়া হল আরও আঠারজন সংগ্রহ করার। পারবেন তো?'

'হ্যাঃ' সতুবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, 'আঠার কেন, আঠারশো ধরে এনে দিতে পারি।'

বেলা বারোটা নাগাদ লোক লস্কর নিয়ে বড়মামা নেপোলিয়ানের মত মার্চ করে বাড়ি ঢুকলেন। একজন বাগানের আগাছা পরিষ্কার করবে। একজন বাঁশ বাঁধবে। একজন উনুন পাতবে। একজন দরমা ঘিরবে। মাসীমা সেই পল্টন দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। এখনি হুকুম হবে, 'চা দে কুসী, চাল নে, সব ভাত খাবে।' হই-হই ব্যাপার।

মেজমামা এক ফাঁকে খুব গম্ভীর মুখে আমাকে ডাকলেন।

'কি সব হচ্ছে হে! ভূতের নৃত্য!'

'খুব মজা মেজমামা। কত লোক আসবে। খাবে। দু'হাত তুলে যাবার সময় চিৎকার করে বলবে, জয় রাজা রাজেন মল্লিক।'

'রাজা রাজেন মল্লিক? তোমার বড়মামা নাম পালটে ফেললে না কি? নাম ভাঁড়িয়ে শেষে এই অসৎ কাজে নেমে পড়ল?'

'আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি। আসলে বলবে, জয় রাজা সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'রাজা! কোথাকার রাজা? কামপুচিয়ার? ওই টাইম-টেবলটা আন তো।'

ড্রয়ারের ওপর থেকে টাইম-টেবলটা এনে মেজমামার হাতে দিলুম। একটা পাতা খুলে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম, রাত নটা চল্লিশ।'

'কোথায় যাবেন মেজমামা?'

'যেদিকে দুচোখ যায়।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ তাই। পাগলামি অনেক সহ্য করেছি। আর নয়।'

'দরিদ্রসেবা পাগলামি? অসৎ কাজ?'

'পরে বুঝবে। এখন যেমন নাচছ নেচে যাও। সবুরে মেওয়া ফলবে। তখন মেও সামলাতে পুলিশ ডাকতে হবে।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসার কি বলছিল রে?'

'বলছিলেন, অসৎ কাজের ঠেলা পরে বুঝবে কামপুচিয়ার রাজা।'

'অসৎ কাজ!' বড়মামা হই-হই করে হেসে উঠলেন, 'হিংসে, বুঝলি, হিংসে। সারা জীবন ছেলে ঠেঙিয়ে কিছুই করতে পারল না। আমি এক কথায় ফেমাস হয়ে গেলুম। এখন পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে, সুধাংশু মুকুজ্যের ভাই। কোন সুধাংশু? আরে সেই ডাক্তার সুধাংশু, গরিবের মা-বাপ।'

'মেজমামা তো রাত নটা চল্লিশের ট্রেনে যেদিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই না কি? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। ভজা, ভজা।'

বড়মামার পার্শ্বচর ভজা। 'যাই বড়বাবু।'

'চাল?'

'আ গিয়া।'

'ডাল?'

'ও ভি আ গিয়া।'

'বহত আচ্ছা। চা বানাও।'

ভজা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গোয়ালে গরু তিনটে ফ্যাল-ফ্যাল করে প্রায় খালি ডাবরের দিকে তাকিয়ে আছে। কালোটা হাম্বা করে উঠল। মানে, এবার দুধ দেবার চেষ্টা কর, নয়ত মালিক খুব খেপে গেছে। ন্যাজ মলে বিদায় করে দেবে।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। সানাইটাই যা বাজল না। তা ছাড়া সবই হল। সকালে মন্ত্র পড়ে উনুন পুজো হল। বাঁশ থেকে ফুলের মালা ঝুলল ঝুলুর-ঝুলুর করে। কাগজের রঙীন শিকলি চলে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। শ্যামজেঠা বেলতলায় বসে সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ করলেন। বড়মামা মাসীমাকে ডেকে বললেন, 'কুসী, সকালে আমি আর তোদের বাড়িতে খাব না। সকলের সাথে ভাগ করে নিতে হবে অন্নপান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমি হর্ষবর্ধন। সঙ্গমে স্নান করে নিজের পরনের কাপড়টা পর্যন্ত দান করে দোব...।'

'তারপর নেংটি পরে কুয়োতলায় ধেই-ধেই করে নাচব।' মাসীমা রেগে চলে গেলেন।

মেজমামা দোতলার বারান্দা থেকে মাসীমাকে চিৎকার করে বললেন, 'ভুলে যাসনি, আমার ট্রেন রাত নটা চল্লিশে।'

ওদিকে বেলতলায় শ্যামজেঠার উদাত্ত গলা, 'রূপং দেহি, যশো দেহি।'

জোড়া উনুনে আগুন পড়েছে। গল-গল করে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে গাছের ডালপালা ভেদ করে।

মেজমামা খুব উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বললেন, 'সেই সাতসকাল থেকে দেহি দেহি শুরু হয়েছে। যার অত দেহি দেহি সে হবে দাতা কর্ণ?'

ছটা কুকর বাড়ি একেবারে মাথায় করে রেখেছে। যত অচেনা অচেনা লোক দেখছে ততই ঘেউ-ঘেউ করছে। মাসীমা গ্লিসারিনে তুলো ভিজিয়ে কানে গুঁজে রেখেছেন। কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না।

সে এক জ্বালা! জল চাইলে তেল এনে দিচ্ছেন।

পেয়ারা গাছের ডালে কাঁসার ঘড়ি বাঁধা হয়েছে। সাবেক কালের জিনিস। বেলা একটার সময় ঠ্যাং করে বাজিয়ে ঘোষণা করা হবে—শুরু হল। সবাই বসে পড়।

দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। ভজুয়া দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে, দুহাতে

একটা লোহার রড ধরে ঘড়িতে ঘা মারল। সারা এলাকা কেঁপে উঠল ঠ্যাং শব্দে। আওয়াজ বটে। কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।

সবার আগে এল জয় নিতাইয়ের দল। সপরিবারে, হই-হই করে। সকলেরই নাকে নিখুঁত রসকলি।

বোষ্টম, বোষ্টমী, গেঁড়ি গেঁড়ে ছেলে মেয়ে। এটা লাফায়, ওটা ছোটে। বড়টা ছোটটার মাথায় গাঁট্টা মারে। ছোটটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মা সবকটাকে ধরে পাইকারি পিটিয়ে দেয়। 'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি', শ্যামজেঠার আর্তনাদ।

'বসে পড় সব, বসে পড় সব।'

ফোলডিং চেয়ার উলটে চার বছরের ছেলেটা মাটিতে চিৎপাত হল। বুকের ওপর চেয়ার। পায়ায় ঠ্যাং জড়িয়ে গেছে।

'জয় নেতাই, পড়ে গেছে রে বাপ। খেঁচকে তোল আপদটাকে।'

'তুলসী গাছ কোন্ দিকে?'

'তুলসী গাছ কি হবে গো?' ভজুয়া জিগ্যেস করল।

'দূর বেটা খোঁট্রা। তুলসীপাতা ছাড়া ভোগ হয়!' বড়মামার তুলসীঝাড় ফাঁক।

পঁচিশ কোথায়? পিল-পিল করে লোক আসছে।

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'মরেছে, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ রে! হাঁড়ি নয়, ড্রাম ড্রাম খিচুড়ি লাগবে। স্টপ দেব? অ্যানাউনস করে দে, পঁচিশ জনের বেশি নয়। গেটটা বন্ধ

করে দে রাশকেল ভজুয়া।'

'গেট বন্ধ করে আটকান যাবে না ডাগদারবাবু। গেট টপকে চলে আসবে।'

'ধাক্কা মেরে বের করে দে।'

'মেরে শেষ করে দেবে বাবু!'

বড়মামা গলা চড়িয়ে বললেন, 'শুনুন, শুনুন, আমাদের এই আয়োজন মাত্র পঁচিশ জনের জন্য।'

প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল, 'আমি সেই পঁচিশজনের একজন।'

'তা কি করে হয়! এখানে অনেককেই দেখছি যাঁরা টেরিকটনের প্যাণ্ট শার্ট পরে এসেছেন। বড় বড় চুল। দে আর নট গরিব।'

চিৎকার উঠল, 'আমরা মডার্ন গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।'

'আমি মডেল গরিব বেছে নেব।'

'বেছে নেব মানে? এটা কি স্টেট লটারি? কে বেছে নেবে?'

বড়মামা খুব অসহায়ের মত বললেন, 'সে কি রে বাবা। এরা যে দেখছি তেরিয়া হয়ে উঠছে। বেশ, জোর যার মুলুক তার। আপনারা পঁচিশ জন বাকি সকলকে ঠেকিয়ে রাখুন। তাজিয়া কাজিয়া যা হয় নিজেরাই ফয়সালা করুন।'

মার, মার, হই হই, রই রই। হে রে রে রে করে লোক ঢুকছে। যেন দশ আনার টিকিটের সিনেমার কাউণ্টার খোলা হয়েছে। ভজুয়া পালাতে পালাতে বললে, 'আরও আসছে বাবু। নারায়ণকা জলুস নিকলেছে আজ।'

শ্যামজেঠা পালাতে পালাতে বললেন, 'সুধাংশু, প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, পেছনের দরজা দিয়ে পালাও।'

বড়মামা ভয়ে পেছতে পেছতে বললেন, 'য পলায়তি স জীবতি। ব্যাপারটা বুফে-লাঞ্চের মত হয়ে গেল। যে পারে সে নিয়ে খাক।'

চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। একপাশের সামিয়ানা কেতরে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়ে বড়মামার লাল মটরবাইক তীরবেগে পশ্চিমে ছুটছে। মেজমামা কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোন ডায়াল করছেন—

'হ্যালো থানা। নরনারায়ণে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। বড় বড় থানইট ছুঁড়ছে। ও সেভ আস, সেভ আস।'

ছটা কুকুর বাগানে নেমে পড়েছে খেপে গিয়ে। মাসীমার কানে অ্যায়সা তুলো ঢুকেছে কিছুতেই বের করতে পারছেন না। মাথার কাঁটা, দেয়াশলাই কাঠি, যতই খোঁচাখুঁচি করছেন গ্লিসারিন-তুলো ততই ভেতরে চলে যাচ্ছে। কেবল বলছেন, 'এখনও চণ্ডীপাঠ হচ্ছে! শিলাবৃষ্টি হচ্ছে না কি রে।'

মেজমামা রিসিভার চেপে বলছেন, 'আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার পা কাঁপছে। প্যাণ্ডিমোনিয়াম! আরে দূর মশাই, হারমোনিয়াম নয়, প্যাণ্ডিমোনিয়াম।'

গরুর রেজাল্ট

বড়মামা প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে নীচে থেকে ওপরে উঠে এলেন। এমন চেহারা এর আগে আর কখনও দেখনি। কপালের ডান পাশটা ফুলে ট্যাপা লালা। দু'হাতের কনুইয়ের কাছ পর্যন্ত লাল টকটকে। গাঢ় নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি একটু উঁচু করে পরা। পায়ে কারো ওয়াটার-প্রুফ জুতো।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে বড়মামা দোতলার ঢাকা বারান্দায় উঠে এলেন। ঝলমলে রোদ জাফরির নকশা পেতে রেখেছে ঝকঝকে লাল মেঝের ওপর। দূরে কোণে মেজমামা বসে বসে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করছিলেন। আমি তাঁর ফাইফরমাস খাটছিলুম। 'এটা দে, ওটা দে।'

মেজমামার কোলের ওপর ক্যামেরা। হাতে হলদে রঙের ফ্ল্যানেলের টুকরো। চোখ আর ক্যামেরার দিকে নেই, বড়মামার দিকে। মেজমামা হঠাৎ বললেন, 'স্টপ। ঠিক ওই জায়গাতেই এক সেকেণ্ড। আমি চট করে তোমার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নি। তোমাকে ঠিক দিশি কাউবয়ের মত দেখাচ্ছে। বেড়ে দেখতে হয়েছ তো! কি করে হলো?'

বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'শাট আপ। শা-আট আ আপ!'

মেজমামা ফিস করে আমাকে বললেন, 'সাবজেক্ট্টা ভাল ছিল তবে একটু খেপে আছে।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে ডাকলেন, 'কাম হিয়ার। কুইক।'

'শুনে আসি মেজমামা।'

'হ্যাঁ শুনে আয়। কেসটা কি আমাকে জানিয়ে যাবি।'

'আচ্ছা।'

ঘরে ঢুকতেই বড়মামা বললেন, 'কি হবে?'

'কিসের কি হবে?'

'জুতো পরে ঢুকে পড়েছি যে!'

'ও কিছু হবে না।'

'এটা যে রাস্তার জুতো। কুসি দেখলে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।'

'মাসীমা তো এখন ধারে কাছে নেই।'

'মেজেতে যে দাগ পড়ে গেল!'

'আমি পা দিয়ে পালিশ করে দিচ্ছি।'

'আমি যে দাঁড়িয়ে পড়েছি!'

'চলতে চান তো চলে ফিরে বেড়ান না। অসুবিধে কিসের!'

'যেদিকে যাব সেই দিকেই তো দাগ পড়ে যাবে!'

'জুতো খুলে ফেলুন।'

'ইয়েস, দ্যাটস রাইট।'

বড়মামা জুতো খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে বারকতক নেচে নিলেন। লাল চকচকে মেজেতে নাচের জুতোর নকশা তৈরি হল।

'দেখলি, দেখলি! সাধে কুসি আমার ওপর রেগে যায়! রেগে যাবার অনেক কারণ আছে! পৃথিবীতে কোন কিছুই কি সহজ নয় রে!'

'জুতোটা না খুলে অমন করে নাচছেন কেন?'

বড়মামা রেগে উঠলেন, 'আমি কি ইচ্ছে করে নাচছি। আমাকে নাচাচ্ছে যে! রবারের জুতো পরে একবার দেখ না। পরা সহজ, তারপর পা থেকে আর খুলতে চায় না। কৃতদাসের জাত। পায়ে ধরে বসে থাকতে চায়।'

'এখন তা হলে কি হবে! সারাদিন এইবাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'আমি বরং দাগে দাগ মিলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তুই ওই মারকিউরোক্রোমের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে আয়। ও, না।'

'কি হল আবার?'

'বাইরে তো উনি ক্যামেরা তাক করে বসে আছেন। এখুনি ফট্ করে একটা ছবি তুলে এত বড় করে বাঁধিয়ে রাখবেন।'

'তাহলে আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি পা থেকে জুতো দু'পাটি খুলে দি।'

'না, দেখে ফেলবে।'

'দেখলে কি হয়েছে? আর কেই বা দেখবে?'

'ও বাবা, দেখলে কি হয়েছ! হোল্ বাড়িতে হই-চই পড়ে যাবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ভাগনেকে দিয়ে জুতো খোলাচ্ছে! মনে নেই সেদিনের কথা। তোকে বলেছিলুম পিঠে একটু তেল ঘষে দিবি, সেই নিয়ে কত রকমের কথা!'

'তাহলে আমি চেয়ারটাকে টেনে আনি, আপনি বসে বসে খুলে ফেলুন।'

'অগত্যা তাই করতে হবে। আমার আবার জুতোয় হাত দিলে কি রকম গা.ঘিন-

ঘিন করে। পায়ের জিনিস পায়ে পায়েই খোলা উচিত। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল, এটা হল সন্ধ্যের জুতো, সকালের নয়।'

'সে আবার কি, জুতোর আবার সকাল-সন্ধ্যে আছে নাকি?'

'জুতোর নেই। শরীরের আছে। সারারাত ঘুমের পর সকালের শরীর হল ফুলো ফুলো, তাজা! মুখ ফুলো, চোখ ফুলো, হাত ফুলো, পা ফুলো। শরীর যত সন্ধ্যের দিকে এগোচ্ছে তত শুকোচ্ছে, চুপসে যাচ্ছে। এসব হল অ্যানাটমি, ফিজিওলজির ব্যাপার। ডাক্তার হলে বুঝতে পারতিস।'

বড়মামা ডাক্তার। চেয়ারটাকে প্রথমে দু'হাতে তুলে আনার চেষ্টা করলুম। বেজায় ভারী। এখন টেনে আনার চেষ্টা করলুম। ঘষটাতে ঘষটাতে আসছি তেলা মেঝের উপর দিয়ে। চেয়ার ঠেলতে বেশ মজা লাগে। ইচ্ছে করেই বেশ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছি। সোজা রাস্তায় আসছি না। পথ ফুরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি!

'একি, একি, অ্যাঁ ঘরের একি অবস্থা, তুই সারা ঘরে চেয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন! বসার জায়গা পাচ্ছিস না! ও মাগো, মেঝেটার কি অবস্থা!'

দরজার সামনে মাসীমা। আমি যেখানে যেভাবে ছিলুম সেইভাবে, বড়মামাও সেই একই ভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে।

বড়মামা চোখ দু'টো কেবল বুজিয়ে ফেলেছেন। এটা বড়মামার নিজস্ব টেকনিক। ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলা।

সেই চোখ বোজান অবস্থাতেই বড়মামা বললেন, 'কুসি, আমি আহত।'

'তোমাকে কিছু বললেই তো তুমি আহত!'

'আমি সেভাবে আহত নই, এই দেখ আমার কপাল।'

বড়মামা মাসীমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কপালটা এর মধ্যে আরও ফুলেছে। থেঁতো হয়ে গেছে।

'তোমার কপালে এই সবই লেখা আছে আমরা জানতুম!'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।' মাসীমার পাশে মেজমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে ক্যামেরা।

মেজমামাকে দেখেই বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'ও, নো নো—নো ফটোগ্রাফ।'

'ছোট্ট করে একটা। ফ্যামিলি অ্যালবামে মানাবে ভাল।'

মাসীমা মেজমামাকে থামিয়ে দিলেন, 'রাখ তো তোমার ক্যামেরা। আগে ছবি তোলা শেখ। ঠ্যার ঠ্যার করে হাত কাঁপে, ফোকাস করতে পার না! কেবল পয়সা নষ্ট।'

'হাত কাঁপে! আমার হাত কাঁপে?'

'হ্যাঁ, কাঁপে। ছবি না তুলে তোমার কম্পাউণ্ডার হওয়া উচিত ছিল। জল দিয়ে পেনিসিলিন গোলাবার জন্য কসরত করার দরকার হত না, তোমার কাঁপা হাতে শিশিটা ধরিয়ে দিলেই আপনি গুলে যেত!'

মেজমামা একটু মুষড়ে গেলেও হেরে যেতে প্রস্তুত নন। আমার মামারা সহজে হারতে

চান না। মেজমামা বললেন, 'আমি যখন রেগে যাই তখনই আমার হাত কাঁপে, তা না হলে আমার হাত ল্যাম্পপোস্টের মতই স্টেডি।'

'তোমার সব সময়েই হাত কাঁপে, তা হলে বুঝতে হবে সব সময়েই রেগে আছ। কথা বাড়িও না, যা করছিলে তাই করগে যাও।'

মাসীমাকে সুবিধে করতে না পেরে মেজমামা বড়মামার ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।

'আহা, তোমার কপালটা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে বড়দা। কিসে ঠুকলে অমন করে!'

বড়মামা যেন হালে পানি পেলেন। মাসীমা যেভাবে তাকিয়ে আছেন, একমাত্র কপালের জোরেই বড়মামা বাঁচতে পারেন।

'ঠোকা? ঠোকাঠুকির মধ্যে আমি নেই। ওই লক্ষ্মীছাড়া। যার নাম রাখা হয়েছিল লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মী পেছনের পায়ে ঝেড়েছে এক লাথি।'

আমি চেয়ারটা যেখানে ছিল সেইখানেই চতুষ্পদ করে রেখে, ওষুধ আর তুলো নিয়ে মাসীমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকেও তো একটা বাঁচার রাস্তা বের করতে হবে। সারা মেজেতে চেয়ার টানার লম্বা লম্বা দাগ।

'এই নিন মাসীমা, ওষুধ।'

মাসীমা ওষুধ আর তুলোটা হাতে নিয়ে বড়মামাকে ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি সাত-সকালে গরুর কাছে কি করতে গিয়েছিলে? তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না!'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো, তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না! তুমি কি পশু চিকিৎসক? তুমি তো মনুষ্য চিকিৎসক!'

বড়মামা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, কথা শোন দু'জনের। যা হয় একটা কিছু বলে দিলেই হল! তোরা জানিস না?'

'কি জানতে হবে?' মাসীমা তুলোয় লাল ওষুধ লাগালেন।

'তোরা জানিস না, আমার সব কটা কাজের লোক পালিয়ে গেছে। মালি গন। কুকুরগুলোকে যে দেখত সেই বিশে ব্যাটা হাওয়া। গরুটাকে যে দেখত সেই রামখেলোয়ান সরে পড়েছে। দেন হু উইল বেল দ্য ক্যাট? তোমরাই বল?'

'ইংরেজিটা ঠিক হল না বড়দা।' অধ্যাপক মেজমামা আবার বানান ভুল, ভাষার ব্যবহারের ভুল একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

'তোমার অবশ্য দোষ নেই। তুমি তো লিটারেচারের লোক নও। সারা জীবন প্রেসক্রিপসানই লিখে গেলে, টিডি, বিডি। তোমার বলা উচিত ছিল...।'

মাসীমা কটমট করে মেজমামার দিকে তাকাতেই মেজমামা আমতা আমতা করে চুপ হয়ে গেলেন, যেন গান শেষ হল, 'না, মানে ভুল, মানে বেল মানে, ক্যাট দি বেল মানে, না না বেল দি ক্যাট মানে,...'

মাসীমা আবার তাকাতেই মেজমামার রেকর্ড একেবারেই থেমে গেল।

'দেখি কপালাটা নীচু কর। ওঃ লম্বা বটে! তালগাছ।'

বড়মামা অভ্যর্থনা সভার সভাপতির মত কপালে যেন তিলক নিচ্ছেন।

মাসীমা একহাতে বড়মামার মাথার পেছন দিকটা ধরে সামনে ঝুঁকিয়ে আর এক হাতে অ্যান্টিসেপটিকে ভেজান তুলো থ্যাঁতলান কপালে চেপে ধরেছেন। বড়মামার যেন চুল কাটা হচ্ছে সেলুনে। তুলোটা কপালে চেপে ধরতেই বড়মামা বিশাল একটা চিৎকার ছাড়লেন। মানুষ উঁচু ছাদ থেকে পড়ে যাবার সময়েই অমন চিৎকার করে। চিৎকার শুনেই কোথা থেকে ছুটে এল বড়মামার কুকুরদের অন্যতম, সবচেয়ে দুর্দান্ত স্প্যানিয়েল, 'ঝড়ু'। সবকটা কুকুরেরই বাঙলা নাম। ঝড়ু, সুকু, ডাকু।

ঝড়ু বড়মামাকে বাঁচাতে এসেছে। সামনের থাবার ওপর মুখ নামিয়ে, ঝিঁকি মেরে মেরে, বার কতক ঘেউ ঘেউ করে খুব খানিকটা বকাঝকা করল। যখন দেখল মাসীমা তবু তার প্রভুকে ছাড়ছে না, তখন শাড়ির আঁচল ধরে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করল।

ফাইন লাগছিল ব্যাপারটা। ঝাড়ুর মুখটা ভারি সুন্দর। সেই মুখে আঁচলের আধখানা, পেছনের দু'পায়ে ভর রেখে, মুখটা সামান্য ওপরে তুলে, টান টান, টানাটানি, টাগ অফ ওয়ার।

বড়মামার কপাল ততক্ষণে মেরামত হয়ে গেছে। মাসীমার দু'হাত এখন মুক্ত। দু'হাতে আঁচল ধরে টানছেন। নতুন শাড়ি। সহজে ছিঁড়ছেনা, কুকুরেও ছাড়ছে না। মেজমামা তারিফ করে বললেন।—

'ডগ ইজ এ ফেতফুল অ্যানিম্যাল। প্রভুভক্ত জীব।'

'প্রভুভক্তি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। এই, লাঠিটা নিয়ে আয় তো।'

লাঠির নাম শুনে ঝড়ু একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর চোখ দুটো আধ-বোজা করে যেমন টানছিল তেমনি টানতে লাগল, ঝটকা মারতে লাগল, খোঁটায় বাঁধা প্রাণীর মত অর্ধবৃত্ত আকারে ঘুরতে লাগল। বড়মামা একটু সামলেছেন। মুখ দেখে মনে হল ঝড়ুর বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে বেশ গর্বিত। তবে লাঠি থেকে বাঁচাতে হবে। ভক্তেরই তো ভগবান! বড়মামা শাসনের সুরে বললেন, ঝড়ু, ঝড়ু, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নো অসভ্যতা।'

উত্তরে ঝড়ু আরও মরিয়া হয়ে মাসীমার আঁচলে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল। মেজমামা বললেন, 'ঝড়ু ছাড়া ঝড়ুর কিছু করতে পারবে না। কুকুরের সঙ্গে কুকুরের ল্যাঙ্গোয়েজেই কথা বলতে হবে।' বড়মামা কুকুরের পক্ষেই গেলেন, 'আসলে কি হয়েছে জানিস, কুকুরের তো বাঁকা বাঁকা দাঁত, কুসির শাড়িটা তাঁতের জ্যালজেলে, দাঁতে আটকে গ্যাছে। ও টানছে না, ও দাঁত থেকে খুলে ফেলার জন্যে ছটফট করছে। দেখি, কাঁচিটা দেখি, এ কেসটা হল সার্জারির কেস।'

মাসীমা বললেন, 'শাড়িটার দাম জান? সেভেনটি-সিকস। সার্জরি নয় লাথি।'

মাসীমা সত্যি সত্যিই একটা লাথি চাললেন। ঝড়ুর গায়ে লাগল না, কিন্তু ভয়ে ছেড়ে দিল। শাড়ির আঁচলটা ফুটো ফুটো, চিবোনো চিবোনো। মাসীমার চোখে জল এসে গেছে।

'আজই নতুন শড়িটা সবে ভেঙ্গে পরলুম, হতচ্ছাড়া, জানোয়ার কুকুর। শাড়িটার কি সুন্দর রঙ ছিল!' মাসীমার কাঁদ কাঁদ গলা শুনে মেজমামা বললেন–

'ছিল বলছিস কেন, এখনও তো সুন্দর রঙই রয়েছে!' জলে পড়লে রঙ ওঠে, কুকুর ধরলে রঙ উঠবে কেন?'

বড়মামা বললেন, 'বারো হাত শাড়ির হাতখানেক কেটে ফেলে দিলেও এগার হাতে থাকে। যে কোন মহিলার পক্ষে এগার হাতে যথেষ্ট। কি বল?'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস ইয়েস। ইলেভেন ইয়ার্ডস'--

'তোমার ইংরেজীটা শুদ্ধ কর, ইয়ার্ড মানে গজ, হাত নয়।' বড়মামা হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেছেন।

নীচে 'হাম্বা' করে একটা শব্দ শোনা গেল, 'গরু খুলে গেছে, ওমা গরু খুলে গেছে, গরু যাঃ যাঃ, হায় গো, ডাঁটার ঝাড়টা নিয়ে পালাল গো!'

'কি হল মানুর মা!' মসীমা শাড়ির শোক ভুলে সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন।

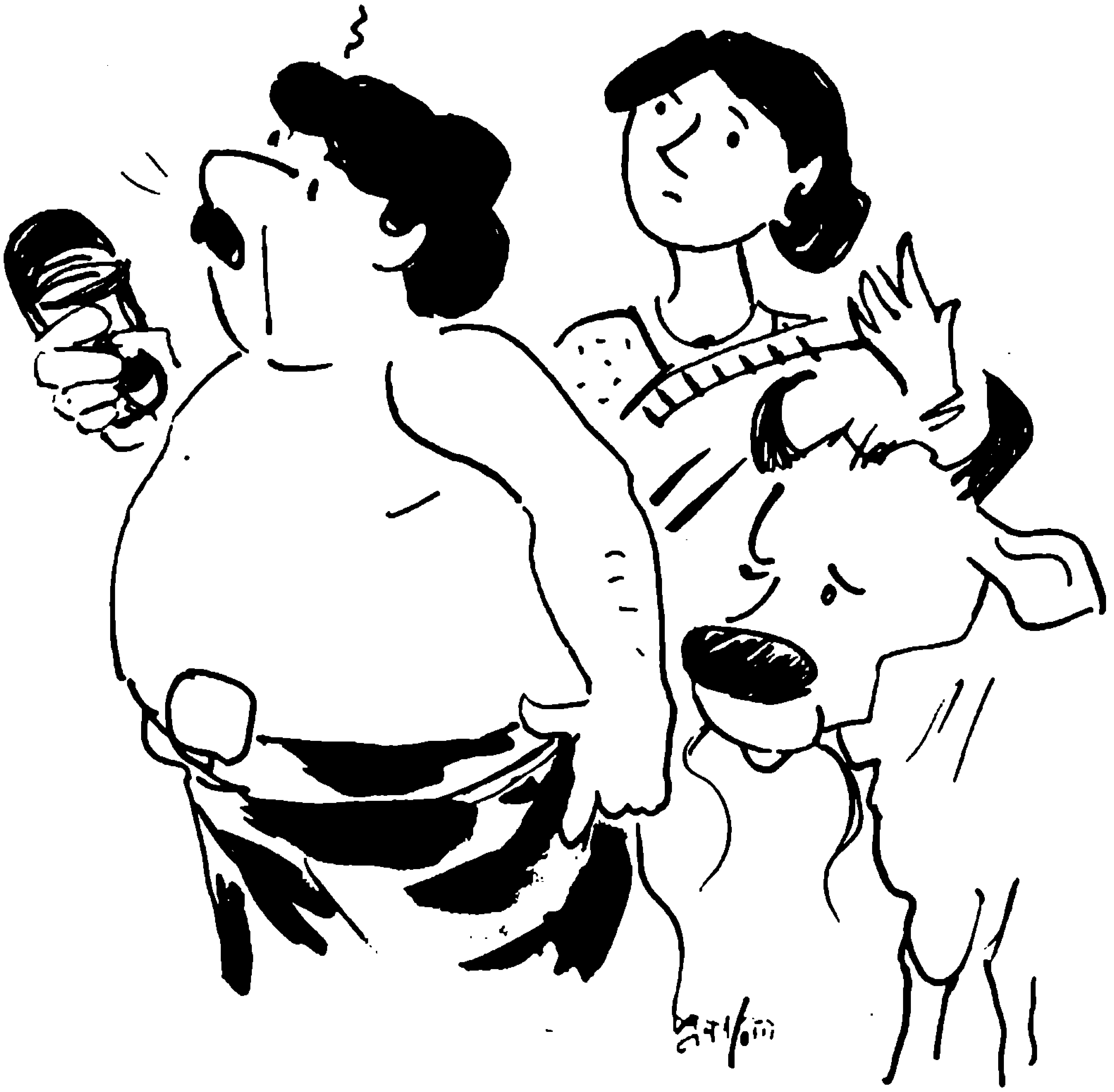

মেজমামা বললেন, 'দাদা, তোমার ভিটামিন বি কমপ্লেকস গবায় নমঃ হয়ে গেল। আসল কাটোয়ার ডেঙ্গো ছিল।'

বড়মামা বললেন, 'নো ক্ষমা, আর ক্ষমা করা চলে না, সেই লাইনটা, অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—'

আমরা সদলে নীচের উঠোনে নেমে এলাম। মাসীমার পেছনে ঝুলছে কুকুরে চিবোন আঁচল। পেছনে আমি। আমার পেছনে বড়মামা। বড়মামার পেছনে মেজমামা।

লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মী উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজিয়ে ডেঙ্গোর ঝাড় চিবোচ্ছে। এত চিৎকার. চেঁচামেচি, কোনদিকে কোন দৃকপাত নেই। নিজের কাজ করে যাচ্ছে আপন মনে। ডাঁটা ঝাড়ের আধখানা চলে গেছে গলায়, বাকি অংশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকছে। মাসীমা সেই বাড়তি অংশটা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। যতটুকু পারা যায় উদ্ধারের চেষ্টা।

মেজমামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ছেড়ে দে কুসি। পারবি না। বোভাইন-টিথের স্ট্রাকচার জানা থাকলে তুই আর চেষ্টা করতিস না। গরুর ওপর আর নীচের পাটিতে কটা করে দাঁত, কি ভাবে সাজান থাকে জানিস?'

মাসীমা বললেন, 'তোমরা জান, আমার জেনে দরকার নেই।' মাসীমা পাতা ধরে টানতে লাগলেন। লক্ষ্মী চিবিয়েই চলেছে। এক ঝটকায় মাসীমাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে টলমল করে দিয়ে লক্ষ্মী পেছন ফিরে দাঁড়াল। ন্যাজটা মাঝে মাঝে দুলছে। বিরক্তি ভাল লাগছে না তার। শান্তিতে কাটোয়ার ডাঁটা চিবোতে চায়। গরুটাকে দেখতে ছবির গরুর মত। সাদা ধবধবে গায়ের রঙ। ন্যাজের দিকটা চামরের মত। ডগাটা কালো। শিং দুটো তেলা। চোখ দুটো বড় বড়, ভাসা ভাসা।

'বড়মামা, আপনার গরুটাকে ভারি সুন্দর দেখতে।'

'অতি অসভ্য গরু। একগুঁয়ে, অবুঝ। গরুর সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে দিয়েছে। মানুষের চেয়েও অসভ্য!' মাসীমা কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সামলে নিলেও ভীষণ রেগে গেছেন।

'অনেকদিন তোমাকে বলেছি দাদা, তোমার এই গরু কুকুর এসব হাটাও। বাড়িতে টেঁকা যায় না। এ আমাদের কম সর্বনাশ করেছে! আদরে আদরে বাঁদর তৈরি হয়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আর মায়া নয়, আজই একে বিদায় করতে হবে। মানুর মা, আজই, এখনই তুমি এটাকে নিয়ে যাও।'

'আমি গরু নিয়ে কি করব দাদাবাবু। আমার নিজেরই থাকার জায়গা নেই। চাল নেই, চুলো নেই।'

'কেন, তোমার বাড়ির পাশের মাঠে বেঁধে রেখে দেবে। যখন দুধ হবে দুধ খাবে, দই খাবে, ক্ষীর খাবে, চেহারা ফিরে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'মাঝে মাঝে লাথিও খাবে। সভ্যতা এতবছর এগিয়ে গেল, গরু কিন্তু সেই গরুই রয়ে গেল। প্যালিওলিথিক গরু, নিওলিথিক গরু আর এই স্পেস এজ গরু, বিবর্তনের ধারাটা কত স্লো দেখছ দাদা! আমরা কত অসম্ভবকে সম্ভব করলুম! গরু কোনও দিন ভাবতে পেরেছিল, তার তরল দুধকে আমরা গুঁড়ো করে টিনে ভরে ফেলব?'

উঠোনে একটা বাঁধান বসার জায়গা ছিল, বড়মামা তার ওপর বসে পড়লেন। চুল উড়ছে। কপালের একটা পাশ গোলাপী। ফর্সা চেহারায় বেশ মানিয়েছে। মাসীমা ডাঁটা উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে ভীষণ যেন রেগে গেলেন। সকালে বাজার এসেছে। মানুর মা সব ধুয়ে ধুয়ে রেখেছে। আলু, পটল, উচ্ছে, কুমড়ো, কাঁচালঙ্কা, পাতিলেবু।

'এই নে সব খা, সৃষ্টি খা, তুইই খা'। ঝুড়িসুদ্ধ সব টান মেরে মাসীমা লক্ষ্মীর মুখের সামনে ছড়িয়ে দিলেন।

লক্ষ্মী খুব চালাক গরু, ভেবেছিলুম পটলের সঙ্গে লঙ্কা চিবিয়ে আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। লক্ষ্মী জানে কোনটার পর কি খেতে হয়। সে কুমড়োটা মুখে পুরেছে। ডেঙ্গো শাক কুমড়ো দিয়েই রাঁধে। এরপরই হয়ত আলু আর পটল খাবে, সঙ্গে একটা কাঁচালঙ্কা। পেটে গিয়ে হয়ে যাবে আলু পটলের ডালনা।

মেজমামা বললেন, 'শিশু আর গরু বুদ্ধিবৃত্তিতে সমান স্তরের প্রাণী। যা পাবে তাই

মুখে পুরবে। যত রকমের অপকর্ম আছে নির্বিবাদে করে যাবে। হ্যাঁ, শিশু আর গরু এক জিনিস, সেম থিঙ্কস, চেহারা ছাড়া সব এক।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে দেখ, সেই শিশু স্নেহ পায় বলেই মানুষ হয়। গরুর বেলায় উল্টো। গরু স্নেহ পায় না, তাই বড় হয়েও গরুর গরুমি যায় না। হ্যাঁরে বাঙলাটা ঠিক হল তো?'

'কি বললে, গরুমি!' বাঁদর, বাঁদরামি, পাগল, পাগলামি, ছাগল, ছাগলামি, গরু থেকে বোধহয় গবরামি হবে। সংস্কৃত গো শব্দ থেকে উৎপত্তি। গো আর রামি।'

'আমরা কত স্বার্থপর দেখ? গরু মানেই আমাদের কাছে দুধ, মাখন, ছানা, দই, রসগোল্লা, গব্যঘৃত, ফুলকো লুচি!'

হঠাৎ লক্ষ্মী একটা লাফ মারল। বালতি, ঝুড়ি সব উলটে পালটে, সেই ছোট্ট উঠোনে টাট্টু ঘোড়ার মত গোল হয়ে ছুটতে লাগল। মাসীমা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। মেজমামা দোতলায় উঠার সিঁড়ির ধাপে, বড়মামা যে বেদিটায় বসেছিল সেইটার ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

দোতলার বারান্দা থেকে আমি বললুম, 'ওর ঝাল লেগেছে বড়মামা, কাঁচালঙ্কা খেয়েছে।'

'একটু পরেই রতন আসবে'।

রতনের খাটাল আছে। মাসীমাই রতনের কথাটা বললেন। বড়মামা যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, কুসি! রতনের ওখানে থাকলে লক্ষ্মীটি মানুষ হবে, সঙ্গী পাবে। একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসবে। আর পাঁচটা গরুকে দুধ দিতে দেখলে নিজের দুধ দেবার ইচ্ছে হবে।'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস, কম্পিটিসন। প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলে গরু ভালো রেজাল্ট দেখাতে পারবে।'

লক্ষ্মী সেজেগুজে রেডি হল। নীল নাইলনের দড়ি। গোয়াল থেকে উঠোনে এসেছে, একটু পরেই সদর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

'বাবু আছেন, ডাক্তার বাবু?' ওই যে রতন এসে গেছে। গায়ে হলদেটে ফতুয়া। নীচের দিকে দু'টো পকেট, নানা রকম জিনিসে ফুলে আছে। লুঙ্গিটা একটু উঁচু করে পরা। কালো তেল চুকচুকে রঙ কদমছাঁট কাঁচা-পাকা চুল।

'এস, রতন এস।' ধরাধরা গলায় রতনকে ডাকলেন।

'বাঃ লক্ষ্মী তো লক্ষ্মীই, বেশ চেহারাটি! গরু হলে এই রকম গরু হওয়াই উচিত।'

'একটা রিকোয়েস্ট রতন, তুমি নজর দিও না।'

'হাসালেন ডাক্তারবাবু, ও তো এখন থেকে আমার নজরেই থাকবে। আমি চেহারা-ফেয়ারা বুঝি না, আমি বুঝি দুদ্। দুদ্ দিলে খাতির, না দিলে জুতো।'

'জুতো মানে, গরুকে জুতো পেটা?'

'না না, হিন্দুর ছেলে গরুকে জুতো মারতে পারি? মহাপাপ! গরু মেরে জুতো তৈরি হবে।'

বড়মামা চমকে উঠে লক্ষ্মীর পিঠে আঙুল ঠেকালেন। তার গা-টা কেঁপে উঠল থির থির করে। ন্যাজটা দুলে উঠলো চামরের মত।

'অবাক হবার কি আছে এতে!' রতন বলল, 'এত জুতো তাহলে আসবে কোথা থেকে? লাখ্‌লাখ্‌ জোড়া পা, লাখ্‌লাখ্‌ জোড়া জুতো। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গরু বড় উপকারী জন্তু!' রতন লক্ষ্মীর পিঠে হাত রেখে বললে, 'এই দেখুন চামড়া, কমসে কম একশো জোড়া জুতো হবে। এই শিং আর পায়ের খুর থেকে কেজি খানেক শিরিস তৈরি হবে। তারপর হাড়। হাড় থেকে তৈরি হবে বোন মিল। গরু কি মানুষ? মরল আর পুড়ে ছাই হল?'

বড়মামা রতনের কথা শুনে লক্ষ্মীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। রতন তখনও শেষ করেনি কথা।

'ওই জন্যে আমরা করি কি, ফুকো দি।'

'ফুকো? সে আবার কি?'

'ডাক্তারবাবু, বিজ্ঞানের কম উন্নতি হয়েছে? ফুকো হল ইঞ্জেকসান।'

'ও ইঞ্জেকসান।' বড়মামা খুশি হলেন, 'ভাল ভাল, গরুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল হবে।'

'সে ইঞ্জেকসান নয়, দুধ বাড়াবার ইঞ্জেকসান। যে গরু আড়াই দেয় সে দেবে পাঁচ, যে পাঁচ দেয় সে দেবে দশ। ডবল ডবল দুধ, ডবল ডবল রোজগার, হ্যা হ্যা।'

'ম্যাজিক নাকি? সে তো জল মেশালেই দুধ বাড়ে!'

'তা বাড়ে, তবে দুধ বাড়লে জল বাড়ে, সব মিলিয়ে আরও বাড়ে। ফুকো দিলে গরুর রক্তটাই দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে। হিসেব করুন না, একটা গরু দশ বছর বেঁচে আড়াই সের দুধ দেওয়া লাভের, না পাঁচ বছর বেঁচে পাঁচসের দেওয়া লাভের? নিজে তো খাইয়ে দেখেছেন, গরুর খোরাক তো জানেন? যত তাড়াতাড়ি পার সব দুধ শুষে নিয়ে, জ্যান্ত কঙ্কালটাকে কষাইখানায় পাঠিয়ে দাও। হ্যা হ্যা। চল লক্ষ্মী চল।'

'বেরোও! গেট আউট', বড়মামা পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিয়েছেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। 'চামার, তুমি গরুরও অধম। নিকালো, আভি নিকালো।'

বড়মামা ঠকঠক করে কাঁপছেন। মাসীমা দৌড়ে এসে বড়মামাকে ধরেছেন। রতন বলছে, 'কি হল, হঠাৎ! বেলাড পেসার মনে হচ্ছে!' মেজমামা ইসারা করে রতনকে চলে যেতে বলছেন। লক্ষ্মী গরু হলেও তার বোধশক্তি আছে। লম্বা জিভ দিয়ে বড়মামার পিঠ চেটে দিচ্ছে। তবে ওই, সামান্য একটু ভুল করে ফেলল। বড়মামার পৈতেটা তার মুখে। সে আর কি হবে! মানুষের কাজেও তো অনেক ভুল থাকে।

বড়মামার বাইক

বড়মামা সকাল থেকেই পেয়ারের কুকুর লাকির ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। পাশের ঘর থেকে শুনছি আমরা, চা-বিস্কুট খেতে খেতে হচ্ছে, 'বেরিয়ে যাও ইডিয়েট, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। তোমার মুখ দেখতে চাই না জানোয়ার, রাসকেল, একটা বিস্কুট আমার দেওয়া ডিউটি, এই নাও। গেট আউট, গেট আউট। না না, ডোণ্ট টাচ্ মাই বডি। উঁহু উঁহু, আদর নয়, আদর নয়। যাও, যাও। মোহন! মোহন! ইডিয়েট মোহন!'

মেজমামা আর আমি এ ঘরে বসে, চা খেতে খেতে গল্প করছিলুম। মেজমামা আমাকে আবিসিনিয়ার কাফ্রীদের গল্প বলছিলেন। এমনভাবে বলছিলেন যেন এইমাত্র ঘুরে এলেন। কথা বলতে বলতে মেজমামার খুব হাত পা নাড়ার অভ্যাস। দুবার কাপ উল্টে যাবার মতো হয়েছিল। গল্পের গভীরে ঢুকে গেলে তখন আর কাপ ডিশের খেয়াল থাকে না। বড়মামা যখন পাশের ঘর থেকে 'মোহন মোহন' করে চিৎকার করছেন মেজমামা তখন বর্শার ফলায় মানুষের মুণ্ডু গেঁথে নাচাচ্ছেন। বড়মামার চিৎকারে ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। গল্প বলার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বললেন, 'বলে এসো তো, মোহন মারা গেছে। আর বলে এসো, ডোণ্ট শাউট।'

মেজমামার হাত থেকে ছাড়া পাবার সব চেয়ে বড় সুযোগ। সকালবেলাই সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন। মাঝে মাঝে উটকো প্রশ্ন করে আমার জ্ঞান পরীক্ষা করবেন। না পারলেই মিনিটখানেক ছি ছি শব্দ করে বললেন, যাও, এনসাইক্লোপিডিয়ার ছ ভল্যুমটা নিয়ে এসো, নিয়ে এসো বারো, কি সাত। প্রত্যেকবার টুলে উঠে-উঠে ভারি-ভারি বই পাড়ো, ধুলো ঝাড়ো। আর পাতার পর পাতা রিডিং পড়ো। গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে কি এই জন্যে আসা। এসেছি বাগানের আম, জাম, জামরুল, ফলসা খেতে।

বড়মামার ঘরের দরজার সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখার মতো। দরজার পর্দাটা একপাশে সরানো। জানলার কাছের ছোট টেবিলে দরজার দিকে

পিছন ফিরে বড়মামা বসে আছেন। টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ধবধবে সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবি কোমরের কাছে দুলছে। ফর্সা চেহারা। চওড়া পিঠ। নধর মাংসল দুটো হাত।

চেয়ারের হাতলের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে লাকি লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা-ভর্তি সাদা-সাদা বড়-বড় লোম। মুখটা ভারী মিষ্টি। ঝুমকো-ঝুমকো লোমের ভেতর থেকে চকচকে দুটো চোখ উঁকি মারছে। লাকি চেষ্টা করছে বড়মামার সঙ্গে ভাব করতে। মুখটাকে ছুঁচলো করে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকছে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে বড়মামার হাতের ওপর দিকটা চুক চুক করে চেটে দিচ্ছে। লাকি যত কাছাকাছি সরে আসার চেষ্টা করছে, বড়মামা ততই শরীরটাকে ডানদিকে মুচড়ে মুখ ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইছেন, লাকির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আর ডানদিকে ঘোরানো সেই মুখ অনবরত চিৎকার করে চলেছে, 'মোহন, মোহন'।

আমি ঘরে ঢুকতেই লাকি নেমে পড়ল। মুখ নিচু করে আমার কাছে এসে ফোঁস ফোঁস করে বার কতক আমাকে শুঁকে, বুকের ওপর দুটো পা তুলে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করল কিছুক্ষণ। বড়মামা তখনও মুখ ঘুরিয়ে আছেন। কুকুরের মুখ দেখবেন না। বড়মামা ভেবেছেন, মোহন এসেছে। বেশ রেগেই বললেন, 'কোথায় থাকিস রাস্কেল!' ইডিয়েটটাকে ঘর থেকে বের করে দে। বলে দে, আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কেন বড়মামা?'

আমার গলা পেয়ে বড়মামা খুব লজ্জা পেয়ে ঘুরে বসলেন। হাসতে গিয়েও হাসলেন না। হাসলেই লাকি দেখে ফেলবে। মুখটাকে বেশ চেষ্টা করে গম্ভীর রেখেই বললেন, 'ও, তুমি! আমি ভেবেছিলুম মোহনানন্দ। সকাল থেকে তিনি কোথায় আনন্দ করতে গেলেন।'

লাকিটা এমন করছিল, মাথায় হাত রেখে একটু আদর না করে পারলুম না। বড়মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'ওর সঙ্গে একদম মিশবে না। একেবারে বখে গেছে। উচ্ছন্নে গেছে।'

'কেন বড়মামা?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

সে আবার কী! ওকে জিজ্ঞেস করব কী! বড়মামার কুকুর কথা বলে নাকি!

'ও কী করে বলবে বড়মামা! ও কি কথা বলতে পারে!'

'সব পারে, সব পারে, ওর মতো পাকা সব পারে! শুনবে ওর কীর্তি? অকৃতজ্ঞতায় ও মানুষের ওপর যায়, এমন কি, তোমার মেজমামাকেও ছাড়িয়ে যায়!'

আবার মেজমামাকে ধরে টানাটানি কেন! মেজতে বড়তে ভাবও যেমন, ঝগড়াও তেমন। গতকাল রাতে খেতে বসে আম নিয়ে ঝগড়ার জের চলেছে বুঝলাম। বড়মামা কবে নাকি গোলাপখাস বলে নার্সারি থেকে একটা আমগাছ খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে বাগানে বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার বাগানেই খালি এই আম হত, এইবার হবে

সুধাংশু মুকুজ্যের বাগানে। সেই গাছে এবছর প্রথম আম ধরেছে। আর সেই আম খাওয়া হচ্ছিল কাল রাতে। মেজমামা ঘন দুধে আম চটকে এক চুমুক খেয়েই, ব্যালাব্যাম বলে মুখের একটা শব্দ করে বাটিটা নামিয়ে রেখেই বললেন, 'বড়দা, এই তোমার গোলাপখাস, এর নাম তেঁতুলখাস। দুধটাই নষ্ট হয়ে গেল। কী ক্ষতিই যে হল! দুধ না খেলে আমার আবার সকালে ভীষণ অসুবিধে হয়।'

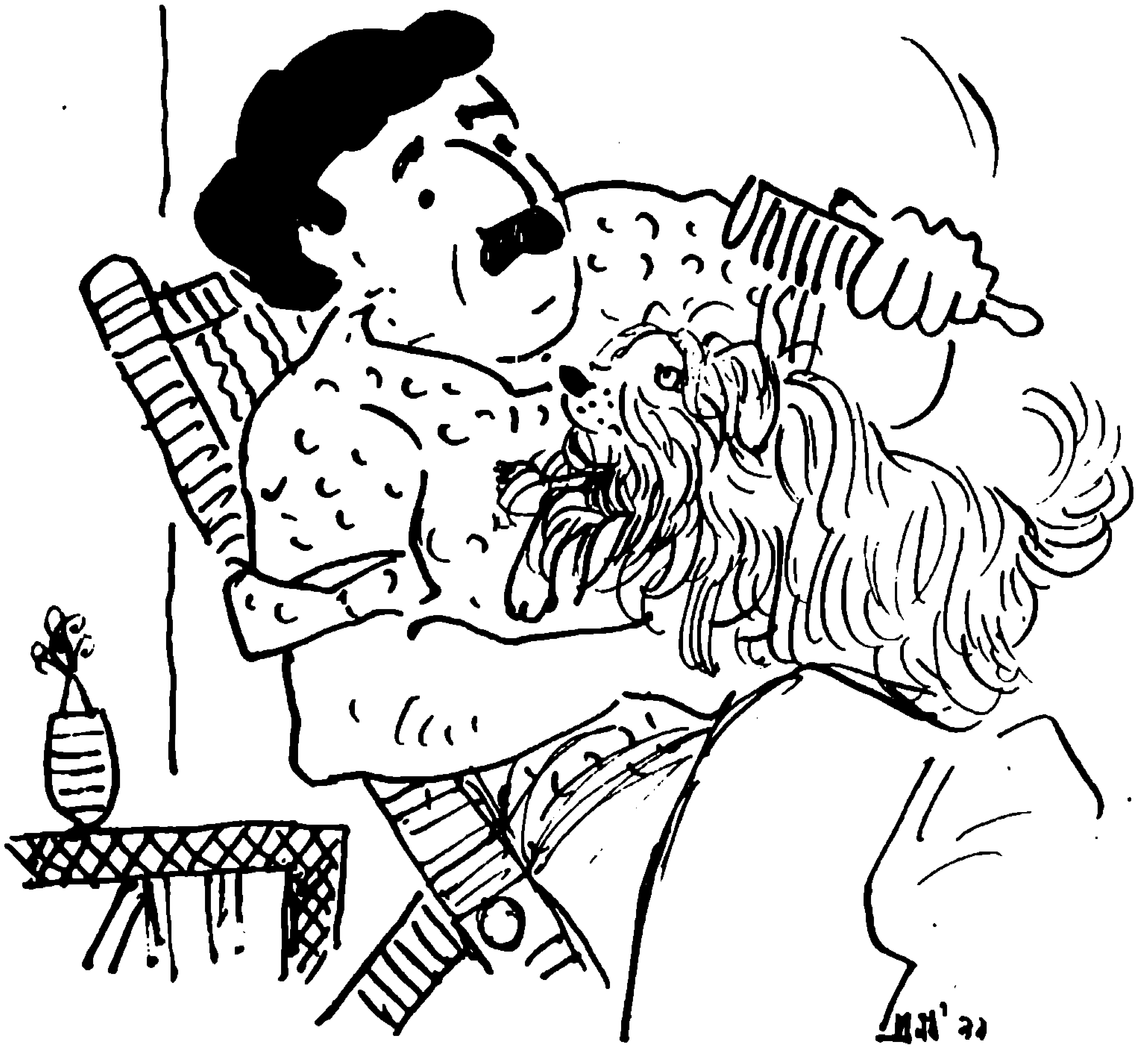

বড়মামা ততক্ষণে আমটা চেখেছেন। বড়মামার মুখের চেহারাও ভীষণ করুণ। কিন্তু মেজর কাছে হেরে গেলে চলবে না। বললেন, 'জীবনে রিয়েল গোলাপখাস তো খাসনি। সে খেয়েছি আমরা। গোলাপখাস একটু টকমিষ্টিই হয়! তবেই না তার টেস্ট। তোর মতো নাবালকের বোম্বাই-টোম্বাই খাওয়া উচিত।'

রাত এগারোটা পর্যন্ত এঁটো হাতে দু'ভাইয়ে আম নিয়ে খুব দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। শেষে সিদ্ধান্ত হল, বড়মামার গাছ বড়মামারই থাক। মেজমামা ল্যাংড়াই খাবেন। গোলাপ ফুল ভদ্রলোকে হয়তো সহ্য করতে পারে, তবে গোলাপখাস ভদ্রলোকের আম নয়। শিশুরা খেতে পারে, কারণ শিশু আর ছাগল একই জাতের জিনিস।

বড়মামা লাকির অকৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেজমামার সঙ্গে তুলনা করলেন। করে বললেন, "কুকুর কখনও মানুষ হয় না, বুঝেছ? মানুষ কিন্তু কুকুর হতে পারে।"

কথাটা শুনে কিনা জানি না, লাকি বারকতক ভেউ ভেউ করে উঠল। বড়মামা বললেন, "ওকে চুপ করতে বলো। এখানে কাজের কথা হচ্ছে।"

আমাকে বলতে হল না। বুদ্ধিমান কুকুর নিজেই বুঝতে পেরেছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড়মামা আড়চোখে একবার দেখে আবার শুরু করলেন, 'মাসে কুড়ি টাকার বিস্কুট। সত্তর টাকার মাংস। পঞ্চাশ টাকার দুধ। তিন কৌটো পাউডার। পঁচিশ টাকার ওষুধ। পনের টাকার সাবান। সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা। সেই অকৃতজ্ঞ কুকুর আজ আমাকে অপমান করেছে। নিজের ভাই অপমান করলে সহ্য হয়, প্রতিবেশী লাথি মারলেও হজম করে নিতে হয়। নিজের কুকুর অপমান করলে সহ্য হয় না। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।'

বড়মামা লাকির দিকে সামান্য ঝুঁকে বেশ জোরে জোরে বলে উঠলেন, 'বুঝেছিস? আত্মহত্যা, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। না, নো, নো, ন্যাজ নাড়লে আমি আর ভুলছি না। তোমার ন্যাজের খেলা আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। নো সম্পর্ক।'

লাকি সামনের থাবায় সেইভাবে মুখ রেখে, চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে, পটাক পটাক করে ন্যাজ নাড়ছে।

এতক্ষণ অনেক কথা হল, বড়মামার রাগের কারণটা কিন্তু বোঝা গেল না। কাল রাতে শুতে যাবার আগে, আম নিয়ে মেজমামার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে যাবার পর খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে, কুকুরকে পেটের ওপর ফেলে বড়মামা যেসব কথা বলছিলেন তার কিছু কিছু তো এখনও মনে আছে। বুরুশ বোলানো হচ্ছে কুকুরের লোমে, আর কথা হচ্ছে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, তুই এবার একদিন মানুষের মতো কথা বলবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানুষের চেয়ে তুই ফার, ফার, ফার, ফার বেটার। অ্যাই কী হচ্ছে কী, নাল লেগে যাচ্ছে না মুখে! উঁহু, উঁহু, আর না, আর না। দেখি পেটের দিকটা, চিত হও, চিত হও। কী হল, কাতুকুতু লাগছে?'

সেই কুকুর কী এমন করল। এই সাতসকালে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে? মেজমামা ওদিকে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন। 'কী হল হে তোমার! এখানে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, ভাল লাগবে কেন! গিয়ে পড়লে কুকুরের খপ্পরে।'

বড়মামার কপালটা একটু কুঁচকে গেল। আমাকে বললেন, 'জিজ্ঞেস করো তো কুকুর কি জ্ঞানের জগতের বাইরে। দর্শনশাস্ত্রটাই জ্ঞান, প্রাণী-তত্ত্বটা জ্ঞান নয়, ফেলনা জিনিস? জিজ্ঞেস করো তো পৃথিবীতে কত রকমের কুকুর আছে, জানে কিনা! ওর জ্ঞানের দৌড় জানা আছে। পৃথিবীটাই জানা হল না, উনি ঈশ্বর ভগবান এই সব নিয়ে ভেবে ভেবে মরে গেলেন।'

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললুম, 'এখুনি আসছি মেজমামা।'

'ধ্যাত! তোর আঠার মাসে বছর। আসতে আসতেই আমার কলেজ যাবার সময় হয়ে যাবে। ভেবেছিলুম, পৃথিবীর একটা পার্ট শেষ করে যাব।'

কথা শেষ করেই মেজমামা, 'মোহন, মোহন' করে চেঁচাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামারও মনে পড়ল মোহনের কথা। দুজনেই তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মোহন, মোহন!'

লাকিটা বকুনি-টকুনি খেয়ে বেশ ঘুমিয়েই পড়েছিল। চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে পড়ে, ছোট্ট একটা ডন মেরেই বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বার কতক ভেউ ভেউ করে, রাস্তার দিকের জানলায় পা দুটো তুলে দাঁড়াল।

আমি এক কদম এগিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলুম। কেন কুকুরটা ওরকম করছে! সামনের বাড়ির বারান্দায় ঠিক লাকির মতো আর একটা কুকুর এ জানলার দিকে তাকিয়ে আছে আর পুটুক পুটুক ন্যাজ নাড়ছে। ও কুকুরটা কিন্তু এটার মত কেঁউ কেঁউ করছে না বা পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে না। দেখলেই মনে হয় কুকুরটা একটু দুষ্টু ধরনের। আমার বন্ধু অরুণের মতো। পড়ার ঘরে বেশ মন দিয়ে হয়ত পড়তে বসেছি, বাইরের জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একটুও কথা নেই। মুচকি মুচকি হাসি, স্থির দৃষ্টি। চোখের পাতা নাচিয়ে যা বলার বলে গেল—বইপত্তর মুড়ে উঠে আয়, পড়ার সময় অনেক পাবি, এমন সকাল পাবি কোথায়! অমনি, এই লাকির মতোই মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল। বাইরের চুপচাপ লাকি ভেতরের বন্দী লাকিকে ডাকছে।

'আজ সকাল থেকে তুমি এই করছ।' বড়মামার তর্জন-গর্জন থামেই না দেখি। 'সকালেই আমি তোমাকে ভাল কথায় বুঝিয়েছি, বাইরে যাওয়া চলবে না, বাইরের কুকুরের সঙ্গে মেশা চলবে না। বাগান আছে, তুমি বাগানে ঘোরো, ছাদ আছে, ছাদে কাঠের বল নিয়ে খেলো। আমি যতক্ষণ আছি আমার সঙ্গে ঘোরা, খেলা করো। কিন্তু মিত্তিরদের বাড়ির ওই নোংরা কুকুর দেখে তোমার মাথা খারাপ করা চলবে না। ওরা আমাদের তিনপুরুষের শত্রু।'

'এই যে মোহন,' বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন। ফিরে দেখলুম, মোহন মেজমামার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। 'ফার্স্ট আমি ডেকেছি, তুই আগে আমার কাছে আয়।'

মেজমামা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'ফার্স্ট সেকেণ্ডের কী আছে রে। তুই আগে আমার ওষুধ তৈরি করে দিয়ে তারপর যেখানে যেতে হয় যাবি!'

বড়মামা বললেন, 'বা হে বাঃ; খলে ঘষে ঘষে তোমার কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে ও সকালটা কাটিয়ে দিক, এদিকে আমি বসে থাকি হাঁ করে। কুকুরের জন্য কিমা না আনলে ও দুপুরে খাবে কী, উপোস করে থাকবে!'

'কিমা! কুকুরের কিমা!' মেজমামা এমনভাবে হাসলেন যেন বড়মামা অদ্ভুত উদ্ভট

কোনো কথা বলছেন। তারপর বড়মামার চোখের সামনে আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, 'জানো না রাস্তায় সব গাড়ির আগে যায় অ্যামবুলেনস আর ফায়ার ব্রিগেড। এমার্জেন্সি, বুঝেছ, এমার্জেন্সি। যা মোহন, প্রথমে ঘষবি দারুহরিদ্রা, তাতে দিবি গোলঞ্চর জল, বড়িটাকে ১৫ মিমিট খলে ঘষবি মধু দিয়ে, তারপর সব এনে হাজির করবি আমার টেবিলে। চলো ভাগনে!'

আমি কিছু প্রতিবাদ করার আগে মেজমামা আমাকে প্রায় হাতে হাতকড়া লাগাবার মতো করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন, 'মূর্খ হয়ে থাকতে চাস। জানিস, পৃথিবীতে কত কী শেখার আছে! এক জীবনে মানুষ সব পারে না।' আমি বললুম, 'তাইতো হাঁসের মতো দুধ আর জল থেকে শুধু জলটা তুলে নিতে চাই।'

'উল্টে গেল হে, উল্টে গেল', কথা বলতে-বলতে মেজমামা আলমারি খুলে একটা বুলওয়ার্কার বের করলেন, 'বুঝেছ, যারা মাথার কাজ করে তাদের একটু করে ব্যায়াম করা উচিত।' মেজমামা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বুলওয়ার্কার টানতে লাগলেন। যতটা না টানছেন তার চেয়ে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

একটা মোটর সাইকেল সশব্দে বাড়ির সীমানা থেকে উল্কার মতো বেরিয়ে গেল। বড়মামা এমনিই খুব জোরে চালান, আজ আবার রেগে আছেন। নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন দেড় মাইল দূরের বাজার থেকে কিমা কেনার জন্যে। জাফরের দোকান ছাড়া মাংস কেনা চলবে না। তা না হলে কাছাকাছি আরও একটা দোকান ছিল।

দু'মামা আর এক মাসির কাণ্ডকারখানা চলেছে এ-বাড়িতে। বড়মামা ডাক্তার। মেজমামা প্রফেসর। মাসি সকালের স্কুলের টীচার। বাড়িতে গরু আছে, পাখি আছে, কুকুর আছে, বাগান আছে, একগাদা কাজের লোক আছে। মাঝেমাঝেই বড়মামা মেজমামার লড়াই আছে, গলায় গলায় ভাব আছে। নেই কেবল মামিমা। বুড়ি দিদিমা ছেলেদের ওপর রাগ করে 'কাশীবাসী।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বড়মামা ফিরছেন না। স্নানের পর গায়ে পাউডার মাখতে মাখতে মেজমামা বললেন, "বাব্বা! বড়বাবু কি ব্যারাকপুর থেকে খিদিরপুর গেলেন কুকুরের কিমা কিনতে! কুকুর কুকুর করেই ডাক্তারবাবু কাবু হয়ে গেলেন। তুমিই বলো, ওষুধ আগে না কুকুর আগে।'

কী আর বলব, চুপ করে শুনছি। ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, মাসি এসে গেলে তবু আর এক দফা মুখরোচক খাবারদাবার জুটত।

মেজমামার জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। জানলা দিয়ে উত্তরদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাবালে দেখছি। উঁহু ভাল ঠেকছে না হে। এতক্ষণ দেরি হবার তো কথা নয়। বাবু রেগেমেগে যেভাবে বেরিয়ে গেলেন। এসব রাস্তায় অত জোরে গাড়ি চালানো কি ঠিক! না ফিরলে বেরোতেই পারছি না। এদিকে প্রথম ক্লাসের সময় হয়ে এল। লঞ্চে করে গঙ্গা পেরোতেই তো আধঘণ্টা লেগে যাবে।'

হঠাৎ দূরে মোটর বাইকের শব্দ হল। ভীষণ বেগে আসছে। আমরা জানলার কাছে সরে এলুম। মেজমামা বললেন, 'মনে হচ্ছে বড়বাবু!' হ্যাঁ বড়মামাই। লাল ঝকঝকে মোটর সাইকেল। পরনে লাল লুঙ্গি। গায়ে গোলগলা গেরুয়া গেঞ্জি। উল্কার বেগে বড়মামা বাড়ির সামনে দিয়ে পশ্চিমে বেরিয়ে গেলেন। মাথার ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে নটরাজের জটার মতো। বড়মামার দশহাত পেছনে ব্যারাকপুরের বিখ্যাত ভোলা। সেও খ্যাড়াখ্যাট্ খ্যাড়াখ্যাট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ভোলা হল ইয়া তাগড়া এক ষাঁড়। বাজার অঞ্চলে ভোলার ভক্ত সংখ্যা কম নয়।

মেজমামা বললেন, 'সেরেছে! বড়বাবুকে দেখছি গঙ্গার জলে না ফেলে দেয়। একে ভোলা, তায় লাল মোটর বাইক, তার ওপর লাল লুঙ্গি, তার ওপর ওই পিলে-ফাটানো শব্দ। কে বাঁচাবে বড়বাবুকে!'

মেজমামা চিন্তিত মুখে, ঘর থেকে রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বলতে কী, দারুণ মজাই লাগছিল। রেসটা বেশ জমেছে! বড়মামা

হারেন, কি ভোলা হারে! রাস্তাটা সামনে গিয়ে গোল একটা প্যাঁচ মেরে আবার ফিরে এসেছে। বেশ জটিল ট্র্যাক। বড়মামা ঘুরে আসছেন, এবার বেগ আরও বেশি। ভোলার স্পীডও যেন বেড়ে গেছে। ভোলা রেগে গেছে, বড়মামাকে হারাতে পারছে না কিছুতেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বড়মামা চিৎকার করে বললেন, 'শান্তি, ষাঁড়টাকে কোনরকমে গ্যারেজ করে দে।'

মেজমামা চিন্তিত মুখে বললেন, 'কী করে ষাঁড় গ্যারেজ করি বলো তো। ষাঁড় তো আর গাড়ি নয়!' দুজনে নেমে রাস্তার পাশে এলুম। কাজের লোকজন কাজ ফেলে এসেছে। মোহনের নানা প্ল্যান। সে একটা লাঠি এনেছে। ষাঁড়কে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেবে। অতই সহজ! নিজেই ছিটকে পড়বে নর্দমায়! মজা দেখার জন্যে আশপাশের বাড়ির জানলা দরজায় বড় ছোট মুখ। মিত্তিরদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোর হুইসিল বাজাচ্ছে।

বড়মামা ওদিককার গোল রাস্তা দিয়ে আবার এদিকে তীরবেগে আসছেন। পেছনে ল্যাজ তুলে ভোলা। এদিকে প্রথম রাস্তায় যাবার সময় বড়মামা বললেন, 'একটা কিছু কর, তেল ফুরিয়ে আসছে। আর পারছি না।' বড়মামা আসতেই মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটা ফুরর ফুরর করে বাঁশি বাজাল। সমস্ত জমায়েত পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে উঠল।

পশ্চিমের দিক থেকে বড়মামা আবার আসছেন। বড়মামা বেশ ক্লান্ত, বিব্রত। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের পাশ দিয়ে তীরবেগে সাদা মতো কী একটা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল—বড়মামার কুকুর লাকি। ভয়ে আমরা চোখ বুজে ফেলেছি। দু'গজ দূরে বিশাল ভোলা লাফাতে লাফাতে আসছে। লাকি একলাফে ভোলার মুখের ওপর লাফিয়ে উঠল। ভোলার চোখ চাপা পড়ে গেছে, লাকি নাক কামড়ে ধরেছে। ভোলা এক ঝটকা মেরে লাকিকে ফেলতে ফেলতেই বড়মামা ঘুরে এসেছেন। মোহন লাঠি বাগিয়ে তেড়ে গেছে। এইবার উল্টো রেস—ভোলা ছুটছে আগে, বড়মামা তাড়া করে পেছনে।

আমরা দৌড়ে গেলুম লাকির কাছে। একটা বাড়ির রকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যে মেজমামা কুকুর দেখলে দশ হাত দূরে পালান, সেই মেজমামা কলেজে যাবার ধবধবে পোশাকে লাকিকে কোলে তুলে নিয়েছে । চোখ দুটো ছলছলে। ভোলাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, বড়মামা ফিরে এসে বাইকটাকে কোন রকমে ফেলে রেখে, ধরা গলায় 'লাকি লাকি' করছেন। মাসিও এসে গেছেন।

দেখতে দেখতে বাড়ি হাসপাতাল। বড়মামার বন্ধু পশু-চিকিৎসক ডাক্তার বরাট এসে গেছেন। দুই মামারই বারেবারে এক প্রশ্ন, 'বাঁচবে তো, বাঁচবে তো!' বরাট বলছেন, 'বেশ একটু শক লেগেছে। সারতে সময় লাগবে কয়েক দিন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলুম।'

সন্ধেবেলা লাকি বড়মামার নরম বিছানায় পাখার তলায় ঘুমোচ্ছে। মাসি চিঁড়ে ভাজছেন।

মেজমামা ইজিচেয়ারে বসে বিশাল মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মুখটা খুব বিষণ্ণ। মাঝে-মাঝে পিট-পিট করে লাকির দিকে তাকাচ্ছেন। বড়মামা দুপুর থেকে লাকির পাশে সিস্টারের মতো বসে আছেন।

হঠাৎ বড়মামা বললেন, 'বুঝলি শান্তি! রাগ চণ্ডাল!'

মেজমামা বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। আমরা দুজনেই ভীষণ রাগী।'

বড়মামা বললেন, 'বাবা ভীষণ রাগী ছিলেন।'

মেজমামা বললেন, 'মা-ও তা-ই। বরং বেশিই ছিল।'

বড়মামা বললেন, 'আসছে বার কুকুর হয়ে জন্মাব।'

মেজমামা বললেন, 'আমিও। লাকিকে দেখে আজ আমার জ্ঞান হল।'

বড়মামা মেজমামার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হাত মেলা।' দু'মামার করমর্দন, আর ঠিক সেই সময়ে সারাদিন পরে লাকি প্রথম দু'বার শব্দ করল—ভুক, ভুক! সঙ্গে সঙ্গে দু'মামার উল্লাসের চিৎকার, 'লাকি, লাকি!'

লাকি বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে ডাক ছাড়ল, 'ভৌ—ঔ—'।

ফিজিওথেরাপি

মেজমামা অষ্টাবক্র মুনির মতো কাতরাতে কাতরাতে বড়মামার ঘরে এসে ঢুকলেন। ডান হাতটা কোমরে। পরনে কালো শর্টস, স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গলার কাছে একটা সোনার পদক ঝুলছে। চোখে চশমা নেই তাই মুখটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বড়মামা সকাল থেকেই ভীষণ ব্যস্ত। বড়মামার কুকুর লাকি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছে। গায়ে বুরুশ দিলেই গাদা গাদা লোম উঠে আসছে। সাতদিন আগেও বড়মামাকে দেখলে যে-ভাবে যত ঘনঘন পটাক পটাক ন্যাজ নাড়ত ইদানীং তত জোরে আর নাড়ছে না। নাড়ছে, তবে দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ধীরে ধীরে, একবার এদিকে একবার ওদিকে। ডাকেরও আর তেমন ঝাঁজ নেই। মিইয়ে মিইয়ে ডাকে। সব সময় হাত-পা ছড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাকে।

সেই কুকুরের জন্যে সুষম খাদ্য তৈরিতে বড়মামা ব্যস্ত। সামনে একটা বড় বই খোলা। বারে বারে পাতা উল্টে যাচ্ছে বলে আমার ওপর হুকুম হয়েছে, 'ধরে থাক। বই আর ছাত্র দু'পক্ষই সমান চঞ্চল। শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই তো হবে না, বইয়ের স্বভাবটাও তো দেখতে হবে। তখন থেকে খোলা রাখার চেষ্টা করছি। চশমার খাপ, পেপার ওয়েটমোয়েট কোনো কিছু দিয়েই জব্দ করা যাচ্ছে না। স্বভাব যাবে কোথায়? পাতায় পাতায় এত জ্ঞান ঠাসা, স্বভাবে নির্বোধ। ঝপাত করে বন্ধ হয়ে গেলেই হল।'

একটু আগেই বইয়ের সঙ্গে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। বইটার মাঝামাঝি একটা জায়গা খুলে বড়মামা একপাশে চাপা দিয়েছিলেন চশমার খাপ আর একপাশে একখণ্ড চৌকো কাঠ। আমি বসেছিলুম জানলায় পা তুলে। হাতে টিনটিন। মেজমামা কালই এনে দিয়েছেন। কোমর দুরমুশ করে দেবার পুরস্কার। হঠাৎ হুম্মার দুড়দুড় শব্দ। কাঠের টুকরো, চশমার ভারী খাপ দুটোই মেঝেতে। পাশাপাশি চিৎপাত। পরক্ষণেই বইটাও মেঝেতে। বড়মামার দাঁত কিড়মিড় করছে, 'রাসকেল, থার্ডগ্রেড ইডিয়েট। আমি দেখছি, দেখে যাচ্ছি।'

বড়মামা বইটাকে মেঝেতে ফেলে জায়গা মতো খুললেন। তারপর সেই খোলা বইয়ের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসেই বললেন, 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। লাইক ডগ, লাইক ক্লাব।'

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মন্তব্য করলেন, 'রাসকেল শব্দটা গালাগাল নয়। তুমি আবার মেজকে গিয়ে যেন বোলো না, বড়মামা সবসময় গালাগাল দেন।'

'বইটার ওপর ওভাবে বসলেন?'

'ওর মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে কাজ করা যাবে না। মানুষের মতো জ্বালাতনে স্বভাব হয়েছে। উনি খোলা থাকতে চান না, বন্ধই থাকবেন। এই যা ব্যবস্থা হল, এখন সারাজীবন খোলাই থাকবে, বন্ধ আর হবে না।'

মোটা রেকসিন বাঁধাই 'ডগ ম্যানুয়েল।' পাতায় পাতায় পৃথিবীর যাবতীয় কুকুরের ছবি। বড়মামার ভারে সামান্য দমে গেলেও মেরুদণ্ডের জোর এখনও বেশ প্রবল। বইটার ওপর আরও অত্যাচারের প্ল্যান হচ্ছিল। মমতা পড়ে যাওয়ায় ছুটে এসে ধরে আছি।

টেবিলের কাঁচের ওপর নানারকম ট্যাবলেট ফেলে শিশির পেছন দিয়ে বড়মামা গুঁড়ো করছেন। কাজে এতই ব্যস্ত, মেজমামা এসেছেন লক্ষ্যই করেননি।

মেজমামা কাতরাতে কাতরাতে বললেন, 'কোমরটা আর সোজা করতে পারছি না।'

'সারা জীবন বেঁকে বসলে সোজা হবে কী করে? বেঁকেই থাকবে।' মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন বড়মামা।

'আহা, সোজা করতে গিয়েই তো বেঁকে গেল।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী? কুকুরের ন্যাজ নাকি? সোজা করা যায় না?' বড়মামা এইবার চোখ তুলে তাকালেন। তাকাতেই হল।

'কোমর সোজা করা যায় না মানে? এই দ্যাখ আমার কোমর। সোজা করছি, বাঁকা করছি।' বড়মামা চেয়ারে বসে বসেই মেজমামাকে কোমর বাঁকানো আর সোজা করার খেলা দেখাতে লাগলেন।

মেজমামার ডান হাতটা কোমরে। শরীরটা সামনে বেঁকে ধনুক। চেষ্টা করেও সোজা হতে পারছেন না। মুখ দেখে মনে হয় যন্ত্রণাও হচ্ছে। সেই অবস্থায় বললেন, 'তোমার কোমর আর আমার কোমরে অনেক তফাত।'

বড়মামা সামনের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন, সোজা হয়ে গেলেন, 'তার মানে? কিসের তফাত? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তুমি কি নিজেকে অতিমানব ভাব নাকি? ও তোমার হল গিয়ে শৌখিন কোমর আর আমার হল গিয়ে মেহনতি কোমর।'

মেজমামা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সব কথাকেই তুমি বড় বাঁকা করে নাও, বড়দা। তোমার কপালে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের গুঁড়ো।'

বড়মামা কপালে হাত দিলেন। মেজমামা থামেননি, 'আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি ক্যাঁট-ক্যাঁট করে কথা শোনাতে লাগলে। আমি বলতে চাই, তোমার শরীরটা চিরকালই

তো ভাল। ব্যায়াম-ট্যায়াম কর। আসন কর। আমার তো সে-সব নেই। কোমরটাকে না খেলিয়ে খেলিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি।'

মেজমামার কথায় বড়মামা যেন খুশিই হলেন। প্রশ্ন করলেন, 'খেলাওনি কেন? পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান তোমার মাথায়, এই জ্ঞানটাই নেই, দরজার কব্জাকে যেমন খেলাতে হয় তেমনি শরীরের কব্জাকেও সচল রাখতে হয়।'

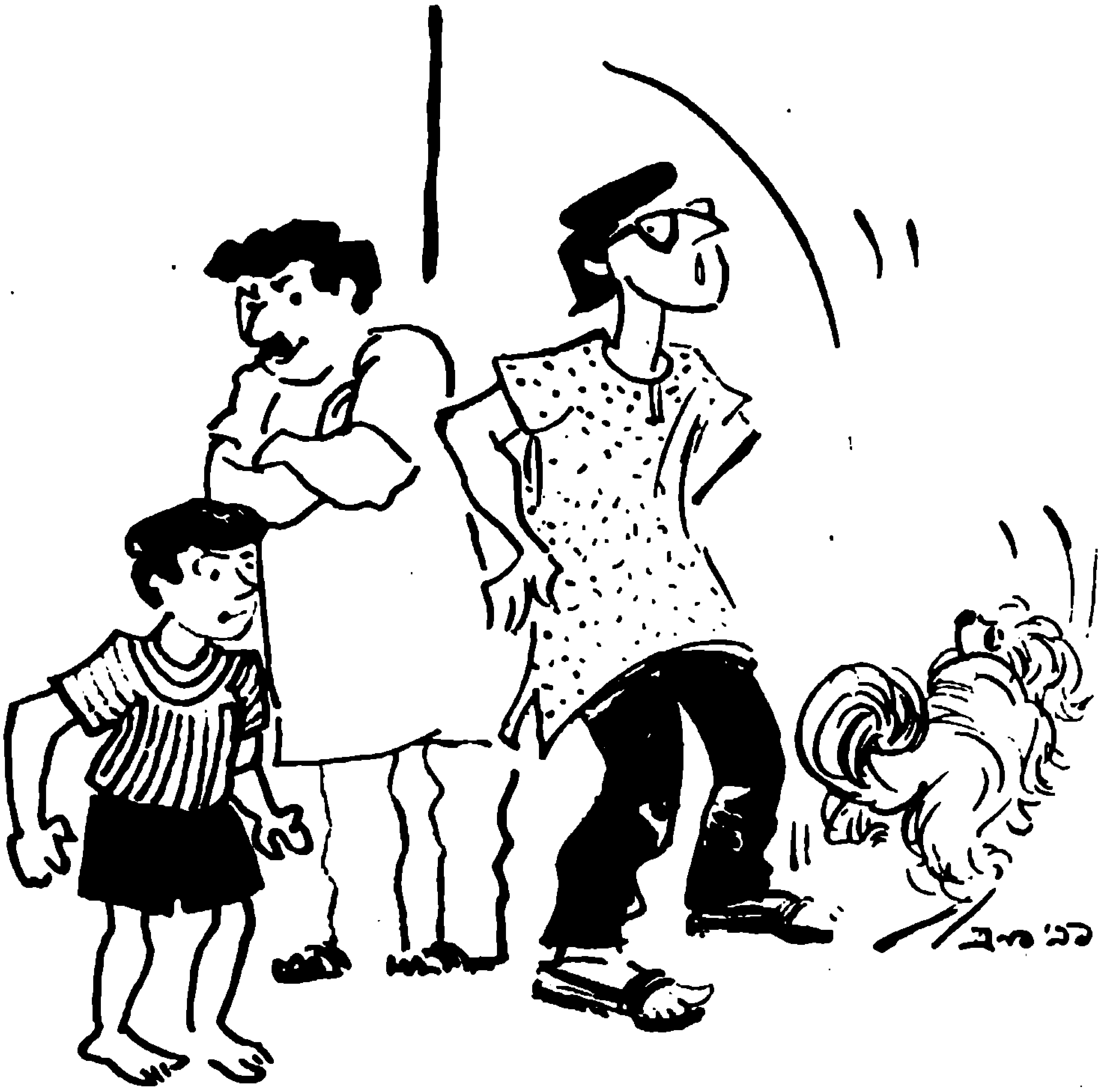

'আহা! এতদিন পরে সেই জ্ঞানটাই তো হয়েছিল। ক'দিন থেকে কনকন করছে, কনকন করছে, সকালে উঠে ভাবলুম, মাথার উপর হাত তুলে কানের পাশে চেপে ধরে হাঁটু না ভেঙে সামনে ঝুঁকে পায়ের পাতা ছুঁই। হাঁটুটা একটু বাঁকলেও মোটামুটি হল, তারপর যেই সোজা হতে গেলুম, খটাক করে একটা শব্দ হল, আর আমি এইরকম হয়ে গেলুম।' মেজমামার মুখ কাঁদোকাঁদো।

অন্যের দুঃখে বড়মামা সবসময়েই কাতর। উঠে দাঁড়ালেন। মেজমামাকে বললেন, 'আয়, ঘরের মাঝখানে সরে আয়। ওষুধে কাজ হবে না। ফিজিওথেরাপি করতে হবে।'.

মেজোমামা একপাশে চেত্তা খেতে খেতে ঘরের মাঝখানে সরে গেলেন। মেজমামার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা দেখে আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। হাসি চাপবার কুঁক-কুঁক শব্দ হল কয়েকবার। ভীষণ অসভ্যতা। কী করব, চাপতে পারছি না।

বড়মামা মেজমামার কোমরে আস্তে আস্তে দুবার চাপড় মারলেন, 'অ্যাঃ, একেবারে দরকচা মেরে গেছে। রেগুলার একে তেল খাওয়াতে হবে। জং ধরে গেছে।' দু'হাত পিছিয়ে এসে দেয়ালে ছবি টাঙাবার সময় যেভাবে বাঁকা সোজা দেখে, বড়মামা সেইভাবে মেজমামাকে দেখতে লাগলেন। 'মনে রাখ, ফর্টি ডিগ্রী নর্থ, টেন ডিগ্রী ওয়েস্ট, জিরো ডিগ্রী ইস্ট।'

বড়মামার কথা শুনে মেজমামা বললেন, 'তুমি যেন জাহাজ চালাচ্ছ?'

'এইবার বুঝবি কেন বাউলরা বলে দেহতরী। প্রথমে তোকে ঠেলে উত্তরদিকে চল্লিশ ডিগ্রী তুলব, তারপর দু'কাঁধ ধরে পশ্চিমে ১০ ডিগ্রী মুচড়ে দেব, পুবে কিছু করতে হবে না। ব্যস, আবার তুই সোজা প্রফেসার হয়ে যাবি।'

বড়মামা কুস্তিগিরের মতো হাতের তালুতে তালু ঘষলেন। মেজমামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'এটা তো তোমার আসুরিক চিকিৎসা হয়ে গেল দাদা। ভীষণ লাগবে। এমন কী চিরকালের মতো আমার কোমরটা কব্জা-ভাঙা দরজার মতো ঢকঢকে হয়ে যাবে।'

'অ্যানাটমির তুমি কী বোঝ হে! মেরুদণ্ডের শেষটা কীরকম তুই জানিস? কটা হাড় আছে তুই জানিস? ওই জায়গাটায় হিঞ্জ সিসটেম, তুই জানিস?'

কথা বলতে বলতে বড়মামা মেজমামার দিকে এগোচ্ছেন। মেজমামা একটু একটু করে পেছোচ্ছেন। বড়মামা বলছেন, 'তুই ভাবছিস সামনের দিক থেকে তোকে মারব? মোটেই না। পেছন দিক থেকে একটা হাত চালিয়ে দেব তোর গলার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি। কব্জিটাকে লাগিয়ে দেব গলা আর দাড়ির মাঝখানের খাঁজে, তারপর পেছন দিকে মারব টান।'

মেজমামার মুখ দেখে মনে হল পালাতে চাইছেন। ক্রমশ দরজার দিকে পেছোচ্ছেন। বড়মামা ধরতে পেরেছেন, 'তুই সরে-সরে দরজার দিকে যাচ্ছিস কেন? পালাবার মতলব?'

মেজমামা বললেন, 'তোমার হাবভাব আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না, দাদা। যেভাবে ব্ল্যাকপ্যান্থারের মতো গুটি-গুটি এগিয়ে আসছ! আমার ভয় লাগছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। নিজে নিজেই ঠিক করে নোব।'

'তার মানে? অবিশ্বাস? আমাকে হাতুড়ে ভাবছিস? ভাবছিস শরীর-তত্ত্বের কিছুই জানি না?'

'আহা, তা ভাবব কেন? এই গ্রামে তোমার মতো অ্যালোপ্যাথ আর কে আছে? আসলে অ্যালোপ্যাথিতে আমার আর তেমন বিশ্বাস, না না, বিশ্বাস নয়, উৎসাহ নেই। আমি হোমিওপ্যাথি করাতে চাই।'

'ধ্যার, আমি কি তোকে অ্যালোপ্যাথি করছি নাকি? ফিজিওথেরাপিতে সবে যে ট্রেনিং

নিয়ে এলুম গত তিনমাস ধরে, তারই প্রথম প্রয়োগ হবে তোর ওপর। এরকম একটা কেস এত সহজে ঘরে বসেই পেয়ে যাব ভাবিনি।'

'দাদা, তোমার পায়ে পড়ছি। বিশ্বাস করো, আমি প্রায় সোজা হয়ে গেছি। তাকিয়ে দ্যাখো। আগের চেয়ে সোজা-সোজা লাগছে না?' মেজমামা জোর করে একটু সোজা মতো হতে গিয়ে 'আউ' করে চিৎকার করে উঠলেন।

বড়মামা শব্দ করে হেসে বললেন, 'আমার হাত না পড়লে তুই মেরামত হবি না রে মেজ!'

বড়মামা দরজা আটকে ফেলেছেন, 'চল, চল, ঘরের মাঝখানে একটু স্থির হয়ে দাঁড়া। তুই তো জানিস একসময় আমি কুস্তি করতুম। তুই যত চলে চলে বেড়াবি আমি আর তোকে রুগি ভাবতে না পেরে প্রতিপক্ষ ভেবে হঠাৎ একটা আড়াই-প্যাঁচ মেরে দোব, তখন মাস তিনেক আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবি না।'

বড়মামার খাটের তলায় এক টুকরো কার্পেটের ওপর লাকি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিল। শরীর ভাল না। সারাদিন শুয়েই থাকে। পেছন দিকের অল্প একটু অংশ ন্যাজ সমেত বাইরে বেরিয়ে আছে। বড়মামাকে সত্যিই এবার কিংকংয়ের মতো মনে হচ্ছে। যেমন করেই হোক মেজমামাকে ধরে পেছন দিকে মটকে দেবেন। মেজমামা বেকায়দায়। খাটের দিকে পিছু হটলেন।

আমি জানতুম এইরকম ঘটনাই ঘটবে। লাকির বেরিয়ে থাকা ন্যাজে মেজমামার পদপাত। অনেকদিন পরে লাকি লাফিয়ে উঠল। সেই পুরনো ঝাঁজ, সেই পুরনো চিৎকার। ঘাউ ঘাউ করে লাফিয়ে উঠেছে। খাটে মাথা ঠুকে কেঁউ কেঁউ। মেজমামার ভীষণ কুকুর-ভীতি। আচমকা লাকির চিৎকারে অনায়াসেই সোজা হয়ে গেছেন। কোমরের খটকা নিজেরই চমকানিতে খুলে গেছে।

বড়মামা টেবিল থেকে লাকির সুষম খাদ্য তৈরির সমস্ত মালমশলা সরাতে সরাতে বললেন, 'বুঝলি ডাক্তারের কুকুরও ডাক্তার হয়। আমাকে হাত দিতেই হল না। অ্যাসিসটেন্টই এক চিৎকারে তোর মেজমামাকে মেরামত করে দিলে।'

আমি বললুম, 'মেজমামার পা যেন রামচন্দ্রের পা। লাকির ন্যাজে পড়তেই অহল্যা উদ্ধারের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠল। সেই থেকে কিরকম চেল্লাচ্ছে দেখেছেন। সেই পুরনো মেজাজ।'

কথাটা বড়মামার তেমন পছন্দ হল বলে মনে হল না।

বামাখ্যাপার চেলা

বিরাট প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। কলকাতার টিম আসছে আমাদের পাড়ার টিমের সঙ্গে খেলতে। বাঘাদা আমাদের ক্যাপটেন। খেলার মাঠের পশ্চিম পাশে বড়মামার বাগানের নড়বড়ে পাঁচিল। ইটের খাঁজ থেকে মশলা ঝরে পড়েছে। নোনা ধরে গেছে। ইটের চাপে ইট দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মধ্যে সাপের খোলস ঝুলে থাকে।

এত বড়ো একটা খেলা! বড়মামা না দেখে পারেন! তায় আবার রবিবারের বিকেল। স্টেথিসকোপের এক বেলা ছুটি। দেয়ালের গায়ে সাপের মতো ঝুলছে। সোমবার সকালে নেমে আসবে বড়মামার গলায়। সিল্কের লাল লুঙ্গি। ট্যাঁকে নস্যির ডিবে। গায়ে গোল গলা, বোতাম লাগানো, হাতাঅলা, ধবধবে সাদা গেঞ্জি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। পাড়ার দলের প্রধান সাপোর্টার হয়ে বড়মামা গোল লাইনের পেছনে। বড়মামার পেছনে আরো এক দল। আর এক দল উঠে বসে আছে বড়মামার পাঁচিলে। বড়মামা একবার একটু খুঁতুর খুঁতুর করেছিলেন। তবে এত বড়ো একটা খেলা। তা ছাড়া পাঁচিলে চেপেছে আমাদেরই দলের সাপোর্টাররা।

আমাদের টিম খেলছে ভালো। তার চেয়েও ভালো আমাদের চিৎকার। মাঝমাঠ থেকে বল ওদের সীমানায় ঢুকেছে কি ঢোকেনি, অমনি আমাদের গগনভেদী চিৎকার—গোল, গোল। খেলা ড্র যাচ্ছে। শেষ হাফে আমাদের ফরোয়ার্ড লাইনের বাঘাদা বাঘের মতো বল নিয়ে, ও-দলের সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করে গোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বড়মামার নস্যির টিপ হাতের আঙুলে। নাকের কাছে উঠছে আবার নেমে নেমে যাচ্ছে। চিৎকার করছেন, ডু অর ডাই। বাঘা, ডু অর ডাই। বাঘাদার প্রথম শট গোলকীপার ফিরিয়ে দিয়েছে। বল নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে! সাপোর্টাররা সামনে পেছনে দুলছে। গলা থেকে গোল শব্দটা গোল না হওয়া পর্যন্ত বেরোবে না। সকলেই চেঁচাচ্ছে—গোও, গোও। ওল আর হয় না। হবে কি করে? গোলের মুখে যে গুলতানি শুরু হয়েছে।

গোল হোক না হোক, এই উত্তেজনায় বড়মামার বাগানের সেই মান্ধাতার আমলের পাঁচিল কোল্যাপ্‌স্‌ করল। হই-হই, রই-রই ব্যাপার। ইট চাপা পড়েও সাপোর্টাররা গোঙ গোঙ করছে। গুল আর হল না। খেলা ড্র-ই রয়ে গেল।

সকালে বড়মামা মিস্ত্রী ধরে আনলেন। রাস্তা আর বাগান এক হয়ে গেছে। নতুন পাঁচিল তো তুলতেই হবে। তা না হলে ওই সাপোর্টররাই বাগান সাফ করে দেবে। ইট এসেছে, বালি এসেছে, সিমেন্ট এসেছে। বড়মামার মিস্ত্রী রহমতুল্লা এসেছে, সঙ্গে দু'জন মজুর। রহমতুল্লা একটা উঁচু ঢিবিতে উবু হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর জোগাড়ে দু'জনের সঙ্গে খুব গল্প করছে। বকরীদের সময় খিদিরপুর থেকে পাঁঠা কিনবে।

খ্যাটের গল্প।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'বড্ড ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে। নটা বেজে গেছে রহমতুল্লা।'

রহমতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে, 'হচ্ছে বাবু হচ্ছে। বেশি টিকটিক করবেন না। কাজ ভালো হবে না।'

'তাই নাকি রে ব্যাটা?'

'ব্যাটা ব্যাটা করবেন না।'

'মেজাজ দেখাচ্ছিস?'

'মেজাজ আপনিই দেখাচ্ছেন।'

'আমি দেখাচ্ছি? না তুই দেখাচ্ছিস ব্যাটা?'

'আবার ব্যাটা বলছেন?'

'ব্যাটার মানে জানিস? ব্যাটা ভূত!'

'আবার ভূত বলছেন?'

'ভূতকে ভূত বলব না তো কি মানুষ বলব'

বেশ মজা লাগছে। দু'জনে কেমন তরজা চলছে। বড়মামার পাশে মেজমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। গোলমাল হই-হই মেজমামা একদম সহ্য করতে পারেন না। কারুর ছেলে কাঁদলে দৌড়ে গিয়ে বলেন, এই নে বাবা পাঁচটা টাকা, ওকে থামা। সেই মজাতেই আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে, সে বেশ পেয়ে বসেছে। গেণ্ডিপেণ্ডি গোটা তিনেককে নিয়ে আসে সাত সকালে। এসেই পেটাতে থাকে। মেজমামা থাকলে পিটুনি বেড়ে যায়। টাকার লোভে। মাসীমা দেখেশুনে বলেন, পৃথিবীটা শয়তানে ভরে উঠেছে।

মেজমামা বড়মামাকে বলছেন, 'কাজ করাবে কাজ করাও, তুমি ওকে ভূতপ্রেত বলছ কেন?'

'প্রথমে আমি ব্যাটা বলেছি, ব্যাটা খারাপ শব্দ! তুই-ই বল-না। ব্যাটা মানে ছেলে। আর ভূত? ভূত তো আদর করে বলে।'

'তোমার অত বকবক, খবরদারির কী দরকার? জানই তো, ওর মাথায় একটু ছিট আছে।'

রহমতুল্লা শুনতে পেয়েছে নিচে থেকে, চিৎকার করে বললে, 'ছিট আমার মাথায় না তোমাদের মাথায়?'

মরেছে, আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে। বড়মামা জানলার পাশ থেকে হুড়মুড় করে মেজমামাকে একপাশে কাত করে দিয়ে ভেতর দিকে সরে গেলেন। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি নিচে থেকে। জানলা থেকে সরে যাওয়া মানেই বড়মামা নিচে নামছেন। ঠিক তাই। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাগানে প্রবেশ।

'অ্যাই তোকে কাজ করতে হবে না। নিকালো, আভি নিকালো।'

'নিকালো বললেই নিকালো। নটা বেজে গেছে, এখন আমরা নতুন কাজ ধরতে পারব?'

'দ্যাটস নট মাই লুক আউট।'

'আমরা যাব না, এ বাড়িতে আমরা বড়বাবুর আমল থেকে কাজ করছি, হু আর ই .'

'উরে ব্বাবা ইঞ্জিরি বলছিস?'

'আমরাও কইতে পারি জনাব।'

'তুমি আমার ইটে হাত দেবে না।'

'জরুর দোব। আতা, মশলা মাখ।'

'মজুরী দোব না।'

'চাই না!'

আতা হোসেন বালি মাপছে, রামভরোসা সিমেণ্টের বস্তা খুলছে। বড়মামার মুখ দেখে মায়া হচ্ছে। তবে শেষ প্রতিবাদ, 'তুমি আমার পাঁচিল গাঁথবে না, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি।'

'যান, যান, নিজের কাজে যান। বাইরের ঘরে অনেক রুগী জমেছে। নিজের চরকায় তেল দিন। অয়েল ইওর ওন মেশিন।'

'তুই গেঁথে দেখ, আমি রদ্দা মেরে ফ্ল্যাট করে দোব।'

'বড়বাবুর আমলের লোক, তুই বলতে তোমার লজ্জা করছে না?'

'আমি বামাখ্যাপার চেলা। আমি সব্বাইকে তুই বলি। আমার শ্যামা মাকেও তুই বলি রে পাঁঠা।'

'বেশ কর। তুমি এখন যাও। ডিসটার্ব কোরো না।'

'আমার এক কথা, তুমি আমার পাঁচিলে হাত দেবে না।'

'হ্যা, পাঁচিলই নেই তো পাঁচিলে হাত দেবে না। রামছাগলের মতো কথা।'

'আমি রামছাগল?'

'আমি পাঁঠা হলে তুমি তাই। আমি মানুষ হলে তুমি তাই। রামভরোসে মাখা লে আও।'

খপাস খপাস করে দু'কড়া মাখা মশলা পাঁচিলের কাছে পড়ল। 'আতা, ইটে পানি ঢাল।'

বড়মামা বললেন, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! আমার কাজ আমি তোমাকে দিয়ে করাব না। ভদ্রলোকের এক কথা।'

কর্ণিকে এক খাবলা মশলা তুলে সেই ডাঁটিয়াল মিস্ত্রী ইটের ওপর খপাস করে ফেলে, একটু নেড়েচেড়ে একটা ইট বসিয়ে কর্নিকের পেছনের বাঁট দিয়ে ঠুকুস ঠুকুস করে ঠুকে দিল! বড়মামা দু'হাত পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গা-জোয়ায়ী হয়ে যাচ্ছে রহমত।'

'জোর যার মুলুক তার।'

তিনটে ইট গাঁথা হয়ে গেল। বড়মামা একেবারে হেল্পলেস। জোগাড়েরা ঘিরে রেখেছে রাজকে! এমনভাবে জল ঢালছে, মশলা ফেলছে, বড়মামার পায়ে ছিটকে ছিটকে লাগছে। কিছু করার নেই, কাজ ইজ কাজ। রহমতুল্লা ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে সরে সরে যাচ্ছে, ইট গাঁথতে গাঁথতে। বড়মামা এমন মানুষের পেছনে কেন যে লাগতে গিয়েছিল? কাজের স্পিড কি, যেন মেশিন! কিন্তু বড়মামা যে এমন তক্কে তক্কে ছিলেন আমরা কেউই বুঝি নি। রহমতুল্লা যেই পাঁচিলের ওকোণে সরে গেছে, বড়মামা সদ্য গাঁথা ইটের সারিতে মারলেন এক লাথি। বাস্, গোটাকতক সরে গিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারী।

রহমতুল্লা ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'কবার ভাঙবে? আমি আবার গাঁথব। দেখি তুমি হার কি আমি হারি!'

'দেখা যাক।' বড়মামারও রোক চেপে গেছে। রোদ ক্রমশ চড়ছে। বেলা বাড়ছে হু হু করে। রহমত গেঁথে চলেছে, বড়মামা ভেঙে চলেছেন। জবরদস্ত খেলা! বড়মামার রুগীরা চেম্বার ছেড়ে বাগানে চলে এসেছেন। এঁরা সব ডাক্তারবাবুর সাপোর্টার। ওপাশে রাস্তায় এক দল, তারা মিস্ত্রীর সাপোর্টার। বড়মামা যেই ভাঙেন, এরা হই-হই করে। রহমত যেই আবার গাঁথে ওরা হই-হই করে।

মেজমামা দর্শনশাস্ত্রে বুঁদ হয়ে চিলেকোঠায় বসেছিলেন। মাসীমা রান্নার কলেজে ভর্তি হয়েছেন। নোট বই খুলে চচ্চড়ি রাঁধছিলেন। দু'জনকেই ঘটনাটা জানালুম। মেজমামা উদাস গলায় বললেন, 'ভাঙছে? ভেঙে ফেলছে? ও তোমার দেখার ভুল। কেউ ভাঙতে পারে না, গড়তেও পারে না। ব্রহ্ম স্ট্যাটিক। স্থির জ্যোতিপুঞ্জ।' মাসীমা ওপরে চলে এসেছেন।

'মেজদা, তুমি থাকতে সকলের সামনে বড়দা এই রকম ছেলেমানুষি করে বংশের মুখ ডোবাবে?'

'আমাকে কি করতে বলিস?'

'তুমি বড়দাকে থামাও। ইটে লাথি মেরে পা-টা যে যাবে।'

'চল, তা হলে।'

বড়মামা লাথি মারবেন বলে সবে ডান পাটা তুলেছেন, মাসীমা আর মেজমামা খপাত করে পেছন দিক থেকে আচমকা বড়মামাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। রাস্তায় রহমতুল্লার সাপোর্টারদের তখন সে কী ভয়ংকর চিৎকার—হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!

গোমুখ্যু গোরু

বড়মামার ডাক্তারি এবার মাথায় উঠবে। রুগীরা ভীষণ অসন্তুষ্ট। যাঁর পরপর তিনটে ইঞ্জেকশান পড়ার কথা তিনি একটা নিয়ে দিনের পর দিন আসছেন আর ফিরে ফিরে যাচ্ছেন। চেম্বারে ডাক্তারবাবু নেই। সেদিন একজন স্পষ্টই বললেন, কুলপুরোহিত আর পরিবারের ডাক্তারকে যদি সময়মতো পাওয়া না যায় তাহলে অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হয়।

মেজমামা বললেন, 'অ্যাদ্দিন ছিল ডাকসাইটে ডাক্তার, শেষ বয়েসে হয়ে গেল জেলে। কার বরাতে কখন কী যে হয়ে যায়। তাও যদি দু-একটা মাছের মুড়ো পাতে দেখা যেত! এমন নিরামিষ বৈষ্ণব জেলে খুব কমই দেখা যায়!'

যে যাই বলুন, আমার ভীষণ মজা। দিন বেশ কাটছে। বড়মামাকে ওই জন্যই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। যখন যা মাথায় ঢোকে তখন তাই করে ফেলেন। কারুর পরোয়া করেন না। ঠিক আমার মতো। লাট্টু ঘোরাব তো সারদিন লাট্টুই ঘোরাব। অঙ্কে গোল্লা। দুটো দিক তো একসঙ্গে সামলানো যায় না। সেবার গুলিতে পেয়েছিল। ইতিহাসে কোনোরকমে টায়ে-টোয়ে তিরিশ। মেজমামা রেজাল্ট দেখা ধেই-ধেই করে নাচতে লাগলেন। বড়মামা বললেন, 'ব্যাটা আমার সাচ্চা ভাগনে।' এবারের পরীক্ষায় কী হবে মা সরস্বতীই জানেন! বড়মামা যেভাবে নাচাচ্ছেন, আমি কী করব! গুরুজনের কথা কি অমান্য করা চলে! সকলে বলবে, বড় অবাধ্য! উঠোনের এক পাশে মামা-ভাগনে থেবড়ে বসে আছি। ভীষণ কেরামতি চলেছে। দু'পাউণ্ড রুটি পিঁপড়ের ডিম দিয়ে চটকানো হয়ে গেছে। বিশু রান্নাঘরে কুঁড়ো আর খোল ভাজছে। গন্ধে বাড়ি ম-ম করছে। এক বোতল তাড়ি ভীষণ অসুবিধেয় ফেলেছে। গন্ধটা তেমন সুবিধের নয়। নারকোলের মালায় কেঁচো কিলবিল করছে। আস্ত একটা বোলতার চাক ডিমসুদ্ধ খবরের কাগজে শুয়ে আছে। কাগজটা মনে হয় আজকের। কারণ মেজমামা অনেক্ষণ দোতলায় 'কাগজ কাগজ' করে অস্থির হচ্ছেন। মেজাজ ক্রমশই চড়ছে। মাসীমা শান্ত

করার চেষ্টা করছেন ; বলছেন, 'আজকাল কাগজ দিতে খুব দেরি করে। লোডশেডিং হয় তো।'

বড়মামা বললেন, 'আমার নাকে রুমালটা বেঁধে দে তো, তাড়ি ঢালব।' বিশুদার কুঁড়োভাজা এসে গেছে। গন্ধে আমার জিভেই জল এসে যাচ্ছে, মাছের যে আজ কী অবস্থা হবে! মেজমামা ঠিকই বলেন, ডাক্তারের ভিটামিনযুক্ত টোপ খেয়ে মাছেরা স্বাস্থ্যবান হচ্ছে, এর পর ডাক্তারকে আর মাছ ধরতে হবে না, মাছেরাই ডাক্তার ধরবে।

তাড়িপর্ব শেষ হল। বিশুদা বাইরে থেকে এসে বললেন, 'একজন রুগি খুব হম্বিতম্বি করছেন, বলছেন, স্ত্রী মরোমরো, না গেলে ঠেঙাবে।'

বড়মামা বললেন, 'ঠেঙাবে কী রে?'

'হ্যাঁ বাবু, ঠেঙাতেও পারে। আজকাল রুগিরা ডাক্তাদের কাথায় কথায় দ্যাখ-মার করছে।

'কী হবে বিশে! আমার তো আর দেরি করা চলে না। তুই বরং এক কাজ কর, আমার জামার বুকপকেট থেকে দশটা টাকা নিয়ে ওকে দিয়ে বল, ভোলা ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যেতে। আমার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার কী হয়েছে বিশু?'

'আজ্ঞে হার্ট অ্যাটাচ।'

'গর্দভ, অ্যাটাচ নয়, অ্যাটাক।'

বিশু চলে যেতেই বড়মামা বললেন, 'নে নে, তৈরি হয়ে নে। মাছের খাবার তো হল, এবার আমাদের সারাদিনের ব্যবস্থা। কুসি, কুসি।'

বড়মামা মাসীমার খোঁজে ভেতরে চলে গেলেন।

নটার সাইরেন বাজতে না বাজতেই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বড়মামার মাথায় শোলার টুপি। কাঁধে বিলিতি ছিপ। সে ছিপ আবার ইচ্ছেমতো বড় ছোট করা যায়। মোটরবাইকে যাওয়া চলবে না। শব্দে রুগিরা টের পেয়ে যাবেন। ডাক্তার বেশ ভালই আছে। সাইকেলই আমাদের বাহন। নিঃশব্দে পাড়া ছেড়ে একবার বড় রাস্তায় পড়তে পারলে আমাদের আর পায় কে! বড়মামার সাইকেল চালানোর ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, আমরা যেন কুখ্যাত আলকাট্রাজ জেল ভেঙে পলাতক দুই আসামী।

পুকুর না বলে দিঘি বলাই ভাল। বলা নেই কওয়া নেই বড়মামা ইজারা নিয়ে বসে আছেন। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বেওয়ারিশ পড়ে আছে। পাঁচিল-টাচিল দিয়ে কোনও দিনই ঘেরা যাবে না, এত বিশাল ব্যাপার। চারপাশে গাছপালা আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, তাল, খেজুর, সুপারি। মেজমামা বলেছিলেন, 'জমা নিচ্ছ নাও, তবে মাছ আর আমাদের চোখে দেখতে হবে না, পাবলিকেই ফাঁক করে দেবে!'

বড়মামা বলেছিলেন, 'নিজের জন্যে তো অনেকদিন বাঁচা গেল, এবার না-হয় পরের জন্যে কিছুদিন বাঁচি।'

সাইকেল থেকে জিনিসপত্র নেমে এল। শতরঞ্জি, জলের ফ্লাস্ক, মাছের খাবার, আমাদের

খাবার, এক জোড়া ছিপ, জল থেকে মাছ তোলার জাল, একটা রঙবেরঙের ছাতা, মোটা একটা লাঠি। একতাল দড়ি।

আমরা যে-জায়গায় বসব সেই জায়গায় লাঠি পুঁতে ছাতাটাকে বেশ করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। একটু ছায়া চাই। চারপাশে রোদ খাঁ-খাঁ করছে। ভিজে-ভিজে ঘাসের ওপর ডোরাকাটা শতরঞ্জি পড়ল। চারে মাছ না এলেও চোখে ঘুম এসে যাবে। কাল তাই হয়েছিল, একপাশে বড়মামা, আর একপাশে ভাগনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তেঠেঙার ওপর ছিপও ঘুমোচ্ছে। স্থির ফাতনার ওপর ফড়িং ঝিমোচ্ছে। মাছেদেরও সেই এক অবস্থা, তাড়ি-

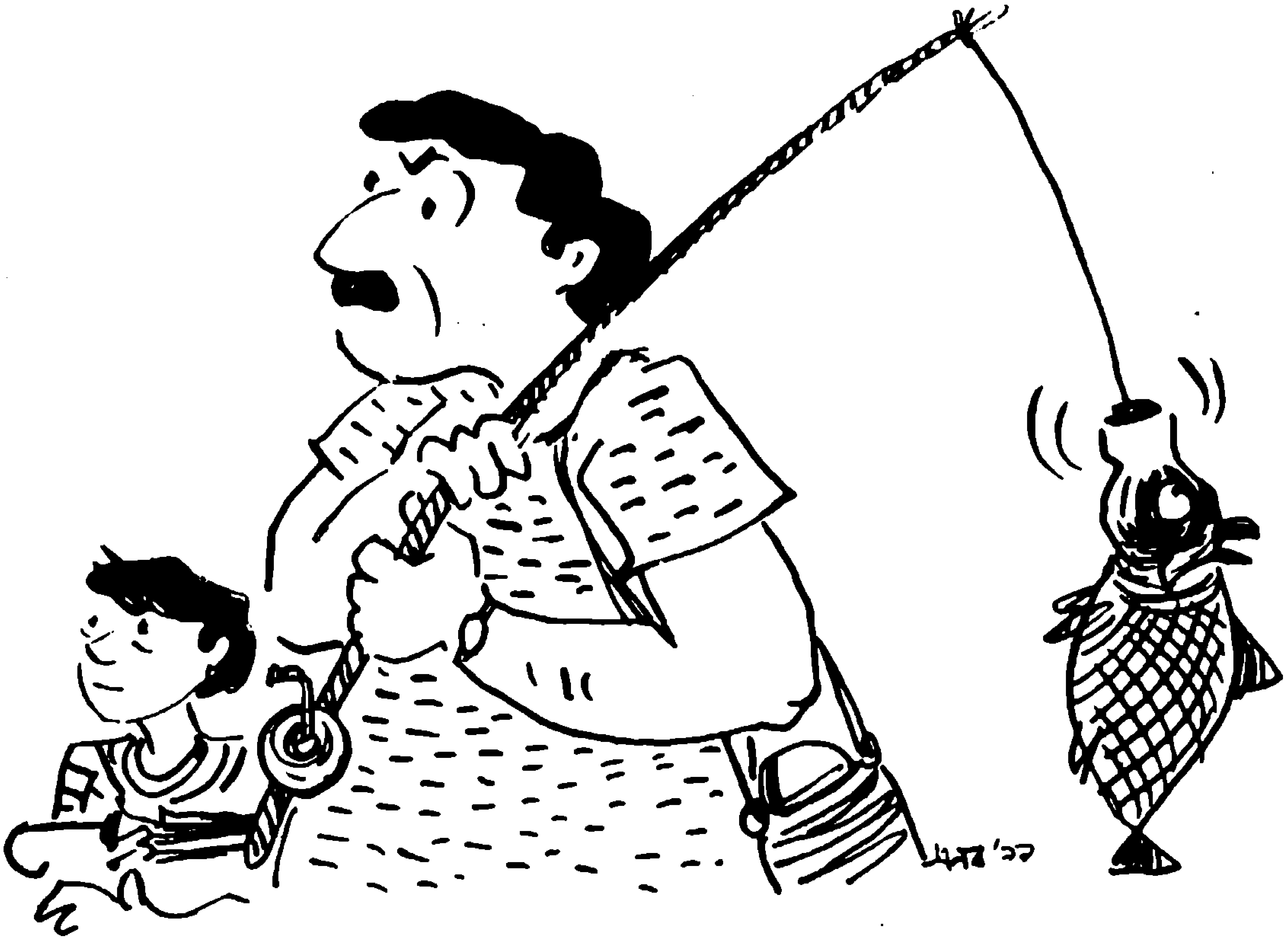

চটকানো চার খেয়ে বেহুঁশ শুয়ে রইল দিঘির তলায় পাঁকের বিছানায়।

বড়মামা বললেন, 'নে, চার কর। আমি একটু চা খেয়ে নি। প্রকৃতি যেন হাসছে রে, প্রকৃতি যেন খিলখিল করে হাসছে। কাল থেকে একটা তাকিয়া আনতে হবে।'

'সাইকেলে কি আর তাকিয়া আনা যাবে?'

'খুব যাবে। চীন দেশে সাইকেলে সংসার বয়ে বেড়ায়। সাহস চাই, কায়দা জানা চাই।'

কৌটো খুলে জলে চার ফেলতে লাগলুম। একটা ব্যাঙের তেমন পছন্দ হল না। তিড়িক করে লাফ মেরে জলে চলে গেল। ব্যাঙ ভালো সাঁতার জানে। মাঝ-পুকুরে কে ঘাই মারল।

বড়মামা আনন্দে আটখানা হয়ে বললেন, 'আসছে, আজ আমাদের ওইটাই টার্গেট। ঘাই দেখে মনে হচ্ছে কেজি-দশেক হবে। মৃগেল। মাথাটা মেজকে দোব, কী বলিস? কুসিকে ন্যাজাটা। মেয়েরা ন্যাজা খেতে ভালবাসে।'

'আজ পর্যন্ত একটাও তো ধরতে পারলেন না বড়মামা?'

'দাঁড়া। মাছেদের লজ্জা ভাঙুক। মাছেরা একটু লাজুক হয়। তাছাড়া জানিস তো, মনে হিংসে থাকলে জীবজগৎ দূরে সরে যায়। মাছভাজা খাব, মাছভাজা খাব—এই লোভ নিয়ে বসলে, মাছ কেন একটা ব্যাঙও তোমার চারে আসবে না।'

'তাহলে আজ আমরা আলু-ভাতে খাব, আলু-ভাতে খাব—এই ভাব নিয়ে বসি।'

'কোনোরকম খাবার চিন্তা মাথায় আনবি না। মনে কর আমরা উপবাসী ব্রাহ্মণ কিংবা রোজা-করা মুসলমান।' বড়মামা খুব কায়দা করে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছিপ ফেলতে গেলেন। আম-ডালে বঁড়শি আটকে ছিপ হাতছাড়া হয়ে গেল। হাত-দুয়েক ওপরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ছিপ দুলছে। হুইলটা তো কম ভারী নয়!

আমাদের হাইজাম্পের মহড়া চলেছে। নিতাই, গৌর, রাধেশ্যাম, দু'হাত তুলে মারো লাফ। আমপাতা, আমডাল, সবসুদ্ধ নিয়ে ছিপ আবার ফিরে এলো মালিকের হাতে।

বড়মামা বললেন, 'বড় শুভ লক্ষণ। আম্রপল্লব শিকার করে উদ্বোধন। এবার যখন ছিপ ফেলব, তুই তখন মাথার দিকটা একটু সামলে দিস তো। আকাশের ওপর আমাদের কোনও অধিকার নেই।'

'তাহলে আপনি একটু বাঁ পাশে সরে আসুন। মাথার ওপর একগাদা ডালপালা ঝুলছে। আবার আটকে যাবে।'

বড়মামা সরে আসতে আসতে বললেন, 'গাছের স্বাধীনতা আকাশে।'

ঘুরিয়ে ছিপ ফেললেন। এবার বেশ ফেলেছেন। সুতোয় টান মেরে ফাতনানটা সোজা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফড়িং এসে বসে পড়ল।

বড়মামা আয়েস করে বসে পড়লেন, 'নে আয়, এবার স্যাণ্ডউইচ খাওয়া যাক।'

'এর মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করলেন? সারাটা দিন পড়ে আছে।'

'থাক না, এটা তো টেস্ট কেস। কুসি কেমন করেছে দেখতে হবে না! চোখের দেখা নয়, চেখে দেখা। বুঝলি, আমি ভাবছি—"

'কী ভাবছেন বড়মামা।'

'এই মাছধরা, আর রুগি দেখাটা একসঙ্গে চালালে কেমন হয়, রথ দেখা আর কলা বেচারা মতো।'

'তাহলে এই দিঘিটাকে তো চেম্বারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হয়।'

'ধ্যার বোকা! চেম্বারটাকে এখানে তুলে আনব। ঘর বানাব না, একটা সাদা তাঁবু খাটাব। কিছু রোজগারও তো চাই। এই দ্যাখ না, কখন মাছ ঠোকরাবে কেউ জানে না। তুই চোখ রাখলি ফাতনার দিকে, আমি দেখতে লাগলুম রুগি।'

'আমি আবার অঙ্কও কষতে পারি।'

'ওঃ, তাহলে তো তুই মেঘনাদ বধ হয়ে যাবি রে!'

'আজ্ঞে মেঘনাদ সাহা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমার প্রায়ই গুলিয়ে যায়। নে, স্যাণ্ডউইচ নে, তাড়াতাড়িতে বেশ ভালই বানিয়েছে। আজকে ওই বড় মাছটা পাবই। ওটা পেলে, কাল মাছের পুর দিয়ে কচুরি করিয়ে আনব! মাছ ধরার কম ধকল! রোগা না হয়ে যাস।'

বড়রা প্রায়ই বলেন, দুঃখের রাত শেষ হতে চায় না। এ দেখছি মাছ ধরার দুপুরও সহজে সন্ধ্যে হতে চায় না। বড়মামা মাঝে মাঝে বঁড়শি তুলে বলছেন, 'যাঃ, টোপ খেয়ে গেছে। নে কৌটোটা খোল। টোপ দে। এবার একটু কেঁচো দে। এবার একটু বোলতার ডিম ছাড়। মাছেদেরও মুখ আছে। মাঝে-মাঝে মুখ পালটে দিতে হয়।'

গরমের দুপুরে ঝিম ধরছে। জল থেকে একটা গরম-ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। মাঝে-মাঝে পানকৌড়ি ছোঁ মেরে জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওপারে গোটাকতক হাঁস প্যাঁকোর-প্যাঁকোর করছে। শরীর ভারী হয়ে আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

হুইলের ভীষণ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলুম। বিরাট মাছ পড়েছে। যাক, এতদিনে বড়মামার হাতযশ দেখা গেল। মেজমামা এবার কাত। উত্তেজনায় বড়মামার চোখ বড়-বড়। মাছ যেভাবে সুতো টানছে, হুইল শেষ হয়ে এল বলে।

পুকুরের দিকে তাকালুম। এ কী, জল স্থির। মাছ তো জলেই খেলবে! বড়মামার ছিপ কোথায়! ছিপ এরিয়েলের মতো শূন্যে খাড়া। পিঠের দিকে বেঁকে আছে ধনুকের মতো। মাছ কি তাহলে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে ছুটছে? কী মাছ রে বাবা!

মাঠের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির।

'ও বড়মামা, আপনি কী ধরছেন?'

'কেন, মাছ?'

'মাছ তো আপনার পেছন দিকে মাঠ ভেঙে ছুটছে।'

'সে কী রে? মেঠো মাছ নাকি?'

'আজ্ঞে না, একটা দামড়া গোরু।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটানে ছিপটা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। গোরু ছুটছে, ছিপ ছুটছে, আমরা ছুটছি।

সন্ধ্যে হয়-হয়, আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। দেখার মতো চেহারা হয়েছে আমাদের। লোকে মাছ ধরে বাড়ি ফেরে, আমরা ফিরলুম গোরু ধরে। গোরু আমাদের সঙ্গেই এসেছে। গোরুর মালিকও আছেন। বঁড়শি কেটে বসে গেছে। অস্ত্রোপচার করে বের করতে হবে।

মেজমামা বললেন, 'কী কায়দায় এমন করলে?'

বড়মামা বললেন, 'ফাতনাটা নড়তেই মেরেছি টান। গোরুটা মনে হয় পেছনে চরে বেড়াচ্ছিল। বঁড়শি গেঁথে গেল পিঠে। গোমুখ্যু মেরেছে ছুট। যত ছোটে, বঁড়শি তত পিঠে ঢোকে। বিশে, বিশে।'

বড়মামার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

গোরু ধরে বড়মামার আবার সুমতি ফিরে এল। রুগিরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। সকলেই বলাবলি করছেন, এ আমাদের সেই পুরনো মুকুজ্যে-ডাক্তার, যাকে যমেও ভয় পায়।

যমে ভয় পেলে কী হয়, বড় দুঃখু, মাছে ভয় পায় না।

সাপে আর নেউলে

বেলা তখন ক'টা হবে, সকাল আট কি সাড়ে আট। বলা সেই কওয়া নেই চারজন ষণ্ডামার্কা লোক তরতর করে আমাদের দোতলায় উঠে এল। দক্ষিণের হলঘরের মতো বড় ঘরটায় ঢুকে ফার্নিচার-মার্নিচার যা ছিল সব ধরাধরি করে বাইরের বারন্দায় বের করতে লাগল। মেজোমামা পুবের জানলার ধারে জলপাইগুড়ি থেকে আনা আরামদায়ক একটা বেতের চেয়ারে বেশ ফলাও হয়ে বসে দর্শনের বই পড়ছেন। এতটাই ডুবে গেছেন বিষয়ে যে, ঘরের মধ্যে চারটে দৈত্যের মতো লোক কীসব টানাহ্যাঁচড়া করছে, সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। আমার মেজোমামা এইরকমই। পড়তে বসলে আর জ্ঞান থাকে না। ইদানীং ব্যায়াম করা ছেড়ে দিয়েছেন বলে বেশ একটু মোটা হয়েছেন, রংটাও বেশ ফরসা হয়েছে। এতদিনের ব্যায়াম হঠাৎ ছাড়ার কারণ, বড়মামা একদিন একটা মেডিকেল জার্নাল সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'মেজো, পড়ে দ্যাখো, ব্যায়ামের কুফল। মাথামোটা হয়ে যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত সেই বোদামাথায় আর ঢুকবে না। ভাল চাও তো হোঁত হোঁত ডনবৈঠক মারা ছেড়ে শুধু মর্নিং ওয়াকের ওপর থাকো"।

এই ওয়াকিংটা মেজোমামা কোনওকালেই পছন্দ করেন না। অকারণে হাঁটার কোনও মানে হয়! ফলে হপ্তায়-হপ্তায় ওজন বাড়ছে। যে-বইটায় তলিয়ে আছেন বিষয়টা তার জানি, বিজ্ঞান ও ভগবান। ভগবান কি আছেন!

মেজোমামার পেছনে দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড় টেবিল। এইবার সেই টেবিলটা বেরোচ্ছে। হুটপাট শব্দ শুনে মাসিমা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন ব্যাপারস্যাপার। বলা নেই কওয়া নেই, এরা কারা! মেজোমামা যেমন গ্রাহ্য করছেন না, ওরাও তেমনই গ্রাহ্য করছে না। টেবিলটাকে চারজনে মিলে তুলেছে। পেছনে একটা ড্রয়িং বোর্ড খাড়া করা ছিল, সেটা সপাটে পড়ল।

মাসিমা তখন একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'মেজদা।'

মেজোমামার কানের রকমটা আমি জানি। মোটা, ভোঁতা, গম্ভীর শব্দ কানে যায় না। সরু, তীক্ষ্ম আওয়াজে চমকে ওঠেন। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

মাসিমা বললেন, 'তোমার ঘরে এরা কারা?'

মেজোমামা এই প্রথম লোক চারজনকে দেখে মাসিমাকেই প্রশ্ন করলেন, 'এরা কারা?'

'ঘরের আদ্দেক জিনিস বাইরে বেরিয়ে গেল, তুমি জানো না এরা কারা! কোন জগতে ছিলে?'

মেজমামা ভুবনভোলানো সেই বিখ্যাত হাসিটি হেসে বললেন, 'কুসি, আমি এখানে ছিলুম না রে!' লোক চারজন টেবিল ধরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়ে গেছে ভয়ানক। মাসিমার চেহারাটা ঠিক মা-দুর্গার মতো তেজস্বী।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা কে?'

যে উত্তর দিল সে মনে হয় দলের নেতা, 'আমরা বড়বাবুর লোক।'

'বড়বাবুর লোক তো মেজোবাবুর ঘরে ঢুকে কী করছ?'

'বড়বাবুর অর্ডার।'

'বড়বাবুর অর্ডার! বড়বাবু কী অর্ডার দিয়েছে! টেবিল রাখো। উতারো।'

টেবিলটাকে মেঝেতে রেখে দলনেতা বলল, 'মেঝেটা চটাব।'

'চটাব মানে?'

'মানে খুঁড়ে ফেলব।'

'খুঁড়ে ফেলব মানে, এটা কি বড়বাবুর মামার বাড়ি!'

দলনেতা বেশ এয়ার নিয়ে বলল, 'অর্ডার সেই রকমই।'

মাসিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বড়দা কোথায় রে?'

বেশ কিছুক্ষণ আগে বড়মামাকে তিনতলার ছোট ছাতে দেখেছিলুম। শর্টস পরে সিদ্ধাসনে বসে সাঁই-সাঁই প্রাণায়াম করছেন। সেই কথাই বললুম।

মাসিমা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'প্রাণায়ামের নিকুচি করেছে। শিগ্‌গির টেনে তুলে আনো।'

হঠাৎ কানে এল বড়মামার গলা। সুর করে বলছেন, 'কুসি, হিয়ার আই অ্যাম। কুসি।'

একটু সরে গিয়ে আমরা ওপর দিকে তাকালুম। তিনতলার ছাদের বাহারি আলসের ফাঁকে বড়মামার হাসি-হাসি মুখ, 'ম্যাডাম কুসি, দে আর জাস্ট এগজিকিউটিং মাই অর্ডার। গো অন আলম।'

'তুমি নেমে এসো।'

'নামছি, নামছি। জাস্ট অ্যানাদার রাউণ্ড অব ডিপ অ্যাণ্ড সিনসিয়ার ব্রিদিং।'

'এইটাই তোমার লাস্ট ব্রিদ হবে, যদি এখুনি, এই মুহূর্তে না নেমে আসো।'

মেজোমামা ওপর দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'ইউ উইল হ্যাভ টু কাউণ্ট সরষে। ইউ উইল সি মাস্টার্ড ফ্লাওয়ার।'

মাসিমা তিরস্কার করলেন, 'তোমার রাগ হচ্ছে না মেজদা!'

মেজোমামা হাসতে-হাসতে বললেন, 'কী সুন্দর দুষ্টু-দুষ্টু মুখ দ্যাখো। রাগ করা যায়! অবিকল একটা লাউ। এসো, নেমে এসো ভ্রাতা, কুসির হাতে ছেঁচকি হবে।'

লোক চারজন অবাক হয়ে কাণ্ড দেখছে। এমন ফ্যামিলি এই বাজারে কে কোথায় দেখেছে।

বড়মামা সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসছেন ছোট ছেলের মতো।

মেজোমামা বলছেন, 'নামছে দেখছিস যেন অনুষ্টুপ ছন্দ!'

মাসিমা বললেন, 'পড়বে যখন, ছন্দ বেরিয়ে যাবে, হয়ে যাবে সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক।'

বড়মামার এখন এই সাধনা চলছে, 'থিঙ্ক ইয়াং অ্যাণ্ড ইউ উইল রিমেন এভার ইয়াং'। একটা বই কিনে এনেছেন, 'লাফটার ইজ দা বেস্ট মেডিসিন'। একটা বড় আয়না কিনে এনেছেন, রোজ সেইটার সামনে দাঁড়িয়ে নানাভাবে নিজেকেই নিজে ভেংচি কাটেন। আপনমনে নানারকম পাগলামি করেন। নিজের সঙ্গেই আবোলতাবোল বকেন। এইসব নাকি মডার্ন মেডিসিন।

শর্টস আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা বড়মামাকে ফ্যানটাসটিক দেখাচ্ছে।

মাসিমা কোনওরকম ভনিতা না করে বললেন, 'তুমি এদের বলেছ মেজদার মেঝে খুঁড়তে!'

'বলেছি।'

'কেন বলেছ? এটা কী ধরনের শত্রুতা!'

'শত্রুতা নয় বৎস, মিত্রতা। প্রবল মিত্রতা। ওর জন্মদিনে ওকে আমি মার্বেল পাথরের ধবধবে সাদা একটা মেঝে উপহার দেব বলে মনস্থ করেছি। আমার গভীর বিশ্বাস, আগামী বছরে ও নোবেন পুরস্কার পেয়ে জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে।'

মাসিমা বললেন, 'কীজন্যে পুরস্কার পাবে?'

'ভগবানকে আবিষ্কার করার কারণে, আজ পর্যন্ত কেউ যা পারেনি।'

'এই বংশে কেউ যদি নোবেল পুরস্কার পায়, সে পাবে পাগলামির জন্য। নমিনেশনের একেবারে এক নম্বরে থাকবে তোমার নাম। এমন সুন্দর লাল চকচকে মেঝেটা কী কারণে তোমার অসহ্য লাগছে! পয়সা বেশি হয়েছে? যদি হয়ে থাকে নষ্ট না করে গরিবকে দান করে দাও। তোমরা দুই পাগলে সংসার খরচটাকে কোথায় তুলেছ, কোনও ধারণা আছে? বিশ হাজার!'

বড়মামা বললেন, 'কুসি, তোর এই এক আছে, টাকা টাকা, আরে টাকা কি তোর সঙ্গে যাবে! খরচ করতে শেখ। আমার কোষ্ঠীতে কী লেখা আছে জানিস, যত খরচ করবে, তত টাকা আসবে। আমি স্বপ্ন দেখেছি রে! ভোরের স্বপ্ন। আমার গ্রেট, গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদার এসে বলছেন, মিস্টার মুকার্জি, আমি ইতালিয়ান মার্বেল পাথরের মেঝেতে, ভেলভেটের আসনে বসে রুপোর জামবাটিতে, নিজেদের চাষের গোবিন্দভোগ চাল আর আমাদেরই কালো গাইয়ের ক্ষীরের মতো দুধ দিয়ে তৈরি পায়েস খেতুম, তাতে কান্দাহারের পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ গজগজ করত। আমাদের সেই পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আন। কুসি, থিঙ্ক বিগ ইউ উইল বি বিগ। ছুঁচোর কথা ভাবিসনি, হাতি ভাব, ছুঁচের কথা ভাবিসনি, শাবলের কথা ভাব। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। আমি কী ভাবি জানিস, আমি নেপোলিয়ান, আমি কাইজার, আমি এম্পারার, আমি জার, আমি বিক্রমাদিত্য, আমি হর্ষবর্ধন...।'

মাসিমা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'তুমি একটি গোবর্ধন। গবা। তোমার মাথায় গোবর। মার্বেল পাথরের দাম জানো? এই কুড়ি বাই আঠারো ঘরে কত লক্ষ টাকার মার্বেল লাগবে, আইডিয়া আছে?'

'কুসি, মার্বেল কি আমি মার্কেট থেকে কিনব রে ভাই! আমার এক পেশেণ্ট একটা মার্বেল পাহাড় কিনেছে।'

'নিশ্চয় মেণ্টাল পেশেণ্ট।'

'আজ্ঞে না, সুগারের। আমি সেই সুগার ফ্যাকট্রিকে ম্যানেজ করেছি মানিক। সেই

পাহাড়ের কিছুটা অংশ ধসিয়ে আমাকে দেবে। দি হোল হাউস উইল বি এ মার্বেল প্যালেস। ঘরে-ঘরে ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালে-দেওয়ালে দেওয়ালগিরি। সকালে ভাত, রাতে বিরিয়ানি।'

'তোমার লজ্জা করে না বড়দা? তোমার আক্কেল কবে হবে? একজন তোমাকে একটা ভাঙা মোটরগাড়ি ড্যাম চিপ বলে চৌত্রিশ হাজারে গছিয়ে গেল। সেই গাড়ি অ্যায়সা তেল খেতে আরম্ভ করল যে, শেষে সংসারটাই খেয়ে ফেলে আর কী! এমন এক ড্রাইভার আনলে সাত মাসে সাতবার অ্যাকসিডেন্ট, গচ্চা আরও সাত হাজার। এই করতে-করতে চৌত্রিশ লাখে উঠল। সেই গাড়ি পড়ে আছে গোয়ালে। বেড়ালের আঁতুড় ঘর। তোমাকে আমি মেঝে করতে দেব না। যা আছে, বেশ আছে, সুন্দর আছে।'

মেজোমামা আমতা-আমতা করে বললেন, 'একটা ইচ্ছে যখন হয়েছে, স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশ, ফুলফিল না করলে পূর্বপুরুষদের ক্রোধ হবে, সংসারের ক্ষতি হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

মাসিমা ভেংচি কেটে বললেন, 'ইত্যাদি, ইত্যাদি। তোমরা তোমাদের গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদারকে দেখেছ! মিথ্যে বলতে গিয়ে এতটাই পেছিয়েছ যে, অরণ্যের কালে চলে

গেছ। সেই সময় তোমাদের গ্রেটেস্ট গ্র্যাণ্ডফাদার বল্কল পরে ঘুরতেন, ঝলসানো মাংস খেতেন আর গুহায় থাকতেন। মার্বেল পাথরের গুহা হলেও বোঝা যেত। অর্ডিনারি পাথরের গুহা। রুপোর জামবাটি, গোবিন্দভোগ, স্বপ্নই বটে! আলমসাহেব, মেঝেফেজে হবে না। যেখানকার-যেখানকার জিনিস সব সেইখানে-সেইখানে ফিট করে দিন।'

টেবিল এতক্ষণ আট হাতের চ্যাংদোলায় দোল খাচ্ছিল, ঠক ঠকাস করে মেঝেতে নেমে এল। আলমসাহেব বারকতক হাতের ব্যায়াম করে নিয়ে বললেন, 'বড়বাবু গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল করবেন না। পাথর রইল পাহাড়ে আপনি হুকুম দিয়ে দিলেন মেঝে খুঁড়ে ফেল। মায়েদের পরামর্শ না নিয়ে কেন কাজ করতে যান! বেকার পরিশ্রম হল।'

এই বেকার শব্দটাই হল কাল। বড়মামা ইদানীং অনেক সাধনার মধ্যে এই সাধনাটাও ঢুকিয়েছিলেন, কিপ আইস কুল। শতকাণ্ডেও মেজাজ বরফ। এর নাম তিতিক্ষা। সেই তিতিক্ষা সামান্য একটা শব্দের গুলিতে তাসের ঘরের মতো চুরমার হয়ে গেল। সম্বোধন তুমি থেকে তুই-এ নেমে এল, 'কী বললি, বেকার! কত টাকা তোকে দিতে হবে বল! ফুলরোজ দিয়ে দেব। সুধাংশু মুকুজ্যে বেকার কাজ করায় না। বল তোদের কত টাকা রোজ।'

আলমসাহেব থতমত খেয়ে বললেন, 'বড়বাবু, টাকার কথা কি আমি একবারও বলেছি। আমাদের ওটা কথার মাত্রা।'

সঙ্গে-সঙ্গে বড়মামা বললেন, 'মেঝে আজই খোঁড়া হবে। পাহাড় থেকে পাথর না আসে, দোকান থেকে আসবে। বিশ-বাইশ লাখ যা লাগে এই সুধাংশু মুকুজ্যেই ক্যাশডাউন করবে।'

মাসিমা গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার অ্যাকাউন্টে বাইশ হাজারও নেই।'

'কেন নেই?'

'বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়েছ।'

'কুছ পরোয়া নেই, বাড়ি বিক্রি করে দেব। তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকার প্রপার্টি।'

'বাড়িই যদি বিক্রি করে দিলে, তা হলে মেঝেটা হবে কোথায়! আমাদের মাথায়! যতসব আজগুবি কথা।' বড়মামার মুখটা দেখার মতো হল। অসহায়, করুণ।

নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন, 'মেঝে তা হলে হবে না!'

মাসিমা বললেন, 'না, সুখে থাকতে আর ভূতে কিলোবে না। অনেক খেলা তুমি দেখিয়েছ, এইবার রেস্ট।'

বড়মামা আবার উত্তেজিত, 'রেস্ট! আমার খেলা শেষ হবে না কালীচরণ! সারাজীবন আমি খেলব। আমি দুবাই যাব।'

মেজোমামা এতক্ষণে কথা বললেন, 'দুবাই যাবে কি সোনা আনতে?'

'না, পেট্রোডলার আনতে। কাগজে দেখেছি, দুবাই ভারতীয় ডাক্তার চাইছে। তিন বছর ডাক্তারি করে তিরিশ লাখ টাকা কামিয়ে ফিরে আসব।'

মাসিমা আলমদের বললেন, 'ব্যাস, একেবারে পাকা কথা, আজ থেকে তিন বছর পরে কাজ শুরু হবে।'

বড়মামা বললেন, 'না, না, অত দেরি নয়, লোনে সব হবে। এসে ঝটাঝট শোধ করে দেব।'

'তোমাকে লোনটা কিসের এগেনস্টে দেবে?'

'এই বাড়িটা। শোধ করতে না পারলে, বাড়ি, জমি, সব তোমার, আমি ডিড সই করে দেব।'

মাসিমা বললেন, 'এটার মাথায় তিন বালতি বরফজল ঢেলে দে ভাগনে। প্রাণায়ামের বায়ু ফুসফুসে না ঢুকে মাথায় চড়ে বসেছে। তাতেও না হলে রাঁচি।'

আলমসাহেব বললেন, 'সব বেক...।'

ঢোক গিলে সামলে নিলেন। বলতে চাইছিলেন, সব বেকার হয়ে গেল। জোর করে একমুখ হেসে বললেন, 'ফালতু টাকা নষ্ট করে কী হবে! এমন সুন্দর বিলিতি পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের মেঝে, আয়নার মতো চকচক করছে। এক যদি হাওলার টাকা ধরতে পারতেন, তা হলে গোটা বাড়িটাই মার্বেলে মোড়া যেত। বরং কোথাও মার্বেলের একটা রক করে নিন। সকাল, বিকেল সবাই একসঙ্গে বসে চা-বিস্কুট খাবেন। গল্প করবেন।'

॥ ২ ॥

গভীর রাতে কী একটা কারণে আমার ঘুম ভেঙে গেল। একই ঘরে দুটো আলাদা খাটে আমি আর বড়মামা ঘুমেই। দেখি, বড়মামার খাটটা খালি। এত রাতে ভদ্রলোক গেলেন কোথায়! দেখা দরকার। দরজা ভেজানো ছিল। খুলে বাইরে ছাতে এলুম। অল্প চাঁদের আলোয় চারপাশে ওড়ানা টানা। আগে আমার খুব ভূতের ভয় ছিল। নাইন থেকে টেনে ওঠার পর ভয় চলে গেছে। এখন আমি একা একটা পোড়োবাড়িতে থাকতে পারি। ভূত বাঘ নয়, সাপ নয়, বিছে নয়। ভূত কামড়ায় না, আঁচড়ায় না, কেবল একটু ভয় দেখায়। ভয় না পেলেই হল। চেহারার কোনও ছিরিছাঁদ নেই, কঙ্কালসার। সে আর কী করা যাবে।

যেদিকটায় বাগান, আম, কাঁঠাল, কলা, নারকেল, কদম, কৃষ্ণচূড়ার একাকার কাণ্ড, ছাতের সেই দিকটায় বড়মামা চুপ করে বসে আছেন। একটা উল্কা জ্বলতে-জ্বলতে দক্ষিণ থেকে পশ্চিম আকাশের দিকে সাঁই-সাঁই করে চলে গেল। স্কুলে আমরা এর নাম রেখেছি 'তারকার আত্মহত্যা'। বড়মামা আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন। আমি যেই কাঁধে হাত রেখেছি, শিউরে উঠলেন। ভয়ে কাঠ। আমাকে ভূত ভেবেছেন। মৃদু স্বরে বলছেন, 'রাম, রাম।'

আমি ধীরে ডাকলাম, 'বড়মামা।'

আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'তুই?'

'এর রাতে একা-একা তুমি এখানে কী করছ?'

'সত্য খুঁজছি।'

'সত্য আবার কী?'

'বোস এইখানে। রাতের বেলা ঘুমোস কেন? ঘুমিয়ে জীবনটাকে নষ্ট করলি। জেগে থাকলে কত কী জানতে পারা যায়! কত কী দেখা যায়! জানিস তো, পাখিদের মধ্যে একমাত্র প্যাঁচাকেই বলে জ্ঞানী, ওয়াইজ আউল। কারণ, পৃথিবীর সবাই যখন ঘুমোয় তখন প্যাঁচা জেগে থাকে, রাতের চৌকিদার। এই তো একটু আগে আমগাছের এই ডালটায় বসে আমাকে দেখছিল, কী ঘুমোওনি! সবাই তো ঘুমোচ্ছে, তুমি কেন জেগে! যেই বলেছি, আমি যে তোমার শিষ্য, কী খুশি! বললে, রাতকে জানলেই সত্যকে জানতে পারবে।'

'আপনি এক-একদিন এক-একরকম বলেন। এই সেদিন বললেন, উপনিষদ বলছে, জ্ঞানই সত্য আর সূর্যই হল জ্ঞান। দিন ছাড়া সূর্য পাবেন কোথায়! সেদিন বললেন, জ্ঞান সূর্যের আলো, অজ্ঞানের অন্ধকার।'

'এইসব ব্যাপারে তোর মাথাটা রিয়েল মোটা। যে-সূর্য সকালে পুব আকাশে ধকধক করে জ্বলে, ওটা ফায়ার বল। টন টন হিলিয়াম দাউ-দাউ জ্বলছে। আমাদের গরমে, ঘামে,

ঘামাচিতে রোজ অতিষ্ঠ করে মারছে। কবে যে এই জ্বলা শেষ হবে! পৃথিবীটা একটু ঠাণ্ডা হবে! দরকার নেই আমার আমগাছ, জামগাছ, দরকার নেই ফড়িং প্রজাপতি। পৃথিবীটা কিছুদিনের জন্যে আইসক্রিম হয়ে যাক। শ্বেত ভালুক আর হোয়াইট টাইগার, স্নো লেপার্ড আর ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট পেঙ্গুইন। আর কুছ নেহি মাংতা।'

কোথা থেকে অন্যরকম একটা গলায় কে প্রশ্ন করল, 'খায়েগা কেয়া। হরি মটর!'

গলাটা বেশ ভারী। ছাতে সম্প্রতি যে নতুন জলের ট্যাঙ্কটা তৈরি হয়েছে, প্রশ্নটা এল তার ওপাশ থেকে। সেদিকে একটা বেলগাছ আছে। খুবই প্রাচীন। প্রবাদ আছে, গাছে

নাকি বন্ধুভাবাপন্ন এক ব্রহ্মদৈত্য বহুদিন বসবাস করছেন। এই পরিবারেরই এক মানুষ, সামান্য অপরাধে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে আছেন। কিন্তু কেউ কোনওদিন তাঁর দর্শন পায়নি।

বড়মামা আমার হাতটা কষকষে করে চেপে ধরলেন। আমার বুকের ভেতরটাও গুমগুম করছে। যুক্তিবাদে তেমন জোর পাচ্ছি না। লৌকিক অলৌকিক হয়ে গেল বলে। আমিও বড়মামার হাতটা জোরে চেপে ধরেছি। এই কণ্ঠস্বর তাঁরই। বড়মামা খুব ভক্তিভরে বললেন, 'প্রভু! রাতের প্রাণী প্যাঁচাদেরও তো খাদ্য আছে।'

'কী খাদ্য বৎস?'

'ইঁদুর।'

'ইঁদুর পাবে কোথায়, সবই যদি বরফ হয়ে যায়!'

'প্রভু, বরফে গর্ত খুঁড়ে শ্বেত ইঁদুর বের করব। হোয়াইট র‍্যাট।'

'বৎস, হোয়াইট র‍্যাট কী খেয়ে বাঁচবে? হোয়াইট ব্যাট? গবেট!'

বড়মামা ব্রহ্মদৈত্যের ওপর ভীষণ কুপিত হয়ে বললেন, 'আমার বাঁচার ব্যবস্থা আমি করে নেব, আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি সকাল-বিকেল আচ্ছাসে পেঁয়াজ, আদা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে পেঙ্গুইনের ডিমের ওমলেট আর কফি খাব। চমরি গাইয়ের দুধ দিয়ে রাবড়ি করে খাব। লেবু দিয়ে ছানা কাটিয়ে কমলাভোগ তৈরি করব।'

এইবার ব্রহ্মদৈত্য আরও কুৎসিত গালাগাল দিলেন, 'পাঁঠা, সূর্য চলে গেলে সবুজও অদৃশ্য হবে। যে ঘাস তুমি এখন খাও সেই ঘাসও হবে না, শাকপাতা, গাছপালা সব মরে যাবে। কোথায় পাবে তোমার পেঁয়াজ, লেবু, কাঁচালঙ্কা, সরষে, সরষের তেল। সব প্রাণী, জীবজগৎ মরে ভূত হবে যাবে। সূর্য আছে বলেই জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি। মরুভূমি আছে বলেই মৌসুমী বায়ু, ধান চাল, গম, রবিশস্য। গর্দভ, সূর্য ফাদার হলেও পৃথিবীর মাদার।'

'প্রভু, এত গালাগাল দিচ্ছেন কেন?'

'আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম বৎস। তোমার মতো গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করার কৃতিত্ব যে আমার। সূর্যশূন্য পৃথিবী মৃত পৃথিবী।'

'মানতে পারলাম না প্রভু, সাইবেরিয়া, আইসল্যাণ্ডে মানুষ বাঁচছে কী করে! সমুদ্রের তলায় আছে অঢেল সম্পদ। নতুন ধরনের মানুষ নতুন জীবনে অভ্যস্ত হবে। সবুজ মাঠের বদলে সাদা মাঠ, সাদা বাড়ি, জুতোর বদলে স্কেটিং শু, মোটরের বদলে স্লেজ, টানবে বলগা হরিণ, স্কি করতে-করতে অফিস। আলোর মালায় শহর, নগর ঝিলমিল করবে। ঠাণ্ডার দেশের ধর্ম হবে খ্রিস্ট ধর্ম। দিকে-দিকে ক্রিসমাস ট্রি, পাতায়-পাতায় আইসক্রিমের মতো বরফ। চার্চ বেল। হিম। লুঙ্গি, গামছা, পাজামা, পাঞ্জাবি বিদায়। শুধু প্যাণ্ট, কোট, হ্যাট, টাই। সিল মাছের গ্রিল, ডলফিনের ড্রিল! আকাশে সবসময় চাঁদ আর তারা। কেয়া মজা!'

'ছাগল।'

'কে ছাগল?'

'তুমি একটি আস্ত বোকাপাঁঠা। সূর্য চলে গেলে চাঁদ আলো পাবে কোথায়?'

'আমাদের রকেট গিয়ে হ্যালোজেন ফিট করে দিয়ে আসবে।'

'তুমি একটি পাগল।'

'তুমি একটা ভূত।'

'তুমি একটা মুক্তকচ্ছ উন্মাদ।'

'মনে পড়েছে, কচ্ছপ আর কাঁকড়া খাব, ঝিনুক আর মাশরুম খাব।'

আমাদের পেছনে কখন যে মাসিমা এসে দাঁড়িয়েছেন আমরা খেয়াল করিনি। তরজার মতো ঝগড়া, ঝগড়ার মতো তরজা চলেছে। মাসিমার হাতে বেত। সেটা নাচাতে-নাচাতে বললেন, 'এই যে, বলি এটা যে রাত সেটা খেয়াল আছে কী?'

'আছে।'

'রাত্তিরে মানুষ কী করে!'

'ভোগীরা ঘুমোয়, যোগীয় জেগে থাকে।'

"পাগলরাও জেগে থাকে, আর দাওয়াই হল পেটাই।"

মাসিমা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই এখানে কী করছিস। তোর কাল স্কুল নেই।'

আমার তখন উত্তেজনার শেষ নেই। মাসিমাকে আমি মৌ বলি। 'জানো মৌ, বেলগাছের ব্রহ্মদৈত্য এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সত্যি-সত্যি। নিজের পরিচয় দিলেন, বড়মামার মাস্টারমশাই ছিলেন। খুব ভাল ব্রহ্মদৈত্য, বড়মামাকে গাধা ছাগল, পাগল সব বলেছেন।'

'ব্রহ্মদৈত্য! সিদ্ধিফিদ্ধি খেয়েছিস নাকি? এত বছর এ-বাড়িতে আছি, একদিনও কিছু শুনলাম না।'

বড়মামা বেশ অহঙ্কারের গলায় বললেন, 'সাধক ছাড়া ওঁরা দর্শন দেন না কথাও বলেন না।'

'কথাটা কোনদিক থেকে আসছিল রে!'

'ট্যাঙ্কের ওপাশ থেকে। যেদিকে বেলগাছ।'

মাসিমা দুদ্দাড় করে সেদিকে এগোলেন। শুনতে পেলুম মাসিমা বলছেন, 'ও পালের গোদা, তুমিও আছ।'

বড়মামা হামা দিয়ে সেদিকে কিছুটা এগিয়ে ট্যাঙ্কের পাশ থেকে উকি মারলেন, 'মেজো তুই?'

'ভগবানকে দেখব বলে বসে ছিলুম, এমন সময় ব্রহ্মদৈত্য ভর করল।'

মাসিমা হতাশ হয়ে বসে পড়লেন থেবড়ে, 'বুঝলে, আমার দ্বারা আর হবে না। তোমাদের জন্যে চাই জাঁদরেল একজন শাসক। তোমরা যা বেড়েছ না!'

দূরে একটা বিশাল কারখানা আছে, সেখানকার পেটা ঘড়িতে ঢ্যাং-ঢ্যাং করে দুটো বাজল। উত্তরের আকাশে ব্লপ করে ভেসে উঠল একটা আলোর বল। ধীরে-ধীরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ফানুসের মতো। ওদিকে বিরাট ক্যান্টনমেন্ট। মিলিটারিরা গভীর রাতে অনেক কিছু পরীক্ষা করে। আলোর বলটায় অনেকরম শব্দ হচ্ছে, যেন মন্ত্র পড়ছে। সহসা আকাশভর্তি আলো হয়ে গেল। সেই আলোয় ছাতে আমাদের ছায়া পড়ল। গাছের পাতায় ঘন কালো ছায়া, এত জোর আলো। কিছু পাখি ভোর হয়ে গেছে ভেবে বোকার মতো কিচিরমিচির করে উঠল।

বড়মামা বললেন, 'মার্কার। সেকেণ্ড ওয়ারে আমি অনেকবার দেখেছি।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'মার্কার কী?'

'রাত্তিবেলা শত্রু কোথায় আছে দেখার জন্যে এই ফসফরাস আলো ভাসানো হয়।'

হঠাৎ মাসিমা বললেন, 'রাতটা কত সুন্দর! এমন কত সুন্দর রাত আমরা ঘুমিয়ে নষ্ট করি। ভাগ্যিস জেগে ছিলুম তাই না এমন সুন্দর আলো দেখতে পেলুম।'

বড়মামা মাসিমার কথায় খুব খুশি হলেন, 'আমি তো সেইজন্যে জেগে থাকারই চেষ্টা করি। রাতে অনেক সত্য ধরা যায়।'

মেজোমামা জ্ঞানী মানুষ, সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'একটু কারেকশন করে দিই, সত্য অনেক নয়, সত্য এক এবং অদ্বিতীয়।'

বড়মাম বললেন, 'সেটা কী?'

মেজোমামা গান গেয়ে উত্তর দিলেন, 'আমি নেই, তুমি নেই, কেউ নেই, কেউ নেই, ওড়ে শুধু একঝাঁক পায়রা।'

'এ তো সেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান রে! আমার কলেজ জীবনের! শ্যামল মিত্রের

সেই গান, স্মৃতি তুমি বেদনা। সতীনাথের পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম। কীসব গান! ও দয়াল বিচার করো। সিনেমায় আমার প্রিয় হিরো ছিলেন অসিতবরণ। সেইসব দিন হইহই করে চলে গেল মিছিলের মতো। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান হয়ে গেল, আসবে না ফিরে কোনওদিন।'

মাসিমা আমাকে বললেন, মোটা বড় শতরঞ্জিটা আনতে, সেটা ধারাধরি করে পাতা হল। উত্তর আকাশের মিলিটারি আলো মিলিয়ে গেছে। গাছপালা আবার মিশে গেছে

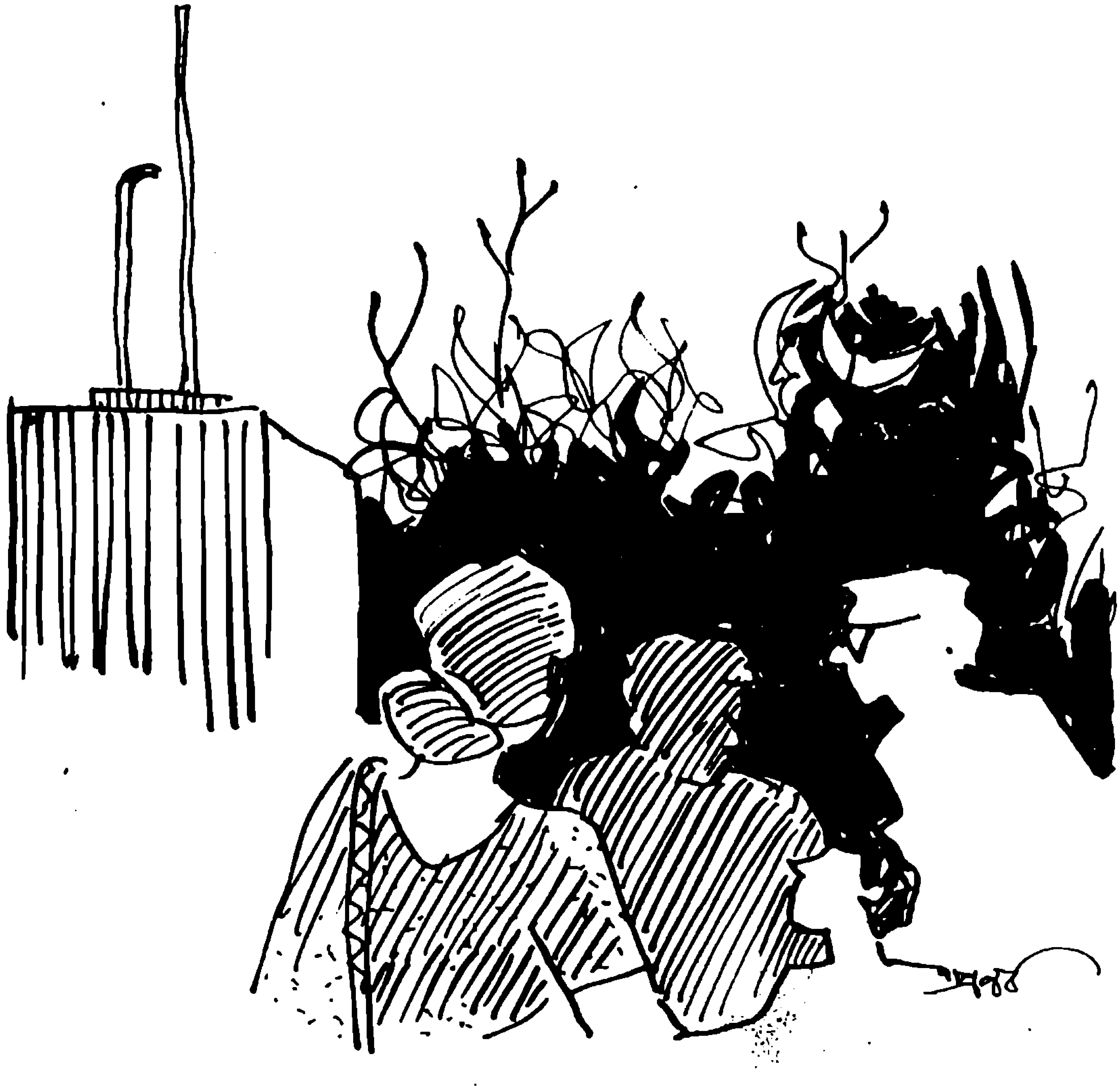

নরম অন্ধকারে। চাঁদ আবার তার জেল্লা ফিরে পেয়েছে। তিনটে সরাল ওঁয়াক-ওঁয়াক করে ডাকতে-ডাকতে আকাশের অনেকটা উঁচু দিয়ে উত্তর দিকে উড়ে গেল। এইবার সোজাসুজি একটা উল্কাপাত হল। ছেলেবেলায় আমরা বলতাম, তারা খসে পড়ল।

শতরঞ্জির মাঝখানে বসেছেন মাসিমা, আমরা তিনজনে তাঁকে ঘিরে আছি মুখোমুখি। মাসিমার প্রিয় দুধসাদা, থুপুরথাপুর বেড়ালটা কোলে এসে বসেছে। নাম তার 'চিত্রা'। রূপের গরবে আমার সঙ্গে বেশি কথাই বলে না, পাত্তাও দেয় না, মাসিমা একবার ডাকলেই,

যেখানেই থাকুক, চামরের মতো লেজ খাড়া করে ছুটে আসবে। রুপোলি চাঁদের আলোয় চিত্রার রূপ ফেটে পড়ছে, সাদা বড়-বড় লোমের ডগা জরির মতো চকচক করছে। সব যেন ফ্লুরোসেন্ট ফাইবার। নারকেল গাছের পাতা চাঁদের আলো ধরায় এক্সপার্ট। পাতার ঝিরিঝিরি বেয়ে পিছলে পড়ছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, আমি একটা ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে বসে আছি। মাঝরাতের পরেই বাতাস ঘুরে যায়। তাই গেল। এতক্ষণ ফুলের গন্ধ ছিল না। তাও এল। ভোরের জন্য ফুল তার সাজি সাজাচ্ছে। সূর্যপ্রণাম করবে, মন্দিরে যাবে।

মাসিমা বললেন, 'একটা প্রশ্ন আমার খুব ইচ্ছে করে তোমাদের করি।'

বড়মামা বললেন, 'করো, করো। প্রশ্নোত্তরের আসর হয়ে যাক।'

'আচ্ছা, তোমরা দু'জনেই কেন বিয়ে করলে না!'

বড়মামার চটজলদি উত্তর, 'মেয়েদের দেখলেই আমার মনে হয় বোন অথবা মা, আর জীবনের সেরা বোন-কাম-মা কুসিকে তো পেয়েই গেছি। আর আমি কিছু চাই না বাবা! জীবন ভরপুর। একমেবাদ্বিতীয়ম আমার কুসি। আর আমি চাই না কিছু।'

'মেজদা, তোমার কেস?'

'এমন একটা বোন থাকতে কোন ছাগল বিয়ে করবে! কুসি, আমি তোর নাবালক ডিপেণ্ডেণ্ট। বিয়ে খুব ব্যাড থিং। যতবার বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছি, ততবারই আমার পেটখারাপ হয়েচে। মালা, সানাই, টোপর এ তিনো হায় ফাঁসিকা ফান্দা!'

'তুমি এই ডায়ালগ শিখলে কোথা থেকে, ফাঁসিকা ফান্দা!'

মেজোমামা অপরাধী বালকের মতো মাথা নিচু করে ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'লুকিয়ে-লুকিয়ে শোলে দেখেছি।'

'তুমি লাইন দিয়ে টিকিট কেটে হলে বসে শোলে দেখেছ। শেম, শেম!'

মেজোমামা হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদের গলায় বললেন, 'সত্যি বলছি হলে নয় শোভনদের বাড়িতে ভি সি আরে। কী মিউজিক! এ দোস্তি, ছোড়েঙ্গে নেহি। কুসিকো নেহি ছোড়ুঙ্গা। লালা, ট্রালা ট্রালা।'

'কী বরাত! এক ছবিতে এতদিনের চরিত্রটা বিগড়ে গেল। সত্যি বলছ, হিন্দি গান গাইছ, ডায়ালগ বলছ, ভাগনে বসে আছে পাশে।'

'ও তো আমাদের বন্ধু।'

অনেক উঁচু দিয়ে একটা প্লেন যাচ্ছে। একেবারে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। ডানার তলার আলো ফ্ল্যাশ মারছে। আমি বললুম, 'এত রাতে প্লেন যায় কোথায়!'

মেজোমামা বললেন, 'ইণ্টারন্যাশনাল ফ্লাইট। লণ্ডন হয়ে নিউ ইয়র্ক। তুইও একদিন আমাদের মাথার ওপর দিয়ে এইভাবে উড়ে যাবি বিশাল জগতে।'

বড়মামা বললেন, 'ওই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটার দিকে তাকিয়ে আজ আমার কত কথাই মনে পড়ছে! চাঁদের আলোয় কেমন পড়ে আছে দ্যাখ। বৃদ্ধ অতীত। পুরনো সেই দিনের

কথা। এক সময় এই গোটা গ্রামটা আমাদের জমিদারি ছিল। দূরের ওই কারখানা, কাগজ কল, কাপড়ের কল, উত্তরের ওই বিল, সব ছিল আমাদের সম্পত্তি। বাবার কথা তোদের মনে পড়ে!'

মেজোমামা বললেন, 'অস্পষ্ট!'

মাসিমা বললেন, 'একেবারেই নয়।'

'মানুষের মতো মানুষ ছিলেন, আমরা তাঁর পায়ের নখের যুগ্যি নই। তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী। ওই যে দেখছিস চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসস্তূপ, ওর তলায় আছে একটা চোরকুঠুরি। একটা সুড়ঙ্গও আছে। সোজা চলে গেছে জোড়া বিলের ধারে। ছেলেবেলায় দেখেছি সেখানে একটা ডাম্বা লেটার বক্স। ওই যেমন দেখা যায়, মন্দিরের মতো লাল রং করা। আসলে সেটা লেটার বক্স ছিল না। কায়দাটা ছিল অদ্ভুত। উলটে শুইয়ে দিলে গহ্বরের মুখ। নামলেই সুড়ঙ্গ। বিপ্লবীরা ওই পথে এসে কুঠুরি থেকে বোমা, রিভলভার, পিস্তল, গুলি, সব নিয়ে যেতেন। বারীন ঘোষ অনেকদিন লুকিয়ে ছিলেন আমাদের চিলেকোঠায়।

'তুমি তখন কত বড়?'

'বালক। বোধবুদ্ধি হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে বাবা পাঠশালা করতেন। আমার খুব মজা লাগত। বিরাট, সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু হচ্ছে। দেশ থেকে ইংরেজ খেদানো। মায়ের সব গয়না গেল। জমিদারি বিক্রি হতে লাগল। বিপ্লবের খরচ জোগাতে বাবা ফতুর। মাঝে-মাঝে পুলিশ আসে, বাড়ি সার্চ করে। বাবা টিকিতে জবাফুল বেঁধে চণ্ডীপাঠ করেন, ঘণ্টা নাড়েন। পুলিশের সব প্রশ্নের উত্তরে সংস্কৃত বলেন। গ্রামে রটে গেল বাবার অলৌকিক ক্ষমতা। যাকে যা বলেন তাই হয়। গভীর রাতে শূন্যপথে ভ্রমণ করেন। তাগা-তাবিজে অসম্ভবকে সম্ভব করেন। খোদ দারোগার মরো-মরো মেয়ের গায়ে আঙুল ঠেকাতেই সে উঠে বসল। ধন্য, ধন্য। গোটা পুলিশ-ব্যারাক বাবার ভক্ত। কে ধরবি ধর!'

মেজোমামা বললেন, 'সত্যি, এইরকম পাওয়ার এসেছিল।'

'কতটা পাওয়ার কতটা প্রচার, সে-বিচারের বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। তবে হ্যাঁ, বাবা ছিলেন মহাসাধক। সে-ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। অষ্টমীর দিন দুর্গাদালানে বসে যখন চণ্ডীপাঠ করতেন, মনে হত মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। বুক ওঠানামা করছে। অসাবধানে মায়ের গায়ে অস্ত্রের খোঁচা লাগলে রক্ত বেরোবে। প্রকৃত শাক্ত ছিলেন। বিসর্জনের দিন রাতে জ্বর আসবেই আসবে, ধুম জ্বর। একদিন মনে আছে, ওই যে বুড়ো আমগাছ, এখন বুড়ো, তখন যুবক, গাছটার তলায় বাবা বসে আছেন খোলা গায়ে, আমরা বাচ্চারা সব খেলা করছি। গাছে কচি-কচি আম। কে একটা ছেলে আধলা ইট ছুড়েছে। ইটটা ডালে লেগে ছিটকে এসে সপাটে বাবার পিঠে। চওড়া পিঠ। ফরসা ধবধবে। একেবারে থেঁতলে গেল। বাবা ছেলেটাকে ডেকে শান্ত গলায় বললেন, 'ইট ছুড়ো না বাবা, তোমাদেরই মাথায় লাগবে।' ছেলেটা বাবার ক্ষতস্থান, আর অমন শান্ত কথা শুনে, হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। ছেলেরা দুব্বো ঘাস ছিঁড়ে, চিবিয়ে-চিবিয়ে রস বের করে বাবার ক্ষতস্থানের ওপর থেবড়ে-থেবড়ে লাগাচ্ছে। বাবা হাসছেন। সে এক দৃশ্য। আজও ভুলিনি। কী সহ্যশক্তি! বাবা বলতেন, বিপ্লবী মানে সাধক, সাধক মানে বিপ্লবী। চলে যাওয়ার দু'দিন আগে, আমার হাতে একটা ডায়েরি দিয়ে বললেন, 'আমি চলে যাওয়ার পর মন দিয়ে পড়বে। এটা শুধু তোমারই জন্যে, আর কেউ যেন না পড়ে। হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে, একটা বাক্সয় ভরে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় বিসর্জন দেবে। কোনও ভুল যেন না হয়।' তখন আমার বয়েস ষোলো।'

মাসিমা খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'সে কী, এই ডায়েরির কথা তো তুমি আগে আমাদের কখনও বলোনি। কোথায় সেই ডায়েরি! আমি পড়তে চাই।'

'সরি! বাবার নির্দেশ পালন করতে আমি বাধ্য, অন্তত ওই ডায়েরিটা পড়ার পর।'

মেজোমামা বললেন, 'আমিও দাদার সঙ্গে ছিলাম। বাক্সটা জলে পড়ে ধীরে-ধীরে তলিয়ে গেল। তারিখটা ছিল ২৫ ডিসেম্বর, আমার মনে আছে স্পষ্ট। একজন সুন্দর চেহারার সন্ন্যাসী স্নান করছিলেন, তিনি বললেন, 'সব মনে আছে তো, ভুলে যাওয়ার আগে লিখে

রেখো। শুধুমাত্র শ্রুতি আর স্মৃতিতে বিশ্বাস কী!' আচ্ছা দাদা, সাধু কেমন করে বলেছিলেন! একটু পরে আমরা তাঁকে কত খুঁজলুম, আর পাওয়াই গেল না!'

বড়মামা সুন্দর একটা উত্তর দিলেন, 'দ্যাখ, বিদ্যুতের খুব শক্তি, আমরা জানি, মাপতেও পারি। কিন্তু কেন এই শক্তি আমরা বলতে পারব না। সেদিন একটা হার্ট অপারেশনের সময় আমি অ্যাসিস্ট করছিলাম। রিববক্স ফেঁড়ে হার্টটাকে বের করে এনে, আইসপ্যাক দিয়ে তার ধুকপুকুনি থামানো হল। রোগী তখন হার্ট অ্যাণ্ড লাং মেশিনে। প্র্যাকটিক্যালি ডেড। এদিকে তার নিজের হার্টও ফ্রোজন। অপারেশন হল। হার্টটাকে ক্যাভিটিতে ভরে টুক করে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দেওয়া হল। চালু হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। এখন একটা প্রশ্ন, প্রথম স্পন্দনটা কে দিয়েছিল। আমরা তো চালু যন্ত্র নিয়েই এসেছি; কিন্তু ভাই, প্রথম কে চালু করেছিলেন। দেখলুম, বরফ দিয়ে বন্ধ করা যায়, আবার বিদ্যুৎ দিয়ে চালু করা যায়, তা হলে কে তিনি?'

বড়মামা তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে, সাধকের মতো দু'হাত তুলে বললেন, 'এই সত্যটাই জানতে চাই, রাতের পর রাত তাই জেগে থাকি। জানতে চাই, কে আমি!'

মেজোমামা তাঁর উদাত্ত গলায় বলে উঠলেন ঃ

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী' পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা—
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা ॥

এই মেজোমামার কাছে আমি আবৃত্তি শিখে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি। মেজোমামা খুব ভাল অভিনয় করতেন কলেজে। শেক্সপিয়রের নাটকে। সুইমিং চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। বড়মামা মাঝে-মাঝেই বলেন, মেজো আমার গর্ব।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'বড়দা, ডায়েরিতে কী লেখা ছিল আমাদেরও বলা যাবে না?'

'দ্যাখো, ডায়রিতে বাবা আমাকে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবাই আমার গুরু। একটা কাগজের মোড়কে ছিল বীজমন্ত্র। ডায়েরিতে ছিল নির্দেশ। আমার জীবনের পথটা তিনি এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বরফের ধ্যান করবে। বলেছিলেন, রাতকে আপন করে নেবে। বলেছিলেন, বাঘ যেমন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকে, সত্যও সেইরকম অন্ধকারে থাকে। তিনটে জিনিস মানতে বলেছিলেন, নারীর অঙ্গ স্পর্শ করবে না, আরতি লঙ্ঘন করবে না, মিথ্যা বলবে না।'

মাসিমা বললেন, 'আরতি লঙ্ঘনের মানে?'

'ধর যদি দেখিস কোনও মন্দিরে আরতি হচ্ছে, যত তাড়াই থাক একটু দাঁড়িয়ে প্রণাম করে যাবি।'

'আর কী লেখা ছিল?'

'লেখা ছিল, চণ্ডীমণ্ডপের তলার চোরকুঠুরিতে ভয়ঙ্কর একটা জিনিস আছে, যেটা পেলে, যে পাবে তার অদ্ভুত একটা শক্তি আসবে, পাওয়ার। সে যা ইচ্ছে করবে তাই হবে।'

'সেটা কী?'

'জানি না।'

'তুমি অনুসন্ধান করোনি?'

'কী করে করব! এক ঝড়ের রাতে মণ্ডপটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। স্তূপাকার। জঙ্গল। কার সাহস হবে ওখানে যাওয়ার!'

'জীবনের পথ কী বলেছেন?'

'কর্তব্য। দেশ স্বাধীন হল, দেশ ভাগ হল, আমাদের জায়গাজমি সব জবরদখল হয়ে গেল। সুবিধাবাদীরা গদিতে বসল। এই গ্রামের এক ধান্দাবাজ, ইংরেজের ইনফরমার মন্ত্রী

হয়ে গেল। বিপ্লবীদের স্থান হল না। দশমীর সন্ধেবেলা বাবা মারা গেলেন। শ্মশানে মুখাগ্নি করছি, ওদিকে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। মা পাগল হয়ে গেলেন। ষোলো বছরের আমি। সংসারের দিকে তাকালাম। দুই বোন, এক ভাই, অপ্রকৃতিস্থ মা। তিন মাস স্বাভাবিক, ন'মাস অস্বাভাবিক। ডায়েরিতে লেখা, কর্তব্য। মামলা, দেনা জ্ঞাতি-শত্রুতা। ঘুম চলে গেল। সেই থেকে আমি রাতজাগা প্রাণী। প্যাঁচা আমার বন্ধু। সাহস করে একদিন চোরকুঠুরিতে নামলাম।'

মাসিমা বললেন, 'এই যে বললে অনুসন্ধান করোনি!'

'আমি করিনি বলিনি, আমি প্রশ্ন রেখেছি, কী করে করব! তার মানে এই নয় আমি করিনি। আমি তোদের সাসপেন্সে রেখেছি।'

চটপট, চটপট কয়েক ফোঁটা জল আমাদের গায়ে পড়ল। আমরা সবাই আকাশের দিকে তাকালুম। কোথাও কিছু নেই। হাহাকার ফাঁকা। বড়মামা বললেন, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই, মাঝে-মাঝে মেঘ ছাড়াই আকাশ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ে শিশিরবিন্দুর মতো। একেই বোধ হয় বলে স্বাতী নক্ষত্রের জল। ঝিনুক জানে। কপ করে গিলে নিলেই মুক্তো। কে যেন বলেছিল, একটি-একটি শিশির কণায় ধানের গর্ভে চাল আসে।'

বাতাস একটু ভিজে-ভিজে। মাসিমা তাঁর শাড়ির আঁচলটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। পাছে ঠাণ্ডা লেগে যায়। আঁচলে সুন্দর ধূপের গন্ধ। মাসিমা কাপড়ের আলমারিতে ধূপের খালি প্যাকেট রাখেন, সুবাসিত হবে বলে। মাসিমা উদ্‌গ্রীব, চোরকুঠুরি থেকে বড়মামা কী পেলেন, 'কী পেলে তুমি?'

'ধপাস করে তো নীচে গিয়ে পড়লুম। মড়াক রে একটা শব্দ হল। ভাবলাম ঠ্যাংটা ভাঙল বুঝি। পাঁচ সেলের টর্চটা জ্বাললাম। কিসের ওপর পা পড়ল দেখি। শুকনো একটা গাছের ডাল। বিজবিজ করে উইপোকা বেরোচ্ছে। অজস্র ইঁদুর চারদিকে দৌড়চ্ছে চিক-চ্যাঁক করে। টর্চের আলোয় তাদের বিন্দু বিন্দু চোখ হিরের মতো জ্বলছে। ওপর থেকে নেমে এসেছে ঘন কালো ঝুল। বিরাট-বিরাট মাকড়সা দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘাপটি মেরে আছে। অনেকটা দূরে দেখি ডাইনির চুলের মতো কী ঝুলছে. জায়গাটায় ঘুরপাক খাচ্ছে নীল বাষ্প। পরে আবিষ্কার করলাম, ওপরের কোনও বড় গাছ, যাকে বলে বৃক্ষ, শিকড় নামিয়ে দিয়েছে। থেকে-থেকে শিসের শব্দ। প্রথমে ভেবেছিলাম, বড় কোনও সাপ। গোখরো অথবা তক্ষক। পরে বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝলাম বাতাস, নানা ফুটো দিয়ে সাঁই-সাঁই করে ঢুকছে। অনুসন্ধান করব কী! ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণীদের জ্বালায় পালাই-পালাই অবস্থা। সেই সময় হঠাৎ যেন নির্দেশ এল, সামনে দশ পা এগোও। এইবার ডান দিকে তাকাও একটু ওপরে। তাকাতেই মনে হল, সেখানে একটা খুপরি আছে। লুজ একটা ইট। সাহস করে ইটটা টানতেই প্রথমে খানিক ধুলো বেরোল ঝুরঝুর করে। পায়ের ওপর সব জমা হল। ভয় করছে, ফ্যাঁস করে সাপ না বেরোয়! টর্চ মারলুম। বেশ গভীর। কাঁধ পর্যন্ত হাত ঢুকে যাবে। প্রথমে-হাত্ পা ঢুকিয়ে গাছের সেই ভাঙা ডালটা সাঁদ করালাম। মনে হল কিছু একটা আছে, শুধু আছে না, ঠেললে সরে যাচ্ছে। তখন 'জয় মা' বলে ঢোকালাম হাত। বার করে আনলাম জংধরা একটা লোহার বাক্স। একটু টানাটানিতেই ঢাকনাটা উপড়ে চলে এল হাতে। আলো ফেলতেই ভয়ে হাড় হিম। গুটিয়ে পাকিয়ে রয়েছে সাপের একটা কঙ্কাল। ভয়ে তিন লাফ। কিছুক্ষণ ভাবলাম। আবার নির্দেশ, সাহস করে জিনিসটা তোলো। তবু সাহস হচ্ছে না। অনেকক্ষণ থম মেরে রইলাম। দেওয়ালের ভয়ঙ্কর মাকড়সাগুলো হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে খিড়খিড় করে নাচানাচি শুরু করল। দু-একটা লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে। বাতাসের সিঁসিঁ ভীষণ বেড়ে গেল। গাছের ঝুলো শেকড়গুলো হিলহিল করে উঠল। আবার, যা থাকে বরাতে—দু' আঙুল দিয়ে জিনিসটাকে টেনে তুললাম। আঃ, কী সুন্দর!'

বড়মামা হঠাৎ থেমে গেলেন। আকাশে সেই ভোরের তারাটা মুকুটের কোহিনুরের মতো জ্বলজ্বল করছে। সমস্ত প্যাঁচা রাত শেষ হবে বলে সমস্বরে ডেকে উঠল, চলো, ভাই শুতে যাই, বিশ্রী দিন ওই আসছে। কর্কশ, ঘসঘস, গোলমাল, চিৎকার, মানুষেরা এইবার জাগছে।

মাসিমা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হঠাৎ, হঠাৎ থেমে পড়াটাই তোমার রোগ। ব্যাটারি ডাউন, গাড়ির মতো। তারপর বলো, কী হল তারপর!'

বড়মামা বললেন, 'আর তো শোনার কিছু নেই। এইবার যা তা দেখার। জিনিসটা তোদের দেখাব।'

'কবে?'

'আজই। ভোরের নীল আলোয়। দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবি, গ্যারাণ্টি।'

॥ ৩ ॥

আকাশে আলোর ডানা। সত্যিই ডানা। রাজহাঁসের পালকের মতো শিল্পীর তুলিতে আঁকা নিখুঁত একটু মেঘ। যেন মা-সরস্বতী তাঁর হাতের কলমটি সুপ্রভাত লিখে ভাসিয়ে দিয়েছেন পুব আকাশে! ধারে-ধারে লাল রং! তিনি আসছেন নতুন একটি দিনের ঘোষণাপত্র হাতে নিয়ে।

বড়মামা হাঁক পাড়লেন, 'হরিদা।' সঙ্গে-সঙ্গে জাহিরুলদের বাড়ির মুরগি ডেকে উঠল,

কোঁকোর কোঁ। ওদিকে সিদ্ধেশ্বরীতলায় মঙ্গলারতি শুরু হয়ে গেল। শুকতারা আকাশের গায়ে অস্পষ্ট একটা টিপ।

হরিদা আমাদের ম্যানেজার কাম অভিভাবক কাম সব কিছু। ত্রিভুবনে নেই কেউ। এই বাড়িকেই নিজের বাড়ি করে নিয়েছেন। আমরাই তাঁর সব। তবে শোনা যায়, হরিদা খুব বড় পরিবারের মানুষ। বিরাট জমিদার ফ্যামিলির ছেলে। বিষয়-সম্পত্তির লোভে হরিদার বাবাকে বিষ দিয়ে খুন করা হয়েছিল। হরিদার মাকে সাপে কামড়েছিল, সেও এক সমাধানহীন রহস্য। হরিদা সেই শৈশবেই এক সাঁওতাল পরিবারের আশ্রিত হয়েছিলেন। জঙ্গলে মানুষ। সেই পালকপিতা ছিলেন এক সেরা গুনিন। হরিদা তাঁর কাছ থেকে অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করছেন। ঘড়ি ছাড়াই বলতে পারেন ঠিক-ঠিক ক'টা বেজেছে। কাক কী বলছে তিনি বোঝেন। এক মুঠো ধুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে দিতে পারেন দিনটা কেমন যাবে। মুখ দেখে বলে দিতে পারেন শরীরের কোথায় গোলযোগ। আরও, আরও অনেক কিছু। পরিষ্কার একটা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরেন। গায়ে হাফশার্ট। অঙ্কে ভীষণ পাকা। শিবঠাকুরের পরম ভক্ত। কত বয়েস, তবু ভীষণ ফিট। ওষুধ হল গাছপাতা, শিকড়বাকড়। সংস্কৃত স্তোত্র যখন সুরে আবৃত্তি করেন, বাড়িটা ঋষির আশ্রম হয়ে যায়। খুব ভাল রাঁধতে পারেন। হরিদা সকালের দাদা, পরামর্শদাতা। গরিবের চিকিৎসক। চিকিৎসায় অসুখ অবশ্যই সারে। বড়মামা হরিদাকে স্পেশ্যাল একটা ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। গান শুনতে ভালবাসেন বলে একটা মিউজিক সিস্টেম কিনে দিয়েছেন।

হরিদা এসে দাঁড়ালেন। এরই মধ্যে চানটান করে টিপটপ। এইটাই তাঁর অভ্যাস। পুকুরের জলে আলো যেই ফুটল, শালুকের পাপড়ি যেই খুলল, যেই ফুটল টগর, মাথায় ফুল দিয়ে হরিদা ডুব দেবেন জলে, ফুলগুলো সব ভেসে-ভেসে চলে যাবে জলের আন্দোলনে। একটা-একটা করে হাঁস ভারিক্কি চালে জলে নামবে। মন্দিরের ত্রিশূলে বসে দোয়েল ধরবে তান। হরিদা উদাত্ত গলায় পাঠ করবেন গায়ত্রীমন্ত্র। এই সময়টাকেই বলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

বড়মামা বললেন, 'দাদা, রাতটা কাল ছাতেই কাটল, এইবার বারান্দায় বসে একটু চা সেবন।'

'সব রেডি, নামলেই হয়।'

আমরা খুব দুঃখ-দুঃখ মুখে আকাশের দিকে তাকালাম। রাতের রহস্য-উপন্যাস যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। ডিমের কুসুমের মতো সূর্য ক্ষণকাল পুবদিগন্তে অবস্থান করে চড়চড় করে মধ্যগগনে উঠে পড়বে আগুনের গোলার মতো। সবকিছু এত স্পষ্ট হবে, উত্তাপ এত অসহ্য হবে যে, ভাল লাগবে না। নিজেকে মনে হবে জোয়াল পরানো বলদ।

সাবিত্রীদি আমাদের বাড়িতে সর্বক্ষণ থাকেন। তাঁর জীবন সবচেয়ে দুঃখের, তাই তিনি সবচেয়ে আনন্দে থাকেন। সদাই যেন নাচছেন। চকচকে মুখে সবসময় ঝকঝকে হাসি। বড়মামা পাটনা স্টেশন থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। মাসিমার ট্রেনিং-এ একেবারে

চোস্ত। নাচতে ভালবাসেন বসে মাসিমা নাচ শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকদের খুব হিংসে। তারা বলে, পাঁচিলের এপারে নিজেদের জগতে সব বেশ আছে। ক'দিন থাকবে রে বাপ! চিরদিন কি সমান যায়। পতন একদিন হবেই হবে। কারও ক্ষমতা নেই ঠেকায়। মাসিমাকে সবাই মেমসায়েব বলে ব্যঙ্গ করে। বলে, 'মেমসায়েব যেন ইউরোপ আমেরিকা তৈরি করে ফিরিঙ্গিনি সেজেছে।'

বিশাল ট্রেতে সাজানো কাপ, টিপট বাহারি, এক প্লেট বিস্কিট। মার্বেল পাথরের টেবিলে নামিয়ে রেখে সাবিত্রীদি বললেন, 'গুড মর্নিং।'

আমরা সমস্বরে বললাম, 'মর্নিং।'

সাবিত্রীদি পদ্মের ডাঁটার মতো দীর্ঘ হাত দুটো জড়ানো সাপের ভঙ্গিতে ওপর দিকে তুলে নমস্কার করলেন পুব আকাশের সূর্যকে। অপূর্ব ভঙ্গি। 'হ্যাভ টি', বলে চলে গেলেন। দিনটাকে ভাল করে শুরু করতে হয়। তারপর যা হয় হোক। এই সেই শুরু।

হরিদা বললেন, 'ঝট করে মুখ ধুয়ে এসো। বাসী মুখে চা আমি অ্যালাউ করব না।'

ভিজে-ভিজে মুখে আমরা ফিরে এসে যে যার জায়গায় বসলুম। গভীর বারান্দা। সাবেক

আমলের জাফরি। তরুণ তপনের কিরণ বিপরীত দেওয়ালে নকশা এঁকেছে। সার-সার অর্কিডের টব। সামনের গাবগাছে সাদা একটা বক বসে-বসে প্ল্যান করছে, কোন পুকুরে যাবে আজ। হরিদা কাপে-কাপে চা ঢালছেন। মাসিমা রোজই বলেন, আমি ঢালি। আজও বললেন। হরিদার সেই একই উত্তর, 'যেদিন আমার হাত কাঁপবে।' বড়মামার তিনটে কাক, আমরা বলি কাকত্রয়ী, ঠিক এসে গেছে। বড়মামার হাত থেকে তিনজনে তিনখানা বিস্কুট ঠোঁটে নিয়ে সাট-সাট উড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই পরিচিত কাশির শব্দ। নেপালবাবু। প্রবীণ শিক্ষক। কেউ কোথাও নেই। ভাঙা একটা বাড়িতে থাকেন। ছেলেরা বিরাট চাকুরে, প্রবাসী। বৃদ্ধ একা কমা দিয়ে যাচ্ছেন, একদিন ফুলস্টপ বসিয়ে দেবেন। কষ্ট দেখে বড়মামা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, চা, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব এখানে। 'মর্নিং টি'-র জন্য আসছেন। সাবিত্রীদি ম্যানেজ করবেন। ইংরেজির নামকরা শিক্ষক। সাবিত্রীদির সঙ্গে একটা কথাও বাংলায় হবে না। দু'পক্ষই ইংরেজি চালাবেন। ভুল বললে মাস্টারমশাই শুধরে দেবেন। রাতের খাবার আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। নোনাধরা ভাঙা বাড়ির দোতলায় বড় একটা লাইব্রেরি আছে। ভাল-ভাল বই। আমুণ্ডসেনের আণ্টার্টিক অভিযান। এভারেস্ট অভিযান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। ডেভিড লিভিংস্টোনের ডার্কেস্ট আফ্রিকা। ভলক্যানো। কত কী? বলেছেন, 'খোকা! তুই এত সেবা করিস, তোকে সব দিয়ে যাব। জীবনে লেখাপড়ার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই।'

বড়মামা বললেন, 'এইবার তা হলে সেইটা। ওয়াণ্ডার অব ওয়াণ্ডার্স।'

বড়মামা বারান্দার একেবারে শেষ ঘরটায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই ঘর থেকে আদেশ এল, 'ক্লোজ ইওর আইজ।'

আমরা চোখ বোজালাম। পায়ের শব্দে বুঝতে পারছি বড়মামা আসছেন। শ্বেতপাথরের টেবিলের কাছে এসে গেছেন। কিছু একটা রাখার শব্দ হল।

'ওপ্ন ইওর আইজ।'

এ কী! এমন জিনিস জীবনে দেখিনি। ছোট-ছোট সমান মাপের হাড় দিয়ে তৈরি একটা বেল্ট। প্রতিটি হাড়ের মাঝখানে একটা করে ঝকঝকে লাল পাথর বসানো। বকলসটা ড্রাগনের মুখ। সেখানে সমান দূরত্বে ছোট-ছোট নীল পাথর।

বড়মামা বললেন, 'লালগুলো সব বহুমূল্য রুবি, আর নীলগুলো নীলা।'

আমরা সবাই ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লুম। এমন অপূর্ব জিনিস অতীতে দেখিনি কখনও। ভবিষ্যতেও দেখব বলে মনে হয় না। মন মনে-মনেই বলছে, কী সুন্দর, কী সুন্দর! স্পর্শ করার সাহস হচ্ছে না। ভয় এবং ঘেন্না। কিসের হাড় কে জানে!

হরিদা ভাল করে দেখে, সোজা হয়ে বললেন, 'আমার সামান্য জ্ঞান থেকে যা মনে হচ্ছে, এটা চিন দেশের।'

মেজোমামা বললেন, 'এটা তো ওই ড্রাগনটা দেখলেই বোঝা যায়।'

হরিদা বললেন, 'এই ব্যাপারে আমার আরও একটু লেখাপড়া করা আছে। এটা শাং ডাইন্যাস্টির জিনিস। তোমরা যে যার জায়গায় বসে পড়ো, আমি ঝট করে তোমাদের মতো জ্ঞানীদের একটু জ্ঞান দিয়ে যাই। জিনিসটা আমি বিলক্ষণ চিনতে পেরেছি। বেশি না, তোমাদের হাজার ছয়েক বছর পেছোতে হবে। তবে আরও দু' হাজার বছর এগিয়ে এসে চার হাজার বছর থেকেই শুরু করব।'

বড়মামা বললেন, 'পিপাসা।'

মেজোমামা বললেন, 'হ্যাং ইওর পিপাসা। এখন একমাত্র পিপাসা হল জ্ঞানের পিপাসা। থার্স্ট ফর নলেজ।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে চা এখন থাক।'

মেজোমামা বললেন, 'চা! আরে চা তো লিকুইড নলেজ। সৃষ্টির কাজ শেষ করে হাত ধুতে-ধুতে ভগবান বললেন, 'নাও, আই উইল সেটল ফর এ কাপ অব টি। ইংরেজ শুনল টি, বাঙালি শুনল চা, হিন্দুস্থানিরা শুনল চায়ে।'

মাসিমা বললেন, 'তা হলে ঢালি।'

হরিদা বললেন, 'আমি একটু খাব।'

মেজোমামা কারেকশান করলেন, 'পান করব।'

কুলকুল করে সোনালি রঙের চা ঝরনাধারায় নামতে লাগল স্বচ্ছ সুন্দর কাপে। আর তখনই সাবিত্রীদি নীচে থেকে বলল, 'বড়দা, মাস্টারমশাই ওয়ান্টস টু সি ইউ।'

বড়মামা তাড়াতাড়ি বাস্কেটে জিনিসটা ভরতে-ভরতে বললেন, 'দয়া করে ওপরে আসবেন।'

মাস্টারমশাই আসছেন। পায়ের শব্দ। ধীরে-ধীরে উঠছেন। চুড়ির শব্দ। তার মানে সাবিত্রীদি ধরে-ধরে আনছে। শার্লক হোম্‌স হতে আর বিলম্ব নাই! আমরা সবাই ভালমানুষের মতো মুখ করে বসে আছি। মাস্টারমশাই প্রায় ছ'ফুট লম্বা। সামনে সামান্য ঝুঁকে আছেন। একমাথা পাকা চুল। টকটকে ফরসা। বনেদি ঘরের মানুষ।

চেয়ারে বসে দু' কদম কাশলেন। ভাল করে সকলকে দেখে নিলেন একবার, 'যাক তোমরা সকলে ভাল আছ দেখে ভালই লাগছে। সৎচিন্তায় মানুষ ভালই থাকে। শোনো ডাক্তার, আমি একটা কাজের কথা বলি। আমাদের ঠাকুরদালানটা তুমি দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাড়িটা আমি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দুটো প্লট করে, একটা বেচে দেব, আর সেই টাকায় নিজের জন্যে ছোট্ট একটা বাংলো তৈরি করব।'

'সুন্দর সিদ্ধান্ত। যতদিন না বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, ততদিন আপনি আমাদের সম্মানিত গেস্ট।'

মাস্টারমশাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। ছানিপড়া বড়-বড় চোখ দুটো জল-টলটলে হচ্ছে। আবেগে শরীর কাঁপছে।

আবেগটা কেটে যেতেই গলা পরিষ্কার করে মাস্টারমশাই বললেন, 'তোমরা ভাল, তোমরা যে এত ভাল তা জানতাম না। তোমরা ভিন্নগ্রহের মানুষ। মনে আছে ডাক্তার, তোমাদের আমি অস্কার ওয়াইল্ডের 'হ্যাপি প্রিন্স' পড়াতাম। মনে পড়ে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই পড়ানো কি ভোলা যায়!'

'সোয়ালো, সোয়ালো, আমি দেখতে পাচ্ছি, দূরে, বহু দূরে গরিবের একটি কুটির। One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worm, and she has a coarse, redhands, all pricked by the needle far she is a Seamstren. রানির প্রধান পরিচারিকার নাচের পোশাকে এমব্রয়ডারি করছে। খাবার নেই, আগুন নেই, ছেলেটা খিদেয় কাঁদছে। সোয়ালো, তুমি আমার তলোয়ালের হাতলে যে বহুমূল্য রুবিটা রয়েছে সেইটা খুলে ওকে দিয়ে এসো। কিছুদিন তবু চলবে। এইভাবে সোয়ালোকে দিয়ে প্রিন্স তার সবকিছু দান করে দিল গরিবদের। সোনার আস্তরণ, চোখের মণি। মেয়র একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সোনার মূর্তি সিসের হয়ে গেছে। পায়ের তলায় মরে পড়ে আছে ছোট্ট সোয়ালো। মূর্তি উৎপাটিত।

আগুনে দেওয়া হল ধাতুটাকে উদ্ধার করে নেওয়ার জন্যে। সব গলে গেল, গলল না তার হৃদয়টি। মনে পড়ে সেই শেষ লাইন ক'টা।

• Bring me the two most precious things in the city—said the God to one of His Angels; and the Angel brought Him the leader heart and the dead bird.

You have rightly chosen—said God,—far in my garden of Paradise this little bird shall sing for evermore, and in my city of Glod the Happy Prince shall praise me.

'ডাক্তার, তোমার হৃদয়টা ওই প্রিন্সের হৃদয়।'

'মাস্টারমশাই, আপনার সব মুখস্থ।'

'ভাল যা কিছু সব আমি স্মৃতিতে ধরে রাখি। শোনো ডাক্তার, আমি আশ্রয়ের জন্যে আসিনি। আমি এসেছি তোমাকে কিছু দিতে, যদি অনুগ্রহ করে নাও।'

'কী জিনিস মাস্টারমশাই!'

'ঠাকুরদালানের বিরাট মেঝেটা ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের। দু'রকমের, সাদা আর কালো। তাঁদের পয়সা ছিল। তুমি ওই পাথরগুলো সব নিয়ে এসো তোমার লোক দিয়ে।'

'কত দাম হবে মাস্টারমশাই?'

'এক পয়সাও না।'

বিস্ময়ে বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল। এইবার তাঁর চোখে জল।

'কাল থেকেই শুরু করিয়ে দাও।'

মাস্টারমশাই ধীরে-ধীরে, পা টেনে-টেনে চলে গেলেন।

বড়মামা অভিভূতের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! এইটাকে যখনই আমি বের করি, তখনই ভয়ঙ্কর রকমের ভাল একটা কিছু ঘটে। এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। কুসি, কাল তোকে বলেছিলুম, এই বাড়িতে মার্বেল আসছেই আসছে।'

হরিদা বললেন, 'ওটা এমন একটা অঞ্চলের জিনিস, যে অঞ্চলের মাটিতে জাদু আছে।'

বড়মামা বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললে, 'বলুন বলুন, শুনি, আর বেশি সময় নেই। লাফিং ক্লাব হয়ে আমাকে চেম্বারে যেতে হবে।'

হরিদা শুরু করলেন, 'চিন ভুখণ্ডের ঠিক মাঝখানের অঞ্চলটিকে এখন বলা হয় হেনান। চার হাজার বছর আগে নাম ছিল, য়ু ঝাও। পশ্চিম থেকে পুবে ঢালু একটি প্রদেশ। তিন দিকে পাহাড়, পশ্চিমে ঝিয়াও আর ফুনিউ পর্বতমালা, দক্ষিণে থংবো আর দাবিয়ে পাহাড়, আর উত্তরে তাইহান। আর পুব দিক দিয়ে ভীমবেগে ছুটে চলেছে চিনের বিখ্যাত হলুদ নদী হুয়াংহে, সঙ্গে দোসর হুয়েহে। এই হেনানেই থাকতেন সেই বিখ্যাত মানুষটি, চিনের রূপকথায় যাঁর নাম, দি ফুলিশ ওল্ড ম্যান।'

হরিদা চা খেলেন এক চুমুক, তারপর শুরু করলেন, 'Long long ago there lived a foolish old man. বৃদ্ধের বাড়ির সামনে আকাশছোঁয়া দুটি পাহাড়, তাইহান আর ওয়াংয়ু। আকাশ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ও-পাশের কোনও কিছুই দেখা যায় না। বৃদ্ধ তার ছেলেদের ডেকে বললে, আয়, আমাকে একটু সাহায্য কর। পাহাড় দুটোকে এখান থেকে সরাব। শুরু হয়ে গেল খোঁড়া। গর্ত করে পাহাড় দুটোকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে বোকা বুড়ো। দিনরাত তারা খুঁড়ছে আর খুঁড়ছে। মানুষ বলছে, দ্যাখো, বোকাটার কী বুদ্ধি! কিন্তু, স্বয়ং ভগবান যখন জানতে পারলেন, তখন একেবারে অভিভূত! মানুষটার কী জেদ, কী কঠিন তার সঙ্কল্প! ভগবান তাঁর দুই দেবদূতকে ডেকে বললেন, 'যাও, পাহাড় দুটোকে একেবারে উত্তরে সরিয়ে দিয়ে এসো।' রাতের অন্ধকারে দেবদূত দু'জন পাহাড় দুটো পিঠে নিয়ে উড়ে গেলেন উত্তরে। এই কাহিনী ছড়িয়ে গেল ঘরে-ঘরে। পরে, আধুনিককালে এর ব্যাখ্যা হল, ইচ্ছে থাকলে, উদ্যোগী হলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এই হুয়াংহে নদীতে আধুনিক চিন বাঁধ তৈরি করে। খরস্রোতা এই ত্রিধারার জলকে সেচের কাজে লাগিয়ে কী ফসলই না ফলাচ্ছে। এই হেনানের মাঝখানে আছে বিখ্যাত, পবিত্র পঞ্চ পাহাড়ের একটি—মাউণ্ট সং। এই পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে আছে হাজার বছরের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সংগিয়াং। আর একেবারে পাদদেশে আছে সেই বিখ্যাত মন্দির, শাওলিন, যেখানে ক্যারাটে আর কুংফুর চর্চা হয়। শাং ডাইনাস্টিতে এইখানে স্থাপিত

হয়েছিল দাস রাজ্য। হেনানের উত্তরে ছিল তার রাজধানী—জিন। পুরাতত্ত্ববিদরা ঝিয়াউটানে এক্সকাভেশন চালিয়ে সেই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। দশ হাজারের মতো অপূর্ব-অপূর্ব সব শিল্পনিদর্শন উদ্ধার করা গেছে। বেরিয়েছে হাড়ের কাজ, কচ্ছপের খোল কেটে তৈরি শিল্পকর্ম। বেরিয়েছে প্রাচীনতম অক্ষরে কচ্ছপের খোলের ওপর লেখা পুঁথি। সেকালের মানুষের জ্যোতির্বিদ্যা, ক্যালেণ্ডার, আবহাওয়াতত্ত্ব এবং শিল্পচর্চার লিখিত ইতিহাস। ব্রোঞ্জের পাত্র বেরিয়েছে নানারকম আর পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের তৈরি আটশো

পঁচাত্তর কিলোগ্রাম ওজনের চার চৌকো, চার পায়াঅলা একটি ধূপদান বা ধুনুচি। অসাধারণ তার কারুকার্য। চারপাশে ড্রাগন। তোমার ওই হাড়ের বেল্টটা প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন। শাং ডাইনাস্টির জিনিস। কচ্ছপের খোলা কেটে তৈরি। হয়তো কোনও রাজকুমারীর কোমরবন্ধনী। তোমার কাছে ওটা আছে কেউ যেন কোনওভাবেই জানতে না পারে। লণ্ডনে সুদবির অকশনে নিয়ে গেলে কোটি টাকা দাম উঠবে। যারা ট্রেজার হাণ্টার তারা

জানতে পারলে তোমাকে খুন করবে। ওই বেল্টে ম্যজিক্যাল পাওয়ার, অকাল্ট, স্পিরিচুয়াল পাওয়ার, সবই থাকতে পারে। ওই জগতের কুলকিনারা নেই।'

বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল ভয়ে। বললেন, 'এইটা পাওয়ার পর থেকে আমাদের ভাগ্য ফিরেছে। এটাকে এখন কাছছাড়া করি কী করে!'

বড়মামা অসহায়ের মতো আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

॥ ৪ ॥

মোহনদার দোকানের সামনে সাইকেল থেকে নামলেন। নামলাম বললে ভুল হবে। কারণ, সাইকেল থেকে আমি বেশ কায়দা করে নামতে পারি না। আমার সপাটে পতন হল। মোহনদার দোকানের নাম, প্রমথ বিল্ডার্স। মোহনদা কাচের গেলাসে চা খাচ্ছিলেন। সাইকেল থেকে আমার নামার রকম দেখে জটায়ুর মতো হেসে উঠলেন। কয়েক মাস হল শিখেছি। ওঠা আর নামাটায় এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। হরিদা বলেছেন, ও হতে-হতে হয়ে যাবে। কয়েকবার মোক্ষম ধরনের পতন না হলে সাইকেলকে ঠিক চেনা যায় না।

মোহনদার হাসি দেখে ভীষণ রাগ হল। রাগ-রাগ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আলমদা কোথায়?' রেগে গেছি বুঝতে পেরেছেন। হাসতে-হাসতে বললেন, 'ডাক্তারবাবুর সাইকেল?'

'হ্যাঁ!'

'তোমার বড়মামা যত বিদঘুটে জিনিস কেনেন। একটা কোম্পানি প্রথম এই মডেল বের করেছিল। বিরাট উঁচু। ছ' ফুট না হলে পা পাবে না। তোমার ছ' ফুট হতে আর কতটা বাকি?'

'দু'ফুট।'

'ও হয়ে যাবে। এই তো তোমার বাড়ের বয়েস, চড়চড়িয়ে বেড়ে যাবে। ওই তোমার আলম আসছে। শুনলাম তোমার বড়মামা পাহাড় কিনেছেন! এইবার একটা সমুদ্র কিনতে বলো।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত রেগে যাও কেন, তোমার মামারা কত বড়লোক ছিলেন, সে আমার ঠাকুরদার কাছে শুনেছি। তোমার দাদুর বিশাল বড় কাঠের ব্যবসা ছিল বার্মায়। নিজেদের একটা জাহাজও ছিল। যা-তা ভেবো না ভাগনে! এই গোটা গ্রামটাই তোমাদের ছিল। এত রেগে যাও কেন! তোমার সঙ্গে একটু মজা করব না তো কার সঙ্গে করব?'

আলমদাকে বললাম, 'সাইকেলে উঠুন, বড়মামার তলব।'

'কে উঠবে?'

'আপনি।'

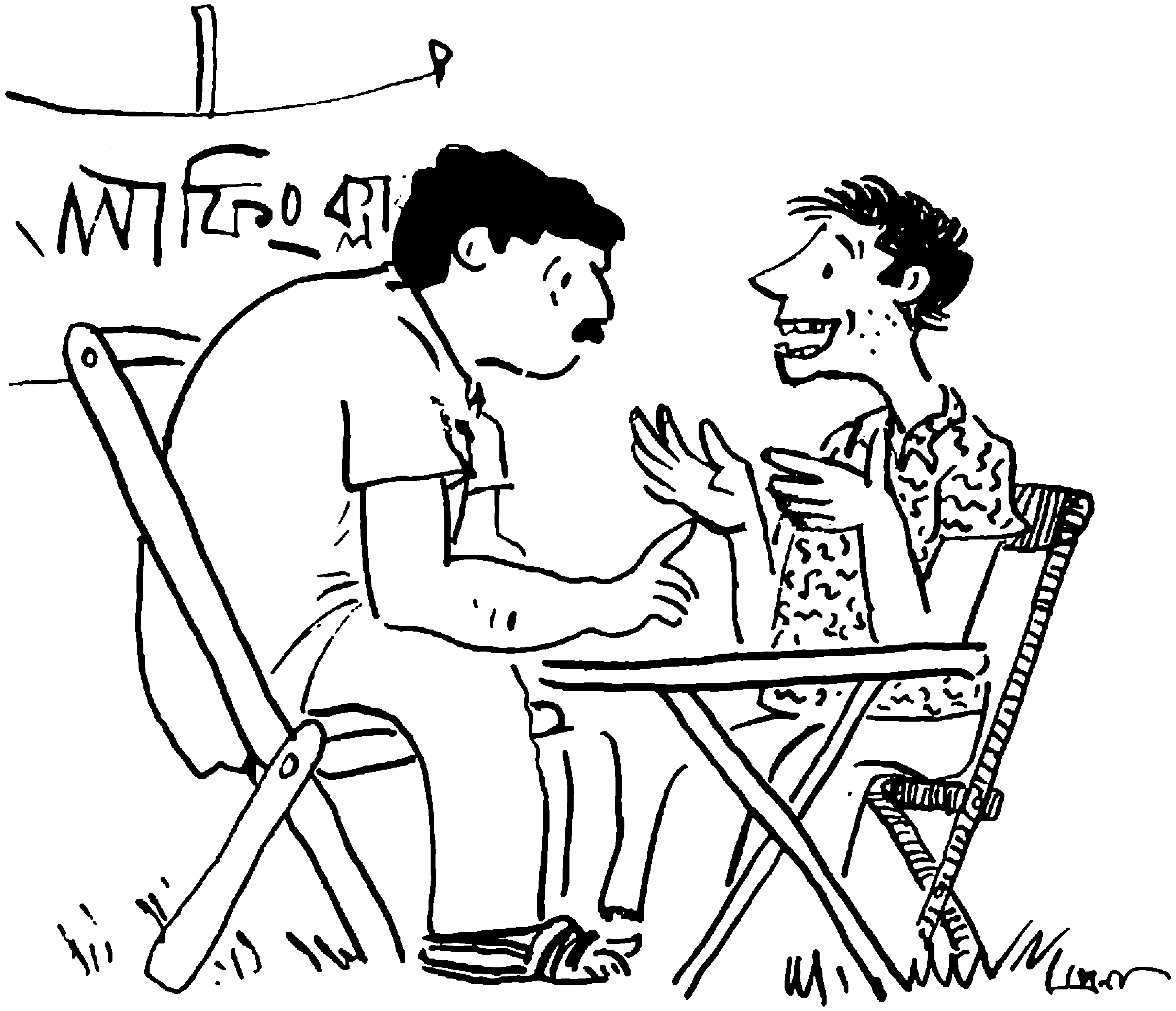

‘কোথায় উঠব?’

‘সিটে।’

‘তাই বলো। বড়মামা কোথায়?’

‘এই মুহূর্তে লাফিং ক্লাবে। সেইখানেই যেতে বলেছেন। ত্রাণনাথের মাঠে।’

‘পাগলের আখড়ায়!’ সাইকেল চালাতে-চালাতে আলমদা বললেন। আমি বসে আছি সামনের রডে। মাঠে ওরা খেটেখুটে খুব সুন্দর সবুজ ঘাস করেছে। ময়দানে যেমন ক্লাবটেণ্ট আছে, সেইরকম একটা সুন্দর টেণ্ট। একটা ফোল্ডিং টেবিল, একটা ফোল্ডিং চেয়ার। চেয়ারে বড়মামা। সাদা ট্রাউজার, সাদা স্পোর্ট্স শার্ট। আমরা যখন গেলাম, তখন বড়মামা একজনকে প্রশ্ন করছেন, আমরা শুনেছি, ‘আপনি কতদিন হাসছেন?’

‘সাতদিন। আজ নিয়ে আট।’

‘কোনও উন্নতি।’

‘কী উন্নতি, তা তো বলেননি।’

‘হুঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা, পাখির মতো হালকা লাগছে?’

'পাখি কীরকম হালকা তা তো জানি না সার।'
'সার নয়, দাদা, এটা সরকারি অফিস?'
'আজ্ঞে না।'
'আজ্ঞে বাদ।'
'ইয়েস সার!'
'আবার সার!'
'সার বাদ সার।'
'কোথায় কাজ করেন বলুন তো?'
'রাইটার্সে সার।'
'তুলোর মতো হালকা মনে হয় নিজেকে?'
'না।'
'শোলার মতো?'
'না সার।'
'থার্মোকলের মতো?'
'নো সার।'
'মাটির খালি কলসির মতো?'
'না সার।'
'তা হলে কতটা হালকা মনে হয়?'
'সিমেন্টের বস্তার মতো।'
'তা হলে উন্নতিটা কী হল?'
'হল না সার!'
'আচ্ছা, অন্য বিভাগে যাই। হজম কেমন হচ্ছে?'
'হচ্ছে না, খেতেই ইচ্ছে করে না।'
'মোটা হচ্ছেন কী করে?'
'পিতামাতার কৃপায়। একজন ছিলেন পর্বত, আর একজন পর্বতী।'
'ক' গেলাস জল খান?'
'ঢুক-ঢুক খাই, ক' গেলাস হয় বলতে পারব না।'
'ঘুম?'
'ভীষণ। পড়লুম কি মরলুম।'
'রাগ?'
'ভীষণ! মনে হয় সব ব্যাটাকে পেটাই।'
'গুন্‌গুন করে সব সময় গান গাইতে ইচ্ছে করে?'
'না, গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে।'

'কাকে?'

'আমার বাড়িঅলাকে।'

'পৃথিবীকে সুন্দর মনে হচ্ছে?'

'নরক।'

'বাঁচার ইচ্ছে বাড়ছে?'

'বাতের যন্ত্রণায় মরে গেলাম।'

'আপনাকে কোন ধরনের হাসি দেওয়া হয়েছে, হিহি, হাহা, হোহো, কোনটা?'

'হিহি তো মেয়েদের সার। আমার পাঁচ রাউণ্ড হাহা, তিন রাউণ্ড হোহো।'

'আমি লিখে দিচ্ছি, ওর সঙ্গে পাঁচ রাউণ্ড খ্যাখ্যা যোগ হবে।'

'একটু দেখিয়ে দেবেন না সার!'

'পঞ্চানন।'

বড়মামা আমাদের ইশারায় দাঁড়াতে বলেছিলেন। এতক্ষণের কাণ্ড দেখে আলমদা অনবরত হাসছিল। বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'হাসছ কেন?'

আলমদা বললেন, 'হাসির ক্লাবে হাসব না!'

'ঠিকই তো।'

বড়মামা মাঠে নামলেন। আমরা পেছনে। একজনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, বড়মামা প্রশ্ন করলেন, 'হাসছ না কেন? হাসছ না কেন?'

তিনি বললেন, 'হাসা উচিত নয়।'

বড়মামা বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে, প্রায় ধমকে উঠলেন, 'হাসা উচিত নয় কেন?'

'কাল আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন।'

বড়মামা হনহন করে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'আর পাঁচ মিনিট, কাতুকুতু সেকশনটা দেখলেই কাজ শেষ।'

ওইটুকু সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক বিভাগ দেখা হল, কাতুকুতু, গড়াগড়ি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসি, দেঁতো হাসি, হাসি কাশি। হাসি কাশি হল, যাঁরা হাসতে-হাসতে কাশিতে চলে যান, তারপর জল, পাখা, বুকে মালিশ।

বড়মামা মাঠের একপাশে এসে আলমসাহেবকে বললেন, 'তোমার ফুলটিম নিয়ে আজই চলে যাও মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে। ঠাকুর দালানের সমস্ত পাথর সাবধানে একটাও না ভেঙে তুলে ফেলো। আমাকে দান করেছেন।'

'ও তো খুব দামী পাথর!'

'জানি। রজভবনে আছে।'

ওপাশে পরিচালক তখনই হাঁকলেন, 'স্টার্ট, হাহা, ওয়ান, টু, থ্রি!'

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল, 'হাহা, হাঃ হা, হাহা।'

আমরা পালিয়ে বাঁচলাম। ওদিকে নারীবিভাগে হিহি। ডানপাশে একটা ব্যানারে লেখা রয়েছে স্লোগান, লাফ ফর লাইফ, লাফ ফর হেল্‌থ, লাফ ফর ওয়েল্‌থ, লাফ্‌টার দি বেস্ট মেডিসিন।'

॥ ৫ ॥

বড়মামাও এলেন মাস্টারমশাইয়ের ঠাকুরদালানে। চারপাশে অনেক গাছ, তার মাঝখানে তিনপাশ খোলা বিশাল সেই নাটমন্দির। যে দেওয়ালকে পেছনে রেখে মায়ের মূর্তি বসত, সেই দেওয়ালের অপূর্ব কারুকার্য এখনও কিছু-কিছু আছে। সবচেয়ে সুন্দর মেঝেটা। কিছুই যত্ন হয় না, তাও কী শোভা! সাদা, কালো ইতালিয়ান মার্বেলের চোখধাঁধানো কাজ।

বড়মামা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ফরমান দিলেন, 'আলম, এ জিনিস তোলা হবে না।'

'তা হলে?'

'তা হলে এইখানেই থাকবে। এই নাটমন্দির আমি সংস্কার করাব। ছাত আর কিছু-

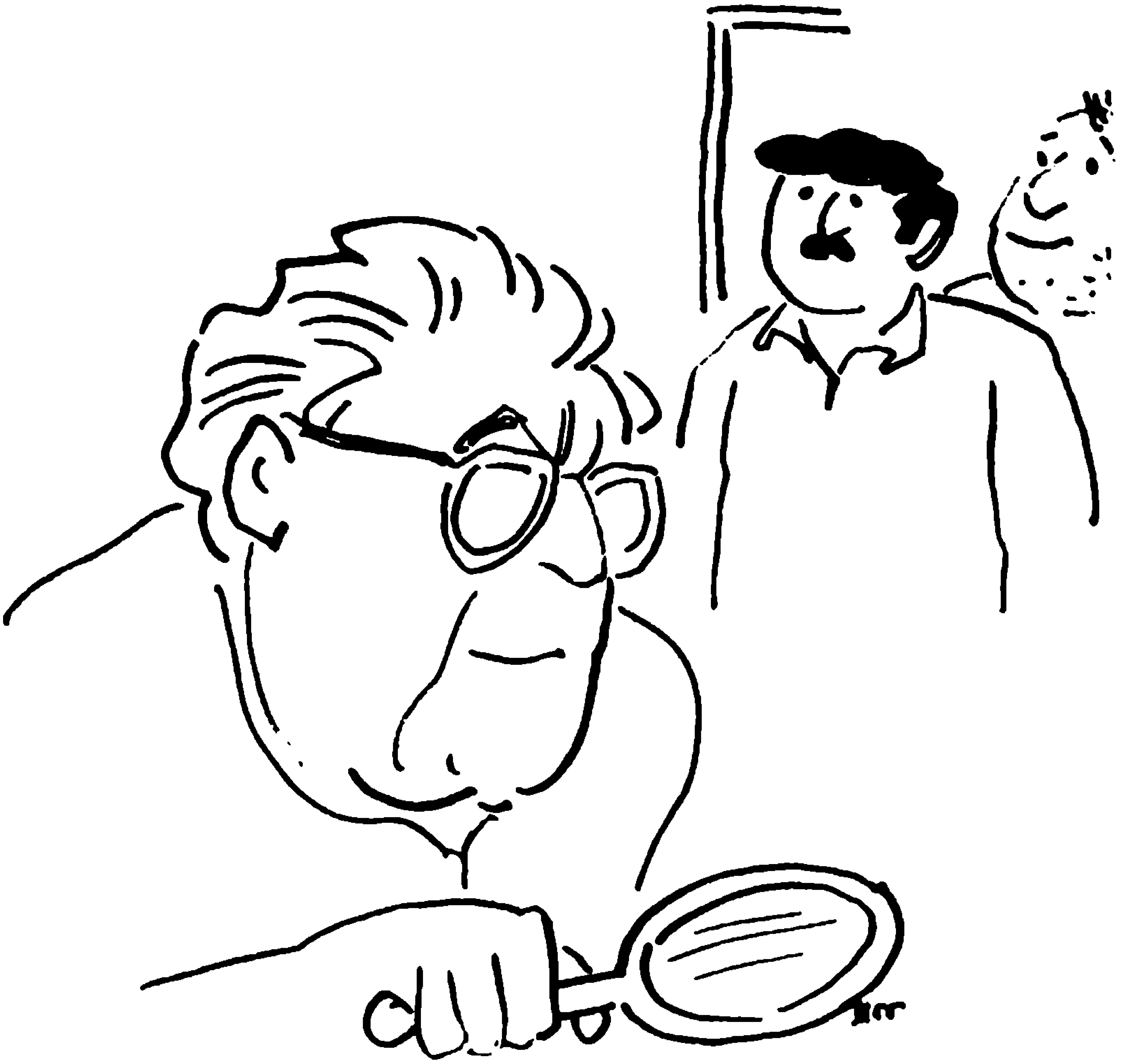

পিলার ড্যামেজ হয়েছে! এখানে আমি মহাপ্রভুর মূর্তি স্থাপন করব। এখানে হবে একালের শ্রেষ্ঠ পাঠবাড়ি। পাঠ হবে, সঙ্কীর্তন হবে। কী না হবে?'

'মাস্টারমশাইয়ের জিনিস, আপনি করার কে?'

'আমি কিনে নেব। এর ওপর কোনও কথা আছে!'

'না, নেই।'

'তুমি মেরামতির কাজে লেগে যাও। রথের দিন উদ্বোধন।'

'মূর্তি কোথায় পাবেন এত তাড়াতাড়ি!'

'সেটা আমার ব্যাপার, আমি বুঝব।'

'আমরা এখন তা হলে কী করব!'

'তুমি এইখানে বোসো। আমি পাকা কথাটা কয়ে আসি।'

মাস্টারমশাই নীচের বৈঠকখানায় বসে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মোটা একটা বই পড়ছিলেন। এমনই তন্ময় যে, আমাদের প্রবেশ বুঝতে পারেননি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড়মামা বললেন, 'আমি এসেছি।'

চোখ তুলে তাকালেন, 'তোমরা! আরে এসো এসো, বোসো। কী সংবাদ!'

বড়মামা উত্তেজনায় বসতে পালরেন না। মাস্টারমশাইয়ের হাত দুটো ধরে বললেন, 'ওই অংশটা আপনি আমাকে বিক্রি করুন, আমি ওই মন্দির সংস্কার করে মহাপ্রভুর মূর্তি বসিয়ে, পাঠবাড়ি করব। আপনার, আমার পূর্বপুরুষ খুশি হবেন। ওইখানে দাঁড়িয়ে আমি এই নির্দেশ পেলাম। আপনার বসবাসের জন্যে আমি একটা ছবির মতো ব্যবস্থা করব। আপনি আপনার লাইব্রেরি আর নিত্যপূজা ও পাঠ নিয়ে থাকবেন। ইচ্ছে করলে এই অংশটা বিক্রি করে টাকাটা ফিক্সড করে দিন।'

চশমার মোটা কাচের আড়ালে বড়-বড় চোখ। মাস্টারমশাই অস্বাভাবিক দৃঢ় গলায় বললেন, 'আমি বিক্রি করব না।' একটু থেমে রইলেন, বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই আরও জোর গলায় বললেন, 'আমি সবটাই তোমাকে দিয়ে দেব। তুমি এখানে এমন একটা কিছু করো, যাতে অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবীর স্মৃতি রক্ষা হয়। তিনি ছিলেন গৃহী সাধক, সর্বত্যাগী দেশসেবক।'

বড়মামা একটু ভাবনা-চিন্তা করে বললেন, 'বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার, অনেকের তো আপত্তি থাকতে পারে!'

'কার আপত্তি! এসব আমার নামে। আমি তোমাকে উইল করে দিয়ে যাব।'

'পাড়ার লোকে পাঁচ কথা বলবে। বলবে, আমি আপনাকে তোয়াজ করে সব লিখিয়ে নিয়েছি।'

'রাখো তোমার পাড়ার লোক! শোনো ডাক্তার, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। যে কোনওদিন চলে যেতে পারি। মানুষকে বেশি পাত্তা দিয়ো না। নিজের কাজ করে যাও।'

'আমরা তা হলে আসি।'

'এসো, তুমি আমাকে বড় নিশ্চিন্ত করে গেলে বাবা।'

আলমদা বাইরে বসে ছিলেন। বড়মামা বললেন, 'কাল থেকে কাজে লেগে যাও।'

সাইকেলে চেপে আমরা ফিরে এলুম। চেম্বারে রোগীদের লাইন পড়ে গেছে। বড়মামা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'একটা দিনের তরেও কি শান্তি নেই! আমার যে এখন নুন-লেবু মাখিয়ে ভুট্টা খেতে ইচ্ছে করছে। আমার যে এখন মাছ ধরতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামা গজগজ করতে-করতে চেম্বারে ঢুকলেন। ঢুকেই একজনকে ভীষণ ধমক দিলেন, 'আপনার অসুখ মশাই কোনওদিন সারবে না। এখানে আপনি ইয়ার্কি মারতে আসেন। কাল গুপির দোকানে আলুর চপ খাচ্ছিলেন। এদিকে আলসারের রোগী!'

এত ধাতানি খেয়েও ভদ্রলোক হাসছেন, 'জানি, এই ভুলটা আপনিও করবেন। ওটা আমি নই, আমার যমজ ভাই। আমাদের দু'জনকে অবিকল একরকম দেখতে। কে বিশ্বনাথ, কে জগন্নাথ, বুঝতে পারবেন না। ছেলেবেলায় একজনকে দু'বার খাওয়ালেন, আর একজনের উপোস। খাওয়ানো হয়ে গেলেই কপালে কাজলের টিপ। যেন ভোট দেওয়া হল। এই

বুদ্ধিটা বেরোতে আমরা দু'জন খেয়ে বাঁচলুম। আর স্কুলে ঢোকার পর আমাকে ন্যাড়া করে দিলেন। একজনের চুল, একজন ন্যাড়া। ন্যাড়া জগন্নাথ। চুলো বিশ্বনাথ। চমৎকার ব্যবস্থা।'

বড়মামা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আমার কাছে কে আসে?'

'আমরা দু'জনেই আসি। এ চুলোয় আর কে আছে যে, ডেথ-সার্টিফিকেট দিতে পারে!'

বড়মামা অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমি ফিট-সার্টিফিকেটও দিই। আপনি কে?'

'নাম বললে গুলিয়ে যাবে, আমি আলসার, আমার ভাই আলুর চপ। তবে প্রবলেমটা

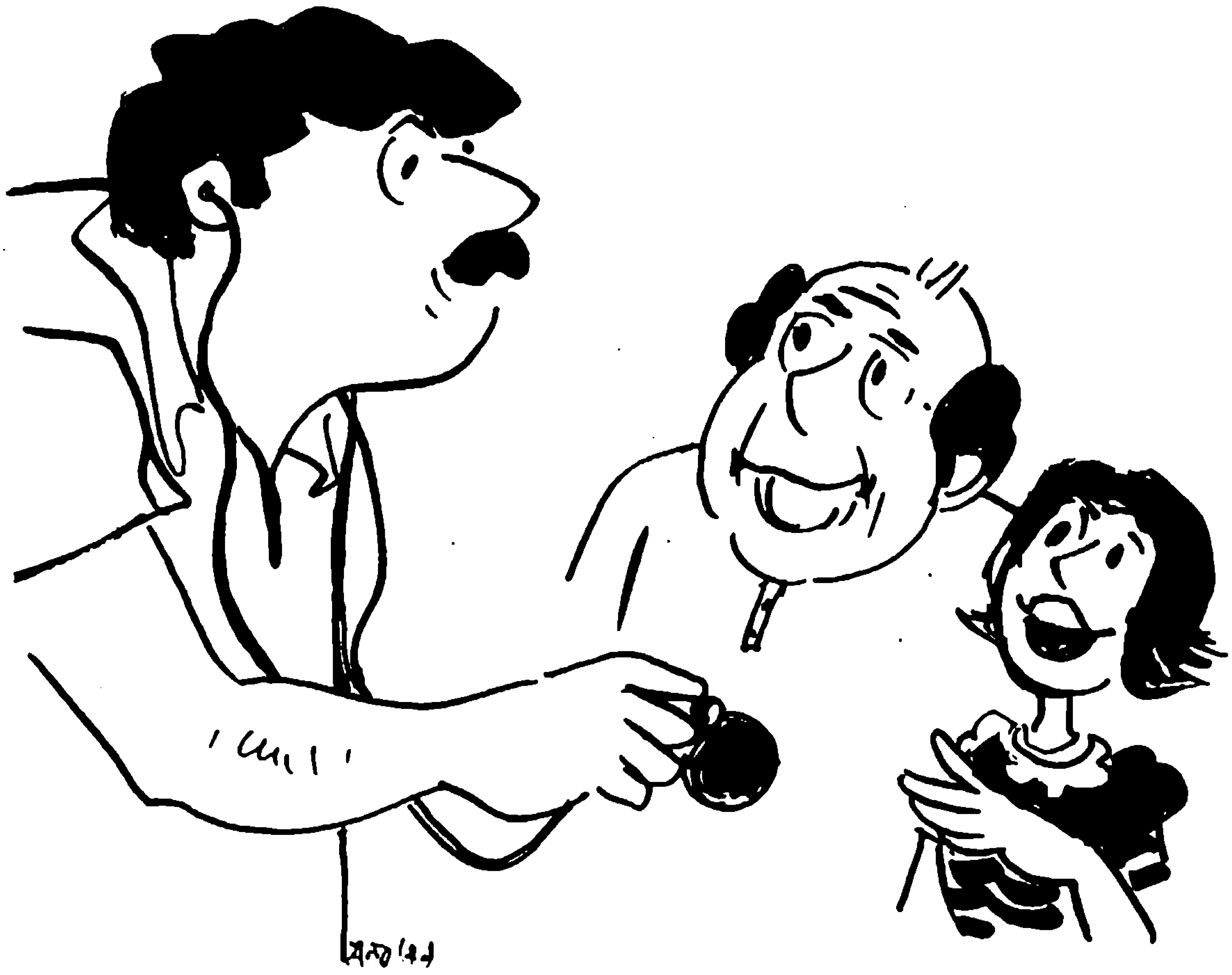

কী হয় জানেন, আলুর চপ অনেক সময় ভুল করে আলসারের মুখে ঢুকে যায়, চিনতে পারে না তো! মাঝে-মাঝে আমারই সন্দেহ হয়, কে প্রকৃত বিশ্বনাথ, কে প্রকৃত জগন্নাথ। আমার মা গুলিয়ে ফেলেননি তো!'

'মাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়!'

'করেছিলুম। মা বলেছিলেন, দুটো নামই রইল, যখন যার যেটা ইচ্ছে, সেইটা ব্যবস্থা করিস। নাম হল জামা। লোক কখনও নীল জামা পরে, কখনও লাল।'

'আরে দুর, ও উপমাটা আসছে না এখানে। নামের ওপর লোকে জামা চড়ায়। লাল বিশ্বনাথও বিশ্বনাথ, নীল বিশ্বনাথও বিশ্বনাথ।'

ওপাশ থেকে এক প্রবীণ মানুষ বললেন, 'একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে, এখানে তো অসুখের হরিহর ছত্রের মেলা! ওই ইয়ারটিতে ছাড়ুন এইবার।'

'আপনার প্রবলেম!' স্টেথো নিয়ে বড়মামা এগোলেন সেইদিকে।

ভদ্রলোক বললেন, 'সেই যে আমি বিষ খেয়েছিলুম!'

বড়মামা থমকে গেলেন, 'সে তো পুলিশ কেস।'

'না, পুলিশ কেস নয়, হাউসহোল্ড পয়জন। গৃহপালিত বিষ।'

'কী খেয়েছিলেন আমার আজকাল আর কিছুই মনে থাকে না।'

'রোগীদের আপনারা কি আর মানুষ ভাবেন! সব গোরু-ছাগল। আমি কাফ মিকশ্চার খেতে গিয়ে দু'ঢোক টিংচার আইডিন খেয়ে ফেলেছি। ভুল করে।'

পাশে বসে ছিল বাচ্চা নাতনি। সে অমনই চিৎকার করে উঠল, 'না ডাক্তারবাবু, না, দিদার সঙ্গে ঝগড়া করে দাদাইয়া আইডিন খেয়েছিল, তারপর বাবা এসে নুন-জল খাইয়ে বমি করিয়ে দিল, অনেক রাত্তিরে, আমি জেগে-জেগে সব দেখেছি।'

'অ্যায় চোপ, একদম চোপ, বড়দের কথায় একদম কথা বলবি না।' বৃদ্ধ খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠলেন। নাতনিও কিছু কম যায় না। সে ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখ ভেঙিয়ে বলল, 'না, বলবে না আবার, তুমি আমার দিদাকে কেবল কষ্ট দাও, সেলফিশ জায়েণ্ট।'

বৃদ্ধের ফরসা মুখ লাল হয়ে গেল। বড়মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। বুড়ির আদরে বাঁদর হয়ে গেছে। দিদার গুপ্তচর। একালের মাতাহারি। ওর কোর্টমার্শাল হওয়া উচিত।'

নাতনির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দিদা আমার, আমি যা খুশি তাই করব, তোর তাতে কী! এই যে সকালে তোর বাবা গরম জিলিপি এনেছিল, আমাদের একখানাও দিয়েছিলিস!'

'দিদা তিনটে খেয়েছে, তোমাকে বলেনি। তোমার তো সুগার, জিলিপি খাবে! জিলিপি!''

বড়মামা তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনার কমপ্লেনটা কী?'

'নো খিতে, নো স্লিপ, চোখে সরষে ফুল।'

'আয়োডিনের এফেক্ট। সুগার কত?'

'লাস্ট তিনশো আশি।'

'বলেন কী, সুগার ফ্যাক্টরি। খুব হাঁটুন। ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।'

'মেয়েরা খেতে পারে?'

'ঘুমের ছেলে-মেয়ে নেই।'

'অলরাইট।'

'তার মানে!

'মানে, আমার ওয়াইফকে খাওয়াব। বুড়ি যদি একটু ঘুমোয়, তা হলে এই বুড়োটাও

সুখে নিদ্রা যেতে পারে। কমপ্লেন অ্যাণ্ড কমপ্লেন অ্যাণ্ড কমপ্লেন। প্লেন আর ল্যাণ্ড করে না, সারা রাত চক্কর।'

কম্পাউণ্ডার মানিকদা এসে বললেন, 'করছেন কী, সাতটা কল আছে। দুটো এখন-তখন।'

বড়মামা তৎপর হলেন, ঝপাঝপ প্রেসক্রিপশন, ধপাধপ ইঞ্জেকশন। চেম্বার খালি। কেবল একজন মহিলা চুপ করে বসে আছেন উদাস মুখে। কাঁচাপাকা চুল। একেবারে যেন মায়ের মূর্তি। বড়মামা ড্রয়ার খুললেন, এক খামচা নোট নিয়ে সসম্ভ্রমে গিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলার কাছে, যেন অঞ্জলি দিচ্ছেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। ভদ্রমহিলা লজ্জায় অধোবদন, বড়মামা চোখ বুজে আছেন। নোট হস্তান্তরিত। ভদ্রমহিলা কাঁদছেন।

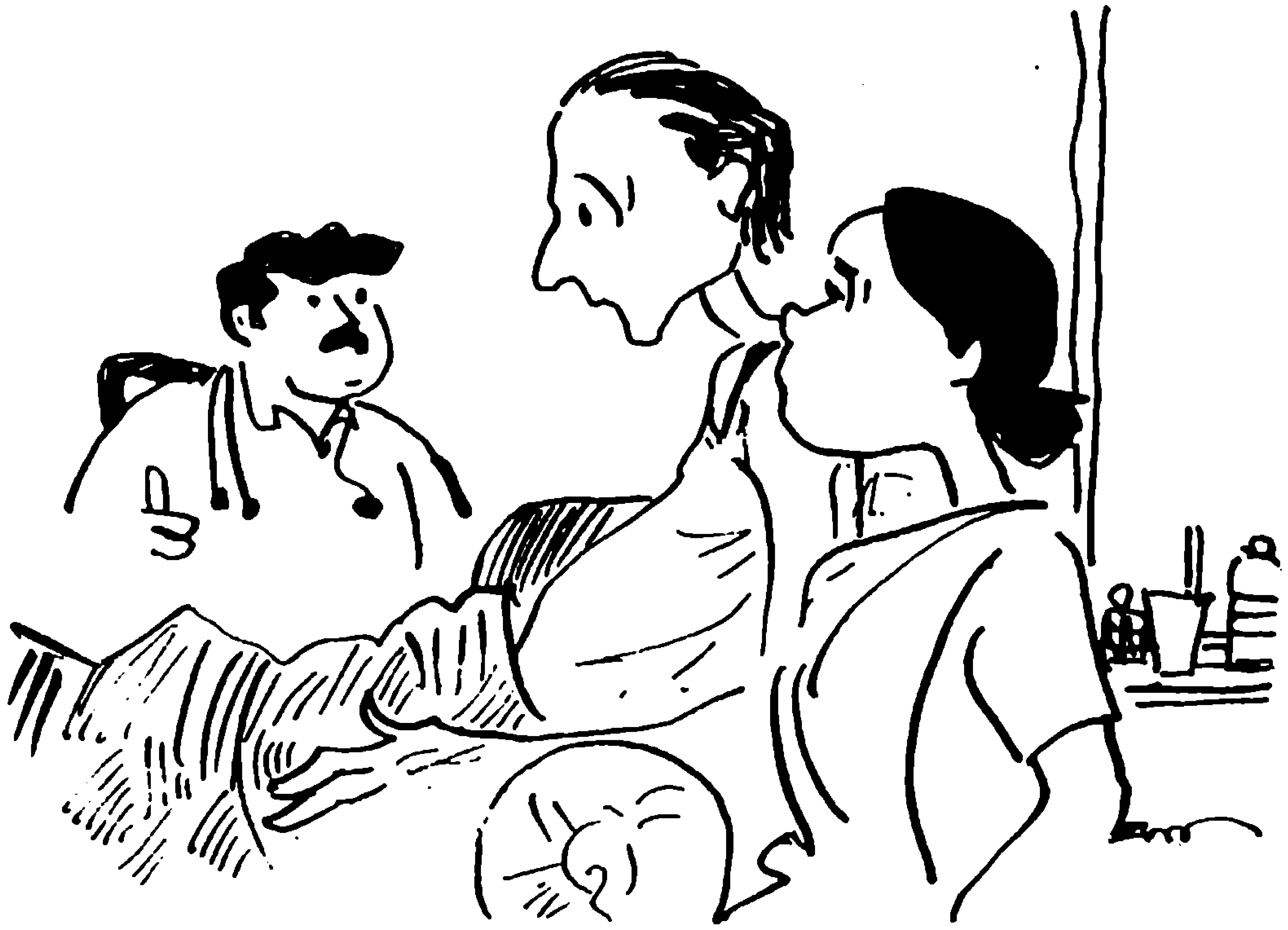

আমি জানি, কেসটা কী! এক বিখ্যাত ডাক্তারের স্ত্রী। দুটো ছেলেই অমানুষ, চোর, চিটিংবাজ। ডাক্তারবাবুর অকালমৃত্যুর কারণ তারাই। বাড়ি, গাড়ি, চেম্বার সব বিক্রি হয়ে গেছে। একটি ছেলে বোধ হয় জেল খাটছে।

বড়মামা পুব দিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, ভদ্রমহিলা চলে যাচ্ছেন। ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছেন। গোটা ব্যাপারটাই ঘটে গেল নিঃশব্দে। ভীষণ শব্দে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন। বুম করে একটা শব্দ হল। টায়ার ফাটল রাস্তায়।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পথ পেয়ে গেছি মাস্টার হাবু।'

যখন যা খুশি নামে ডাকা বড়মামার অনেক মজার একটা মজা। কয়েকদিন আগে মাসিমাকে ডাকছিলেন, 'ম্যাডাম ফিশফ্রাই'। মেজোমামাকে কয়েকদিন ডেকেছিলেন, 'শ্রীমান ভরদ্বাজ'। আমাদেরও বেশ মজা লাগে। কম্পাউণ্ডার দাদা তাড়া দিলেন, 'সাতটা কল, দুটো এখন-তখন।'

বড়মামা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'যাক, মরে যাক সব, বেঁচে থেকে কী হবে! মানুষের হাতে মরার চেয়ে রোগে মরা ভল।'

চেয়ারে ধপাস করে বসে বললেন, 'পাকা পেয়ারা খেতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামার ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললুম, 'চলুন, চলুন, কল শেষ করে আমাদের পেয়ারাবাগানে যেতে হবে ক্রোটন গাছ কিনতে।'

'রা-রাইট ইউ আর। লেট্‌স গো।'

গাড়িতে বসে বললেন, 'দ্যাখ তো, এখন-তখনে প্রথম কে আছেন!'

কলবুক খুললুম, 'হরিসাধন দত্ত।'

'থ্রোট ক্যানসার, লস্ট কেস।'

বিছানায় আধশোয়া, জ্বলে-পুড়ে যাওয়া কঙ্কালসার এক মানুষ। জোরে-জোরে শ্বাস ফেলছেন হাপরের মতো, ফ্যালফ্যালে দুটো চোখ। পাশে বসে আছেন স্ত্রী। শীর্ণ চেহারা, উদ্বিগ্ন মুখ। দেখলেই মনে হয় বড় ঘরের মেয়ে। ঘরের বাইরে লাল মেঝেতে, পা গুটিয়ে হতাশ হয়ে বসে আছেন বড় ছেলে, মানবদা। কলেজের অধ্যাপক। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। বড়মামা রোগীর ঘরে ঢুকে গেলেন, আমি মানবদার পাশে মেঝেতে বসে পড়লাম।

মানবদা আমার ডান হাতটা আলতোভাবে ছুঁয়ে বললেন, 'আজকের দিনটা কাটে কি না সন্দেহ। এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। মাঝে-মাঝে মনে হয়, কিছুই যখন করার নেই, চলে যাওয়াই ভাল।'

সারা বাড়ি থম মেরে আছে। যেন বর্ষার আকাশের তলায় মৃত্যুর কালো ছাতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়মামা বেরিয়ে এলেন, থমথমে মুখ। বুকপকেট থেকে টাকা বের করে মানবদা ভিজিট দিতে গেলেন। বড়মামা ফিসফিস করে বললেন, 'আমাকে জানোয়ার ভেবো না। শোনো, এক পারসেণ্টও আশা নেই। প্রস্তুত থাকো। একটা স্টেরয়েড দিয়ে গেলুম। যতক্ষণ চলে। হার্ট স্ট্রং, তাই ফাইট করতে পারছেন। তুমি মাকে এইবার একটু রিলিফ দাও।'

'পাশ থেকে কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না। অনেকবার চেষ্টা করেছি।'

গাড়িতে এসে বড়মামা বললেন, 'চারপাশে গিজগিজ করছে মৃত্যু, তার মধ্যে আমরা কোলা ব্যাঙের মতো খপাং-খপাং লাফাচ্ছি। লোকসভা, বিধানসভা করছি। আকাশ ভেঙে সব চাপা পড়ে গেলে বাঁচা যায়। তোর স্কুল কবে খুলছে?'

'এখনও পনেরো দিন।'

'বাঁচা গেছে। তুই সব দেখে রাখ, পরে গল্প, উপন্যাসে মানুষের কথা লিখবি। দু' নম্বরটা দ্যাখ।'

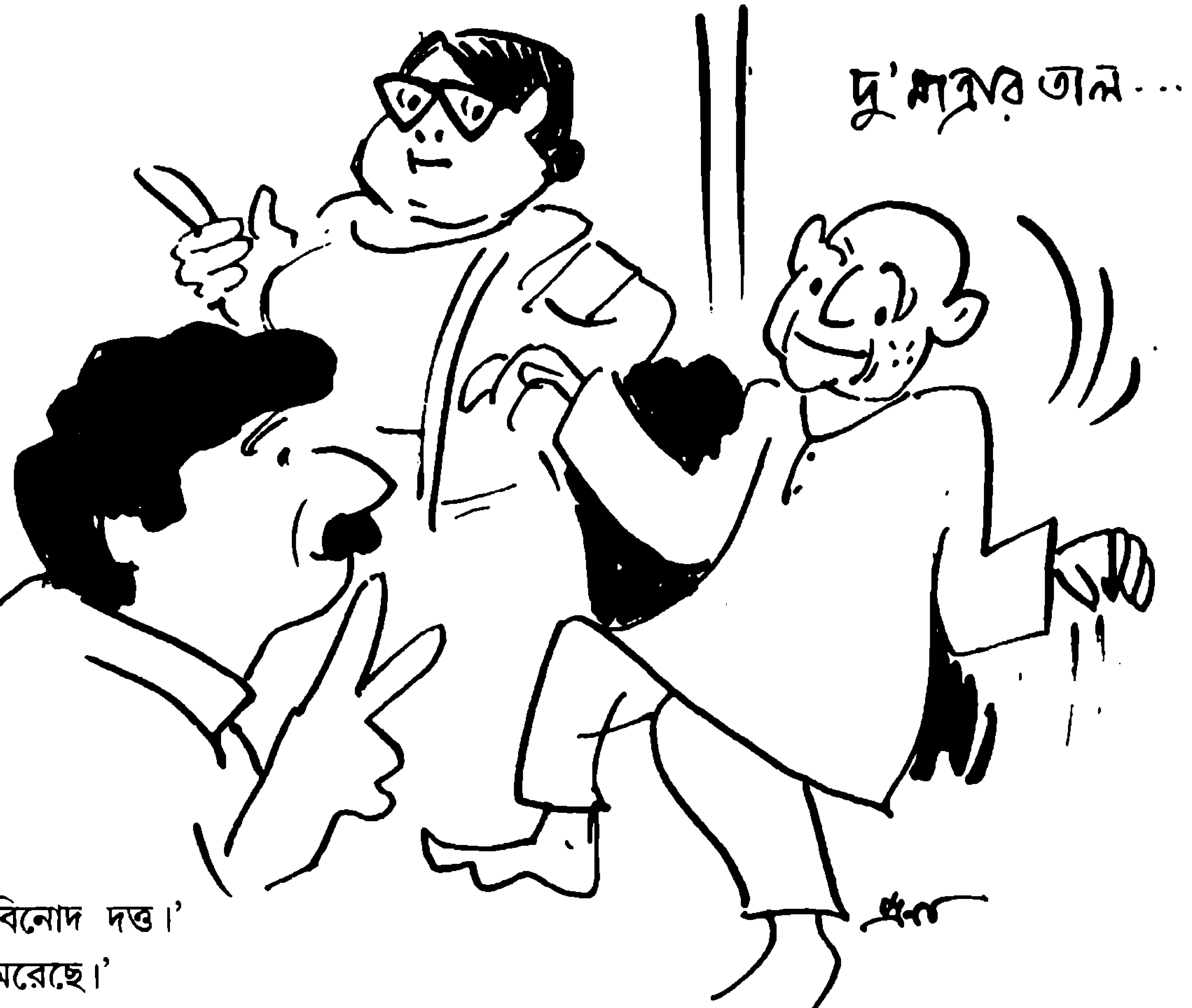

'বিনোদ দত্ত।'

'মরেছে।'

'না, মরেনি, মরলে কেউ কল দেয়!'

'ধুর ও মরবে কেন! মরেছি আমি। কিছু রুগি থাকে যারা ডাক্তারকে মারে। পকেটে-পকেটে রোগ। দুটো কথা মনে রাখ, পরে জট ছাড়াবি। মানুষের রোগ, আর রোগের মানুষ। ইংরেজি করতে পারিস, আর ও জি ইউ ই। রোগ।'

বিনোদবাবুর বিশাল বাড়ি। চতুর্দিকে তার ধ্যাবড়া-ধ্যাবড়া কাজ। উৎকট রং। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে শুনছি, রেকর্ড প্লেয়ারে ধাঁইধাপ্পড় গান হচ্ছে। বিচ্ছু টাইপের গোটাকতক বাচ্চা উঠোনে রবারের বল পেটাচ্ছে। একটা বউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় কাজের মেয়েটাকে গালাগাল দিচ্ছে। আর একটা বউ খ্যাড়খেড়ে গলায় উপদেশ দিচ্ছে, 'ও বলে কিছু হবে না, বেশ করে পিটিয়ে দাও।' মোটা থলথলে, আদুর গা, লুঙ্গি-পরা একজন লোক বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলছে, 'হ্যাঁ, আমার জেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। খেদ্দাও, খেদ্দাও, উকিলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট আছে। আঃ, কুমার শানু যা গায় না, নাচতে ইচ্ছে করে। বাংলার গৌরব, শানু আর সৌরভ। আর একটা সেঞ্চুরি হাঁকড়ে দিলে।'

নীচের উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ্যায় গুটকে, ফুটবল রাখ, ব্যাট পেটা। মেরাদোনা নয়, সৌরভ।'

সেই শব্দব্রহ্ম ভেদ কর, বারান্দার প্যাঁচ খুলে আমরা দ্বিতীয় মহলে এলাম। বিছানায় ছত্রিশটা বালিশ ফিট করে শয্যাশায়ী, পাকা টুসটুসে এক বৃদ্ধ।

'ডাক্তার, আজ আবার একটা করে বিট মিস করছে।'

'ভয় নাই, আজ শেষ ওষুধ অব্যর্থ নিয়ে এসেছি।'

'কী, কী, বিলিতি?'

'জাপানি।'

'আরে, ওরা তো বামন অবতার! কী ওষুধ!'

'সাইজটা একটু বড়, গিলতে পারবেন?'

'চেষ্টা করে গিলতেই হবে। বাঁচতে যখন হবে! কত বড়?'

'একটা কোয়ার্জ রিস্টওয়াচ। জেণ্টস নয়, লেডিজ।'

'আমি মরে যাচ্ছি ডাক্তার, আর তুমি আমার সঙ্গে কৌতুক করছ!'

বড়মামা হঠাৎ ডিক্টেটরের গলায় বললেন, 'গেট আপ, উঠে বসুন।'

ভদ্রলোক ভয়-ভয়ে উঠে বসলেন।

'বিছানা থেকে নেমে আসুন। গেট ডাউন।'

ইংরেজি কমাণ্ডে বেশ কাজ হচ্ছে। ভদ্রলোক কাঁপতে-কাঁপতে মেঝেতে দাঁড়ালেন।

বড়মামা বললেন, 'কানে কিছু আসছে, গান-বাজনার শব্দ!'

'ও তো অষ্টপ্রহরই আসছে। তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না শান্তিতে।'

'দু' মাত্রার তাল, লেফ্‌ট-রাইট। নিন আসুন, আমার সঙ্গে নাচুন। ধেই, ধেই, ধেই, ধেই। এই বিটে নাচুন। হার্টবিট আর মিস করবে না।'

পাকা ঠান্‌দির মতো চেহারার এক ভদ্রমহিলা পান-জর্দা চিবোতে-চিবোতে ঘরে ঢুকে বললেন, 'বুড়ো, এইবার জব্দ হয়েছে। সারাটা জীবন বাতিকের অসুখে আমাকে জেরবার করে দিলে।'

বৃদ্ধ নাচতে-নাচতে বললেন, 'বেশ লাগছে নাচতে!'

বড়মামা মহিলাকে বললেন, 'এবার আর আমাকে ডাকবেন না, নাচের মাস্টারমশাইকে কল দেবেন। অনেক কম খরচে আরোগ্য।'

মহিলা বললেন, 'কাউকে ডাকতে হবে না, আমিই নাচিয়ে দেব।'

'এর পর আমাকে ডাকলে, ঘুমের ওষুধ দিয়ে ওপরের বাঙ্কে তুলে দেব। ঘুমোতে-ঘুমোতে ডেস্টিনেশনে। হরিবোল ইস্টিশন।'

বড়মামা ভিজিটের টাকা গুনে-গুনে পকেটে পুরলেন।

ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ডাক্তার আমাকে ত্যাগ কোরো না, তা হলে আমায় প্রাণত্যাগ করতে হবে।'

বড়মামা গাড়িতে বসে উত্তরটা দিলেন, 'তোমার মতো দুধেল গোরুকে কেউ ত্যাগ করে? তোমার তো অসুখ নয়, ব্যায়রাম। ব্যায়রামের ব্যুৎপত্তি জানিস—ব্যয় করিলেই আরাম।'

পেয়ারাবাগানে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় দুটো। রোদের দুপুর চড়চড় করছে। গাছের পাতা ঝিম মেরে আছে। জায়গাটা এতই সুন্দর যে লোকে বলে, দ্বিতীয় বারাণসী। কোনও গাছে ঝাপড়া হয়ে আছে হলদে ফুল, কোনও গাছে সাদা। তামাটে-নীল আকাশ. হলুদ, সাদা ফুলের বাহার, নিঝুম সবুজ পাতা, ঘন ছায়া, এত বড়-বড় ফিঙে পাখি, শালিকের ঝাঁক।

মেটে রাস্তা দিয়ে টিকোতে-টিকোতে চলেছে বড়মামার হিন্দুস্তান ফোর্টিন। যার সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল সেটা যেন মুঘল আমলের দুর্গ। ছোট-ছোট লাল ইটে গাঁথা সুউচ্চ পাঁচিল। কয়েদি টপকাতে পারবে না। জায়গায়-জায়গায় সুবজ শৈবাল ছোট-ছোট পরগাছা। বিশাল একটা দরজা। হাতি গলে যাবে। বড়মামা হর্ন দিলেন। ঘড়ঘড় করে ঘুলে গেল দুর্গের দরজা। যেন স্বপ্ন খুলে গেল। লাল টুকটুকে চওড়া একটা পথ ভেতরে হারিয়ে গেছে। শুধু গাছ আর গাছ। রঙের বিস্ফোরণ। মশমশ শব্দে গাড়ি দরজা অতিক্রম করে কিছুটা গিয়ে ঘস করে থামল।

অদ্ভুত এক শীতলতা, অদ্ভুত শান্তি। জীবনে প্রথম বাবুই পাখির বাসা দেখলাম। গাছের ডালে সার-সার ঝুলছে। প্রত্যেকটায় একটা করে গোল দরজা। একটা করে পাখির ঠোঁট উঁকি মারছে। এক জোড়া কুবো পাখি বিশাল লেজের ভারে টলবল করে উড়ছে। যে ডালে বসছে সেই ডালই ঝুঁকে পড়ছে দেহভারে। ছোট-ছোট পেয়ারাগাছ আষ্টেপৃষ্ঠে ফল ধরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দেখলাম আফ্রিকার কালো পেঁপেগাছ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কালো। ক্রোটন অন্তত পঁচিশ-তিরিশ রকমের। ফার্ন বহুরকমের। রাশি-রাশি হাইব্রিড গোলাপ। অবাক-করা ডোরাকাটা গোলাপ। প্রায় এক-একটা বারকোশের মতো সূর্যমুখী। রং হল সানসেট ইয়েলো! গোল্ডেন কাঞ্চন। জিনিয়ার কী বাহার! পিটুনিয়া এখনও ফুটছে। হেঁটে-হেঁটে আর শেষ করা যাচ্ছে না। পান্থপাদপ পাতার পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইছে। আয়নার মতো এখানে-ওখানে পড়ে আছে ছোট-ছোট জলাশয়। পাড় বাঁধানো বিশাল এক পদ্মপুকুর। বাতাসে পাতার কানগুলো মুচড়ে দিয়ে যাচ্ছে। বড়-বড় পদ্মফুল গোটা-গোটা ভ্রমরের অহঙ্কার ফেটে পড়ছে। বড়মামা একদিকে হারিয়ে গেছেন, আমি একদিকে। হেথায় আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।

'আর পারি না।' বলে, সিমেন্ট বাঁধানো একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। পায়ের তলায় মখমল-সবুজ ঘাস। হাতের পাতার চেয়েও বড় চিত্র-বিচিত্র প্রজাপতি ভেসে-ভেসে যাচ্ছে চারপাশ দিয়ে। আমি আর এখান থেকে যাব না। তামাটে রঙের চারজন বলশালী মানুষ দূরে একটা কিছু করছেন। রোদে চকচক করছে শরীর। মাথার ওপর ফড়িংয়ের ঝাঁক।

বহু দূর থেকে বড়মামার গলা, 'শিগ্‌গির আয়।'

বাগানের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা কুঠিয়ার সামনে বড়মাম। জানলায় উঁকি মারছেন। দরজায় মরচে-ধরা তালা।

আগাছা, লতা, গুল্ম দণ্ডবৎ হয়ে আছে।

বড়মামা বললেন, 'দ্যাখ, দ্যাখ, উঁকি মেরে দ্যাখ।'

আলোছায়ায় একটি মূর্তি। পাথরের কোন দেবতার, বুঝলাম না। 'একটা মূর্তি!'

বড়মামা খলখল করে হেসে বললেন, 'মহাপ্রভু! চিনতে পারছিস না, মহাপ্রভুর মূর্তি।' 'কানু, কানু!' বড়মামা ছুটছেন।

তামাটে বর্ণ মানুষদের মধ্যে একজন এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে ডাক্তারবাবু!'

'মহাপ্রভুর মূর্তি।'

'হ্যাঁ, অবহেলায় পড়ে আছেন বহুদিন। চোদ্দ বছর আগে এক বৈষ্ণব সাধক এখানে ছিলেন। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "বৃন্দাবন দর্শন করে আসি" বলে সেই যে গেলেন, আর এলেন না।'

'মূর্তি আমার চাই, যা লাগে।'

'আপনি নেবেন! নিয়ে যান, একটা পয়সাও লাগবে না। রাতে আমার ঘুম হয় না। স্বপ্ন দেখি। কিছু না করতে পারার ভয়ে মরি।'

বড়মামা ঘর্মাক্ত সেই মানুষটিকে জড়িয়ে ধরলেন। ফড়িং উড়ছে, প্রজাপতি খেলছে, একঝাঁক টিয়া মহাকলরবে পেয়ারাগাছে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনটে রাজহাঁস, চতুর্থটাকে গলা মিলিয়ে ডাকছে। বড়মামা কাঁদছেন। দমকা একটা বাতাসে গাছের মাথা দুলিয়ে দিয়ে গেল। কৃষ্ণচূড়ার চূড়াপাতায় বাতাস নাচছে।

বহুকালের পুরনো চাবি। তালার প্যাঁচ আর ঘোরেই না। ফোঁদলে করে তেল ঢালা হল। একসময় ফস করে তালা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর-ঠাকুর গন্ধ। মনে হল সঙ্কীর্তন চলছিল। এইমাত্র বন্ধ হল। দেওয়ালে একটি মৃদঙ্গ ঝুলছে। বেদির ওপর একজোড়া খঞ্জনি। বিছানার একটি রোল একপাশে। পূজার আসনটি আজও পাতা। মনেই হচ্ছে না ঘরটি অব্যবহৃত। কেউ কি রোজ গভীর রাতে এসে সব পরিচ্ছন্ন করে পূজায় বসতেন! শ্বেতপাথরে দণ্ডায়মান মূর্তি যেন বড়মামাকে দেখে হাসছেন, 'এসো, এসো, এগিয়ে এসো, চোদ্দটা বছর আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।'

বড়মামা এগোচ্ছেন। কোথায় পা পড়ছে দিশা নেই। মূর্তির সামনে তিনিও মূর্তি হয়ে গেলেন। আমাদের পণ্ডিতমশাই যেমন বলেন, কাষ্ঠপুত্তলিবৎ। চিত্রার্পিত। আমি অতশত

বুঝি না; কিন্তু আমারও মনে হচ্ছিল মূর্তির একটা প্রভাব আমাদের মধ্যে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা সবাই বর্তমান ছেড়ে অতীতের দিকে চলেছি।

সন্ধে তখন প্রায় সাতটা। একটা ম্যাটাডর ভ্যানে আমরা বসে আছি। মহাপ্রভুর মূর্তি .র। আমাদের ঘিরে আছে ক্রোটন আর ফার্নের টব। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন ে্জোমামা আর মাসিমা।

তাঁরা দু'জনে ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠার আগেই বড়মামা চিৎকার ছাড়লেন, 'ওরে শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা, তিনি এসেছেন।'

দু'জনেই থ' হয়ে গেছেন। অন্ধকারে হদিস পাচ্ছেন না। পাতার ফাঁকে উকি মেরে দেখেই মাসিমা বললেন, 'এ কী গো! এ কী সুন্দর!'

গাড়ির ওপর বড়মামার নৃত্য, 'মহাপ্রভু এলেন, মহাপ্রভু।'

শাঁখ বাজল। ছুটে এসেছেন হরিদা। প্রথমে নামল গাছের টব। এইবার নামছেন মহাপ্রভু, ধীরে, সাবধানে, সন্তর্পণে। শীতল, মসৃণ। চন্দনের গন্ধ। গাড়িতে যতক্ষণ ধরে বসে ছিলাম, মনে হচ্ছিল, আমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে ধরে আছি। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা কত সুন্দর।

দোতলার বারান্দায় এসে বসলেন মহাপ্রভু। যেন বাড়ির সর্বময় অভিভাবক! গলায় দুলছে জুঁইফুলের গোড়ের মালা। সবাই বসেছি সামনে।

হরিদা বললেন, 'অনেক আশ্চর্য দেখেছি, এমন দেখিনি কখনও। মহাপ্রভুর এমন সুন্দর মূর্তি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন পেয়ারাবাগনে! এমন মূর্তি সহসা দেখা যায় না!'

বড়মামা বললেন, 'আমি আজ সকালে আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর অবস্থা দেখে ঠিক করেছি, অনাথ মেয়েদের জন্যে একটা আশ্রম করব। যেখানে কর্মই হবে ধর্ম। ধর্মই কর্ম নয়।'

মেজোমামা বললেন, 'গুড আইডিয়া।'

মাসিমা বললেন, 'এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমাদের বাবা আর মায়ের নাম। আমাদের মা জীবনে কোনও সুখই পাননি। আমাদের বিপ্লবী বাবার জন্যে সব ত্যাগ করেছিলেন। ছেঁড়া কাপড়, দিনের পর দিন উপোস।'

॥ ৬ ॥

আবার সেই চাঁদের আলোর রাত।

রাতের ঘড়িতে সংখ্যা এক। আকাশ থেকে রুপোর তবক খসে-খসে পড়ছে। এমন প্রখর চাঁদের আলো যে, গাছের প্রতিটি পাতা গুনে নেওয়া যায়। দক্ষিণের বাতাস বইছে, বুঝি বসন্তকাল। কোকিলরা চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছে না। আকুল আবেগে বারেবারে ডেকে উঠছে।

পুবের আকাশে নতুন এক ছবি, দুধসাদা এক মন্দিরের চূড়া। সাদা একটি পতাকা ফনফন করে উড়ছে। সেই মন্দির, যে মন্দিরের স্বপ্ন বড়মামা দেখেছিলেন। মহাপ্রভু সেখানে শ্বেতপাথরের বেদিতে। ফুলের সাজে সেজে আছেন। মাস্টারমশাইয়ের আশ্রম তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে মহিলাবাস। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এসে গেছেন। তিনি আবার মাস্টারমশাইয়ের দেখাশোনা করছেন।

আমাদের প্রত্যেকের বয়েস দু'বছর বেড়ে গেছে। হরিদার সব গোঁফ পেকে গেছে। মাসিমা নাকি চার-পাঁচটা পাকা চুল খুঁজে পেয়েছেন নিজের মাথায়। মেজোমামার ভুঁড়ি আরও দু'ইঞ্চি বেড়েছে। আমি আরও লম্বা হয়েছি।

সকলে একসঙ্গে বললেন, 'পুব দিকে তাকালে মনে হচ্ছে স্বপ্ন। পতাকাটা যেন প্রেম-ভালবাসার মতো উড়ছে। ঠিক মাথার ওপর সেই সাক্ষীতারাটা।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে আমি বাকি গল্পটা বলি। আমাদের বেঁচে থাকার গল্প! আমাদের অপ্রকৃতিস্থ মা ওই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন। একটা-একটা করে ইট তুলে আঁচলে রাখছেন আর বলছেন, 'এক টাকা, দশ টাকা, কুড়ি টাকা, একশো টাকা।' ছোট্ট

ফ্রক পরা কুসি যতবার মা বলে কাছে যাচ্ছে, মা বলছেন, 'খুকি রাত হয়েছে বাড়ি যাও, রামছাগলে গুঁতিয়ে দেবে।' কুসি কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে আসছে আমার কাছে, 'দাদা, মা কেন আমাকে চিনতে পারছে না!' মেজোর টনসিলের ধাত, নাগাড়ে কেশে যাচ্ছে। কেউ নেই। ওই অতটুকু মেয়ে আমাকে রান্নায় সাহায্য করছে। অতীতের সেই দৃশ্য চোখ বুজলেই দেখতে পাই। বুকের কাছে কাঠকুটো ধরে এগিয়ে আসছে। দু'হাতে বালতি নিয়ে আসছে হেঁইসো-হেঁইসো করে। নিজেই নিজের চুল বাঁধছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'দাদা, তুমি বিনুনি করতে পারো!'

'এই দুর্দিনে এলেন হরিদা। দাদা বলি, কিন্তু হরিদা আমার বাবা। আজ আমি যা হয়েছি তা ওই মানুষটির জন্যে। আমাদের সংসার চালাবার জন্যে, আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে হরিদা জুটমিলে চাকরি করেছেন। হরিদা আমাদের মাকে চোখে-চোখে রেখেছেন, বাড়ি থেকে যাতে ছিটকে বেরিয়ে না যান। হরিদা আমাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মাসের পর মাস কোর্ট-কাছারি করছেন। শেষে যা হল, সে এক অলৌকিক ব্যাপার। কে একজন জোর করে হরিদাকে একটা লটারির টিকিট গছিয়েছিল, সেই টিকিটে লেগে গেল ফার্স্ট প্রাইজ। আমার, মেজোর, কুসির লেখাপড়ার খরচ ওই টাকা থেকেই হল।'

'আর মায়ের মৃত্যু! সে তো ভোলার নয়! মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। যেন দীর্ঘ একটা ঘুমের পর জেগে উঠলেন। বলতে লাগলেন, 'ওমা! তোরা কবে এত বড় হলি! এই বুঝি কুসি, তোকে কত ছোট দেখেছি।' মা আবার সংসারটাকে সাজিয়ে তুললেন। মায়ের হাতের বিখ্যাত রান্না খেয়ে আমরা মোটা হতে লাগলুম। কী আনন্দ! হঠাৎ পায়ে একটা পেরেক ফুটল। আমাদের কাউকে জানতে দিলেন না। টিটেনাসে মৃত্যু হল। আমরা ভাবছি হিস্টিরিয়া, একমাত্র হরিদাই ঠিক ধরেছিলেন ডাক্তার না হয়েও। নতুন করে শুরু করতে গিয়ে মা শেষ হয়ে গেলেন। শ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস, এই আমাদের জীবন। বুঝলি মেজো, ডাক্তার হওয়ার ফলে জীবনটাকে আচ্ছাসে দেখা গেল।'

'তুমি তো সাধক দাদা!'

'তুই একদিন আমাকে শয়তান বলেছিলিস।'

'তুমি আমাকে একদিন পাঁঠা বলেছিলে।'

'তুমি তার আগে আমাকে উড়নচণ্ডে বলেছিলে।'

মাসিমা এইবার হুঙ্কার ছাড়লেন, 'স্টপ, স্টপ আই সে।'

বড়মামা বললেন, 'কেন এমন করলুম জানিস, মাকে ভুলব বলে। দৃশ্যটা যে চোখের সামনে ভাসছে। পরের দিন রেজাল্ট বেরলো। ডাক্তার হয়েছি আমি। ডাক্তার! শ্মশানচিতার সামনে দাঁড়িয়ে বলে এলাম, জানো মা, তোমার সব দুঃখের অবসান করব বলে, রাত জেগে, রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে এই এতটা পথ এলাম, তুমি খাঁচা খুলে উড়ে গেলে। তোমার মুখটা কত সুন্দর ছিল, তোমার দু' চোখে কত স্নেহ ছিল, তোমার দু' হাতে কত সেবা

ছিল, তোমার মনে কত ত্যাগ ছিল, তোমার হৃদয়ে কত বড় একটা আকাশ ছিল, তুমি ছাই হয়ে গেলে!'

'স্টপ, স্টপ আই সে।'

'সেদিনও ছিল এমনই চাঁদের আলোর রাত। কেউ ছিল না শ্মশানে। কুসি, তোর মুখটা ঠিক আমার মায়ের মতো।'

'দাদা'— মাসিমা বড়মামার কোলে মুখ গুঁজলেন। মেজোমামা ধীরে হাত রাখলেন

মাসিমার পিঠে। সেদিনের সেই প্লেনটা উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে আলোর পিচকিরি ছুড়তে-ছুড়তে। সেই প্যাঁচা আমগাছের ডালে।

মাসিমা বড়মামার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। চাঁদের আলোয় সাদা ব্লাউজ-পরা পিঠটা ঠেক যেন দুধের মতো সাদা! ঘাড়ের কাছে আলগা খোঁপা। পিঠের ওপর পড়ে আছে তিনটে হাত, দুটো বড়মামার, একটা মেজোমামার। প্রশ্ন জাগছে, মানুষের অতীতটা কি লিকুইড, শুধু জল? হাসি আর আনন্দের পাউডার বলে কিছু নেই। থাকবে কী করে!

নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। পৃথিবীর তিনভাগই যে জল। বড়মামার বড়-বড় চোখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল মাসিমার পিঠে পড়ছে।

মাস্টারমশাই সেদিন হ্যাপি প্রিন্সের কথা বলছিলেন। সারাদিন ওড়াউড়ির পর ক্লান্ত সোয়ালো সোনায় মোড়া প্রিন্সের মূর্তির দু' পায়ের ফাঁকে আশ্রয় নিয়ে ভাবছে, আই হ্যাভ এ গোল্ডেন বেডরুম। সোয়ালো ডানার তলায় তার ছোট্ট মাথাটা গুঁজে সবে ঘুমোতে যাবে, পিঠের ওপর বড় একফোঁটা জল পড়ল। আকাশে একটুকরো মেঘ নেই, বড়-বড় তারা, উজ্জ্বল একটি রাত, তাও বৃষ্টি। উত্তর ইউরোপের আবহাওয়া প্রকৃতই ভয়ঙ্কর।

আবার একফোঁটা জল।

সোয়ালো ভাবছে, দুর ঘোড়ার ডিম, এই মূর্তির কী দরকার, যে একটা ছোট্ট পাখিকে বৃষ্টির আশ্রয় দিতে পারে না। এর চেয়ে বরং একটা চিমনি ভাল। যাই, আবার উড়ি।

ডানা মেলার আগেই আবার একফোঁটা জল। সোয়ালো তখন ওপর দিকে তাকাল, এ কী দেখছি! দ্য আইজ অব দ্য হ্যাপি প্রিন্স ওয়্যার ফিল্ড উইথ টিয়ারস, অ্যান্ড টিয়ারস ওয়্যার রানিং ডাউন হিজ গোল্ডেন চিকস। হিজ ফেস ওয়াজ সো বিউটিফুল ইন দ্য মুনলাইট!

আমার বড়মামা যেন হ্যাপি প্রিন্স। সেই মূর্তির মতোই তিনি দেখতে পাচ্ছেন— অল দ্য আগলিনেস, অ্যাণ্ড অল দ্য মিজারি অব মাই সিটি।

পুব দিকের আলসের কাছে আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম পাশাপাশি। চাঁদের সমুদ্রে ভাসছে নতুন মন্দিরের চূড়া। হাঁসের ডানার মতো পতপত করছে পতাকা। একটি তারা তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। দুধসাদা মন্দির-চূড়া।

আমি বললুম, 'বড়মামা, আপনার মন্দিরের চূড়াটা কী ফ্যানটাসটিক দেখাচ্ছে!'

বড়মামা বললেন, 'আমার মন্দির কী রে! বল, মানুষের মন্দির; বল, দুঃখ নয় সুখ; বল, ঘৃণা নয় প্রেম; বল, মৃত্যু নয়, জীবন; বল, অশান্তি নয়, শান্তি; বল, আমরা মানুষ।'

শঙ্খ-ঘন্টার শব্দ। সে কী! মঙ্গল আরতি শুরু হল বড়মামার মানবমন্দিরে। রাত তা হলে ভোর হল! মাস্টারমশাই মহামানবের ঘুম ভাঙাচ্ছেন!

একটু আগে আমরা কেঁদেছি
এখন আমাদের মুখে হাসি
মানুষের দুটো পা
সুখ আর দুঃখ!

এইরকম কিছু মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বড়মামা বললেন, 'রাতের রহস্য যদিও-বা জানা যায়, মানুষের জীবনের রহস্য কোনওদিনই জানা যাবে না।'

মেজোমামা বললেন, 'স্টিফেন হকিং প্রায় একই রকম বলেছেন, যে নিয়মে প্রকৃতি বাঁধা তা বোঝা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু মানুষের সমাজের নিয়মকানুন চির দুর্বোধ্য।'

'তার মানে তুই বলতে চাইছিস আমি হকিং থেকে মেরেছি?'

'এর মানে কি তাই হল?'

'হ্যাঁ, হল।'

'আচ্ছা কুচুটে তো!'

'তুমি ভারী সরল!'

'তোর মতো কুটিল নই!'

মাসিমা শাসন করলেন, 'স্টপ, স্টপ আই সে। তোমাদের স্বভাব জীবনে পালটাবে না।'

দুই মামা হাসতে-হাসতে সমস্বরে বললেন, 'সাপে আর নেউলে, ম্যাডাম!'

মন্দিরে শুরু হয়েছে নাম-সঙ্কীর্তন।

মহাপ্রস্থান

এখন দু'জনকেই সামলানো দায়। মাসিমা শ্বশুরবাড়িতে। দুই মামার পোয়া বারো। যখন যা প্রাণ চাইছে, তাই করছেন। আজ ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙছে, তো কাল দশটায়। রোজ রাত বারোটার আগে কারো খাওয়ার ইচ্ছেই করে না। তারপর রাত দুটো--আড়াইটে পর্যন্ত গজর গজর। চোরেরা এই বাড়িটাকে তাদের লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

দু'জনের এখন খুব ভাব। মাসিমা যখন ছিলেন, তখন কথায় কথায় লেগে যেত। এখন একেবারে হরি-হর আত্মা। এ বলছে মেজো, তো ও বলছে বড়। পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজই হয় না। বাড়িতে যিনি রান্না করেন, বামুনদি, তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, বড়দা, আজ কি রান্না হবে! বড়দা অমনি বললেন, দাঁড়াও মেজোকে জিজ্ঞেস করি। এইবার বড়তে, মেজতে আধঘণ্টা শলা-পরামর্শ হবে। দু'জনেরই পছন্দের খাবারের বিরাট লিস্ট হবে, দশ-বারোটা পদ। তারপরে দেখা যাবে, খাওয়ার সময় দু'জনেই বেপাত্তা। মেজো কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানে সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসে মশগুল। বড় ডাক্তার, তিনি কোনো গোপ্পে রুগির বাড়ি, নাড়ি টিপে, মাছ ধরার গল্প করেই যাচ্ছেন, করেই যাচ্ছেন। ঘড়ি, সময়, দিন রাত, এ-সবের কোনো তোয়াক্কা নেই।

মেজমামা যদি একবার ক্রশওয়ার্ড নিয়ে বসেন, হয়ে গেল। পাশে তিনখানা ডিকশেনারি। বড়মামা যদি মেডিকেল জার্নাল নিয়ে বসেন, রাত কাবার।

মাসিমা থাকলে, এই সব চলত না। এতটা বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করতেন না। কাগজ-পত্র ছোড়াছুড়ি করে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে, আলো নিবিয়ে দু'জনকেই মশারির মধ্যে। সবশেষে বলতেন, দেখি, কে ফার্স্ট হয়। মানে, কে আগে ঘুমোয়, বড়ো না ছোট। মেজমামাই ফার্স্ট হতেন। বালিশ মাথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাপরের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস। বড়মামা সহজে ঘুমোতে পারেন না। এপাশ, ওপাশ, চিৎ, উপুড়। আমি বড়মামার পাশেই শুই।

সবশেষে আমার সঙ্গে দুষ্টুমি। এই কাতুকুতু দিচ্ছেন। এই চিমটি কাটছেন। শেষে বিরক্ত হয়ে আমাকে বলতে হত, মাসিমাকে ডাকব?

মাসিমার ভয়ে বড়মামা লক্ষ্মীছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়তেন।

এখন মাসিমা তো নেই। কাকে ডাকব শাসন করার জন্যে। বল্গাহীন উৎপাত রাত ঠিক একটা। আমাদের খাওয়া শেষ হল। পাড়ার লোকের এখন মাঝরাত্তির। খাওয়া মানে যে-সে খাওয়া নয়। চর্বচষ্য-লেহ্যপেয়। দু'জনেই এখন দোতলার দক্ষিণের বারান্দায়। ইজি চেয়ারে একটু বিশ্রাম করছেন। সামনে গাছ-পালা, ফাঁকা মাঠ, দূরে একটা ঝিল। ঝিলের কিছুটা দূরে রেল লাইন। একটা ট্রানসমিশান টাওয়ার। মাথার ওপর লাল আলো। আরো দূরে একটা বড় ফ্যাকট্রি—অন্নপূর্ণা রোলিং মিল। দিন রাত কাজ হয়। দক্ষিণের বাতাসে শব্দ ভেসে আসছে। লোহার রড তৈরির ঝড়াং ঝড়াং শব্দ। যে-সব নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশের মাথায় ছিল, তারা সব পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। আমিও একপাশে বসে বসে ঢুলছিলুম।

হঠাৎ কানে এল বড়মামা বলছেন, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না।'

মেজমামা গম্ভীর গলায় অভিভাবকের মতো বললেন, 'ঠিক করে করার চেষ্টা কর।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন কাজের কথা বলছি বল তো।'

'যে কোনো কাজ, এনি ওয়ার্ক, ঠিক করে করা উচিত। মনে নেই, সেই কোন ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি, কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার। পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা।' মেজমামা হাঁউমাউ করে হাই তুললেন।

বড়মামা বললেন, 'কিস্যু বোঝোনি। আমি বলছি, এত রাতে, এত খাওয়াটা ঠিক নয়। প্রথমত নটার মধ্যে খাওয়া উচিত।'

'শিশুরা খাবে। বড়দের জন্যে সময় অনেকটা বাড়ানো আছে।'

'দ্বিতীয় কথা, রাতের খাওয়া হবে লাইট। ভেরি লাইট।'

'ইণ্ডিয়ান নিয়ম। আমেরিকান নিয়ম উলটো। দিনে লাইট, রাতে হেভি। বেশ জমিয়ে গুছিয়ে, কবজি ডুবিয়ে খাওয়া।'

'স্বাস্থ্যের তৃতীয় নিয়ম, আফটার সাপার ওয়াকএ মাইল।'

'নিয়ম বদলে গেছে। এখন বলছে, খাওয়ার পরই অজগর হয়ে যাও। টেনে ঘুম।'

বড়মামা আক্ষেপের গলায় বললেন, 'কিন্তু ভাই দিন দিন ভুঁড়ি বাড়ছে। এই রেটে বাড়লে, সবাই বলবে, কুমড়ো পটাশ।'

'মোটার জন্যে তুমি স্কিপিং করতে পার।'

'এই শরীরে স্কিপিং! একমাত্র চাঁদে গেলে আমার পক্ষে স্কিপিং সম্ভব। সেখানে গ্র্যাভিটি নেই।'

মেজমামা বললেন, 'খুব আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।'

'সে তো হচ্ছেই। অকারণে এত খাওয়া। এর হাফ খেলেই আমাদের হয়ে যায়!'

'আমি সে-ক্ষতির কথা বলছি না। আমি বলছি, সমস্ত জামা-প্যান্ট ছোট হয়ে যাচ্ছে সপ্তাহে সপ্তাহে।

'এ তো আমারও সমস্যা। আমি প্রবলেম সল্‌ভ করে ফেলেছি।'

'কি ভাবে করলে? ইলেকট্রনিকস দিয়ে?'

'আরে না রে বাবা। মাদ্রাজি কায়দায়। ধুতি দু-ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো করে পরছি। ভুঁড়ি তুই কত বাড়বি বাড়।'

মেজমামা বললেন, 'ওটা কোনো সলিউশান হল না। আমি কি ভাবছি জান, চলো আমরা পাহাড়ে যাই, একেবারে হিমালয়ে।'

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'আঃ, একেবারে আমার মনের কথা। ছেলেবেলা থেকেই আমার খুব ইচ্ছে, এভারেস্টে উঠব, সাউথ কল দিয়ে।'

'আর আমার কি ইচ্ছে জান, মহাপ্রস্থানের পথ ধরে হিমালয়ে যাব। নো বাস, নো ট্রাম।'

'বেশ, তাহলে চলো. বেরিয়ে পড়া যাক। আমি এভারেস্ট। তুই মহাপ্রস্থান।'

আমার ঘুম ছুটে গেল। রাত দুটোর সময় এরা বলে কী। আর এদের আমি চিনি। বলা মানেই করা। আমি বললুম, 'আমাকে একা ফেলে রেখে তোমরা চলে যাবে?'

বড়মামা বললেন, 'তুই এটা ভাবলি কী করে? তোকে ফেলে রেখে চলে যাব! তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে।'

'তোমার তিনটে জার্সি গরু, দশটা দশ জাতের কুকুর, তিন খাঁচা পাখি তাদের কে খাওয়াবে?'

বড়মামা একগাল হেসে বললেন, 'সে কি আর আমি ভাবিনি ভাগ্নে। অনেক ভেবে মাথা থেকে প্ল্যান বার করেছি। কোনো ক্যাটারিং কোম্পানিকে বলব, তারা এসে খাইয়ে যাবে। গরুদের দেবে জাবনা, কুকুরদের মাংস, ভাত। পাখিদের দানা।'

মেজমামা সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'এরকম কোনো ক্যাটারার আছে বলে মনে হয় না।'

বড়মামা বললেন, 'খোঁজ নেবো।' আধুনিক পৃথিবীতে সবই থাকে।'

আমি বললুম, 'মাসিমাকে রিকোয়েস্ট করলে কেমন হয়। যদি এসে কয়েকদিন থাকেন।'

বড়মামা, মেজমামা, দু'জনেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'খবরদার, খবরদার। কোনো ভাবে যেন জানতে না পারে, তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

॥ দুই ॥

ভোরবেলা হরিদা এসে হাজির। আমাদের পুরনো কাজের লোক। কী কারণে যেন অনেকদিনের জন্যে দেশে চলে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁর আসার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। হঠাৎ বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে হাসতে হাসতে প্রভাতসূর্যের মতো উদয়। তাঁকে দেখে বড়মামা আর মেজমামার কি উল্লাস। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দু'জনের ধেই ধেই নৃত্য। সঙ্গে অসাধারণ গান।

In you catch a chinchilla in chile
And then cutoff its beard, willynilly.
With a small rajor blade,
You can say that youv'e made
A chilean chinchilla's chinchilly.

এক রাউণ্ড নাচের পর বড়মামা হরিদাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'হরিদা! বাবা কেদারনাথ তোমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি কোনো স্বপ্ন পেয়েছ?'

'স্বপ্ন নয়, আদেশ পেয়েছি। আমাদের বুড়োশিবতলার বেলগাছের মাথা থেকে ভর সন্ধেবেলা কে যেন গম্ভীরগলায় হেঁকে বললেন, 'হরে, ওরা বিপদে পড়েছে, শিগ্গির ছুটে যা। ছেলে দুটোকে সেভ কর।'

'বাবা মহাদেবের আদেশ। তবে ইংরিজিটা না বললেই পারতেন।'

'উনি ইংরিজিটা বলেনিনি, ইংরিজিটা আমার।'

'হ্যাঁ, তাই বলো।'

বেলার দিকে মেজমামা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, রেল অফিস। টিকিট কাটতে। দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ হয়ে হিমালয়। রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ। রুট আমাদের তৈরি। দু'জনেই ঠিক করেছেন, মহাপ্রস্থানের পথ ধরেই এগোবেন। যতদূর যাওয়া যায়। পথের শেষে সত্যিই যদি স্বর্গ থাকে, তাহলে দরজাটা ঠেলে দেখে আসবেন, ভেতরে কতবড় বাগান, ফোয়ারা, ইন্দ্রপুরী! স্বর্গে মানুষ কী খায়। বড়মামার ধারণা, সবাই সেখানে রকম রকম আইসক্রিম খায়, ট্রবোর, ভ্যানিলা, চকোলেট। বরফে গর্ত করে কামধেনুর দুধ আর চিনি ঢেলে দিলেই কুলফি মালাই।

সাতদিন পরেই আমরা তিনজন হরিদ্বার। হর-কি-পৌরিতে গঙ্গার ধারে তোফা বসে আছি। গঙ্গা বহে চলেছেন হর হর শব্দে। সত্যি কি জায়গা! বড়মামা প্রায় ধ্যানস্থ অবস্থায় ঘোষণা করলেন, 'আমি আর মর্ত্যে ফিরব না।'

মেজমামা বললেন, 'এইটা তোমার স্বর্গ?'

'এইই হল স্বর্গের চৌকাঠ। কাল আমার আরো আনন্দের দিন। লছমনঝুলা পেরিয়ে সোজা চলে যাব সেই জায়গায় যেখানে মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, ভোট নেই, বোমা নেই, হিন্দি সিনেমা নেই। সেখানে অনন্ত যৌবন। জলে জন্ডিস নেই, আন্ত্রিক নেই, অ্যান্টিবায়োটিক নেই।'

মেজমামা বললেন, 'ওখানে কাটলেট নেই, চিলি চিকেন নেই, ফ্রায়েড প্রন নেই।'

'মেজ! তোর এখনো ভোগে এত মতি! ভোগই দুর্ভোগের কারণ। বিচার কর। কাটলেটে কি আছে! এক টুকরো মাংস। সেটা কি মাংস, কেউ জানে না, কুকুর হতে পারে, ধেড়ে ইঁদুর হতে পারে, সেটাকে কিমা করে, ময়দা দিয়ে বেঁধে, ডিম গোলায় চুবিয়ে লেড়ো বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে শূকরের চর্বিতে ভাজা। ভাবলেই পেট গুলোয়। চিলি চিকেনে কি আছে। দীন-হীন-অসহায় একটা মুরগিকে শুধু হত্যা করেনি, নৃশংস এক রাঁধুনী তাকে নুন আর লঙ্কায় চুবিয়েছে। আর ফ্রায়েড প্রন! চিংড়ি হল জলের পোকা। পচা চিংড়ির গন্ধে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাহলে বুঝলে ব্যাপারটা! ভোজ মানে হিংসা, হত্যা, বদহজম, দুর্ভোগ। আমাদের এই বয়েসে দুটো জিনিসের প্রয়োজন, ত্যাগ আর সংযম।'

মেজমামা আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি তো তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।'

'আরে তাতে কী হয়েছে, যাঁরা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন। পঁতাল্লিশ আর পঞ্চাশ একই ব্যাপার। ফর্টি তো ক্রশ করেছে।'

॥ তিন ॥

আমার মামাদের থেকে থেকেই খুব খিদে পেয়ে যায়।

বেশ বসেছিলুম প্রবাহিনী গঙ্গার ধারে। যত রাত বাড়ছে চারপাশে তত লোক বাড়ছে—ভজন হচ্ছে। কথকতা হচ্ছে। কত আলো, কত ভক্তি। এরই মাঝে বড়মামা হঠাৎ বললেন।—

'আর বসে থাকা যায় না। পেট চোঁ-চোঁ করছে।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমারও একই অবস্থা। ছুঁচো ডন মারছে পেটে।'

বড়মামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কী অবস্থা?'

'আমি খিদে টিদে ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে, সারা রাত এইখানে বসে থাকি।'

বড়মামা বললেন, 'আহা! অত কথা তোকে কে বলতে বলেছে? খিদে পেয়েছে কী না।'

'অল্প, অল্প।'

'তাহলে চলো। আর দেরি কেন?'

যে হোটেলে আমরা কদিন ধরে খাচ্ছি, তার সবই ভাল, বেশ পরিষ্কার, ধবধবে সাদা দেরাদুন চালের ভাত। সমস্যা একটাই, সেটা হল তরকারি। লাল রঙের বদখত একটা

জিনিস। সবজিটা কী বোঝা মুশকিল—না আলু, না রাঙালু। মেজমামা নাম রেখেছেন গজালুর তরকারি। ভাতকে গলায় চালান করার একমাত্র সহায়, পাঁপর।

মেজমামা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এ বেশ হয়েছে ভালো, সকালে গজালু, রাতে গজালু, শয়নে গজালু স্বপনে গজালু। সর্বং গজালুময়ং জগৎ।'

বড়মামা বললেন, 'এই ভাবেই মানুষের বৈরাগ্য আসবে ভাই। চলো, শুয়ে পড়া যাক।

কাল অতি ভোরে ঊষাকালে আমাদের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা।'

আমাদের নিবাসের ঠিক তলা দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছেন 'হর হর' শব্দে। সেই সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুম এসে গেল এক সময়। স্বপ্ন দেখলুম, তুষারমৌলি হিমালয়। মাথার ওপর চিল উড়ছে।

সাতসকালে মালাই দেওয়া চা খেয়ে যাত্রা শুরু হল। আমরা যেন সন্ন্যাসী। হাতে কম্বল, কমণ্ডলু, লাঠি। মামাদের পরিধানে আলখাল্লা। মাথায় সন্ন্যাসীদের টুপি। একটু

বাড়াবাড়ি হলেও, দেখাচ্ছে সুন্দর। দু'জনের চেহারাই তো খুব সুন্দর। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। কেউ কেউ মনে হয় শিষ্য হবার বাসনা করছেন মনে মনে।

লছমনঝুলায় এসে আমাদের হাঁটা শুরু হল। গীতাভবনে সেই রাতের মতো যাত্রাবিরতি। কলকাতায় বসে ভাবাই যায় না। পৃথিবীটা এত সুন্দর। পাহাড়ের পর পাহাড়। প্রবাহিত অলকান্দা। শীত শীত বাতাস। ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, সন্ন্যাসীরা ঘুরছেন। আশ্রমের পর আশ্রম। কোথাও বেদগান, কোথাও রামনাম। এই তো স্বর্গ।

এক বাঙালি ভদ্রলোক সেই থেকে সমানে বক বক করছেন, হাঁটাপথে যাবেন না বাসে যাবেন। ভদ্রলোক হিমালয় বিশেষজ্ঞ। কলকাতায় ফিরে গিয়েই আবার ছুটে আসেন হিমালয়ে। মহা আকর্ষণ।

বড়মামা বললেন, 'মশাই! বাস, ট্রাম তো জীবনে চাপলেন অনেক, পদযাত্রীদের পথে চলুন না একবার। সেটাও তো অ্যাডভেঞ্চার!'

গাইড ছাড়া পারবেন যেতে?'

'পথই তো গাইড! পথই পথ দেখাবে।'

ভদ্রলোকের নাম, রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত। হাটখোলার জমিদার বংশের ছেলে। প্রচুর পয়সার মালিক কিন্তু অমায়িক। বিনয়ী। বিষ্ণুচরণ ঘোষের আখড়ায় ব্যায়াম করতেন। সুন্দর স্বাস্থ্য।

মেজমামা একটু তাতিয়ে দিলেন, 'এত সুন্দর চেহারা আপনার। আপনি ভয় পাচ্ছেন! বিপদই তো পদে পদে ভয় পাবে আপনাকে দেখে।'

রবীনবাবু বললেন, 'ভয়ডর আমার নেই। আমি যৌবনে একবার সিদ্ধান্ত করেছিলুম বাঘের সঙ্গে লড়াই করব। মুখার্জিবাবুর সার্কাসের একটা বাঘও ঠিক করা হয়েছিল। লড়াইটা হবে পার্কসার্কাসের ময়দানে। শেষ পর্যন্ত ক্যানসেল হয়ে গেল?'

বড়মামার ছেলেমানুষের মতো আগ্রহ, 'কেন, কেন, ক্যানসেল হল কেন? লাস্ট মোমেণ্টে ভয় পেয়ে গেছেন!'

'না না ভয় পাব কেন? টাকার জন্যে হল না। একটা বড় সাইজের বাঘের দাম দুলক্ষ টাকা। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, রবীনবাবু আপনার সঙ্গে লড়াই মনেই বাঘটার মৃত্যু। দু'লক্ষ টাকা চোট। আমি বললুম, প্রফেসর মুখার্জি, যদি আমি মারা যায়। ভদ্রলোক অম্লান বদনে বললেন, আপনার আর কীই বা দাম! আপনার ওজনের একটা ছাগল হলেও না হয় কথা ছিল। কেটে ঝুলিয়ে দিলেই ষাট টাকা কেজি। কথা শুনুন! অসভ্য, ইতর।'

মেজমামা বললেন, 'কথাটা অপ্রিয় হলেও অতিশয় সত্য। মানুষের কোনো মূল্য নেই।'

দত্তমশাই প্রতিবাদ করলেন, 'মানতে পারলুম না আপনার কথা। আইনস্টাইন, ওপেনহাইমার, এডিসন ফ্লেমিং, রাসেল, সক্রেটিস, এঁদের দাম নেই!'

'ওই রকম হতে পারলে দাম আছে, তা না হলে এক কানাকড়িও দাম নেই।' দত্তমশাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ন্যায্য কথা। আসলে কি জানেন, একবার জন্মে গেলে

মরতে ভীষণ ভয় করে। ওটা তো আমাদের কাছে বেপাড়া। ওপাড়ায় কি আছে কে জানে। বিশাল বিশাল উনুন, বিরাট বিরাট কড়া, সেই কড়ায় ফেলে হয়তো ফুলুরি ভাজার মতো ভাজবে।' মেজমামা এক ধমক লাগালেন, 'থামুন মশাই, একটা শিক্ষিত লোক হয়ে এই সব ভাবেন কী করে। একটা বেলুনের ভেতর কি থাকে?'

'হাওয়া।'

'এক একটা মানুষ এক একটা বেলুন। হাওয়াটা বেরিয়ে গেলেই চুপসে গেল। হাওয়ার মানুষ হাওয়াতেই মিশে গেল। যা বলবেন বুঝেসুঝে বলবেন, আপনি এখন আর কচি খোকাটি নন। নিন উঠুন। অনেক কথা হয়েছে, এইবার এনার্জি স্টোর করে নিয়ে বেরোতে হবে।'

কিছুটা পথ আমরা বাসে এলুম। ভয়ঙ্কর পথ। স্টিয়ারিং সামান্য এদিক ওদিক হলেই হাজার ফুট খাদে ধপাস। আমরা একটা জায়গায় তিনজন নেমে পড়লুম। কন্ডাকটার জিজ্ঞেস করলেন, এখানে নামছেন? যাবেন কোথায়? এখানে থাকার কোনো চটি নেই।'

মেজমামা উত্তরে বিজ্ঞের মতো হাসলেন।

এই চটি শব্দটাই দত্তমশাইকে ভাবিয়ে তুলল। বাসটা চলে যেতেই দত্তমশাই শুরু করে দিলেন, 'হ্যাঁ মশাই, কাজটা কি ভাল হচ্ছে। চলতে, চলতে রাত তো হবেই, তখন আমরা থাকব কোথায়! চটি নেই তো!'

বড়মামা দার্শনিকের মতো বললেন, 'তিনি যেখানে রাখবেন সেইখানেই থাকব। তেমন হলে গাছতলা তো আছেই।'

দত্তমশাই বললেন, 'বাঘও তো আছে।'

মেজমামা বললেন, 'থাকলেই বা, ভয় কী, আপনি তো আছেন। বেওয়ারিশ বাঘের সঙ্গে লড়ে যাবেন, লাখটাকা লাগবে না।'

দত্তমশাই নিজের প্যাঁচে পড়ে ঢোঁক গিললেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। বড়মামা তাঁর ভয়ঙ্কর হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাপ্রস্থানের পথ কোনটা!'

সন্ন্যাসী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ থমকে থেকে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, 'এখানে তো সবই মহাপ্রস্থানের পথ বাবা, একটু অসাবধান হলেই খাদে পতন ও সশরীরে স্বর্গে গমন। তবে হ্যাঁ, সেকালের তীর্থযাত্রীরা যে হাঁটাপথে কেদারে যেত, সেটা ওই বাঁ দিকে। ওপথে আজকাল আর কেউ যায় না। তোমরা যাবে না কি!'

মেজমামা টপ করে একটা প্রণাম করে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন।'

সন্ন্যাসী একটু সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের পথে চলে গেলেন।

দত্তমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, মরতে যদি হয় তো মরব। আর আমি ভাবতে পারছি না। চলুন তো মশাই। আমার এইবার রোখ চেপে গেছে।'

তিনি তরতর করে এগিয়ে চললেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ মানুষ। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। টকটকে ফর্সা। ডানদিকে পাহাড়ের দেওয়াল, বাঁ দিকে সুঁড়ি পথ। ভাঙা-চোরা। বড়, ছোট পাথর ছড়ান। পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টির জল গড়াতে গড়াতে সরু সরু নালি তৈরি হয়েছে। বাঁ দিকের গভীর বন। দিনের বেলা, তাও ঝিঁঝির ডাকে কান পাতা যায় না।

আমি সবার আগে নাচতে নাচতে চলেচি। বেশ ঠাণ্ডা, তাই কোনো কষ্টই হচ্ছে না। ভয় তো হচ্ছেই না। দিনের বেলা আবার ভয় কিসের। রাত আসুক দেখা যাবে। আমার দুই মামা থেকে থেকেই বলছেন, ওয়াণ্ডারফুল, একস্ট্রা অর্ডিনারি, জীবন ধন্য। মরি যদি সেও ভালো। দত্তমশাই নিজেকে সাহস দেওয়ার জন্যে গান ধরলেন—আমি ভয় করব না ভয় করব না।

হঠাৎ আমাদের মনে হল ব্যাপারটা কী। আমরা চারজন ছাড়া কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। লোকালয় বলে কিছু নেই। তার ওপর বাঁ দিকের জঙ্গল হঠাৎ অনেকটা নিচে চলে গেল। তা প্রায় হাজার ফুট নীচে।

সামনে ভাঙাচোরা পায়ে চলা পথ। খুবই সরু। একটু অসাবধান হলেই বাঁ দিকের গভীর খাদে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে, পথের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বড়মামার পাঁচ সেলের টর্চ এই বিশাল অন্ধকারের রাজত্বে দেশলাই।

বড়মামার চিন্তিত গলা পাওয়া গেল, 'মেজ আমরা এখন নো ম্যানস ল্যাণ্ডে। একেই বলে হর্নস অফ ডাইলেমা, এগোবো না পেছোবো।'

মেজমামা বীরের মতো বললেন, 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভীরুরা। আমরা সাহসী, করেঙ্গে ইয়ে...মেজমামা অদৃশ্য। বহু নিচে থেকে শোনা গেল, 'মরেঙ্গে'।

দত্তমশাই বললেন, 'যাঃ, আপনার মেজ ভাই গনফট। তলিয়ে গেছে। 'বড়মামা বললেন, 'তলিয়ে গেছে মানে?'

'মানে, সামনে আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? তিনি মহাপ্রস্থানে গেলেন। সামনে আর রাস্তা নেই, বিশাল খাদ। তিনি আত্মবলিদান করে আমাদের বাঁচালেন।'

বড়মামা কাঁদো কঁদো গলায় বললেন, 'মেজো মারা গেল?'

আমি ভাঙা পথের ওপর শুয়ে পড়ে মুখ ঝুলিয়ে থকথকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়লুম, 'মেজোমামা?'

অনেকটা নিচে থেকে উত্তর এল, 'ফাসক্লাস আছি, জায়গাটা বেশ মনোরম। অনেকটা নিচে একটা নদী বইছে মনে হয়। জলের আওয়াজ পাচ্ছি।'

বড়মামাও আমার পাশে শুয়ে পড়ে মুখ ঝুলিয়ে টর্চলাইট মারলেন। আলোর পথ অন্ধকারে কিছু দূর নেমে হারিয়ে গেল। বড়মামা চিৎকার করে বললেন, 'মেজ! উঠে আসতে পারবি?'

মেজমামার উত্তর এল, 'অসম্ভব! আমার আশা তোমরা ছেড়ে দাও।

দত্তমশাই অন্ধকারে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বড়মামা তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মশাই! এ তো দেখছি ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিতে হবে। তাঁরা শুনেছি হাওড়া ব্রিজের মাথা থেকে পাগল নামাতে পারেন। কুয়ো থেকে গরু তুলতে পারেন।

দত্তমশাই বললেন, 'ভুল করছেন, এটা কলকাতা নয়।'

'তা হলে কী হবে?'

'এই রাতে আর কী হবে। উনি ওইখানে যেমন আছেন থাকুন, আমরা এইখানে থাকি। ভোর হলে দেখা যাবে।'

'এই সরু জায়গায় আমরা থাকব কী করে? পাশ ফিরলেই তো পড়ে যাব!'

'আপনি কি এটাকে খাট ভাবছেন! ঘুমোবেন না কী! পাহাড়ে পিঠ দিয়ে আমরা জেগে বসে থাকব। তা ছাড়া এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে আর খুঁজে পাব না। আমরা সারা রাত গান গাইব। আমি ভাল কীর্তন জানি, আসুন জমিয়ে বসা যাক। খাবার দাবার যা আছে বের করুন।'

বড়মামা বললেন, খাবার তো মেজর ঝুলিতে।

দত্ত মশাইও বললেন, 'বাঃ তোফা। সারারাত আমাদের নিরম্বু উপবাস।'

'আপনার খাওয়ার চিন্তা আসছে? একটা মানুষ হাজার ফুট নিচে ঝুলছে, আমরা একটা ছাতের কার্নিসে কোনো রকমে বসে আছি, কনকনে বাতাসে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, একটু পরেই ওপর পাহাড় থেকে ভাল্লুক নামবে, আপনি খাওয়ার কথা বলতে পারলে?'

'না খেলে কাল আপনার ভাইকে তুলব কী করে?'

উঃ রাতের মতো রাত! হাড়কাঁপানো বাতাস। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। মাঝে মাঝে অলৌকিক একটা আলো অকাশে খেলা করে যাচ্ছে। কিড্‌র কিট, কিড্‌র কিট করে একটা শব্দ অনবরতই হয়ে চলেছে। গুম্ গুম্ করে পিলে কাঁপানো একটা শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসছে। দত্তমশাই বললেন, পাহাড় ভেঙে পড়ার শব্দ। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি আমরা তিনটে ভাল্লুক।

বসে থাকতে থাকতে দত্তমশাই হঠাৎ বললেন, 'এই সময় যদি হঠাৎ পাহাড়ী বৃষ্টি নামে। সেই তোড়ে আমরা তিনজনেই নিচে নেমে যাব।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'বৃষ্টি কখন হবে?'

'এনি মোমেণ্ট, এনি টাইম'।

শীতকাঁপা গলায় বড়মামা বললেন, 'তখন কী হবে?'

দত্তমশাই বেপরোয়া গলায় বললেন, 'কী আর হবে! রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে?'

দুরে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল গুম গুম করে। দত্তমশাই বললেন, 'ওই শুনুন। ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে।'

কোনোরকমে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে রাতটা আমরা কাটালুম। অসাধারণ একটা ভোর। সোনার পাত মোড়া একটা আকাশ। ভগবানের খোদ দপ্তরের রকমসকমই আলাদা।

বড়মামা খাদের কিনারায় মুখ ঝুলিয়ে ডাকলেন, 'মেজো'।

নিচে থেকে উত্তর এল, 'গুড মরনিং। ব্রেকফাস্ট ড্রপ করে দাও।' 'ব্রেক ফাস্ট! খাবারের ঝোলা তো তোর কাছে!'

সে তো কাঁধ থেকে স্লিপ করে, আমাকে ত্যাগ করে আমার চেয়ে নিচে চলে গেছে।'

'তুই আছিস কোথায়?'

'মনে হচ্ছে একটা বাড়ির চালে বসে আছি।'

'সে কী রে?'

'এটা একটা ফরেস্ট বাংলোর ছাত। নিচে অনেক ফরেনার ঘোরাঘুরি করছে। সুন্দর সুন্দর সব মেমসাহেব।'

বড়মামা ছোট ছেলে যে-রকম বায়না করে সেইরকম গলায় বললেন, 'আমরাও তোর কাছে যাব ভাই।' মেজমামা অনেক নিচে থেকে হেঁকে বললেন, 'আমার মতো হড়কে নেমে এস।'

বড়মামা দত্তমশাইকে বললেন, 'আসুন আমরা তাহলে হড়কাই।'

দত্তমশাই বললেন, উনি বাইচান্‌স কপালের জোরে ওইখানে পড়েছেন। নিজের ইচ্ছেতে নয়। আমাদের বেলায় তা নাও হতে পারে। তালগোল পাকাতে পাকাতে সোজা নিচে, তারপর হাড়গোড় ভাঙা।'

'তা হলে?'

'আমার মনে হচ্ছে, রাস্তা একটা আছে।'

'কোথায়?'

আমারা আসার পথে অনেকটা পেছনে, বাঁদিকে একটা পথ দেখেছিলুম মনে আছে? সেই পথটাই নেমে অলকানন্দা।

বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা তিনজন ধুঁকতে ধুঁকতে অলকানন্দার তীরে সেই সুন্দর ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছে গেলুম। মেজমামা যে-জায়গাটায় এক মিনিটে পৌঁছেছিলেন আমাদের সেই জায়গায় আসতে সাত ঘণ্টা সময় লাগল।

সুপারিনটেন্ডেণ্ট খাতা থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আপনারা ক'জন আছেন?'

বড়মামা বললেন, 'চারজন।'

'চারজন কোথায়? তিনজন তো!'

'আর একজন চালে বসে আছে। আকাশ থেকে ল্যাণ্ড করেছে। আপনাদের মই আছে!' ভদ্রলোক অবাক হলেন। বেরিয়ে এলেন বাইরের কম্পাউণ্ডে। খাড়াখাড়া পাইন গাছ। তারই আড়ালে একটা কটেজের লাল চালে মেজমামা পা ছড়িয়ে বসে আছেন। মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

বড়মামা বললেন, 'ওই যে, ওকে নামাতে পারলেই আমরা চারজন। জাস্ট একটা মই পেলেই হয়ে যায়। ব্রিং এ ল্যাডার।'

মেজমামা ওদিকে, সেকালের জমিদাররা যে-কায়দায় তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে সেরেস্তায় বসে থাকতেন সেইভাবে আধশোয়া হয়ে চালে চালকুমড়োর মতো শোভা পাচ্ছেন।

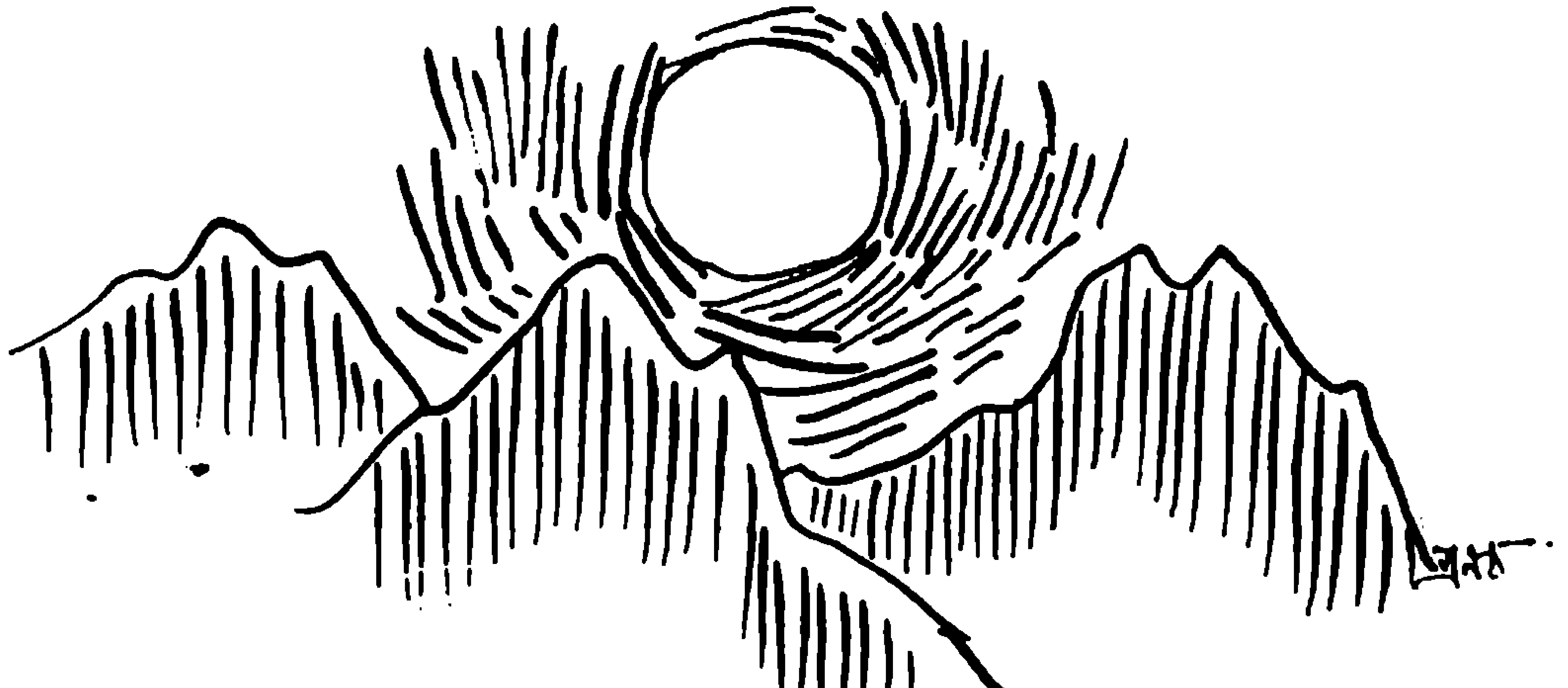

বিপাশায় দুই মামা

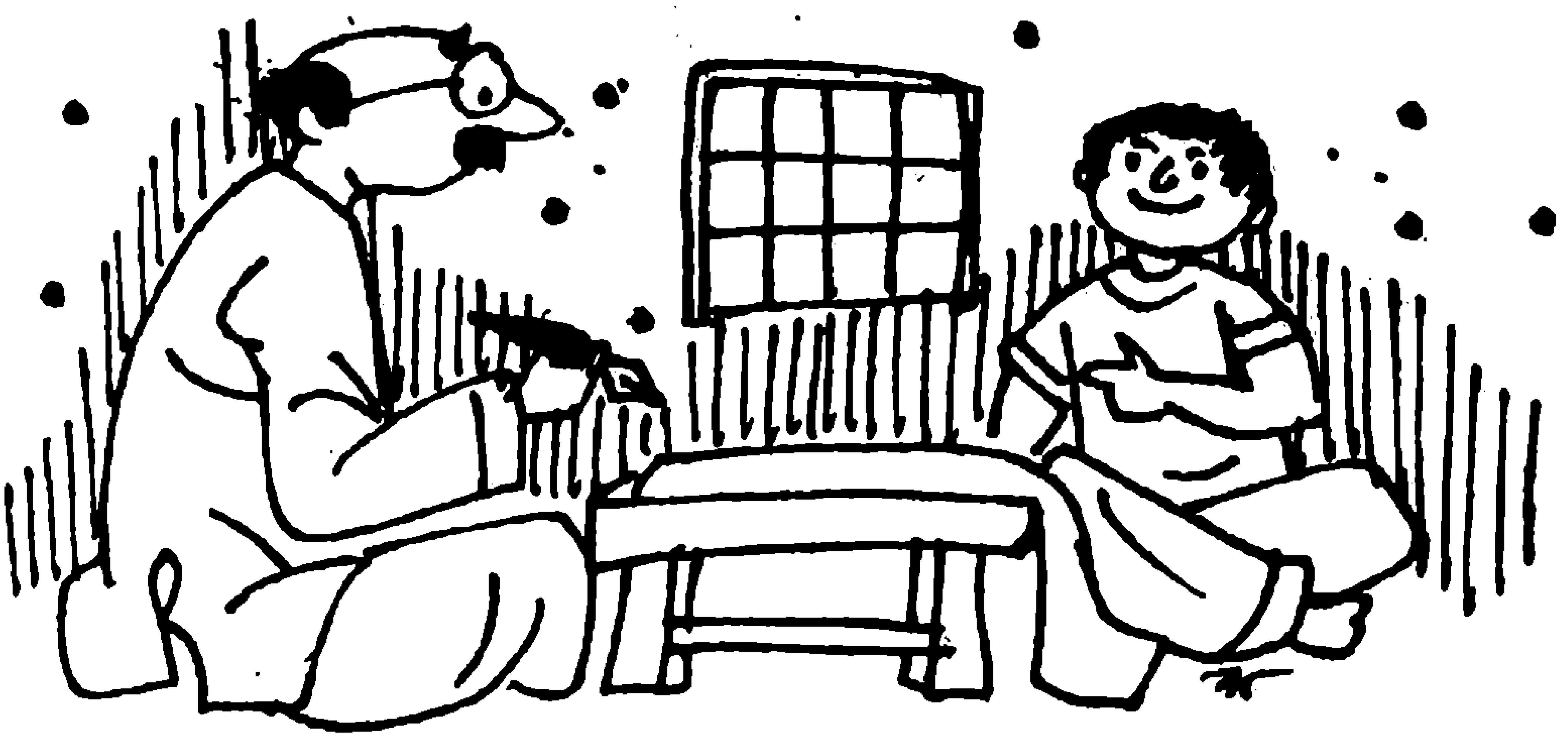

'লেখ্‌! বিপাশা নদীর তীরে আমার পর্ণ কুটীরে...'

বড়মামা লেখক হবেন। আমাকে নিয়ে বসেছেন। বড়মামা বলে যাবেন আমি লিখে যাব। বড়মামার হতের লেখা ভাল নয়। বাংলাও পড়া যায় না, ইংরিজিও পড়া যায় না। নামজাদা ডাক্তার। সারা দিনে শতিনেক প্রেসক্রিপশান লেখেন। সে-লেখা ওষুধের দোকানেই পড়তে পারে। তাও মাঝে মাঝে ভুল পড়ে ভুল ওষুধ দিয়ে দেয়। একবার জ্বরের ওষুধের বদলে জোলাপ দিয়ে দিয়েছিল। রোগী তিন জ্বরে পড়েছিল বিছানায়, শেষে গিয়ে শুল বাথরুমে। আশ্চর্য এই কেউ যার জ্বর নামাতে পারছিলেন না, তিনি একদিনে চাঙ্গা। সেই রোগী আবার ভারী, ওজনদার রাজনৈতিক নেতা। পকেটে সব সময় মাল বোঝাই একটা মেশিন থাকে। এমন কি জ্বরের সময়েও ছিল। বড়মামা পেট টিপে লিভার পরীক্ষার সময় সেইটাকেই টিপতে টিপতে বলেছিলেন, কি করে বাঁচবে, লিভারটা ত লোহা হয়ে গেছে। রোগী হাসতে হাসতে বলেছিল, ওটা লিভার নয় লোডেড রিভলভার। লিভারটা তলায় আছে। সেই নেতা সুস্থ হয়ে বড়মামার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে। বড়মামা আবার বক্তৃতায় বললেন, 'তোমরা সমাজসেবী নেতা, আমাদের সকলের প্রিয় নাদুকে, যার ভাল নাম সূর্যকান্ত, সেই উদীয়মান সূর্যকে জীবনের আদর্শ করো। দেশের দশের সেবা করো।' আমরা বাড়িতে বড়মামাকে সবাই চেপে ধরলুম, এটা কি হল? বড়মামা বললেন, 'ভুল ওষুধে মরে যেতেও পারত। তখন কি হত! আমাদেরও ওর সঙ্গে স্বর্গে যেতে হত। একটু পিঠ চাপড়ে দিলুম আর কি! বুঝতে পারলি ব্যাপারটা! আর আমার পাওয়ারও একটু বেড়ে গেল।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'পর্ণকুটীর লিখবি, না চালাবাড়ি লিখবি।'

'বিপাশা নদীর তীরে চালাবাড়ি থাকতে পারে না। পর্ণকুটীরই থাকে।'

'পর্ণকুটীর কাকে বলে রে?'

'সে এক অসাধারণ সুন্দর, লতায়-পাতায় ঢাকা ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার।'

'তুই দেখেছিস?'

'আমি কি করে দেখব, তবে ইন্টারনেটে হয়ত দেখা যেতে পারে।'

'বিপাশা নদীটা কোথায় রে?'

'আপনি দেখেন নি?'

'আমি গঙ্গা, দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী আর সুবর্ণরেখা দেখেছি।'

'তাহলে যে-নদী দেখেন নি, সেই নদীর ধারে, যে-কুটীর দেখেন নি সেই কুটীরের কথা লিখছেন কেন?'

'মিথ্যে ছাড়া গল্প হয় না। সত্যই যদি হবে ত গল্প বলবে কেন? তুই যদি গল্পে মাছের ঝোল খাচ্ছে পড়িস, তাহলে জানবি সেই ঝোলের ঝোল, আলু, পটল, পেঁপে, মশলা, মাছ সব মিথ্যে। এই যেমন ধর ভূত। সবই গল্পে, একদিনও সত্যি ভূত দেখেছিস?'

মেজমামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আমি ছবার দেখেছি, এই বাড়িতেই তিন বার।' মেজমামা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বসে বললেন, 'সেনসেশানাল। গায়ের লোম খাঁড়া হয়ে যাবে।'

বড়মামা বললেন, 'কি করা যাবে মেজো, ভূত যে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস আসে না আমার। ডাক্তারি পড়ার সময় কঙ্কাল নিয়ে ঘর করেছি আর কত যে মড়া কেটেছি!'

'ভূত আলাদা জিনিস বড়দা। সে না দেখলে তোমার কোনো ধারণাই হবে না। যাই হোক, তোমাকে জোর করে কিছু বিশ্বাস করাতে চাই না। ভূত যদি কৃপা করে তাহলে হবে। তা, কি করছ এখন?'

'গল্প লিখছি।'

'সে কি, প্রেসক্রিপশান লেখা ছেড়ে দিয়ে গল্প!'

'অবাক হবার কি আছে? ডাক্তাররাই বড় লেখক হয়। কোনান ডয়েল, বনফুল।'

'কতটা লিখলে?'

'সবে পেতেছি, এইবার ধীরে ধীরে বিছবো।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নে, কলম ধর। ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। শতদ্রু নদীর ধারে...'

'বিপাশা বলেছিলেন।'

'বেশ, বিপাশা নদীর তীরে আমার পর্ণকুটীর। পাশেই সঙ্কীর্ণ মুনির আশ্রম। সেখানে সাতটি মৃগ ঘাস খাচ্ছে।'

'খাস খাচ্ছে বলবেন? মৃগর সঙ্গে ঘাস যায় না।'

'কি যায়?'

'শষ্প।'

'তা, তাই লেখ, শষ্প খাচ্ছে।'

মেজমামা বললেন, 'ওঃ প্রতিভার বাষ্প বেরচ্ছে। শষ্প খাচ্ছে!'

বড়মামা বললেন, 'কেন, তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে? হরিণ ঘাস খায় না?'

মেজমামা বললেন, 'হরিণ অবশ্যই ঘাস খায়, তব মৃগ শষ্প খায় না, ভোজন করে।'
বড়মামা বললেন, 'কেন? শষ্প কি এমন জিনিস যে ভোজন করতে হবে?'
মেজমামা মুচকি হেসে বললেন, 'এই তো বড়বাবু, সাহিত্যিক হওয়া কি এতই সহজ! প্রতিভা থাকা চাই। ভাষার ওপর দখল থাকা চাই। তুমি তো আবার কিছু শিখতে চাও না, তা না হলে আমি একটু সাহায্য করতে পারতুম।'
'পারতে, তো পারো, হাত লাগাও।'
মেজমামা বললেন, 'হাত নয় মুখ লাগাচ্ছি। নে লেখ; বিপাশা নদীর তীরে আমার স্বর্ণকুটীরের পাশে সঙ্কর্ষণ মুনির সুরম্য আশ্রম সংলগ্ন সবুজ তৃণভূমিতে প্রসন্ন রৌদ্রাভাসিত সকালে একদল অতিসুন্দর মৃগ শষ্প ভোজনে নিরত ছিল।'
মেজমামা হাসি হাসি মুখে বড়মামাকে বললেন, 'কি বুঝলে?'
বড়মামা বললেন, 'মালগড়ি।'
'মালগাড়ি মানে?'
'বিশাল লম্বা। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, কমাও নেই ফুলস্টপও নেই। লেভেল ক্রসিং-এ আটকালে তবেই বোঝা যায় মালগাড়ি কত লম্বা। তবে হ্যাঁ, নামিয়েছিস ভাল। আর একটু এগো।'
মেজমামা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'নে লেখ, ঋষিপুত্র নির্বাণ বেদপাঠ করতে করতে বিপাশার দিকে তাকিয়ে দেখলে, ভরাপালে একটি নৌকা মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। নৌকার ছইয়ে বসে অপূর্ব সুন্দর এক যুবক বাঁশি বাজাচ্ছে। পক্ষীর কলতান বংশীর সুরধ্বনিতে প্রভাতের বাতাস যেন রবীন্দ্রনাথ!'
বড়মামা বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ মানে?'
'এই দ্যাখো, বেসিক জিনিসটাই জান না, সাহিত্য করছ! রবীন্দ্রনাথ মানে কবিতা। আকাশে, বাতাসে, পাহাড়ে, পর্বতে, অরণ্যে, সমুদ্রে, হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ। কবিতা মানেই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মানেই কবিতা। রবীন্দ্রনাথ কিছু পড়েছ?'
বড়মামা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'না রে, পড়িনি তেমন, তবে শুনেছি। সেদিন উত্তরপাড়ায় একটা সভায় নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে একটা মেয়ে আবৃত্তি করছিল, পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল। আর আমি নিজে মাঝে মাঝে গাই, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার...।'
মেজমামা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওতে হবে না। আগে রবীন্দ্রনাথ পড় তারপর কলম ধর। তবেই সৃষ্টি করতে পারবে কালজয়ী সাহিত্য।'
মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন, 'এ ঘরে কটা পাখা? তিনটে। প্রত্যেকটার তিনটে করে ব্লেড। তার মানে মোট নটা। বড়দা আর মেজদা, এক একজনের ভাগে পড়ছে সাড়ে চারখানা।'
মেজমামা বললেন, 'সাড়ে চারখানা কি?'
'সাড়ে চারখানা ব্লেড।'
বড়মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, নিজেকেই নিজে বলছেন, 'ভীষণ ক্রিটিক্যাল কেস। বাঁচবে না, তবু শেষ চেষ্টা, যমের মুখ থেকে, যমের মুখ থেকে...' দরজার দিকে গুটি গুটি এগোচ্ছেন।

মাসিমা খপ করে হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'পালাচ্ছ কোথায়? আমার এ হাত যম এলেও ছাড়াতে পারবে না।'

মেজমামা দর্শনের অধ্যাপক। তিনিও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন, নিজেকেই নিজে বলছেন, 'কিরকেগারের বইটা এখানে নেই, না? দেখি ছাতের ঘরে।'

মাসিমা খপ্ করে আর এক হাতে মেজমামাকে ধরেছেন, 'এটা আরো বেশি শয়তান। কিরকেগার, ছাতের ঘরে ধুলো ছাড়া কিছুই নেই।'

মাসিমা আমাকে বললেন, 'যা, ঘড়াঞ্চিটা নিয়ে আয়। পুজো এসে গেল পাখার ছিরি দেখ।'

ঘড়াঞ্চি এল। সেটাকে ফিট করা হল একটা পাখার নীচে।

মাসিমা বললেন, 'আগে বড়টা উঠবে, মেজটা ধরে থাকবে। ঘড়াঞ্চির ঠ্যাং যেন হড়কে না যায়। এরপর মেজদা উঠবে, বড়দা ধরবে। আর তুই থাকবি পাহারায়। ঘুষ খাবি না।'

মেজমামা বললেন, 'ও ডাক্তার, ঝাড়পোঁছ ওর আসে, কুসী! আমি যে দার্শনিক!'

মাসিমা বললেন, 'শুধু দর্শন করলে হবে? ঝাড়পোঁছ কে করবে? পড়ো নি, ক্লিনলিনেস ইজ গডলিনেস। এই কাজ বেকার হবে না। গঙ্গার ইলিশ এসেছে এক জোড়া। প্রত্যেকে চারপিস। সঙ্গে ডিম। আমি রাঁধতে যাচ্ছি, একটু পরেই গন্ধ পাবে। সিলিং-এর কাছে আরো বেশি পাবে। নিজেদের কাজ নিজেদেরই করতে হয়। পরনির্ভর হলে চলে না।'

মাসিমা বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন আমাকে, 'তুই পাহারায় থাক। ফাঁকি দিলেই আমাকে রিপোর্ট করবি।'

কিছু দূর গিয়ে মাসিমা আবার ফিরে এলেন। আমাকে বললেন, 'শোন পিন্টু। এরা দরজা বন্ধ করে তোকে দিয়ে কাজটা করাতে চাইবে। খুব সাবধান! দরজাটা খোলাই থাকবে। আমি এক একবার এসে দেখে যাব।'

মাসিমা চলে যেতেই মেজমামা বললেন, 'সাঙ্ঘাতিক মহিলা, মনের কথা টের পায়।'

বড়মামা বললেন, 'কেন, তুই ওইরকম কিছু ভাবছিলিস বুঝি?'

মেজমামা বললেন, 'না, না, আমি ভাবব কেন! ভাবছিল আমাদের ভাগনে, আহা, মামারা কেন কষ্ট করবে! এ আর কি এমন ব্যাপার আমিই করে দি।'

বড়মামা বললেন, 'আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস, বিপাশা নদীতে ডুব মারি।'

আমাদের পাড়ার ইলেকট্রিশিয়ান বিশুদা সঙ্গে তাঁর অ্যাসিসটেন্টকে নিয়ে ঢুকলেন, 'ডাক্তারবাবু, নমস্কার। মেজদা নমস্কার। ঘরটা যে একটু ছাড়তে হবে। পাখার ব্লেড পরিষ্কার করবে।'

'অ্যাঁ, এই যে বললে আমাদের করতে হবে।'

'ওই তো! দিদির জবাব নেই। আমাকে বললেন, যাও দেখ গে যাও, দুটোর মাথায় পাখা ভেঙে পড়েছে। হে হে হে।'

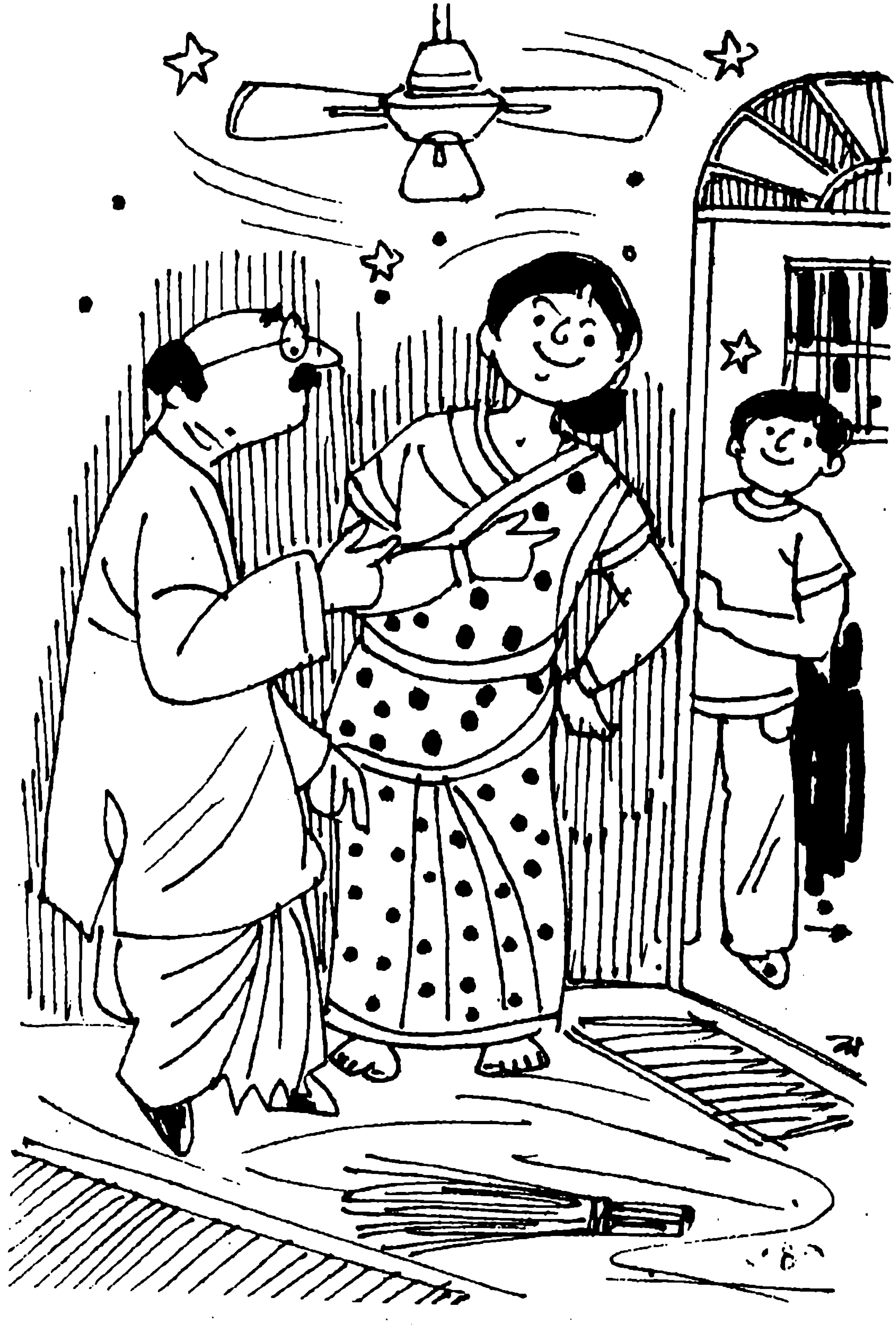

রুপোর মাছ

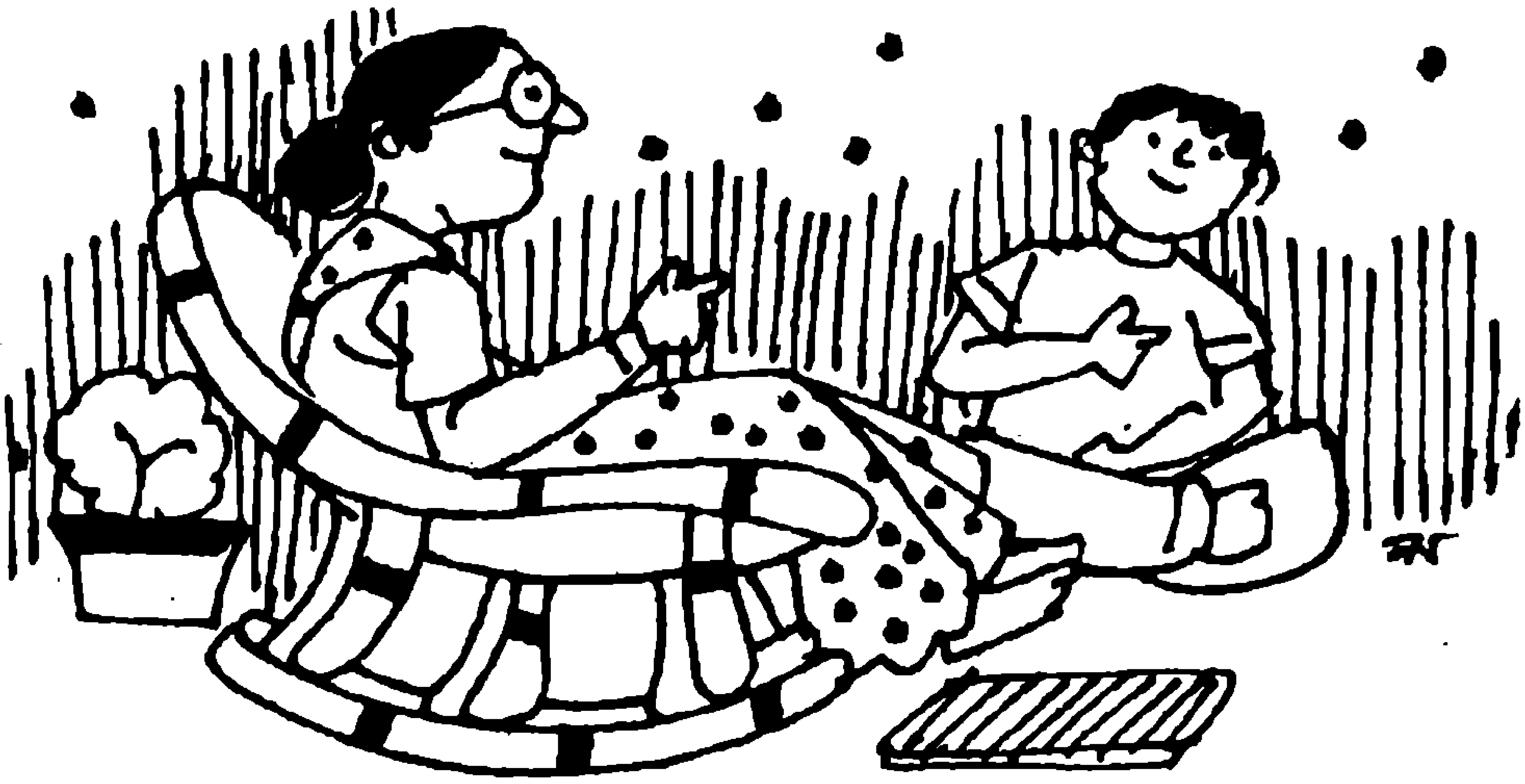

অনেকেই বলে মামার বাড়িতে মানুষ হওয়া ভাল নয়। নিজের বাড়ি ছেড়ে মামার বাড়ি কেন? অনেক সময় ছেলেদের বাবা মারা গেলে বা বাবার অবস্থা খারাপ হলে মায়েরা ছেলেকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আমার ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমার বড়মামা বিরাট ডাক্তার। মেজমামা নাম করা অধ্যাপক। আমার মাসিমাও খুব শিক্ষিতা। এক সময়ে একটা ভাল স্কুলে শিক্ষকতাও করেছিলেন কিছুকাল। আমার দুই মামা এবং মাসিমা ঠিকই করেছেন বিয়েটিয়ে করবে না। সাবেক আমলের বিশাল বাড়ি। বিরাট জমিদারি। আমার মাকে এসে অনুরোধ করেছিলেন, দিদি, ভাগ্নেটাকে আমাদের দিয়ে দে। তৈরি করে আবার তোর কাছে ফেরত দিয়ে যাব। ওখানে অতবড় জায়গা, খোলামেলা, কাছাকাছি ভাল ইস্কুল। দেখবি ও খুব আনন্দে থাকবে। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল কী জানি বাবা, বাবা মাকে ছেড়ে থাকতে পারব তো! এখন মনে হয় মামাদের আর মাসিকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না। লোকে বলে আনন্দ নিকেতন। আমার মামার বাড়িটা সত্যিই তাই। সব সময় একটা হুল্লোড়। যখন একা থাকি তখন ভাবি স্বর্গ তো দেখিনি, দেখতেও চাই না। আমার মামার বাড়িটাই তো স্বর্গ! আমার বড়মামা যেন মহাদেব। মেজমামাকে দেখলে মনে হয় অর্জুন। আর আমার মাসিমা যেন দ্রৌপদী! ঠিক দ্রৌপদীর মতো দেখতে। দ্রৌপদী কেমন দেখতে ছিলেন জানি না। তবে কল্পনায় দ্রৌপদীর যে ছবি আছে তার সঙ্গে আমার মাসিমার খুব মিল। নামটাও ভারি সুন্দর—কুসী! কুসী বোধ হয় একটা নদীর নাম। আবার কচি কচি আমকেও বলে কুসী। সত্যি কথা বলতে কী, আমি আমার মাসিমাকে মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি।

সকাল বেলা। মাসিমা আমাদের একতলার বসার ঘরে একটা দোল খাওয়া চেয়ারে বসে অল্প অল্প দুলছেন আর গান গাইছেন, দিবা নিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে

রচেছি আসন। কর্তা যিনি ক্ষ্যাপা তিনি ক্ষ্যাপার মূলাধার। চাকলা ছাড়া চ্যালা দুটো সঙ্গে অনিবার। আহা গুণের কথা কইবো কার। মাসিমা গান গাইছেন আর গান্ধারীদি একটা হাতল লাগানো ডাস্টার দিয়ে ছবির ধুলো ঝাড়ছে। মাসিমার বসে থাকার কারণ এই ধুলো ঝাড়ার কাজটা গান্ধারীদি একটু ফাঁকি দিয়ে সারে। তাই মাসিমা বলেছেন, আমি বসে থাকবো, আমার সামনে তুই পরিষ্কার করে সব ঝাড়বি। একটাও ছবি যেন না ভাঙে।

গান্ধারীদি একটা ছবি একটু নাড়াতেই ছবির পেছন থেকে একটা খাম মেঝের ওপর পড়ল। গান্ধারীদি থেবড়ে বসে খামটা দেখছে। মাসিমা গান থামিয়ে বললেন, 'কি ওটা?'

'এই ছবিটার পেছন থেকে খুটুস করে পড়ে গেল।'

'পড় না, পেছনে কার নাম লেখা আছে?'

'কিছু লেখা নেই গো। সাদা খাম। মোটা মতন। যেন পার্শে মাছের ডিম ধরেছে।'

'টিপে দেখনা।'

'না বাবা, ভয় করছে! কি না কি আছে ভেতরে। মাগ্গো!'

আমি ওপাশের টেবিলে বসে বসে অঙ্ক কষছিলুম। আর একটু পরেই মাস্টার মশাই আসবেন। মাসিমা আমাকে বললেন, 'বিলে দেখ তো, আমার আলসে লেগে গেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না চেয়ার ছেড়ে।'

আমি উঠে এসে খামটা হাতে নিয়ে খুলতেই ভেতর থেকে কিছু শুকনো বেলপাতা আর ফুল মেঝেতে পড়ে গেল। গান্ধারীদি বললে, 'ইঃ বাব্বা, ফুল বেলপাতা! কেউ তুকতাক করেছে গো!'

মাসিমা বললেন, 'তোর মাথা করেছে!'

গান্ধারীদি বললে, 'এই দেখ না সিঁদুর মাখানো বেলপাতা। চন্দন মাখানো জবা ফুল। একটা লাল কাপড়ের টুকরো। মেঝেতে যখন পড়ল না বাড়িটা একেবারে কেঁপে উঠল।'

মাসিমা বললেন, 'কেঁপে উঠল! আমরা কেউ টের পেলুম না!'

তুমি তো বসে বসে দুলছিলে আর ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা করে গান গাইছিলে। তুমি কি করে টের পাবে! হ্যাঁ, বিলু পেয়েছে। বাড়িটা কেমন কেঁপে উঠল নারে!'

আমি বললুম, 'অঙ্ক কষতে বসলে আমার কাছে তখন সারা পৃথিবীটাই কাঁপে। আমি অত বুঝতে পারিনি। তা বলছে যখন কেঁপেছে তাহলে কেঁপেছে!'

মাসিমা এক ধমক দিলেন আমাকে, 'চুপ কর!'

গান্ধারীদি বললে, 'এই দেখ বিশ্বাস কর না, ওই তো সে বার চৈত্র মাসে আমার মেসোমশাই যার পল্টন বাজারে অত বড় দোকান, এ বেলা ও বেলা হাজার টাকা রোজগার! আর কী খাওয়া! যখন খেতে বসতো তখন গোটা একটা

ছাগল মাথা বাদ দিয়ে খেয়ে উঠত। খেয়ে উঠে যখন ঢেঁকুর তুলতো তখন মনে হত রাজবাড়িতে তোপ পড়ল! পাড়ার লোকে ঘড়ি মিলিয়ে নিত—ঠিক আড়াইটে!

মাসিমা বললেন, 'তার সঙ্গে ফুল বেলপাতার কী সম্পর্ক?'

গান্ধারীদি বললে, 'আমার মা বলতো, গেঁদো যখন বলবি তখন সব গোড়া থেকে বলবি। জেনে রাখ আগে গাছের গোড়া তারপর ডালপালা।'

মাসিমা বললেন, 'আমার গোড়ার দরকার নেই। তুই ডালপালাটাই বল।'

গান্ধারীদি বললে, 'পিতা-মাতা আর গুরুর বাক্য আমি অমান্য করতে পারবো না। সে তুমি যাই বল। আমি গোড়া থেকেই বলবো।'

মাসিমা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'তাহলে তুই মাসিমার জন্ম মেসোমশাইয়ের জন্ম থেকেই বল, সে যবে শেষ হয় হবে।'

গান্ধারীদি খুব মিষ্টি গলায় শান্ত স্বরে বললে, 'শোন দিদি, তোমার গুণের কোনও তুলনা নেই। কিন্তু তোমার একটাই দোষ। কথায় কথায় বড় রেগে যাও। আমি কি অতটা গোড়া থেকে বলবো বলেছি? আমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই! তাহলে তো মার সঙ্গে বাবার বিয়ে দিয়ে শুরু করতে হয়! তুমিই বল যেটা আগে সেটা আগের। যেটা পরে সেটা পরের। আমার বাবা বলতো, গাঁদু আগে অ বলবি তারপর আ বলবি তারপরে হ্রস্বই।'

মাসিমা বললেন, 'তারপরে দীর্ঘ-ই বলবি, তারপরে হ্রস্ব-উ বলবি, তারপরে দীর্ঘ-উ বলবি তারপর...' মাসিমা ক্ষেপে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'ঋ, ঌ, ও, ঔ তারপরে ক, খ, গ, ঘ। তারপরে দ্বিতীয় ভাগ তার পরে নব ধারাপাত!'

গান্ধারীদি বললে, 'ওই দেখ, আমি একটা উপমা দিলুম, তুমি কিনা রেগে গিয়ে বর্ণপরিচয় পড়তে লাগলে! আমার মা কি বলতো জানো? মানুষ রাগে অন্ধ হয়ে যায়, অন্ধ! আমার বাবার ডান পা-টা কি করে ভেঙে ছিল জানো? রেগে গিয়ে।'

আমি মেঝের একপাশে বসে পড়েছি। থাক অঙ্ক মাসিমার সঙ্গে গান্ধারীদির লাগলে সে যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে!

মাসিমা বললেন, 'রেগে গিয়ে নিজের পা-টা দুমড়ে মটাস করে ভেঙে ফেললে!'

গান্ধারীদি বললে, 'আরে না গো সে এক কাণ্ড। শোন না! আমার বাবা যে কী রকম রাগী ছিল সে তুমি না বললে বুঝতে পারবে না।' মা বলেই বিয়ে করেছিল আমি হলে করতুম না।'

মাসিমা বললেন, 'ছি ছি ছি! বাবাকে কেউ বিয়ে করে!'

গান্ধারীদি বললে, 'দিদি তুমি সবই বোঝ কিন্তু বড় লেটে। দাঁড়াও তোমাকে বোঝাই। ধর আমি আমার মা। এবার আমার সম্বন্ধ হল আমার বাবার সঙ্গে। না এটা তুমি বুঝবে না। আর একটু খোলসা করি। ধর আমার সম্বন্ধ হল আমার মায়ের স্বামীর সঙ্গে। কি ক্লিয়ার! খালি তুমি চরিত্রটা পাল্টে নাও। ধর গান্ধারী

মা তাহলে কী হত? আমি পরিষ্কার বলে দিতুম, এ লোককে আমি বিয়ে করবো না।'

মাসিমা বললেন, 'তার মানে তুই তোর বাবাকে ভালবাসিস না, ঘৃণা করিস।'

গান্ধারীদি ফুঁসে উঠে বললে, 'সে যদি বল তো তাই বল। আমার অবস্থা দেখে তুমি বুঝতে পার না—যে আমার বাবা কেমন ছিল?'

মাসিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তার মানে তুই বলতে চাইছিস এই বাড়িতে তোর অবস্থা খুব খারাপ! তাকিয়ে দেখ আমার সঙ্গে তোর তফাৎ কোথায়! আমি গোটা কতক পাস করেছি, তুই করিস নি। যা তুই আমার সঙ্গে আর কথা বলবি না। তুমি তোমার মতো থাকো, আমি আমার মতো থাকি। তোর হাঁড়িতে তোর চাল ফুটবে আমার হাঁড়িতে আমার চাল।'

গান্ধারীদি কেঁদে ফেলেছে, 'এই নাও, কি বুঝতে কি বুঝলে! তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে গো! আমি কি তোমাদের পর? জেনে রাখো পর করলেও পর হচ্ছি না। তুমি সেই চেষ্টাই করছ। আমি কি জানি না।'

মাসিমা বললেন, 'আমি চেষ্টা করছি!'

গান্ধারীদি এইবার হাপুস কেঁদে বলতে লাগল, 'তা নাহলে তুমি এমন কথা বললে কি করে তোর হাঁড়িতে তোর চাল, আমার হাঁড়িতে আমার চাল!'

মাসিমা গান্ধারীদির চোখ মোছাতে মোছাতে বললেন, 'আমার হয়েছে পাগল আর পাগলি নিয়ে কারবার। ভাই দুটো বদ্ধ পাগল আর এই একটা পাগলি! তা বল তোর বাবার ঠ্যাং ভাঙল কি করে? না না ঠ্যাং বলাটা ঠিক হল না। তোর বাবার পা ভাঙল কি করে?'

গান্ধারীদি একটু সামলে নিয়ে শুরু করল, 'রোজ রাত্তিরে এক রাউন্ড পেটাপেটি তা হবেই। সেদিন মা বললে তুমি আমার গায়ে হাত তুলে দেখ তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। তার আগের দিন মা একটা হিন্দি ছবি দেখে এসেছিল। একটা বোতল ভেঙে খোঁচা মতো করে বাবাকে একবার শুধু ভয় দেখালে—আজ তোমার ভুঁড়ি ফাঁসাবো। বাবা অমনি ওরে বাবারে বলে এমন দৌড় লাগাল, দাওয়া থেকে উঠোনে। পড়বি তো পড় গর্তে! সেই মাকেই যেতে হল সদরে। পায়ে প্লাস্টার করে পড়ে রইল ন' মাস! ব্যবসা লাটে উঠল। দোকান বিক্রি হয়ে গেল। বাবা হয়ে গেল একটা জবুথবু জন্তুর মতো। তারপরে মা বিধবা হল। এই সব দেখে মা আমাকে একটা কথা বলেছিল। সেই কথাটা তোমাকেও বলে রাখি দিদি, মা বলেছিল, বুঝলি গান্ধারী হিন্দি ছবির কোমর দোলানো মেয়ে হতে যেও না। স্বামী যেমনই হোক দেবতা।'

মাসিমা বললেন, 'তাই তুই হিন্দি ছবি দেখিস না এতদিনে বুঝতে পারলুম।'

গান্ধারীদি বললে, 'ভাল লাগে না গো, কী সব বাজে বাজে গান। বাজে বাজে নাচ। ওরা কি আমাদের দেশের মেয়ে গো! পুরুষগুলোও ভারি বদ। খালি মদ খায় আর মারামারি করে।'

মাসিমা বললেন, 'তুই একেবারে খাঁটি কথা বলেছিস। সব পয়সার লোভে! বল গান্ধারী টাকা ছাড়া কি পৃথিবীতে কিছু নেই!'

গান্ধারীদি বললে, 'অ্যায় তুমি সার কথা বললে। মা আমাকে বলত, গেঁদো, উপোস করে মরবি সেও ভাল তবু চরিত্র নষ্ট করবি না।'

মাসিমা বললেন, 'বাঃ বাঃ! এই তো এ দেশের মেয়ে! স্বামীজির ভারতবর্ষের মেয়ে! হ্যাঁরে গান্ধারী তোর মা মারা যাবার পর কি হল?'

গান্ধারীদি বললে, 'আমার জন্মজন্মের যে বাবা সে তোমার ওই বড় দাদা আমাকে রেল স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে এল গো! ছোট ছোট প্যাকেটে বাদাম বিক্রি করতুম। চুলে তেল নেই। পেটে ভাত নেই। ছেঁড়া ফ্রক। তারপর তুমি সবই তো জানো দিদি!'

মাসিমা বললেন, 'তুই ঠিক তোর মায়ের মতো হয়েছিস। তোকে কি তোর মায়ের মতো দেখতে রে!'

গান্ধারীদি বললে, 'ঠিকই বলেছ! একেবারে মায়ের মতো দেখতে। আমাদের যখন অবস্থা ভাল ছিল এখন আমি যেমন দেখতে আমার মাকেও ঠিক ওই রকম দেখাত। কপালে এতখানি একটা লাল টিপ। সুন্দর একটা শাড়ি। মা মন্দিরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন রাজরানি!'

মাসিমা বললেন, 'জানিস তো গান্ধারী মাঝে মাঝে আমার মায়ের কথা বড্ড মনে পড়ে।'

গান্ধারীদি বললে, 'মনের কথা মনেই রাখ দিদি মন খুলো না। সব মানুষই এখন আনমনা।'

মাসিমা বললেন, 'বাঃ চমৎকার একটা শব্দ বললি তো—আনমনা। আনমাইন্ডফুলের বাংলা! তোর যদি বয়েসটা একটু কম হত আমি তোকে ডক্টরেট করাতুম।'

গান্ধারীদি বললে, 'না বাবা আমি ডাক্তার হতে চাই না। বড়দাকে দেখে আমার শিক্ষা হয়েছে।'

মাসিমা বললেন, 'কোথায় ডক্টরেট কোথায় ডাক্তার! এখন বল তোর মেসোমশাইয়ের কী হল?'

গান্ধারীদি বললে, 'মেসোমশায়ের বিছানার তলায় শালপাতায় মোড়া লাল জবা, বেলপাতা, মেয়েদের মাথার বড় বড় চুল। একটা লাল কাপড়ের টুকরো। কে না কে ঢুকিয়ে রেখেছিল। মেসোমশাই উদুরি হয়ে মারা গেল।'

মাসিমা বললেন, 'তা বেলপাতার সঙ্গে উদুরির কি সম্পর্ক!'

গান্ধারীদি বললে, 'তুমি শহরে থাক তো তাই এসব বুঝবে না। একে বলে তুকতাক। জান তো সম্পত্তি হল কালসাপ। না থাকা সে অনেক ভাল। যদি থাকে অশান্তির একশেষ। জানো তো আমার মেসোমশাইয়ের বড় ভাইয়ের বউ এই কান্ডটা করেছিল। মা বলত, গেঁদো অনেক খেয়ে দুঃখে থাকার চেয়ে অল্প খেয়ে সুখে থাকা ভাল।'

মাসিমা বললেন, 'একেবারে সার কথা। আমি তো এদের বলি, পূর্বপুরুষরা করে গেছেন, দেখো, তোমরা যেন ভাইয়ে ভাইয়ে অশান্তি করে পুড়িয়ে ফেল না!'

গান্ধারীদি বললে, 'তুমি যখন চুল এল করে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক তখন মনে হয় তুমি এই বাড়ির জগদ্ধাত্রী।'

মাসিমা বললেন, 'বাড়াস নি তো! এমনিই মানুষের অহংকার যায় না, সেই আগুনে আর ফুঁ দিস না। এখন বল এগুলোর কি হবে!'

আমি এতক্ষণ শুনছিলুম চুপ করে। এই জগদ্ধাত্রী বলায় আমার মনে হল গান্ধারীদি ঠিকই বলেছে। মাসিমার মধ্যে কি একটা ব্যাপার আছে।

এইবার হল কি বড়মামা আমাদের নগেন কাকাকে নিয়ে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়ল। নগেন কাকার হাতে একটা খ্যাপলা জাল। সেই জালে অন্তত শ-খানেক নানা মাপের রুপোলি মাছ খলবল করছে! সারা ঘরে ছিরছির করে জল পড়ছে। পুকুরের কিছু শ্যাওলা আর ঝাঁজিও রয়েছে। মাসিমা এক লাফে দোলনা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, 'একি একি!'

বড়মামার মুখে উদ্ভাসিত হাসি, 'দেখ দেখ কুসী কী অসাধারণ! কী সুন্দর!

তোকে দেখাবার জন্যে দৌড়ে এসেছি। পুব দিকের পুকুরে জাল ফেলা হয়েছিল তো, দুচোখ ভরে একবার দেখে নে!'

মাসিমা বললেন, 'সত্যি বড়দা তোমার তুলনা তুমিই!'

নগেন কাকু হাসতে হাসতে বললেন, 'জলের মাছ তাহলে জলেই ছেড়ে দিয়ে আসি দিদি।'

গান্ধারীদি বললে, 'আমি একবার কোলে নিয়ে বসব!'

মাসিমা বললেন, 'না নানা, সারা ঘর জলে জল তোর কাজ বাড়ল!'

গান্ধারীদি বললে, 'তা বাড়ুক, বসার ঘরে জ্যান্ত মাছ দেখেছ কখনও?'

বড়মামা হঠাৎ মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একি ছবির পেছন থেকে এগুলোকে কে টেনে বার করলে? কী সর্বনাশ!'

মাসিমা বললেন, 'কেন, কে রেখেছে?'

বড়মামা বললেন, 'আমি আমি!'

মাসিমা বললেন, 'ওখানে রাখার কারণ?'

বড়মামা বললেন, 'মানুষ আঙুলে আংটি পরে কেন! মঙ্গলের জন্যে। তা বাড়িটা কি দোষ করেছে! বাড়ির তো আর আঙুল নেই থাকার মধ্যে আছে দেওয়াল। সেই দেওয়ালে টাচ্ করিয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির ফুল বেলপাতা আর মায়ের শাড়ির আঁচল রেখে দিয়েছি। কেউ মাড়ায়নি তো! যা যা ঠিক যেমন ছিল, রেখে দে, দেওয়াল টাচ্ করিয়ে। তোকে কে এসব নাড়াচাড়া করতে বলেছে?'

গান্ধারীদি বললে, 'লে হালুয়া, কাল রাত্তিরেই তো তুমি বললে, তোদের প্রত্যেককে সায়েব বাড়ি ঘুরিয়ে আনা উচিত। বাড়ি কী করে এন্টারটেন করতে হয়!'

বড়মামা বললেন, 'উঃ আবার সেই ভুল ইংরেজি! এন্টারটেন নয় এন্টারটেন নয়, মেনটেন মেনটেন।' বলতে বলতে বড়মামা বেরিয়ে গেলেন। পেছন পেছন নগেন কাকু।

ঘরের মেঝেতে থৈ থৈ জল। সেই জলে একটা রুপোলি মাছ জাল গলে পড়ে গেছে। সেটা তিরতির করে লাফাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে গান্ধারীদি একটা অসাধারণ কথা বললে, 'দেখ দিদি, এইবাড়ির সুখ এই বাড়ির আনন্দের মতো কী রকম মেঝেতে পড়ে আছে। পুকুরে দিয়ে আসি বলো! সুখটা আরও বড় হোক।'

শাড়ির আঁচলে মাছটা পুরে গান্ধারীদি বেরতে বেরতে বললে, 'বিলু বিলু, আয় আয়। ও অঙ্কটঙ্ক পরে হবে। এমন সুন্দর রোদ, নীল আকাশ শরতের মেঘ। চল চল মাছ দেখি। ফড়িং দেখি। ফুল দেখি। পাখি দেখি...।'

আমার আগে আগে গান্ধারীদি ছুটছে। পেছন পেছন আমি।

বড়মামার সাপ-লুডো

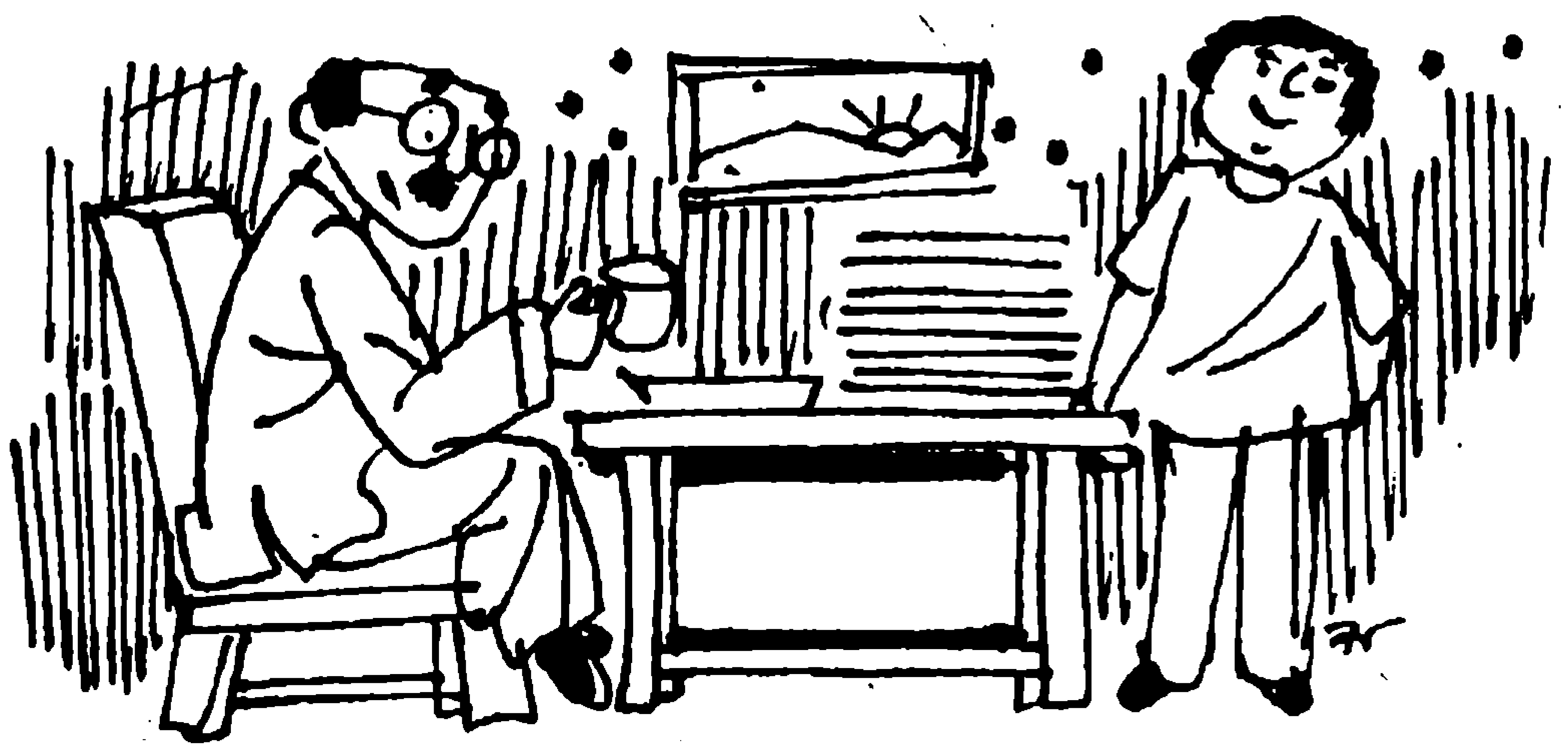

ব ড়মামা বসে আছেন। আজ রবিবার। রবিবার ডাক্তাররা ডাক্তারি করেন না। ডাক্তারদের সঙ্গে সঙ্গে আজ সব অসুখেরও ছুটি। মেজমামা ওপাশে জানলার ধারে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছেন। পাশে চায়ের কাপ, মাঝে মাঝে একটু একটু চুমুক দিচ্ছেন।

বড়মামার এই বসে থাকাটা, অকারণে বসে থাকা নয়। তিনি এর নাম দিয়েছেন, 'সানডে সেসান।' এটা না কি কালচারাল অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাফেয়ারস মিনিস্ট্রির আন্ডারে একদিন চলে যাবে। এর উদ্দেশ্য হল, চরিত্রের উন্নতি করা, সাহস বাড়ান, পরোপকারী হওয়া এবং ভালবাসা আনা। জীবজন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, ঘটি বাটি চেয়ার সব কিছুকে ভয়ঙ্কর ভাবে ভালবাসা।

এই সেসানে আপাতত আমি একা। আমি তৈরি হলে, বড়মামা আমাকে 'অ্যামবাসাডার' করবেন। একটা সাদা রঙের স্কুটার কিনে দেবেন। তার সামনে পতপত করে একটা সাদা পতাকা উড়বে। সেই পতাকায় আঁকা থাকবে একটা শঙ্খ। আমি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বাণীপ্রচার করব।

ভুলে যাও মামলা
রুখে দাও হামলা
এসো ভাই, এসো ভাই
বলো ভাই, ভাই ভাই।।

এই সেসানের এটা দ্বিতীয় দিন। প্রথমে সংকল্প পাঠ। বড়মামা বললেন, 'বলো, প্রত্যেকটা লাইন তিনবার করে। আমার সঙ্গে সঙ্গে,

আমি মানুষ, আমি মানুষ, আমি মানুষ।
আমি গরু নই, আমি গরু নই, আমি গরু নই।।

মেজমামার কান এদিকেই ছিল। তিনি প্রতিবাদ করলেন, 'উঁহু উঁহু, হল না,

হল না। তুমি ঘৃণা শেখাচ্ছ, গরুর প্রতি ঘৃণা। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি গাছপালা, জীবজন্তুও সৃষ্টি করেছেন। গরু মানুষের চেয়ে কম কিসে?'

বড়মামা মানলেন, 'তা ঠিক। আমাদেরই ত সাড়ে ছটা গরু। তার মধ্যে দুটো জার্সি। জার্সির কম দাম?'

'তবেই বোঝ! দুধ খাচ্ছ, ঘি খাচ্ছ, ছানা খাচ্ছ। বলতে নেই, মধ্যপ্রদেশটি দিন দিন আয়তনে বাড়ছে, যেন পেটে একটি বড় সাইজের কুমড়ো ফিট করেছ।'

'যেমন তোমার গর্দানটি, যেন উলটনো ঘট। তার ওপর একটা ফুটবল।'

'এই যে পারস্পরিক হানাহানি, এটা কি ভাল?'

'তুমিই প্রথম শুরু করলে।'

'আমি শুরু করলেও তুমি চালু রাখবে কেন। তুমি তো একজনকে জীবনের উচ্চ আদর্শ শেখাতে বসেছ! শিক্ষক! শিক্ষককে কত সংযত, সহিষ্ণু হতে হবে।' একটুতে ক্ষেপে গেলে ওর চরিত্রতেও সেইটা চলে যাবে। কথায় কথায় তোমার মতো ধেই ধেই করে নাচতে শিখবে। তোমার জীবনটা ত জীবন নয়, ড্যান্স ড্রামা।'

বড়মামা অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে জানতে চাইলেন, 'কি রকম? কি রকম?'

মেজমামা বললেন, 'তুলনা জিনিসটা ভাল নয়। অন্য কিছু বলো।'

বড়মামা বললেন, 'বেশ! এই বলুক, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ...।'

মেজমামা বললেন, 'হল না। এ তো অহঙ্কার! অহঙ্কারী হওয়া কি ভাল?'

বড়মামা বললেন, 'তা ঠিক। অহঙ্কার ভাল নয়। তাহলে কি করা যায়।'

মেজমামা মৃদু হেসে বললেন, 'নতুন কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই বড়দা। পুরোনো ধরে থাকাই ভাল, অন্তত মানুষের ব্যাপারে! জানো তো সেই প্রবাদ, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। নতুন চালে ফ্যান বেশি, জ্যাবজ্যাবে। চাল হিসেবে দেখতে ভারি সুন্দর। ভাত হলেই একতাল চ্যাটচ্যাটে পিণ্ডি। খাদ্য হিসেবেও অপকারী।'

বড়মামা বললেন, 'সবই ত বুঝলুম, এখন এই সমস্যার কি সমাধান!'

মেজমামা বললেন, 'কেন? সংকল্প এই হোক,

সকালে উঠিয়া আমি,
মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন
ভাল কাজ করি।
আদেশ করেন যাহা
মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ,
করি ভাল মনে।।

ল্যাঠা চুকে গেল। এতে মানুষও নেই। গরু, ভেড়া, ছাগলও নেই। আছে আমি, আমার গুরুজন, গুরজনের আদেশ, আছে আমার মন, আর গুরজনের আদেশ ভাল মনে, হাসি মুখে পালন। ফার্স্ট ক্লাস।'

বড়মামা খুশি হয়ে বললেন, 'তোর কোনো তুলনা নেই। তুই আমাদের, তথা দেশের, তথা জাতির, তথা বিশ্বের, তথা...।'

মেজমামা বললেন, 'আর তথা নেই, শেষ।'

বড়মামা বললেন, 'আছে আছে, আমি বিমলবাবুর বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে শুনেছি। একডজন তথার পর বলেছিলেন, গর্বের। তোর তো মাত্র তিনটে হল। তুই আমাদের গর্ব। সাধে তোকে মেজো বলে! মাজা, ঘষার পর এই জিনিস দাঁড়িয়েছে। ঝকঝকে স্বার্থপর!'

মেজমামার হাসি হাসি মুখ নিমেষে ফিউজ।

বড়মামা পরিবর্তন লক্ষ্য করে বললেন, 'কি হল!'

মেজমামা বললেন, 'কি বললে, স্বার্থপর?'

'কেন? ভুল কি বলেছি? আমি অহঙ্কার করতে চাই না, কিন্তু আমি তোর চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর। তার জন্যে অবশ্যই আমার প্রফেসান দায়ী। সারাটা দিনই তো আমাকে পরের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এর হাঁচি, ওর কাশি।'

মেজমামা হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, 'কি বাংলাই শিখেছ ডাক্তার!' কিছু বলার নেই। ইংরেজ আমলে এক বাঙালি আইনজীবী জজ সাহেবকে তোয়াজ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ইওর অনার লুকস ব্লাডি। বিলেত থেকে সায়েব সবে এসেছেন লাল টকটকে হয়ে। সায়েব তো পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারতে যান আর কি! তখন সেই উকিল বুঝিয়ে দিলেন, ব্লাড অন ফেস, ব্লাড অন বডি, হেল্‌থ, হেল্‌থ।'

'তাহলে কি বলতে হবে।'

'বলতে হবে পরার্থপর। যাক, ও ভাবে হবে না। দাঁড়াও; আমি যাচ্ছি।'

মেজমামা ওপাশ থেকে এপাশে এসে বসলেন, আমাদের কাছে।

বড়মামা বললেন, 'এই যে তুই এলি, বুকটা ভরে গেল। হৃদয়টা জুড়িয়ে গেল।'

'কি করব? পরীক্ষার খাতা ফেলে আসতে বাধ্য হলুম। শিক্ষক তো! ছেলেটাকে ভুল পথে মানুষ করার চেষ্টা হচ্ছে। উদাস হয়ে বসে থাকা যায়! কে কাকে মানুষ করবে? যে মানুষ করবে সে নিজে কি মানুষ হয়েছে?'

বড়মামা বললেন, 'তার মানে আমি?'

'শুধু তুমি কেন? আমিও কি মানুষ?'

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, 'তা হলে আমরা কি?'

মেজমামা বললেন, 'আমরা মানুষের মতো দেখতে। কিন্তু আমরা মানুষ নই। আমাদের ভেতরে অনেক আবর্জনা আছে। সেই সব আবর্জনা ফেলতে হবে।'

বড়মামা বললেন, 'সে তোমার পেট থাকলেই আবর্জনা থাকবে। কি করা যাবে?'

মেজমামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি সে-আবর্জনার কথা বলছি না। আমি আমাদের মনের আবর্জনার কথা বলছি।'

মেজমামা আমাকে বললেন, 'বিলে! ওই ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটা নিয়ে আয়।'

ওয়েস্টপেপার বাস্কেট আবার কি হবে! যাই হোক আদেশ পালন করলুম। একটু আগেই শুনেছি, আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে।

মেজমামা বললেন, 'খালি করে নিয়ে আয়।'

বেশ! তাই হোক। যা ছিল সব ফেলে দিয়ে নিয়ে এলুম।

মেজমামা বললেন, 'রাখ এখানে। এটা হল প্রতীক। প্রতীকের ইংরিজী?'

'সিম্বল!'

'গুড! এটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসব।'

ঠিক এই সময় মাসিমা ঘরে ঢুকলেন, 'পাগল দুটো কি করছে! মেঝেতে কেন? মাঝখানে ওটা কি? বাস্কেট! আতা খাওয়া হচ্ছে?'

অনেক সময় আতা এলে দুজনে একটা ঝুড়ি নিয়ে বসেন, সেই ঝুড়িতে বিচি ফেলেন এক ঝুড়ির মতো বিচি হলে, আতা খাওয়া শেষ। অনেক সময় আতার বিচি ধুয়ে পরিষ্কার করে নানারকম আর্ট হয়। সে বেশ মজার।

মেজমামা বললেন, 'বসে পড়। আমরা মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি।'

মাসিমা আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, 'ব্যর্থ চেষ্টা। যা কোনো দিনই হবে না, তার চেষ্টা করে সময় নষ্ট কোরো না। মাঝখানে এই বাস্কেটটা কেন?'

মেজমামা বললেন, 'খুব ভাল সময়ে এসেছিস কুসী। একটু ধৈর্য ধরে বোস।'

মাসিমা বললেন, 'বেশ বসলুম।'

মেজমামা বললেন, 'এইবার আমাদের বাছ।'

মাসিমা অবাক হয়ে বললেন, 'সে আবার কি?'

মেজমামা বললেন, 'যে ভাবে চাল বাছে। কালো চাল, ধান যেমন বেছে বেছে ফেলে দেয়, সেই ভাবে, আমাদের চালে যে বেচাল আছে, সেই বেচাল ধরে ধরে দে, আমরা ফেলে ফেলে দি। খুব নিষ্ঠুর ভাবে বল। কোনো খাতিরের দরকার নেই।'

মাসিমা বললেন, 'তোমরা ভীষণ অহঙ্কারী। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করো না।'

মেজমামা বললেন, 'কি রে বড়দা?'

বড়মামা বললেন, 'ঠিক ধরেছে। সর্বক্ষণ অহঙ্কারে মট মট করছি। লোক দেখলে প্রথমেই যেটা মনে হয়, হ্যাঃ, এ আবার কে। কে হরিদাস পাল। ফুঃ, ভুঃ।'

মেজমামা বললেন, 'আমারও ওই একই কেস। আমার বোধহয় বড়দার চেয়ে বেশি অহঙ্কার। নিজেকে মনে করি জগতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। অন্য কোনো লোকের মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। রোজ সকালে দাড়ি কামাবার সময় বেশ একটা মজা হয়। নিজের মুখই আয়নায়, তবু বলি, কে তুই! তারপর নিজের ভাল বুঝতে পেরে হেসে ফেলি—ওটা ত আমি! আমারই মুখের ছবি! তখন বলি, হ্যাললো, প্রফেসার!'

বড়মামা বললেন, 'আমার অহঙ্কারের অবস্থা শুনবি, আমার নাম ধরে কেউ ডাকলে রাগ ধরে যায়। ডাক্তারবাবু বললে ঠিক আছে। আর সার বললে ত কথাই নেই।'

মেজমামা বললেন, 'নাও, ফেলো। এই ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে অহঙ্কার ফেলে দাও।'

বড়মামা বললেন, 'তোরটাও ফেল।'

মেজমামা বললেন, 'কখন ফেলে দিয়েছি। এরপর কুসী?'

মাসিমা বললেন, 'এইবার রাগ। তোমাদের বিখ্যাত ক্রোধ।'

বড়মামা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। আমার এত রাগ, কথায় কথায় রেগে যাই। সব সময় দাঁত খিঁচোচ্ছি। সব সময়েই যেন টুথ ব্রাশ। সেদিন রেগে গিয়ে ফুলগাছের টবে এক লাথি। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা গাড়ির বনেটের মতো উলটে গেল।'

মাসিমা বললেন, 'ও, টবটা তুমিই ভেঙেছ?'

মেজমামা বললেন, 'আমারও ত ওই এক কেস। আমার এত রাগ, দেহের উত্তাপ সব সময় স্বাভাবিকের চেয়ে দু'ডিগ্রি বেশি। সব সময় নাইনটি নাইন।'

বড়মামা বললেন, 'নে, ফেল। ফেলে দে। ক্রোধ ফেলে দে।'

মেজমামা বললেন, 'এ-এ-ই ফেললুম।'

বড়মামা বললেন, 'হিংসা। তোর হিংসা আছে?'

মেজমামা বললেন, 'নেই আবার! আমার চেয়ে কারো ভাল হয়েছে দেখলে, আমার জ্বর হয়, খিদে কমে যায়। তার সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে যায়। সময় সময় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।'

বড়মামা বললেন, 'আমার এত হিংসে, যে টাক পড়ে গেল। কারুর ভাল হয়েছে শুনলে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়।'

মেজমামা বললেন, 'ফেলো ফেলো, ফেলে দাও। ওটাকে অক্টোপাসের মতো দেখতে। দূর করে ফেলে দাও।'

বড়মামা বললেন, 'মেজো, তোর লোভ আছে?'

মেজমামা বললেন, 'নেই আবার? কারো কাছে কোনো ভাল জিনিস দেখলেই

আমার পেতে ইচ্ছে করে। এই সেদিন প্রফেসার বোসের কাছে একটা বিলিতি পার্কার দেখার পর থেকে আমার রাতের ঘুম চলে গেছে।'

বড়মামা বললেন, 'একই ব্যাপার। সেদিন এক রোগীর আঙুলে একটা পাথর দেখলুম। বড়লোক। দেখেই বুঝেছি, হীরে। আমাদের সত্যেনকে জিজ্ঞেস করলুম, হীরের কি দাম! ও তো পাথরের কারবারী। বললে, রিয়েল হীরে লাখ, দেড়লাখ।'

মেজমামা বললেন, 'ফেলে দাও, ফেলে দাও। বড় বাজে জিনিস। আচ্ছা, তোমার টাকা-পয়সা খরচ করতে কেমন লাগে বড়দা?'

বড়মামা বললেন, 'খুব খারাপ। পয়সা বের করতে হলেই মনে হয় মরে যাই। বাংলায় যাকে বলে, ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। কেউ যদি বিপদে পড়ে সাহায্য চায় আমি তখন পাথরের মতো হয়ে যাই।'

মেজমামা বললেন, 'আমার কেস আরো খারাপ। পাছে খরচ করতে হয়, এই ভয়ে সব টাকা ফিক্সড। বলতে গেলে আমার মতো গরিব খুব কম আছে।'

বড়মামা বললেন, 'তার মানে, আমরা কৃপণ!'

মেজমামা বললেন, 'অবশ্যই। হাড় কেপ্পন।'

বড়মামা বললেন, 'ফেল, ফেল, কৃপণতা ফেলে দে।'

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছেন আমাদের মনোজ কাকু। এক সময় আর্মিতে ছিলেন। তিনি বললেন, 'কিচ্ছু ফেলো না। কিচ্ছু ফেলো না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, যাকে রাখো সেই রাখে। ইংরেজিতে আছে, ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট। এমন গোল হয়ে বসে তোমরা কি করছ?'

মাসিমা বললেন, 'আমরা সাপলুডো খেলছি।'

'অ, স্নেকস অ্যান্ড ল্যাডারস। কখনো সাপের লেজে। কখনো সাপের মুখে। এই ওপরে, তো এই নিচে। তাহলে আমিও বসে যাই।'

সোনার পালক

বড়মামা অনেকক্ষণ ছাতে একা ঘুরছে। সেই বেলা তিনটে নাগাদ উঠেছে, এখন প্রায় সন্ধ্যা হতে চলল। আমি স্কুলের হোমটাস্ক করছিলুম। শীত আসছে বলে মাসিমা কলে সোয়েটার বুনছিল। আমাকে বললে, 'একবার দেখে আয় তো, বড় কত্তা এতক্ষণ ছাতে কি করছে! নিশ্চয় কোনো অপকর্ম!'

'সে করলে করুক না। ছাতেও তো একটা বাথরুম আছে।'

'তোর মাথা। অপকর্ম, দুষ্কর্ম এই সব মিলিয়ে কতরকম কর্ম আছে জানিস?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'এই তো মাস তিনেক আগে ওই ছাতে বসে নিজের চুল নিজে কাটছিল, তারপর কি হলো?'

'ন্যাড়া হতে হলো।'

'তারপর, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কে মারা গেছেন। যেই শোনে কেউ মারা যায়নি, তখন প্রশ্ন, তাহলে কি উকুন! তুই যা, চুপি চুপি একবার দেখে আয়।'

আমার মামার বাড়িটা খুব সুন্দর জায়গায়। কিছু দূরেই একটা সরোবর। ভোরবেলায় দিগ্বিদিক থেকে হরেক রকমের পাখি এসে জলে নামে। চারপাশের গাছ নানারকমের পাখিতে ভরে যায়। আর এই সন্ধ্যেবেলায় সব বাসায় ফেরার পালা। ছাতের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে। কত রকমের ডানার শব্দ। হুস্ হুস্, ফটফট, ঝপাস ঝপাস। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে গায়ে ডানার বাতাস লাগে।

বড়মামার যত সব উদ্ভট গল্প। যখন ক্লাস টু-তে পড়তুম, বিশ্বাস করতুম। চোখ বড় বড় হয়ে যেত। একবার এক পূর্ণিমার রাতে ফটফটে চাঁদের আলোয় বড়মামা এই ছাতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাচের মতো আকাশ। হঠাৎ সেই আকাশ থেকে কি একটা পাক খেতে খেতে নিচের দিকে নেমে আসছে। ঠক করে বুকে

এসে পড়ল। তুলে দেখল, এই এত বড় একটা সোনার পালক। ভীষণ সুন্দর! তার যে কত টাকা দাম হবে, কারো ধারণা নেই।

'কিসের পালক? কার পালক?'

'হাঁসের পালক। এক ধরনের স্বর্গীয় হাঁস আছে, যারা আকাশের খুব উঁচুতে, মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তারা স্বর্গে থাকে। পৃথিবীর একটা জায়গায় তারা পূর্ণিমার রাতে নামে, সেই জায়গাটার নাম মানস সরোবর। পৃথিবীর মানুষের জন্যে তারা ডানা থেকে একটা করে পালক খসায়। সেই সোনার পালক কে পায় জানিস? যারা সৎ, সুন্দর, জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলে না, লেখাপড়ায় ভাল, ফার্স্ট, সেকেন্ড হয়।'

'তুমি যা বললে, সেই রকম হলে, আমারও বুকে সোনার পালক পড়বে?'

'আলবাৎ পড়বে।'

সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করলুম, একটাও মিথ্যে কথা বলব না। একটাও বাজে কাজ করব না। লেখাপড়া মন দিয়ে করব। সবাই বলতে লাগল, পিন্টুটা হঠাৎ কি রকম বদলে গেছে। পরীক্ষাতেও ফার্স্ট, সেকেন্ড হচ্ছে। বড়মামা বলেছিল, দেখ, এসব কথা কারোকে বলবি না, সিক্রেট। সোনার পালকের কথা কারোকে বলবি না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, তোমার পালকটা কোথায়? বড়মামা বললে, সেই পালকটা দিয়ে, আমি ভগবানের কাছ থেকে বুদ্ধি কিনেছি। বুদ্ধি তো দোকানে পাওয়া যায় না।

তখন সবই বিশ্বাস করেছিলুম।

বড়মামা, আমি যখন আর একটু বড় হলুম, তখন একদিন বললে, সোনার পালকের রহস্যটা বুঝলি। সোনার পালক হলো চরিত্র। আমি বললুম, সে আমি অনেক আগেই বুঝেছি বড়মামা। সোনার পালক আমি পেয়েছি। বড়মামা বললে, সেই কলমে নিজের জীবনী লিখে যা।

বড়মামা ছাতের মাঝখানে একটা মাদুর পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো খোলাই রয়েছে। মাসিমার নির্দেশ মতো চুপি চুপি এলেও বড়মামা ধরে ফেলেছে, 'কিসের অনুসন্ধান ভাগনে?'

'না, কোনো অনুসন্ধানই নেই। বেড়াতে এসেছি।'

'তা ভাল। তবে আমি জানি, কি কারণে এসেছিস!'

'কি কারণ!'

'কুসী পাঠিয়েছে। দেখে আয় তো কি করছে!'

'মিথ্যে কথা বলব না, মাসিমা বললে, দেখে আয় তো বড়টা অনেকক্ষণ ছাতে একলা রয়েছে, কি আবার অপকর্ম করছে।'

'এ অপবাদ আমার ঘুচল না রে ভাগনে! এতখানি বয়েস হলো আমার। তুই সেই গল্পটা জানিস?'

'কোনটা?'

'গুড়ের ফোঁটা।'

'না।'

'তাহলে শোন। এক মুদিখানার দোকানের বাইরে দুই ভদ্রলোক বাঁশের মাচানে পাশাপাশি বসে আছে। ওদিকে দোকানি বসে আছে টাটে। খুব কেনাবেচা চলছে। সকালের ভিড়। ওই দুই ভদ্রলোকের একজন হলো শয়তানের দূত, আর একজন দেবদূত। শয়তানের দূত খুব দুঃখ করে দেবদূতকে বলছে, 'দ্যাখো ভাই, পৃথিবীর যেখানে যত গণ্ডগোল, লোকে বলে শয়তানের কারসাজি। আমার প্রভুর এমনই বরাত। আচ্ছা, এই যে গুড়ের টিনটা এইখানে রয়েছে, এর থেকে আঙুলে করে একটা ফোঁটা নিয়ে আমি এই বাঁশের খোঁটায় লাগালুম।'

শয়তানের দূত ছোট্ট একটা ফোঁটা লাগিয়ে দেবদূতের পাশে এসে বসল। দেবদূতকে প্রশ্ন করল, 'এর মধ্যে তুমি শয়তানের কোনো কারসাজি দেখতে পাচ্ছ?'

দেবদূত বললে, 'না। অনেকেই অমন করতে পারে। খদ্দেররাও অনেকে আঙুলে কিছু লাগলে বাঁশের গায়ে মুছে দেয়।'

শয়তানের দূত বললে, 'তবে? সব দোষ আমার প্রভুর ঘাড়ে! আচ্ছা, আমি তবে আসি ভাই। তুমি খানিক বসে যাও।'

শয়তানের দূত চলে গেল। দেবদূত বসে রইল উদাস। দেবদূতদের মাঝে মাঝে অমন হয়, কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করে না। ঘন ঘন হাই ওঠে। মানুষ হলে চা খেত। দেবদূতদের তো চা খাওয়া বারণ। চা হলে শয়তানের আরক। দেবদূত দেখছে, গুড়ের ফোঁটাটা লক্ষ্য করে এক সার পিঁপড়ে বাঁশ বেয়ে উঠছে। আর বেশ মোটাসোটা একটা টিকটিকি একেবারে টঙে নিচের দিকে মুখ ঝুলিয়ে স্থির। কোথাও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই। খদ্দেররা আসছে যাচ্ছে। দাঁড়িপাল্লা, বাটখারার শব্দ। নানা কথা। কখনো বচসা। দেবদূত দেখছে, টিকটিকিটা পিঁপড়ে ধরার লোভে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। তা এগোক। টিকটিকির কাজ টিকটিকি করুক। একটা বেড়াল আধবোজা চোখে থুপ্পি মেরে বসেছিল। বেড়ালটা টিকটিকি দেখে মারলে লাফ। একটা কালো মুশকো কুকুর ঝিমোচ্ছিল এক পাশে। চিরশত্রু বেড়াল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ালটার ঘাড়ে। এইবার বেড়াল আর কুকুর ঝটাপটি করতে করতে দোকানদারের ঘাড়ে। দোকানদার এক লাফ। মাথার কাছে তাকে তাকে যত কৌটো-ফৌটো ছিল সব পড়তে লাগল শিলাবৃষ্টির মতো। খরিদ্দার ভয়ে ছুটোছুটি। নিমেষে দোকান লণ্ডভণ্ড। দেবদূতও দৌড় মেরেছে। একটা গাছের তলায় শয়তানের দূত গুড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। দেবদূত হাঁপাচ্ছে। শয়তানের দূত বললে, 'এসো ভাই, বোসো, হাঁপাচ্ছ কেন?' দেবদূত পাশে বসে বললে, 'তোমার কেরামতি আছে ভাই।' দেবদূত তাকিয়ে আছে। শয়তানের দূত বললে, 'সবই আমার প্রভুর ইচ্ছা ভাই।'

বড়মামা গল্প শেষ করে বললে, 'জানিস তো, আমার ওই গুড়ের ফোঁটা। কুসীর দোষ নেই। সবই আমার বরাত। সেদিন খাটটাকে জানলার দিকে সরাব বলে যেই টানলুম, একটা পায়া মচকে গেল। খাটটা এখন তোর ইনক্লাইনড প্লেন। এধারে শুলুম তো কিছুক্ষণের মধ্যে গড়িয়ে ওধারে। যেন খাদে পড়ে গেলুম গড়িয়ে। তারপরেই শুরু হলো কসরত। গড়িয়ে ওপরে উঠতে হবে। সারা রাত ধস্তাধস্তি। রাত ভোর। একে বলে একসারসাইজ অন ইনক্লাইনড প্লেন। এই ব্যায়ামের ফলে আমার ভুঁড়িটা কত উন্নত হয়েছে দ্যাখ।'

'তাহলে মাসিমাকে কি বলব?'

'বলবি, এক ভদ্রলোক অতি ভদ্রলোকের মতো ছাতে শুয়ে আছে।'

'কেন শুয়ে আছ? শুয়ে কেন আছ?'

'আমার মন খারাপ। আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। মা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের আর কে আছে! ভাই, বোন, ভাগনে থাকাও যা, না থাকাও তা। আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে তোকে পাঠাতেন না, নিজেই চলে আসতেন। আমার মাথার কাছে বসে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনাতেন, কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি, গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগনে মদন।'

'তা তুমি আরো কতক্ষণ এইভাবে শুয়ে থাকবে!'

'সে তো বলতে পারছি না, মন ভাল হলেই উঠে পড়ব।'

মাসিমাকে গিয়ে রিপোর্ট করলুম।

মাসিমা বললে, 'মা থাকলে কি করত?'

'মাথার শিয়রে বসে চুলে হাত বোলাতেন আর কুমোরপাড়া শোনাতেন।'

'তাই না কি! মা যা রাগী ছিলেন! এমন একটা দিন ছিল না, যে বড়দা পেটানি খায়নি। ব্যাপার অন্য, চল তো, আমার সঙ্গে চল।'

মাসিমা ছাতে গিয়েই বললে, 'এই ওঠো তো। ওঠো, ওঠো।'

বড়মামা বললে, 'অসম্ভব। এখন আমার মায়ের সঙ্গে কমিউনিকেশান চলছে। নানারকম মেসেজ আসছে, ডোন্ট ডিসটার্ব।'

'তুমি উঠবে, না গায়ে আরশোলা ছাড়ব।'

আরশোলার ভয়ে বড়মামা একবার ভুবনেশ্বরে পালিয়েছিল। সেখান থেকে আবার পালিয়ে এসেছিল কাঁকড়াবিছের ভয়ে। আরশোলার নাম শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। মাসিমা বললে, 'আমার এই কৌটোয় বেশ বড়সড় তেলচুকচুকে একটা আছে, পিঠের দিকেই ছাড়ি।'

বড়মামা এক লাফে ছাতের ট্যাংকের কাছে। মাসিমা আমাকে বললে, 'মাদুরটা তোল!' এই মাসখানেক আগে প্রচুর খরচা করে ছাতে পাথর বসানো হয়েছিল। একটা পাথর চৌচির! মাসিমা হুঙ্কার ছাড়ল, 'বড়দা, এটা কি?'

বড়মামা সরল বালকের মতো এগিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'এ কি! ফেটে চৌচির!'

মাসিমা বললে, 'সে তো আমরা সবাই দেখছি। প্রশ্ন হলো, এই অপকর্মটি কার?'

বড়মামা বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার বটে। যখন মাদুর পাতলুম তখন কিচ্ছু ছিল না। বইয়ে পড়েছিলুম, মানুষের দুঃখে পাথর ফাটে, আজ স্বচক্ষে দেখলুম।'

'কোন মানুষের দুঃখ?'

'আমার দুঃখে পাথর ফ্র্যাকচার।'

'তোমার আবার কিসের দুঃখ!'

'হঠাৎ মা-র কথা মনে পড়ল। শীতকালে মা আমাদের কতরকম করে খাওয়াতেন। মায়ের কোলে চড়ে ঝুলনের মেলায় দিয়ে কাঠের বাঘ কেনা।'

'কোলে চড়ার কাল পর্যন্ত মনে আছে! বাব্বা! কি মেমারি!'

আমি থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, 'বড়মামা, তুমি না সোনার পালক পেয়েছিলে!'

বড়মামা থতমত খেয়ে আমার দিকে তাকাল, 'তাহলে সত্যি কথাই বলি, এটা কাশ্মীর কেস।'

'জঙ্গি হানা! তলার দিক থেকে পাথর ফাটিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা।'

বড়মামা বললে, 'না, আখরোট। হাতুড়ি দিয়ে ঠুকছি। মুখে ফেলছি। এক বেটা এতই নিরেট, ছিটকে বেরিয়ে গেল, ধরে এনে মারলুম এক ঘা। রেগে গেছি তো। রেগে গেলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। আর সেই কারণেই আখরোটটা জানে বেঁচে গেল। হাতুড়ি মিস করল। পড়ল পাথরে। কেয়াবাত, ফ্র্যাকচার। সঙ্গে সঙ্গে মাদুর পেতে শয়ন। তবে হ্যাঁ, এইটুকু বলতে পারি, আমি একটা দামী জিনিস পেয়েছি। ফাটা পাথরের উপহার। কাউকে দেখাব না। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

বড়মামা পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে।

মাসিমা বললে, 'তুই, বন্দেমাতরম বলে ঝাপটে ধর।'

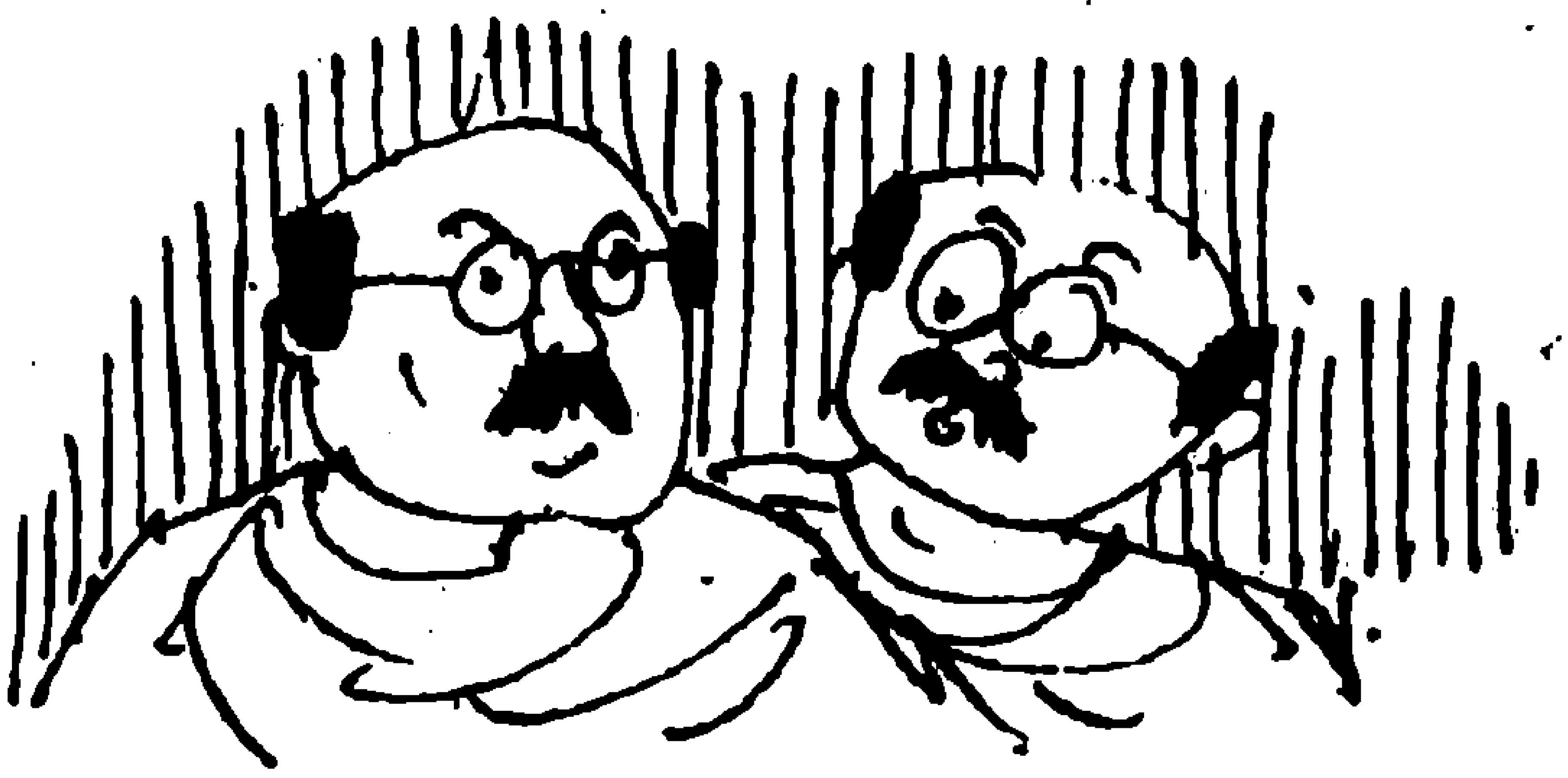

---

৩৪৫ থেকে ৩৬৭ নং পাতার ছবি এঁকেছেন শংকর বসাক

মামা সমগ্র
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়